খুশবন্ত সিং এর
সাড়া জাগানো উপন্যাস

দিল্লী

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস-
৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল | মাঘ ১৪০৪
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ | পৌষ ১৪০৬
জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ শিল্পী | ফরিদী নুমান

কম্পিউটার কম্পোজ | এ্যাপেলটক কম্পিউটার
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | একশত ষাট টাকা মাত্র

DELHI- a novel by Khushwant Singh. Translated by Anwar Hossain Manju— Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First edition : February 1998 and Second Print : January 2000
Price : taka 160 only.

ISBN 984-11-0451-9

ভূমিকা

ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিং ১৯১৫ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের হাদালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর সরকারি কলেজ এবং লন্ডনের কিংস কলেজ ও ইনার টেম্পলে পড়াশুনা করেন। লাহোর হাইকোর্টে বেশ কয়েক বছর আইনজীবীর পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন। কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন কানাডা ও ইংল্যান্ডে। ইউনেস্কোর সাথে জড়িত হয়ে প্যারিসে কাটান কিছুকাল।

সাংবাদিক হিসেবে তার কাজের শুরু ১৯৫১ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে। তখন 'যোজনা' নামে একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকও ছিলেন (১৯৫১-১৯৫৩)। ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত। একই সাথে ১৯৭৮-৭৯ সালে ন্যাশনাল হেরাল্ডের সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৭৯-৮০ সালে 'নিউ দিল্লী'র প্রধান সম্পাদক ও ১৯৮০-৮৩ সালে হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক ছিলেন। ভারতের সবগুলো প্রধান দৈনিকে এবং দেশের বাইরেও তিনি লিখে থাকেন। ভারতের ক্ষুরধার লেখনীর কলামিস্ট হিসেবে তাঁর বহুল পরিচিতি।

লেখক হিসেবেও তিনি অত্যন্ত সফল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে দুই খন্ডে সমাপ্ত শিখ জাতির ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ গ্রন্থ। বেশ কিছু উপন্যাসও লিখেছেন তিনি। 'ট্রেন টু পাকিস্তান' ১৯৫৪ সালে গ্রোভ প্রেস পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'দিল্লী' উপন্যাসটিও পাঠকের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

খুশবন্ত সিং ১৯৮০-৮৬ সালে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৪ সালে প্রেসিডেন্ট তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু ১৯৮৪ সালে অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হামলার পর তিনি 'পদ্মভূষণ' খেতাব ফিরিয়ে দেন।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'দিল্লী'র অধ্যায়গুলো তিনি লিখেছেন দীর্ঘ ২৫ বছরে। ইতিহাস এই উপন্যাসের মূল বিষয় হলেও তাঁর ভাষায়, 'ইতিহাস আমাকে দিয়েছে উপন্যাসের কঙ্কাল। আমি সংযোজন করেছি মাংস এবং তাতে রক্ত ও বীর্যসহ অন্যান্য তরল উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছি।'

অনুবাদকের কথা

টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' ১৯৮৫ সালের দু'টি সংখ্যায় প্রকাশিত খুশবন্ত সিং-এর 'লাস্ট এন্ড দ্য লোনলি সিটি' গল্পটি পড়ে মুগ্ধ হই। গল্পের কাহিনী কবি মীর তকী মীরকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কাহিনীটি অনুবাদ করে ফেলি। কিন্তু অনুবাদ প্রকাশ করতে সম্পাদকরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েন। যৌন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা ছিল কাহিনীতে। সে জন্যই তাদের দ্বিধা। অবশেষে পাক্ষিক নিপুণের সম্পাদক মোস্তফা জব্বার যথেষ্ট কাটছাঁট করে 'নিস্তব্ধ নগরী' নামে অনুবাদটি প্রকাশ করেন। খুশবন্ত সিং তখন ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্য পরিষদের সদস্য। তাকে চিঠি লিখি আমার অনূদিত কাহিনীসহ তার প্রকাশিতব্য উপন্যাসটি বাংলায় অনুবাদ করার সুযোগ কামনা করে। তিনি আমার চিঠির উত্তরে বাংলায় প্রকাশিত অনুবাদ পাঠাতে বলেন এবং জানান যে, '৯০ সালের পূর্বে উপন্যাসটি প্রকাশের সম্ভাবনা নেই। আমি তাকে নিপুণের কপি পাঠিয়ে দেই। ১৯৮৮-৮৯ সালে আমার যুক্তরাষ্ট্র অবস্থানকালে খুশবন্ত সিং-এর প্রথম উপন্যাস 'ট্রেন টু পাকিস্তান' এর প্রথম সংস্করণের একটি কপি পেয়ে পাঠ করি। তার উপস্থাপনা ও ভাষার গতি আমাকে আরো আকৃষ্ট করে। ১৯৯২ সালে আমার দিল্লী অবস্থানকালে 'দিল্লী' উপন্যাসটি সংগ্রহ এবং উপন্যাসে বর্ণিত প্রায় প্রতিটি স্থানে গমন করি, যাতে অনুবাদের ক্ষেত্রে উপন্যাসের মূল চরিত্র ও স্থানগুলোর সাথে নিজেকে একাত্ম করতে পারি। অনুবাদে আমি কতটুকু সফল হয়েছি জানি না, কিন্তু পাঠক হিসেবে দারুণ উপভোগ করেছি খুশবন্ত সিং-এর সাড়া জাগানো উপন্যাস 'দিল্লী'কে। বাংলা ভাষী পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি গ্রহণ করবেন বলে আশা করি।

P/১১২২৯
২৫৭৮২

সূচীপত্র

১.	দিল্লী	৭
২.	লেডী জেএইচটি	১৫
৩.	ভাগমতী	২৫
৪.	হযরত খাজা নিজামুদ্দিন ও মুসাদ্দিলাল	৩৯
৫.	ভাগমতী	৬১
৬.	তৈমুর লং এর দিল্লী অভিযান	৬৬
৭.	ভাগমতী	৭১
৮.	সম্রাট শাহজাহান ও মেথর জৈতা	৮৩
৯.	ভাগমতী	৯২
১০.	হিন্দুস্থানের মহান সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর	৯৭
১১.	ভাগমতী	১১০
১২.	নাদির শাহের দিল্লী অভিযান	১১৩
১৩.	ভাগমতী	১২৯
১৪.	কবি মীর তকী মীর	১৩১
১৫.	ভাগমতী	১৫৮
১৬.	১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ	১৬১
১৭.	ভাগমতী	২১০
১৮.	ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্তিম লগ্ন	২১২
১৯.	ভাগমতী	২৩১
২০.	দেশ বিভাগ ও গান্ধীর হত্যাকান্ড	২৩২
২১.	ভিন্দ্রানওয়ালে ও ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ড	২৪৮

পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

১

দিল্লী

বিদেশের মাটিতে বেশ্যাদের সঙ্গে যৌনলীলায় নিজেকে তৃপ্ত করে আমি যখন দিল্লীতে ফিরে আসি, তখন ফিরে আসি আমার কামসঙ্গিনী ভাগমতীর কাছে। দিল্লী এবং ভাগমতীর মধ্যে অনেক বিষয়েই অদ্ভুত মিল। দীর্ঘদিন ধরে জঘন্য গোঁয়ার মানুষের হাতে দলিত মর্দিত হয়ে তারা তাদের অবসাদে আচ্ছন্ন সৌন্দর্যকে কুদর্শন মুখোশের অন্তরালে গোপন করতে শিখেছে। তারা শুধুমাত্র তাদের প্রেমিকদের কাছে নিজেদের আসল রূপ মেলে ধরে, যাদের মধ্যে আমি নিজেকেও গণ্য করি।

নতুন কোনো আগন্তুকের কাছে দিল্লীকে মনে হতে পারে এক মৃত নদীর তীরে কোলাহলপূর্ণ বাজার, কিছু ভগ্নপ্রায় মসজিদ আর দুর্গের ফাঁকে ফাঁকে গড়ে ওঠা বস্তির ভিড়ে আক্রান্ত নগরী বলে। সে যদি নগরীর সরু গলিপথ ধরে অগ্রসর হয়, তাহলে উপচে পড়া ময়লার দুর্গন্ধে তার বমির উপক্রম হবে। দিল্লীবাসীরা নিজেদেরকে কারো প্রিয়ভাজন করতে কোনো চেষ্টাই করে না। তারা যত্রতত্র কফ আর পানের পিক ফেলে। যখন যেখানে প্রকৃতির ডাক আসে, সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করে। তারা উচ্চকণ্ঠ। অশ্রাব্য গালিগালাজের সঙ্গে তারা এতোই সম্পৃক্ত যে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তার প্রয়োগ করে। তারা যখন কথা বলে তখন শরীরের গোপন স্থান চুলকায়। এই বিবরণ ভাগমতীর বেলায়ও প্রযোজ্য। যারা তাকে চিনে না তাদের কাছে সে কুৎসিৎ। তার গায়ের রং কালো এবং মুখে গুটি বসন্তের দাগ। সে বেঁটে এবং মোটা। দাঁত অসমান এবং জর্দা চিবানো আর বিড়ি টানার কারণে হলদে বর্ণ ধারণ করেছে। সে মোটা কাপড় পরে আর তার কণ্ঠস্বরও মোটা। তার কথাবার্তা বিরক্তিকর এবং ব্যবহার আপত্তিকর।

আমি যা বললাম, তা নিরেট উপরিকাঠামো- ঠিক দুর্গন্ধ ছড়ানো তেলের মতো, যা লোকজন ব্যবহার করে মশার কামড় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। অথবা রক্তচোষা কৃমির হাত থেকে রক্ষা পেতে। দিল্লীর বাসিন্দা হিসেবে এই অবস্থা থেকে বাঁচার জন্য ভিন্নতর আর কিইবা করার আছে। বিশেষ করে ভাগমতীর মতো কারো সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকে। মার্বেল পাথরে নির্মিত ভবনগুলোর উপরের আকাশ নীল। নগরীর গম্বুজওয়ালা মসজিদ আর পেন্সিলের মতো সোজা মিনারগুলো যেন রংধনু। মাটি থেকে কখনো সুগন্ধি 'খাস' ও 'জেসমিনের' সুবাস ভেসে আসে। এর মধ্যে মেঘবর্ণের ভাগমতী যখন তার গুরু নিতম্ব দুলিয়ে এগিয়ে আসে তখন তাকে মনে হয় মন্দিরের নর্তকী। তার মুখে তাজা লবঙ্গের গন্ধ আর সে কথা বলে হিন্দুস্থানের মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর মতো। যখন সে যৌনকাতর হয়ে পড়ে তখন প্রতিটি কামুক মহিলার মতোই আচরণ করে। এটা খুবই সহজ ফর্মূলা- এ কাজে তোমার মাথা নয়, হৃদয় ব্যবহার করো। যুক্তি নয়, আবেগ প্রকাশ করো।

আমার কাছে দিল্লী নগরী আর ভাগমতী- দুইই রহস্যময়। আসল সত্যটা হচ্ছে, আমি কোনোভাবে আমার চিন্তা-ভাবনায় দ্বিধাগ্রস্ত। অর্থাৎ আমি যা বলতে চেষ্টা করছি তা হচ্ছে, যদিও দিল্লীতে বসবাস করে আমি বিতৃষ্ণ এবং ভাগমতীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে লজ্জিত, তবু এই দু'টি থেকেই আমি নিজেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন রাখতে পারি না। কলমের আঁচড়ে আমার গোটা জীবনে এই নগরী ও মহিলাটির সঙ্গে প্রেম ও ঘৃণার অদ্ভুত প্রসঙ্গগুলোই তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। এ

আলোচনার একটি শিরোনাম দেয়া যেতে পারে- 'ফাকিং ম্যানস গাইড টু দিল্লীঃ পাস্ট এন্ড প্রেজেন্ট' অর্থাৎ 'দিল্লীতে কামুক ব্যক্তিদের নির্দেশিকাঃ অতীত ও বর্তমান'। কিন্তু আমি তা বোঝাতে চাই না।

গ্রীনিচ সময় ২১০০টায় বিমান পালাম স্পর্শ করলো। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা পর। একজন বললো, সরকার বিমান ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হাতে নেয়ার পর থেকেই এয়ার ইন্ডিয়া সময় ঠিক রাখতে পারছে না। স্পীকারে একটি কণ্ঠ আমাদের আসনে বসে থাকার নির্দেশ দিলো। পাশ দিয়ে গমণরত একজন এয়ার হোস্টেসকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?' সে তার মুখটা আমার কানের কাছে নামিয়ে বললো, 'স্বাস্থ্যগত কারণে'। মানুষ যতোরকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, ভারত সে সব রোগব্যাধির অধিকাংশের জননী। তিনি তার তালিকায় নতুন কোনো ব্যাধি যোগ করতে চান না। আমরা বসে রইলাম। ফিসফাস কথা বললাম।

কেউ বিমানের দরজায় জোরে থাপ্পড় দিচ্ছে। ইয়ার্ড দরজা খুললো। চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত সাদা অ্যাপ্রন পরা দুই ব্যক্তি প্রবেশ করার সাথে সাথে গরম বাতাসের ঝাপটা লাগলো। তারা যাত্রীদের মধ্যে মুদ্রিত ফর্ম বিতরণ করলো। আমরা ফর্মের প্রশ্নগুলো পূরণে ব্যস্ত হলাম- গত দশ দিন তুমি কোথায় কাটিয়েছ? নবম দিন? গতকাল? একজন তার পকেট থেকে ক্যানিস্টার বের করে বিমানের সারি দিয়ে যেতে যেতে স্প্রে শুরু করলো। নাকে হাসপাতালের গন্ধ পেলাম। এবার আমরা অবতরণ করতে পারি। আমরা সারি ধরে নামলাম। ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের বহির্গমণ গেটের সামনে বৃহদাকৃতির একটি রোলস রয়েস গাড়ি। নম্বর প্লেটের ওপর প্রেসিডেন্টের ত্রিমুখী সিংহের প্রতীক লাগানো। গাড়ির পাশেই দাঁড়ানো প্রেসিডেন্টের এডিসি। পুষ্পস্তবক ধরে আছে একজন আর্দালী। তাদের পেছনেই অর্ধ ডজন ফটোগ্রাফার নাকের কাছে ক্যামেরা উঁচিয়ে অপেক্ষমান। এক হাতে ফার কোট আরেক হাতে হ্যাট ধরা এক শ্বেতাঙ্গিনীকে বিমানের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গেলো। ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলে উঠলো। এডিসি পায়ের গোড়ালি উঁচু করে স্যালিউট দিলো। সে খানিকটা এগিয়ে শ্বেতাঙ্গিনীর ফার কোট এবং হ্যাট নিজ হাতে নিয়ে তা আর্দালীর হাতে দিলো। মহিলাকে একটি ফুলের মালা পরিয়ে হাতে ফুলের তোড়া ধরিয়ে দিয়ে পুনরায় স্যালিউট দিলো। শ্বেতাঙ্গিনী তার দিকে তাকিয়ে দন্ত বিকশিত করলো। উভয়ে রোলস রয়েসে গিয়ে বসলো। রোলস রয়েস অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

ভদ্র মহিলা কে?

আমরা গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়েছি। এয়ার ইন্ডিয়ার একজন কর্মকর্তাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশিত হলাম। এয়ারপোর্টের উজ্জ্বল আলো এবং আলো ঘিরে পোকার ভিড় থেকে বাঁচতে হাত দিয়ে চোখ আড়াল করলাম। কিছু পর 'ইন্টারন্যাশনাল' বোর্ড লেখা দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম। পন্ডিত নেহেরুর বড়সড় ছবি সংবলিত পোস্টার আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে 'ওয়েলকাম টু ইন্ডিয়া'।

একজন পুলিশ সার্জেন্ট আমাদের কাছ থেকে হেলথ কার্ড সংগ্রহ করে তার টেবিলের বাক্সেটে রাখলো। একজন সাব-ইন্সপেক্টর পাসপোর্ট পরীক্ষা করে তাতে সিলমোহর মেরে ফেরত দিলো। একজন কাস্টমস অফিসার কিছু ফর্ম দিলো প্রতিটি তিন কপি করে পূরণ করতে। তিনটিতে লিখতে হবে, আমরা বিদেশে কী ক্রয় করেছি। তিনটিতে লিখতে হবে আমাদের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা আছে কিনা। এসব পূরণ করতে আধ ঘন্টা সময় ব্যয় করলাম। কাস্টমসের লোকরা সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছে আমাদের কোনো দুর্বলতা খুঁজে পেতে। আমরা ক্লান্ত, শ্রান্ত। আমাদের ভাবভঙ্গিতে গোপনীয় কিছু প্রকাশ পেলো না।

চল্লিশ মিনিট পর কাস্টমস শেডে ট্রলি চলাচল শুরু হলো। কুলিরা মেঝের ওপর মালামাল নামিয়ে রাখছে। আমার সুটকেস পেয়ে একজন কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে ধরলাম। আমি বিদেশে কিছু কিনিনি এবং আমার কাছে বৈদেশিক মুদ্রাও নেই। ইন্সপেক্টর আমার কথায় বিশ্বাস করলো না। সে আমার ডিক্লারেশন ফর্ম, পাসপোর্ট পরীক্ষা করে দেখলো। আমার সুইকেস খুললো এবং আমার কাপড়চোপড় উল্টাপাল্টা করে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়তে লাগলো-

'কোনো হুইস্কি টুইস্কি?'

'না।'

'টেপ রেকর্ডার?'

'না।'

'ক্যামেরা ট্যামেরা?'

'না।'

'ঘড়িটড়ি?'

'না।'

সে খপ করে আমার হাত ধরে চকচকে নতুন তলকান অ্যালার্ম ঘড়ি পরীক্ষা শুরু করলো। বৈরুত এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপে ৩৫ পাউন্ড দিয়ে এটা কিনেছি।

'কত হয়েছে?'

হিপ পকেট থেকে আমার বাবুর্চির জন্যে কেনা ঘড়ির রশিদ বের করে দেখালাম, 'সাত পাউন্ড'।

ইন্সপেক্টর হতাশ হলো। সে সুটকেসে চক দিয়ে দাগ কাটলো, যেন লিখছে 'গোল্লায় যাও'।

একজন কুলি এসে আমার সুটকেস ধরলো। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের টানাহেঁচড়ার মধ্যেও একটা ট্যাক্সি ঠিক করলাম। কুলি সুটকেসটি পেছনের সিটে রেখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। 'ও কে স্যার, সালাম।' এয়ারপোর্টের বিধান অনুসারে কুলিকে বকশিশ দেয়া নিষিদ্ধ। সে আমার কাছ থেকে পাঁচ টাকা আদায় করলো।

শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভারের আরেক শিখ বন্ধু সামনের আসনে বসা ছিলো। বিশ মিনিট পর আমার গন্তব্যে পৌঁছলাম। ড্রাইভার দিয়াশলাই এর কাঠি জ্বেলে মিটার দেখে বললো, 'সাড়ে আঠারো টাকা। লাগেজের জন্য আরো দুই টাকা। মোট বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা'।

'সাড়ে আঠারো?' আমার কণ্ঠে অবিশ্বাস। কয়েক সপ্তাহ আগে পালাম এয়ারপোর্টে যেতে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে যতো দিয়েছি এরা তার দ্বিগুণের বেশি হাঁকছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আবার বললো, 'সাড়ে আঠারো টাকা'। তার বন্ধু আরেকটা কাঠি জ্বালালো, 'দেখুন না মিটার, সাড়ে আঠার।' একজন শিখ আরেকজন শিখের সাথে যুক্তি প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু একজন শিখের কখনো দু'জন শিখের সাথে তর্ক করা উচিত নয়। আমি বিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সাতো বটেই আরো দুই টাকা বখশিশ দিলাম।

আমাদের মহল্লার নৈশ প্রহরীও একজন শিখ। আমি দিল্লীর বাইরে গেলে আমার ফ্ল্যাটের চাবি তার কাছেই রেখে যাই। সে খুব সৎ লোক। কিন্তু পাগড়ির নিচটা দুর্বল। কিছু গোলমেলে স্বভাবের কারণে তাকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। যদিও সে ছিলো সামান্য ট্রাক ড্রাইভার, কিন্তু কখনো ভুলতে পারে না যে, এককালে সে সৈনিকের ইউনিফর্ম পরিধান করেছে। সে খাটিয়া থেকে লাফ দিয়ে নিজেকেই অর্ডার দিলো, 'স্যালিউট' এবং আমাকে স্যালিউট দিলো। যেন আমি তার রেজিমেন্টের কর্নেল ছিলাম। সে আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করলো, 'হাউ ওয়াজ হিজ ম্যাজেস্টি দি কিং অব ইংল্যান্ড?'

'ইংল্যান্ডে এখন একজন রাণী আছেন।'

সে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবতে নারাজ। 'ভেরি ওয়েল স্যার। ডিড ইউ আস্ক হিজ- বেগ পার্ডন, হার ম্যাজেস্টি, হোয়াই শি ডিড নট অ্যান্সার মাই লেটারস?'

'বুধ সিং তুমি আর কতকাল এরকম থাকবে?' আমি তাকে ভদ্রভাবে বলি। বুধ (বুদ্ধি) সিং বছরে তিনবার এরকম হয়ে যায়। তখন সে হয় বুদ্ধু (আহম্মক) সিং। বুদ্ধু সিং-এর সাথে তখন খুব ভদ্র আচরণ করতে হয়।

তার চোখে আগুন 'আপনি ভাবছেন, আমি পাগল। আপনি আমাকে চাকরি থেকে ডিসমিস করতে চান?' আমি উত্তর দেই না। সে দরজা খুলে, সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে আমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়। অন্ধকার বেড রুমে আমার সুটকেস বয়ে নিতে বিড়বিড় করে আপন মনে। ফিরে এসে দু'হাতে আমাকে অ্যাপার্টমেন্টের চাবি অর্পণ করে। ঠিক যেভাবে পরাজিত সেনাপতি তার তলোয়ার সমর্পণ করে বিজয়ী সেনাপতির কাছে, 'স্যার এই আপনার চাবি, আর আপনার

চাকরি।'

আমি চাবি নিতে নিতে বলি 'বুধ সিং, আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি, আর কতোদিন তুমি এমন থাকবে?'

আমার চোখে চোখে তাকিয়ে সে বলে, 'তা বলেছেন, কিন্তু আমি সত্যটা জানি। লোকজন বলে, বুধ সিং আবার বুদ্ধ হয়ে গেছে। বিদেশ থেকে ফিরেই সাহেব তাকে বরখাস্ত করবে। আমি বলি, হনুজ দিল্লী দূর আস্ত। আপনি জানেন, এর অর্থ কী? দিল্লী এখনো বহু দূরে'।

'কিন্তু আমি দিল্লীতে ফিরে এসেছি।' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেই। সে আরো গভীরভাবে আমাকে দেখে, 'ওকে ফরগিভ এন্ড ফরগেট।'

সে আমাকে নিশ্চিত করে যে, 'অ্যাপার্টমেন্ট ঝাড়পোছ হয়েছে, আসবাবপত্রের ধূলি পরিষ্কার করা হয়েছে। সবকিছু ঠিক আছে। রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার সব ঠিক। আসুন, দেখুন।' আমি তাকে অনুসরণ করে বেডরুমে প্রবেশ করি এবং সুইচ অন করি। বাতি জ্বললো না। আবার চেষ্টা করি। না কোনো ফল হলো না। 'মাফ করবেন, বাল্ব ফিউজ হয়ে গেছে'- বুধ সিং ব্যাখ্যা দেয়। সে আরেকটি সুইচ অন করে। আলোর ঝলক লাগে আমার চোখে। সে আনন্দে লাফ দিয়ে মাজারের ভক্তদের মতো নৃত্য শুরু করে দেয়।

সে তার হাত দিয়ে পাগড়ি স্পর্শ করে বলে, 'বসন্তকালে এখানে কিছু একটা ঘটে যায়। কিছু মনে করবেন না। স্যালিউট।'

আমি তাকে আশ্বাস দেই, 'এটা কেটে যাবে।' সে আমার খুব কাছে এগিয়ে আসে। তার দাড়ি আমাকে স্পর্শ করছে। গোপন ষড়যন্ত্রের মতো ফিসফিস করে বলে, 'মাফ করবেন, আপনার হিজড়া অনেকবার খোঁজ নিতে এসেছিলো, আপনি বিদেশ থেকে ফিরেছেন কিনা।'

বুধ সিং আমার মিস্ট্রেস ভাগমতীকে পছন্দ করে না। কারণ, সে তাকে বলে পাগল সিং। বুধ সিং তাকে ক্ষমা করতে পারে না। সে তাকে বলে মরদ অথবা হিজড়া। ভাগমতীর স্তন ক্ষুদ্রকার এবং কণ্ঠ কর্কশ। 'মাফ করবেন, সবাই এ বিষয়ে বলাবলি করে। তারা বলে, একটা মেয়ে হোক, ছেলে হলেও চলে- তবু ভালো, কিন্তু হিজড়া- কাজটা মোটেই ভাল নয়। আমি যে এভাবে বলছি, সে জন্যে মনে কিছু করবেন না।'

আমি কিছু বলি না। বুধ সিং আমার নিরবতাকে তিরস্কার বলে বিবেচনা করে। সে সামরিক কায়দায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আবার স্যালিউট দিয়ে নিজেকে অর্ডার দেয়। 'রাইট টার্ন।' সে ডানে ঘুরে দাঁড়ায়। 'বাই দ্য লেফট; কুইক মার্চ।' এবং পরিমিত পা ফেলে বের হয়ে যায়।

আহ্, বাঁচা গেলো। আমি কাপড়চোপড় ছেড়ে বাথরুমে ঢুকি। ট্যাপ ঘুরাই। ঘোলাটে পানির ঝাপটা আসে। এরপর বাতাসের শব্দ। পানি নেই। হাল ছেড়ে দেই। পাঠকক্ষে গেলাম। ফোন তুলে রাতের দায়িত্বে নিয়োজিত কেয়ারটেকারের নাম্বারে ঘুরালাম। দুই বালিকাকে তাদের দাদাজি ও আংকেলজির ব্যাপারে আলাপ করতে শুনলাম। রিসিভার রাখলাম। আমার পেটের ওপর একটা মশা বসেছিলো, সেটাকে চড় মেরে আবার চেষ্টা করলাম। দুই বালিকা এখনো লাইনে। এবার তারা মাম্মিজি ও আন্টিজির কথা বলছে। গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়ায় আমার নাসিকায় দুর্গন্ধ অনুভূত হলো। আমি তৃতীয়বার ফোন করতে চেষ্টা করলাম। বাঙালী বাজারের চটকদার কথা নিয়ে বলছে ওরা। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে এবং ওদের বললাম যে, এখন মধ্যরাত্রি এবং তাদের মাম্মিজিরা ড্যাডিজিদের সাথে এখন যা করছে, তাদের তাই করা উচিত। একজন বললো, 'আমাদের লাইনে বাজে লোক ঢুকে পড়েছে। পরে কথা বলবো। টা-টা।'

এবার আমার নম্বরে ডায়াল করলাম। এনগেজড। তিন মিনিট পর আবার ডায়াল করলাম। এনগেজড। অভিযোগ নম্বরে ডায়াল ঘুরালাম। সেখানকার লোকটি বললো, অ্যাসিস্ট্যান্স নম্বরে ডায়াল করতে। তাই করলাম। অপারেটর বললো, 'নম্বরটি খারাপ হয়ে আছে। কমপ্লেনে ডায়াল করুন।' ধুত্তোরি, চুলোয় যাক।

বেডরুমে গিয়ে এয়ার কন্ডিশনার চালিয়ে দিলাম। আমার নগ্ন দেহ ও উত্তপ্ত মেজাজ ঠান্ডা করার জন্য। ধীর শব্দ তুলে এয়ার কন্ডিশনার চালু হলো। কিন্তু পরক্ষণেই বন্ধ হয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে আমার বেডরুম কলকাতার অন্ধকূপের মত হয়ে গেল।

বিদ্যুৎ চলে গেছে। লাইট নেই, ফ্যান নেই। আমি বাগানে নেমে এলাম এবং বেতের

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। খুব গরম, আদ্র, অন্ধকার ও নিশ্চল। আকাশে কিছু তারা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো বহুদূরে। মশার ভীষণ উপদ্রব। আমার মেজাজ খিচড়ে গেল। আমি পত্রিকায় চিঠি লিখবো বিমানের বিলম্বে পৌঁছার জন্য। কাস্টমস ইন্সপেক্টরের দুর্ব্যবহার, ট্যাক্সি ড্রাইভারের প্রতারণা, বিদ্যুৎ বিভাগের অদক্ষতা, দিল্লীর টেলিফোন, পানি সরবরাহ....সবকিছু নিয়ে লিখবো।

এরপর ভাগমতীকে নিয়ে ভাবলাম। আমি যখন বাইরে থাকি তখন সে কত সংখ্যক লোকের শয্যায় যায় কে জানে। সে তার যৌন কীর্তিকলাপ আমাকে বলতে পছন্দ করে। কারণ সে জানে এতে ওর প্রতি আমার কামনা তীব্র হয়। অনেক ঘন্টা ধরে আমি অন্ধকারে বসে আছি। আমি ক্রুদ্ধ, আমি উচ্ছৃঙ্খল। এরপর ক্রোধ কমলো। কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়লো। একটি পাতুর, বুড়ো চাঁদ আকাশে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের মন্দিরে বাতি দেখা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ এসেছে- যখন এর আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি উঠে ড্রয়িং রুমের দিকে পা টেনে নিলাম।

টেবিল ল্যাম্প জ্বাললাম। ভোর পাঁচটা পনের মিনিট। জানালা খুলে পর্দা সরিয়ে দিলাম। বাউন্ডারি ওয়াল জুড়ে বেড়ে ওঠা মধুমালতির সুগন্ধসহ ঠান্ডা বাতাস শরীর স্পর্শ করলো। এতে গতকালের মৃত বাতাস দূরীভূত হলো। আমি আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জানালা পথে বাইরে তাকালাম। রাস্তার বাতিগুলো নিভে গেছে। মালবেরী গাছের ফাঁক দিয়ে ধূসর ভোর অবলোকন করছি।

রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানো শিয়ালগুলো এখন বড় বড় অর্জুন গাছের পাশ দিয়ে তাদের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে। আমার উপরের এপার্টমেন্টে যে বৃদ্ধা বাস করেন তিনি পা ঘসে ঘসে রাস্তায় হাঁটছেন। তিনি আমার জবাফুল গাছের কাছে থেমে এদিক-ওদিক তাকালেন যে, কেউ তাকে দেখছে কিনা। দ্রুত কিছু ফুল তুলে দোপাট্টার ভাঁজে লুকিয়ে ফেললেন এবং পুনরায় পা ঘসে ঘসে মন্দিরের পথ ধরলেন। তার স্বামী বৃদ্ধ লোকটিও তাকে অনুসরণ করলো। তিনি জবা গাছের কাছে থামলেন, এদিক-ওদিক তাকালেন এবং বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করে সশব্দে প্রলম্বিত বায়ু ত্যাগ করলেন। এমনভাবে তিনি পা ফেলছেন, যেন জানেন না কে কাজটি করলো। তার মুখের দিকে তাকান। বিপরীত দিকের একটি বাড়িতে আলো জ্বলে উঠলো। এক মহিলা পর্দা টেনে দিচ্ছে। মহিলা তার অবিন্যস্ত চুল খোপায় বাঁধলো এবং আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করলো। আরো আলো জ্বললো এবং নিভলো। গোলাপী আকাশে ভোরের তারকাগুলো আর দেখা যাচ্ছে না। কাকের চিৎকার শুরু হয়েছে। চড়ুই পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়েছে মালবেরী গাছে। মুয়াযযিনের কণ্ঠ স্বর্গের পানে চলে যাচ্ছে। মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি ভগবানদেরকে জাগ্রত করছে। দুধওয়ালা সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে, আর তার দুধের পাত্রগুলো বিচিত্র শব্দ তুলছে। আরেক সাইকেল চালক বেল বাজাতে বাজাতে চিৎকার করছে, 'পেপারওয়ালা! স্টেটসম্যান, টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস, এক্সপ্রেস, হেরাল্ড, পেপারওয়ালা....।' আমার দরজার নিচ দিয়ে পেপার ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, তার শব্দ পেলাম। আর্ম চেয়ারেই বসে রইলাম আমি। আমার কক্ষে সকালের আলো প্রবেশ করেছে। বাতাস শীতল, সুগন্ধযুক্ত...বেদনা ও কামনায় পরিপূর্ণ। সকালের বাতাস, প্রেমিকদের কাছে পবিত্র। আমি আমার প্রিয় নগরীতে ফিরে এসেছি।

হিন্দুস্তান টাইমসে মনোনিবেশ করলাম। প্রথম পৃষ্ঠায় এক শ্বেতাঙ্গিনীর ছবি, যাকে গত রাতে বিমান থেকে অবতরণ করতে দেখেছি। সংবাদ শিরোনাম, 'লেডী হয়টিটয়টি বলেছেন, দিল্লীতে এসে মনে হচ্ছে যেন নিজ বাড়িতেই ফিরে এসেছেন।' তাহলে ইনিই সেই মহিলা। তিনি এসেছেন প্রত্নতত্ত্বের ওপর একটি গ্রন্থের মাল মশল্লা সংগ্রহ করতে। প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান করছেন।

আমি শিরোনাম ও ছবিগুলোর ওপর দৃষ্টি ঘুরালাম।

আমার বাবুর্চি চোখে মুখে স্বাগত জানানোর উচ্ছ্বাস নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। তার জন্য আনা জাপানী ঘড়িটি দিলাম। তার আনন্দ হাসিতে পরিবর্তিত হলো। আমাকে এক মগ কালো কফি দিয়ে জানতে চাইলো, দুপুরে আমি খাবো কিনা। আমি মানা করলে সে ডিনারের কথা জানতে

চাইলো। 'হ্যাঁ, রাতে খাবো। কিন্তু ফিরতে বিলম্ব হতে পারে। অতএব খাবার টেবিলে রেখে দিও।' আমি কী খাবো? আমি জানি, সে ভাগমতীর কথা ভাবছে। কারণ ভাগমতী শুধু ভারতীয় খাদ্যেই অভ্যস্ত। আর আমি পছন্দ করি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান খাবার। আমি জানি না, কিভাবে, কখন বা কোথায় ভাগমতীর সাথে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আমি বাবুর্চিকে কিছু বলতে চাই না। সে জন্য বললাম, 'যা খুশি রান্না করো।' সে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে চলে গেল।

দিল্লীর সাথে পাল্লা দেবার এখনই সময়। দ্রুত গোসল সেরে আমার হিন্দুস্থান অ্যাম্বেসেডর নিয়ে বের হলাম। অনেক রাস্তা ও মোড়ের নাম বদলে গেছে। উইন্ডসর, ইয়র্কস, কানিংস, হার্ডিংস পরিবর্তিত হয়েছে তিলক, প্যাটেল, আজাদ ও নেহেরুতে। একটি পেট্রোল স্টেশনের বাইরে লাল পতাকা হাতে নিয়ে তিনজন লোক শ্লোগান দিচ্ছে, 'পেট্রোল স্টেশন মালিক- নিপাত যাক।' ডাঃ সেনের নার্সিং হোমের সামনেও লাল পতাকা। ছয়জন লোক চিৎকার করছে, 'ডাক্তাররা নিপাত যাক।' কৃষি মন্ত্রণালয় ভবনের সামনে লাল পতাকা। চারজন লোক ফুলের মালা গলায় ভবনের সামনে যোগাসনে বসে আছে। তাদের সামনে প্লাকার্ডে লিখা, 'অনশন ধর্মঘটের তৃতীয় দিবস।' গেরুয়া রং-এর পতাকা হাতে একটি শোভাযাত্রা পার্লামেন্ট স্ট্রীট ধরে এগুচ্ছে। তাদের কণ্ঠে শ্লোগান, 'আমাদের ধর্ম ও আমাদের দেশ এক। গরু আমাদের মা। গরু খোররা নিপাত যাক।' কনট সার্কাসের লনে একটি রাজনৈতিক সমাবেশ হচ্ছে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তা চিৎকার করছে, 'সকলে আওয়াজ তুলুন- জয় হিন্দ'। শোতৃমণ্ডলী সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে 'জয় হিন্দ'। কিন্তু বক্তা সন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না, 'এতো দুর্বল আওয়াজে চলবে না। এই দুর্বল কণ্ঠে আমরা চীনা শুয়োরদের সাথে লড়তে পারবো না। পারবো কি? আপনাদের আওয়াজ এতো জোরে হতে হবে যাতে এ আওয়াজ পিকিং-এ পৌছে যায়। সবাই বলুন, 'জয় হিন্দ!' 'জয় হিন্দ!'

পিকিং-এর শুয়োররা তোদের প্যান্টে হিসি করেছে। ভারতীয়দের মত দুশমনদের সঙ্গে লড়তে তাদের মূত্র ছাড়া আর কিছু হারাবার নেই।

আমি জনপথে (এককালের কুইন্সওয়ে) তিব্বতী অ্যান্টিক ডিলারের দোকানের পাশে গাড়ি পার্ক করলাম। আমেরিকান ট্যুরিস্টরা পিতল ও পাথরের তৈরি উপহার সামগ্রী কিনতে দরকষাকষি করছে। শিখ জ্যোতিষীরা বিদেশী ট্যুরিস্টদেরকে রোমান্সের সম্ভাবনার কথা শোনাচ্ছে। জ্যোতিষীদের একজন আমার রংচং-এর টি শার্ট দেখে এগিয়ে এলো, 'আপনি ফরেন থেকে এসেছেন, আবার ফরেনে যাবেন। আমাকে একটা মিনিট সময় দিন, তাহলে আপনার প্রেম সম্পর্কে বলতে পারবো। বিত্তবান শ্বেতাঙ্গিনী আপনার প্রতীক্ষায় আছে। আমি তার নাম বলতে পারি। আমি বলতে পারি কী করে তার এবং বিশেষ করে আপনার ভাগ্য গড়বেন।' আমি তাকে পাঞ্জাবী জবানে বললাম, 'একথাগুলো আমেরিকানদের বলো। আমার কাছে পয়সা নেই।' জ্যোতিষী তার শিকার চেনে। সে অবজ্ঞার সুরে বলে, 'পয়সা! সাহেব, টাকা-পয়সা তো হাতের ময়লা। আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপনার হাতে বিপুল অর্থ আসবে। বিদেশী মহিলাদের সাথে আপনার প্রেম হবে। একটি দুষ্ট নক্ষত্র আপনাকে বাধা দিচ্ছে। আপনার হাত মুঠি করুন।' কোনো চিন্তা না করেই মুঠি বন্ধ করলাম। 'এখন খুলুন।' হাত খুললাম। বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো, 'দেখুন, কালো নক্ষত্র। আমাকে মাত্র এক টাকা দিন। আমেরিকানদের থেকে আমি দশ টাকা নেই। আমি বলছি, কিভাবে দুষ্ট নক্ষত্রকে জয় করা যাবে।' তাকে এক টাকা দেয়ার পর সে আমাকে বিদেশী মহিলাদের কাবু করার কৌশল শিখিয়ে দেয়, 'সর্দারজি, আপনার বিদেশী প্রেমিকার নামের শুরু জেএইচটি- তাই না।' জেএইচটি নামের কোনো মহিলাকে আমি চিনি না। সে বলে চলেছে, 'আপনি যখন জেএইচটি নামের শ্বেতাঙ্গিনীকে পাবেন, তখন বিশ্ববিখ্যাত হস্তরেখা বিশারদ নাথা সিংকে দয়া করে স্মরণ করবেন।'

আমি অল ইন্ডিয়া কোঅপারেটিভ কফি হাউজে পৌছলাম। আরো অনেক লাল পতাকা চোখে পড়লো। একটি ব্যানারে লিখা, 'আমাদের দাবি মেনে নাও।' একজন আমার হাতে দাবিনামা সম্বলিত লিফলেট গুজে দিল। আমি সেটা দলামুচড়া করে আপত্তিকর ভঙ্গিতে তার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। লোকটি তার মন্তব্য ছুড়লো, 'বাজে লোক!'

আমি চারদিকে তাকালাম। এমন কাউকে চোখে পড়লো না, যাকে গণ্য করতে পারি। নিউজ

স্ট্যান্ড থেকে 'দিল্লী আন্ডারওয়ার্ল্ড'-এর একটি কপি কিনলাম। একটি টেবিল দখল করে বসলাম। টেবিল ঘিরে তিনটি চেয়ার। দিল্লীর সাপ্তাহিক কেলেংকারির রিপোর্টে মন দিলাম। একজন কেবিনেট মন্ত্রী (যার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে) তার পুত্রবধূকে গর্ভবতী করে ফেলেছে। এটা এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি। বিনে পয়সায় পুত্রকে সার্ভিস দান। আফ্রিকার কোনো একটি দেশের অ্যামবেসীর ভারতীয় কর্মচারী কর্তৃক দুর্ব্যবহারের অভিযোগ। কনট সার্কাসের এক পতিতা স্বীকার করেছে যে, ভারতীয়দের চাইতে আফ্রিকান খদ্দের অনেক উদার। তারা বেশি অর্থও প্রদান করে। কলেজ পড়ুয়া এক ছোকরা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে যে, তার পিতা কার্যোপলক্ষে বাইরে অবস্থানকালে তার সৎমা তাকে ধর্ষণ করেছে। সম্পাদক এই চিঠির নিচে তার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, যা ইটালিক অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে, *"তোমার পিতা যে যন্ত্র দ্বারা তোমার জন্ম দিয়েছে, সেটির কর্মস্থলে কী করে তোমার নিজের যন্ত্র স্থাপন করলো?....তোমার সৎমা ভারতীয় নারী সমাজের কলংক।"* এ ধরনের মহিলাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা উচিত পরবর্তী সংখ্যায় সে সম্পর্কে উপদেশ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। পরবর্তী সংখ্যায় তিহার জেলে মহিলা কয়েদীদের ওপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশের প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়েছেন। ভাগমতী এ ব্যাপারে আমাকে অনেক কিছু বলেছে। সে অনেকবার তিহার জেলে গেছে।

আমাদের আড্ডার দু'জন এসে গেছে। একজন ফটোগ্রাফার, আরেকজন সাংবাদিক। দু'জনকেই দিল্লীর চ্যাম্পিয়ন মাগিবাজ বিবেচনা করা হয়। আমাকে দেখামাত্র উভয়ে হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো, 'হ্যাল্লো। ছোট বাবু কেমন আছে?' ফটোগ্রাফার জিজ্ঞেস করলো, 'মেম সাহেবদের কাছে সে কি তার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেছে?' আমি পাল্টা জানতে চাই, 'দিল্লীর এফোঁড় ওফোঁড় করা চ্যাম্পিয়ন ষাঁড়ের খবর কী?' সে কাঁধ ঝাঁকালো, 'পনের দিন কোনো কোনো অ্যাকশন নেই। কিন্তু আমার লক্ষ্যে আমি, অবিচল- 'যখন তুমি কোনো কুমারী মেয়েকে লাভ করো, যখন তুমি কৌমার্য অক্ষুণ্ন রাখো না; তখন কোনো রকম আত্মপ্রতারণা নয়, হস্তমৈথুন নয়, বালক বা হিজড়া নয়। সে কারণে আমার মধ্যাঙ্গ ক্ষিপ্ত।'

'আর এই যে মহান মসীচালক, তোমার কুতুব মিনারের খবর কী?' আমি সাংবাদিক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করি। সে আকৃতিতে বিপুল এবং মুখমন্ডলে নিম্নাঙ্গের কৃষ্ণ কেশদামের মত দাড়ি বেড়েছে। সেও কবিতা আউড়ে উত্তর দেয়, "যখন কোনো নারীকে পাই, আমি সঙ্গম করি। যখন পাই না, আমি হস্তমৈথুন করি। কোনো অভিযোগ নেই। মহান গুরু স্বর্গে আছেন, আর মাগুকা আমার শয্যায়।" সে নিজের একটি দাড়ি ছিড়ে দার্শনিকের ভাবনা নিয়ে তা পরখ করে। তৃতীয় এক বন্ধুর আগমন ঘটে। সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আপার ডিভিশন কার্ক। আগে না- নেয়া সিকলীভ কাজে লাগাচ্ছে সে। আমাদের এ ধরনের বিশৃঙ্খলালাপে সে আপত্তি করলো, 'বিহারে ৫০ লক্ষ ভারতীয় ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে, আর তোমরা ভাবছো মহিলাদের নিয়ে।' সে মেঝেতে আঘাত করে পা দিয়ে। সে চেয়ারে পা তুলে বসে। তার গুরু নিতম্বের কোনো এক ফাঁক দিয়ে সশব্দে বায়ু নির্গত হয়। এতে নিজেই বিব্রত। পা নিচে নামিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, 'দুঃখিত, ফসকে বেরিয়ে গেছে।'

আমাদের আড্ডার আরেক সদস্য আবির্ভূত হয়। সে এক ধরনের রাজনীতিবিদ এবং আমাদের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। বিগত দুর্ভিক্ষের সময় সে চাপাতি সংগ্রহ সপ্তাহ আন্দোলন সংগঠিত করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিল। এখন সে 'তুমি যদি সৌভাগ্য কামনা করো, তাহলে সপ্তাহে মাত্র একজন'...এই শ্লোগানকে পুঁজি করে পরিবার পরিকল্পনার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। কিন্তু শ্লোগানটি এখনো জনপ্রিয় হয়নি। আমরা সেক্স, দুর্নীতি, অদক্ষতা এবং বিহারের ৫০ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ফিরে এলাম। অনেক কাপ কফি ও অনেক কাজু বাদাম নিঃশেষ করলাম। এভাবে সকালটা কাটলো।

দারুণ অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো হঠাৎ করে। কফি হাউজের বন্ধুদের থেকে বিদায় নিয়ে আমি রিং রোড ধরে গাড়ি চালালাম। রাস্তাটি পুরনো নগরীর দিকে গেছে। আমি মোগল নগরপ্রাচীর এবং জিনাত মহলের মসজিদ অতিক্রম করে বৈদ্যুতিক শ্মশানের কাছে পৌছে গাড়ির গতি মন্থর করলাম। কোনো খদ্দের নেই। ধুঁয়া উড়ছে না। যমুনা নদীর তীরে নিগমবোধ

ঘাটের শ্মশানের কাছে গাড়ি থামিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দিল্লীওয়ালাদের কী হয়েছে? যেভাবে তারা মরতে অভ্যস্ত সেভাবে মরছে না। একটি মাত্র চিতা জ্বলছে এবং তিনটি ছাই-এর স্তূপ দেখছি। শোক জানানোর লোকও নেই। আমি ধীরে ধীরে যমুনার তীর পর্যন্ত নেমে গেলাম। সেখানে জীবন আছে কিনা দেখতে চাই। কী সুন্দর দৃশ্য! সিঁড়ির শেষ ধাপে একটি মৃতদেহ লাল কাপড়ে ঢাকা। এক ডজন নারী-পুরুষ কাঁদছে ও বুক চাপড়াচ্ছে। এক ব্রাহ্মণ তাদের এক পাশে ঠেলে দিয়ে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে মৃতদেহের ওপর পানি ছিটা দিতে লাগলো। মাঝ বয়সী এক ব্যক্তি মৃতের মুখের ওপর থেকে কাপড় সরালো। একটি বালিকার মৃতদেহ। লোকটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো। মৃতদেহের উল্টো পাশের মহিলা নিজের কপালে আঘাতের পর আঘাত করে দু'হাতে বালিকাকে জড়িয়ে ধরলো। অন্যান্য লোকজন শোকাভিভূত দম্পতিকে সান্ত্বনা দিয়ে সরিয়ে নিলো এবং বালিকার মুখ পুনরায় ঢেকে দিলো। পুরোহিত তার হাত মেলে ধরলো। একজন তার হাতে একটি টাকা দিলো। রৌপ্য মুদ্রাটির পানে সে হতাশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে খড়মের শব্দ তুলে সিঁড়ির ধাপ ডিঙ্গাতে শুরু করলো। শোকার্ত লোকজন খাটিয়া তুলে তাকে অনুসরণ করলো। উপরে উঠে মৃতদেহ মাটিতে নামিয়ে লাকড়ীর একটা বেদী তৈরি করলো। মাঝবয়সী দম্পতি পুনরায় আর্তনাদ শুরু করলো। মহিলাটি তার মাথায় ধুলি মাখতে মাখতে চিৎকার করলো, 'হায়, হায়, একি হলো!' লোকটি আবার মৃত বালিকাটির মুখের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিবিষ্টভাবে মিনিটখানেক তাকিয়ে থেকে আর্তনাদ করে উঠলো, 'হায় রাব্বা!' মৃত সন্তানের ওপর থেকে সে চোখ ফিরাতে পারছে না। চিতা প্রস্তুত। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হলো। ঘি ভর্তি একটা তামার লোটা এনে সবটুকু ঘি চিতায় ঢালার পর একজন লোক কেরোসিন ভেজা নেকড়ায় আগুন জ্বেলে চিতার চারপাশে অগ্নিসংযোগ করলো। চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আরেক লোক মাথা চোখা একটি বাঁশ হাতে চিতায় মেয়েটির মাথা, দেহ স্থির রাখার জন্যে ব্যবহার শুরু করলো।

তার বাবা-মা ধুলার মধ্যে মুখ ঢেকে মাটি চাপড়ে আর্তনাদ অব্যাহত রেখেছে। কলকাতা থেকে আগত তুফান মেল যমুনা নদীর ওপর লৌহসেতু অতিক্রম করে দিল্লী স্টেশনের দিকে যাচ্ছে।

আমি নিগমবোধ ঘাট ত্যাগ করলাম। আমার মুখে চিতার আগুনের হলকা লাগলো। যথার্থই দুঃখজনক। সূচের মত হৃদয়ে গেঁথে যায়। আমিও হয়তো এভাবে আমার সন্তানের মৃত্যুতে ধূলায় আছড়ে কপাল চাপড়াতে বাধ্য হতাম। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়ার জন্য আমার অ্যাম্বেসেডর গাড়ি চালাচ্ছি। আমার প্রতিক্রিয়া কী, ঈর্ষা বা হতাশা? শ্মশান থেকে এই দম্পতি বাড়ি ফিরে তাদের কন্যার শূন্যতা অনুভব করবে। আমি বাড়ি ফিরে স্কচের বোতল নিয়ে বসবো।

বুধ সিং আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলে, 'আমাকে মাফ করবেন, আপনার হিজড়া এসেছিল আপনাকে দেখতে। আমি তাকে বলে দিয়েছি যে, আপনি বিদেশ থেকে ফিরে আসেননি। আশা করি আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। মেয়ে হোক, বালক হোক, তবু ভালো। কিন্তু হিজড়ার সাথে....।

আমি বুধ সিংকে চড় কষাতে পারতাম তার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখে। তা না করে শান্তভাবে দরজা বন্ধ করে পানপাত্র নিয়ে বসলাম।

এই হলো দিল্লী। জীবন যখন খুব ভারি হয়ে যায় তখন ঘন্টাখানেক নিগমবোধ ঘাটে কাটিয়ে আসা উচিত। কিভাবে মৃতদেহ অগ্নিশিখার মধ্যে ভস্মীভূত হয় তা প্রত্যক্ষ করা এবং মৃতের নিকটজনের আর্তনাদ শ্রবণ করা উচিত। এরপর বাড়ি ফিরে কয়েক পেগ হুইস্কি গেলা উচিত। দিল্লীতে মৃত্যু এবং মদ্যপান জীবনকে জীবন্ত করে তোলে।

২

লেডী জেএইচটি

আমার দ্বিতীয় স্কচ পেগের সাথে দ্বিতীয় স্যান্ডউইচে কামড় দিচ্ছি। এ সময় ফোন বেজে উঠলো। 'এটা কি ৪২০৪২০?' নম্বর ঠিক আছে। 'স্যার, দয়া করে শিক্ষা সচিবের সাথে কথা বলুন।'

'বুড়ো মুরগা, কেমন আছো? (সচিব এবং আমি দিল্লীর বৃদ্ধ মোরগ নেটওয়ার্কের সদস্য)। তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চলেছেন, লেডী হয়টিটয়টির ব্যাপারে কথা বলতে চাই। সকালের কাগজে তুমি নিশ্চয়ই তার সম্পর্কে পড়েছো। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। রাণী এলিজাবেথের কাজিন। প্রেসিডেন্টের অতিথি। ভিভিআইপি ইত্যাদি ইত্যাদি। চমৎকার যোগসূত্র। হয়তো সবই ভালো। তিনি কিছু প্রাচীন এলাকা পরীক্ষা করে দেখতে চান, যদি কিছু বের করতে পারেন। সবকিছু ঠিকঠাক করা আছে। লিমোজিন, ক্যাভিয়ার, শ্যাম্পেন। আমাদের দরিদ্র দেশ যতটা পারে সবই আয়োজন করা হয়েছে। তুমি কি ঘুরিয়ে দেখাতে পারবে?'

'অবশ্যই!'

'চমৎকার! ভোর পাঁচটায় গাড়ি যাবে তোমাকে তুলে আনতে। মহামান্যা লেডীকে যেন অপেক্ষা করে থাকতে না হয়। আশা করি তাকে শয্যায় নেয়ার সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে না।'

আমি বিস্মিত হয়ে 'পাঁচটা' বলার পূর্বেই সচিব ফোন রেখে দিয়েছে। নিজের সাথে কথা বললাম। একদিন অতি ভোরে জাগার ক্ষতিপূরণ হবে জীবনের জন্যে খ্যাতি অর্জনের মাধ্যমে। কেমন হবে ব্যাপারটা? জীবনকে পরিপূর্ণ করো। যৌনতার বিশ্বে কামনাপূর্ণ ব্যতিব্যস্ত একটি ঘন্টা খ্যাতিহীন গোটা জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বখ্যাত এক মহিলার সাথে সারাটা দিন কাটাবো। ভাগ্যে থাকলে তাকে মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্নও করতে পারি। তাহলে ইতিহাসে তার প্রেমিকদের একজন হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাবনাও আছে।

কাওয়ালির রাতে আমি তাকে মোতি মহলে নিয়ে যেতে পারি। লোকজন কানাকানি, ফিসফিস, হিংসা করবে এবং বন্ধুদের বলতে পারবো, 'জেন আমাকে বলেছে....।' কে এই জেন দোস্ত? 'তোমরা জান না, লেডী জেন হয়টিটয়টি, রাণীর কাজিন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। ভালো কথা, আমরা ধূসর মাটির পাত্রের খোঁজে মাটি খনন করছি। আমরা ভালো বন্ধুতে পরিণত হয়েছি।'

রাতে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ঘুম খুব সামান্যই হয়েছে। শ্মশানের দৃশ্য আমাকে তাড়া করে ফিরেছে। সময় দেখার জন্যে আমি মাঝে মধ্যেই বাতি জ্বেলেছি। ভোর সাড়ে চারটায় অ্যালার্ম ঘড়ির আওয়াজে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হলো। পায়খানা গোসল তাড়াতাড়ি সেরে আধঘন্টা পর আমি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

এখন মার্চ মাস। সুন্দর ভোর। ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলোর চাইতে ভোরের নক্ষত্র উজ্জ্বল। অ্যাপার্টমেন্টের সারি একটি গাড়ির হেডলাইটের আলোতে উজ্জ্বল হলো। একটি ট্রাক গর্জন করে অতিক্রম করলো। ভোরের নীরবতা, নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা এবং মৃদুমন্দ বাতাস আমাকে স্পর্শ করছে। পূর্ব দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বড় বড় বাদুর পাখা মেলে তাদের ঘরে ফিরছে।

আরেকটা গাড়ি গেল, আরেকটা...। আমার ঘড়িতে ৫টা ৪০। মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে। আমি আরো আধঘন্টা বিছানায় থাকতে পারতাম। হেডলাইটের আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। একটি রোলস রয়েস এসে থামলো এবং তা থেকে নামলো ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। আমিই আমি কিনা? হ্যাঁ। সে সামনের দরজা খুলে ধরলো। আমি ড্রাইভার এবং ইউনিফর্ম পরা লোকটির মাঝখানে। গাড়ির পিছনের আসনের দিকে তাকালাম। প্রশস্ত আসন দখল করে আছেন হালকা গড়নের এক শ্বেতাঙ্গিনী। ফার কোটে তার দেহ আবৃত। তিনি তার বিবর্ণ মুখ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আর ইউ দ্য গাইড?'

'ইয়েস ম্যাডাম।' আমি কুণ্ঠিতভাবে উত্তর দিলাম। তিনি যখন আবিষ্কার করতে পারবেন যে আমি কে, তখন খুব বিব্রত হবেন। এই ভাবনা আমার চেতনাকে জাগ্রত করলো।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম, 'পুরানা কিল্লা।'

'না', তিনি পিছন থেকে আপত্তি করলেন, 'তিলপাত।' তাকে বলে দেয়া হয়েছে। কোথায় যেতে হবে। তাহলে তিনি দিল্লী চিনেন। আমার করণীয় কী? রাজ কুকুরীর উপর উপগত হওয়ার রাজকীয় কায়দা অনুসরণ!

আমরা মথুরা-আগ্রা সড়ক ধরে যাচ্ছি। প্রাচীন বড়াপুল্লা ব্রিজ অতিক্রম করলাম। রোলস রয়েসের হেডলাইট নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। সকালের আলোতে সারি সারি মলত্যাগকারীর উদোম নিতম্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। রেলওয়ে ব্রিজ অতিক্রম করলাম। ফ্রেন্ডস কলোনির পর পৌর আবর্জনা স্তূপ করার বিশাল এলাকাটি অতিক্রম করার সময় নাকে দুর্গন্ধ প্রবেশ করলো। এক পাশে রোড রিসার্চ ইন্সটিটিউট। বদরপুর গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হাইওয়ে থেকে ভিন্ন পথ নিলাম। উদীয়মান সূর্যের পানে আমরা এগুচ্ছি। রাস্তার উভয় পার্শ্বের মাঠ মলত্যাগকারীতে পরিপূর্ণ। অনেকের মুখ আমাদের দিকে। তাদের লিঙ্গ দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে ঝুলছে। অন্যেরা পিছন ফিরে বসেছে, তাদের নিতম্ব আমাদের চোখে পড়ছে- মলের পিড়ামিডের এক ইঞ্চি উপরে। ভারতীয় চাষীরা মলত্যাগের ক্ষেত্রে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। চাপাতি ও সরিষা শাকের স্তূপ গলধঃকরণের পর দিনে দু'বার মলত্যাগ করতে হয় বিপুল পরিমাণে। সকালে ও বিকালে। আমরা পশ্চিম যমুনা খাল অতিক্রম করলাম। কচি গমের চারার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে তিলপাত গ্রাম নজরে এলো। ড্রাইভার ঘোষণা করলো, 'ম্যাডাম, তিলপাত।'

তিনি উৎফুল্ল হলেন, 'সত্যিই আমরা এসে গেছি।' তার কণ্ঠস্বর কর্কশ। হাঁপানি রোগীর মত ফ্যাসফ্যাসে। 'কোথাও গাড়ি থামাও। আমি কিছু নাশতা করতে চাই।'

আমি ড্রাইভারকে বললাম, রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে। 'গ্রামের সেই প্রান্তে একটি তালবাগান আছে। সেখানে তিলপাতের অর্ধেক বাসিন্দার দৃষ্টি থেকে বেঁচে আপনি শান্তিতে নাশতা করতে পারবেন।'

'শুনে ভালো লাগলো। গরম এক কাপ কফির জন্যে মরে যাচ্ছি। মনে হয় তোমার অবস্থাও একই রকম।'

আমি তার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করলাম। দুঃখ প্রকাশ না করা পর্যন্ত আমি তাকে শাস্তি দেব। আমরা তিলপাত ঘুরে এলাম। রাস্তাটা হঠাৎ করেই তালবাগানের মাঝে একটি মন্দিরের পাশে এসে থেমে গেছে। ইউনিফর্মধারী তড়িঘড়ি বের হয়ে গাড়ির পিছনের দরজা খুলে ধরলো। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

লেডি হয়টিটয়টি তার আশ্রয় থেকে বের হলেন। আমি তাকে পুরোপুরি দেখলাম। পঞ্চাশোর্ধ, ক্ষুদ্রাকৃতির (পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি হতে পারে) স্তনহীন, নিতম্বহীন, যৌন আকর্ষণহীন এক নারী। কাদার রং এর মতো এলোমেলো চুল। একই রকম খসখসে গোলাপি ত্বক। চোয়ালের পাশে কাটা দাগ দেখে মনে হয় সার্জিক্যাল অপারেশন হয়েছে। তার পরনে ধূসর কার্ডিগান, নীল বর্ণের ডেনিম, খাকি ক্যানভাসের বুট। আকৃতিতে ছোট, নীল চোখ এবং সোনালী মুদ্রাশোভিত একটি ব্রেসলেট ছাড়া তার মধ্যে নারীসুলভ আর কিছুই নেই।

একটি কলাপসিবল টেবিল পেতে খাবার সাজানো হলো। ডিম, স্যান্ডউইচ, ধূমায়মান কফি। 'তুমি সাধারণের চাইতে অনেক ভালো ইংরেজী বলো। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তুমি ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করেছো।' তিনি আমাকে একটি সিগারেট দেন।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, হেইলেবারি।' এটা বলাই নিরাপদ ছিল।

কণ্ঠে পৃষ্ঠপোষকতার সুর এনে তিনি বলেন, 'ওল্ড ইস্ট ইন্ডিয়া স্কুল। তোমার গলার টাইটাও নিশ্চয়ই কিংস টাই।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।' আমি টাই তুলে রেখেছিলাম, যা পরার কোনো অধিকার আমার নেই।'

'আমার স্বামীও কিংস-এর ছাত্র। তুমি কখন সেখানে ছিলে?'

'সাত বছর আগে।' তার স্বামী আমার চেয়ে কমপক্ষে ত্রিশ বছরের বড়। ধরা পড়ার ভয় নেই।

'তুমি কি বিষয়ে পড়াশুনা করেছো?'

'ইতিহাস।'

তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। 'আমার স্বামীও ইতিহাস পড়েছেন। তোমার শিক্ষক কে ছিলেন?'

তাকে এভাবে প্রশ্ন করতে দিলে আমি বিপদে পড়ে যাবো। 'আমি টিউটরিয়ালের চাইতে খেলার মাঠে অধিক সময় ব্যয় করেছি।'

তার মুখে স্মিত হাসি। 'আমি সত্যিই দুঃখিত। আমি তোমাকে পেশাদার গাইড ভেবেছিলাম। তাদের ঠিকভাবে বলা উচিত ছিল। আমার অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্যে ক্ষমা করো।'

'এ নিয়ে ভাববেন না। আপনার খেদমতে দিল্লীর সবচেয়ে বাজে বিনা পারিশ্রমিকের গাইড নিবেদিত।'

'তুমি একটা জোকার। তোমার সাথে আমার ভালো কাটবে। আমার নাম জেন। তোমার নাম কি?' তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। শক্ত, শীতল, অস্থিময় হাত। 'সিং। এ নামে অন্তত পাঁচ কোটি শিখ, রাজপুত, বানিয়া, ঠাকুর, গুর্খা, বিহারী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক আছে।'

তাকে তুষ্ট মনে হলো। আমরা যেন পুরনো বন্ধু। আমি তাকে জানালাম যে, তিনি যে বিমানে ভারতে আগমন করেছেন, আমিও সেই বিমানের যাত্রী ছিলাম। আমি তাকে সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট। 'ক্যামেরার ফ্লাশ যখন জ্বলছিল তখন আমার মনে হয়েছিল, আপনি একজন চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। আপনি তাদের একজন হতে পারেন।'

'মিথ্যুক! আমি সৌজন্য পছন্দ করি। চাটুবাক্য নয়।' তিনি হেসে উঠলেন।

আমরা কফিতে চুমুক দিচ্ছি। ডিম, স্যান্ডউইচে কামড় দিচ্ছি। তার সাথে কথাবার্তা চলছে।

'তুমি তিলপাত সম্পর্কে কি জানো?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব বেশি জানি না। কাহিনীটা এ রকম যে, পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রামের মধ্যে এটিও একটি ছিল। আপনি কি পাণ্ডবদের সম্পর্কে জানেন?'

তিনি মাথা ঝাঁকালেন। 'আমাকে আবার বলো।'

'পাণ্ডবরা তাদের উত্তরাধিকারের অংশ দাবি করেছিল কুরুদের নিকট হতে। যার মধ্যে পাঁচটি গ্রাম, পানিপাত, সোনিপাত, ইন্দ্রপাত, বাগপাত ও তিলপাত ছিল। কুরুরা দাবি মানতে অস্বীকার করলে যুদ্ধ শুরু হয়। কুরুক্ষেত্র নামক এক স্থানে যুদ্ধ হয়। জায়গাটা এখান থেকে সত্তর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পাণ্ডবদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন কৃষ্ণ। তাদের বিজয় হয়। আপনি কি গীতা পড়েছেন?

তিনি আবার মাথা ঝাঁকান। 'মহাভারতের অংশ তাই না? ন্যায় যুদ্ধের পক্ষে কৃষ্ণের বাণী....তাতে একটি রমণীর অনেক স্বামীর কথা আছে।'

'দ্রৌপদী, তিনি পাঁচ পাণ্ডব ভাই-এর স্ত্রী ছিলেন। তাদের তৃতীয় ভাই অর্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তাকে লাভ করে। তিনি যখন দ্রৌপদীকে বাড়ি নিয়ে এসে মাকে বলেন, 'মা, দেখো, আমি কী পেয়েছি?' তার মা পিছনে না ফিরেই উত্তর দেন, ভালো ছেলের মতো তোমার ভাইদের সাথে ভাগ করে নাও।' এতএব একজন বাধ্য, মাতৃভক্ত অনুগত ভারতীয় পুত্রের মত সে মায়ের আদেশ প্রতিপালন করেছে।'

'কুরুদের সাথে বিবাদ নিষ্পত্তির পর তারা হিমালয়ে চলে যায়। যেভাবে সকল সৎ ভারতীয় বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুবরণ করার জন্যে হিমালয়ে গমন করে। সম্ভবত যারা এখানে বাস করছে তারা পাণ্ডবদের অধঃস্তন পুরুষ, যারা হিমালয়ে না গিয়ে এখানেই অবস্থান করছিল।'

তিনি বললেন, 'এর আগে আমি এখানে এসেছিলাম খননকার্যের সময়। মাটির কিছু তৈজসপত্র পাওয়া গেছে। নমুনাগুলো আমি পরীক্ষা করেছি। এগুলো খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বছর বা তারও পূর্বের।' তার কণ্ঠে এক ধরনের স্থিরতা ও কর্তৃত্বের সুর। কফির অবশিষ্ট মাটিতে ফেলে দিলে ইউনিফর্মধারী দৌড়ে কাপ নিতে আসে। সূর্যালোকে তিলপাত এখন উজ্জ্বল। গ্রামে কিছু মাটির কুটির, কয়েকটা ইটের ঘর এবং একটি মন্দির।

এক পাল গরু ও মহিষ আমাদের দিকেই আসছে। কারো ফসলি জমিতে যাতে মুখ না দেয় সে জন্যে রাখালরা সতর্ক। কিছু বালিকা গরু মহিষের পিছু পিছু আসছে। গোবর সংগ্রহের জন্যে। গরুগুলো রোলস রয়েসের দিকে দৃষ্টি ফেলে লজ্জায় কেটে পড়লো। মহিষও তাদের অনুসরণ করলো। গরু-মহিষকে তালবাগানে চরতে দিয়ে রাখাল বালকরা আমাদের থেকে কয়েক ফুট দূরে মাটিতে বসে পড়লো। বালিকারা তাদের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। লেডি হয়টিটয়টি জানতে চাইলেন, 'ওরা কী চায়?'

আমি হিন্দিতে অনুবাদ করে বললাম, 'তোমরা কী চাও।'

বালকদের একজন বললো, 'কিছুই চাই না। শুধু দেখছি।' আমি ইংরেজিতে লেডীকে জানাই। একজন গ্রামবাসী সাইকেল থেকে নেমে জানতে চায় যে, 'কি হচ্ছে।' বালকরা তাকে বলে, 'কিছু না।' সাইকেল চালক তাদের সাথে যোগ দিলো। আরো গ্রামবাসী আসে। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেশ জনতার সমাগম হয়।

আমি তাদের উদ্দেশে নম্রভাবে বলি,'ভাইসব, এটা কি তামাশা? এটা কি চিড়িয়াখানা?'

কথাটা তাদের মনঃপুত হয়নি। তারা ঠেলাঠেলি করে। কিন্তু বসে আমাদের দিকে তাকিয়েই থাকে। একটি বালক আমাকে জিজ্ঞেস করে 'এটা কি মেম, না সাহেব?'

বালিকারা একে অন্যের দিকে তাকায় এবং কৌতুকের হাসি হাসে। লোকগুলোর চোখে মুখেও বিদ্রূপ। বালকগুলো উৎসাহিত হয়। 'আরে এতো সাহেবদের মতো প্যান্ট পরেছে। এর সামনে বা পিছনে কিছু নেই। কে বলবে পুরুষ, না মহিলা?' আরো কৌতুক, আরো হাসি। হয়টিটয়টি ধরে ফেলেন যে তাকে নিয়েই কথা হচ্ছে। আমার হাতটা শক্ত করে ধরে দৃঢ়তার সাথে জানতে চান, ব্যাপারটা কি ঘটছে। আমি তাকে বলি। তিনি আমাকে বালকটির দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। 'ওকে বলো ঝোপের ওপাশে আসতে। আমি কাপড় খুলে দেখাব।' বালককে কথাটা বলি। সে দারুণ বিব্রত। লেডি হয়টিটয়টি বালকটির কান ধরে দাঁড় করান, 'আয় আমার সাথে, দেখে যা নিজের চোখে।'

বালক কোনোমতে কানটা ছাড়িয়ে দৌড় দেয়। অন্যান্য বালক-বালিকাও তার পিছু পিছু দৌড় লাগায়। সাইকেল চালকও কেটে পড়ে। বাকি লোকজনও এক এক করে বিদায় নেয়। এই তো চাই। এই মহিলার যদিও উল্লেখ করার মতো স্তন নেই, তবুও যা আছে একটি পদাতিক বাহিনীর চোষার জন্যে যথেষ্ট।

এই বিজয়ে লেডি নিজেও সন্তুষ্ট। দুই হাতের কাল্পনিক ধূলি ঝেড়ে বললেন, 'আমি গ্রামটি ঘুরে দেখতে চাই। নদীটা নিশ্চয়ই এখান থেকে খুব দূরে নয়।'

'ঘন্টাখানেক হাঁটলেই নদী।'

'তাহলে চলো।'

আমরা পূর্বদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। তালবাগান ছাড়িয়ে উন্মুক্ত গ্রাম। একটি জলাশয় পড়লো। মাটি ধূলিময়। আশেপাশে ঝোপঝাড়। দৃষ্টিসীমার মধ্যে একপাল হরিণ পড়লো এবং আমাদের দেখেই হরিণগুলা দৌড়ে পালালো। একটি কালো বড় হরিণ, সিং আকাশমুখী। আমাদের কয়েক গজ দূরে থমকে দাঁড়ালো। লেডি হয়টিটয়টি হাত তুলে গুলী করার মতো শব্দ করলেন 'ব্যাং।' হরিণ পিছন ফিরে দৌড় দিলো। কিন্তু এটির পায়ে গুলী লেগেছে। গুলীবিদ্ধ স্থান থেকে রক্ত ঝরছে। হরিণের গতি মন্থর হলো এবং ঝোপের পাশে হারিয়ে গেল। রাইফেল ও শটগানধারী কয়েকজন শিখ জীপে আসীন। আমাদের দেখে প্রশ্ন করলো, 'সর্দারজি, এদিক দিয়ে এক পাল হরিণ যেতে দেখেছেন?' পাঞ্জাবিতেই প্রশ্নটি ছিল। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীকে সাথে দেখে ইংরেজীতে বললো, 'একটি বড় কালো বড় হরিণ। আমি নিশ্চিত যে, আমার গুলী ঠিক ওর গায়ে লেগেছে।'

আমি নদীর দিকে দেখালাম। 'একটু আগেই গেছে। বেশি দূরে যেতে পেরেছে বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।' জীপ নদীর পানে ছুটলো।

'এসব হারামজাদা শিকারীদের আমি জেলে ঢুকাবো..' হয়টিটয়টির মুখে হাসি। নীল চোখে উচ্ছলতা। 'নো ব্যাং ব্যাং।' আমার দাড়িতে আন্তরিক হওয়ার অনুমোদনসূচক চাপড় দেয় লেডি।

'আমি যখন ছোট্ট বালক ছিলাম তখন নগর প্রাচীরের এক মাইলের মধ্যে নীল ষাঁড়, বুনো শুয়োরের পাল দেখেছি। আপনি এখন যেখানে অবস্থান করছেন, সেই রাষ্ট্রপতি ভবনের পিছনের জঙ্গলে বাঘ দেখা যেতো। আমাদের পার্কগুলোতে খরগোশ, 'তিতির ও ময়ূর ছিল। আমার মনে আছে এখান থেকে বিশ মাইলও হবে না।, সেখানে বড় বড় হরিণ একসাথে অন্তত পঞ্চাশটি দেখেছি। এখন আপনি দিল্লীর একশ' মাইলের মধ্যে কিছুই দেখবেন না। বিদেশী শুয়োরের বাচ্চারা কূটনৈতিক সুবিধার নামে এসব মেরে সাফ করে ফেলেছে। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি ওদের গুলী করে মারতাম।'

'কিন্তু জীপের লোকগুলোকে তো বিদেশী মনে হলো না। দেখতে তোমারই মতো।' তিনি বললেন।

'আমি ওদেরকেও গুলী করে মারবো।'

আমরা এগিয়ে যাই শস্যক্ষেতের আলপথ ধরে। গম সবুজ থেকে হালকা হলদে বর্ণ ধারণ করেছে। শস্যক্ষেত শেষ হলো। আমাদের পা বালিতে দেবে যাচ্ছে। একটি ছোট্ট পুকুরের পাশে থামলাম। ছোট ছোট 'এক ধরনের হাঁস শব্দ করতে করতে আমাদের মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে। আমি হাত তুলে শব্দ করলাম, 'ব্যা ব্যাং।...গুলী লেগেছে লেডি হয়টিটয়টি। ছয়টি পাখি পড়ে গেছে।' তিনি হাসছেন। 'তুমি আমার সাথে ঠাট্টা করছো।'

নদী দেখা যাচ্ছে। আমরা নদীর উঁচু তীরে দাঁড়িয়ে আছি। নিচে যমুনা নদী তিন মাইল দীর্ঘ অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে। নদীকে মনে হচ্ছে প্রাণহীন, কিন্তু লাল রং এর কিছু ফুল গাদা ফুলের সাথে একাকার হয়ে ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে ভাটির দিকে। অর্থাৎ কিছুটা হলেও নদীর জীবন নিঃশেষিত হয়নি। তিনটি কচ্ছপ পনিতে নেমে গেল। নদীর অপর তীরে বালির উপর হাজার হাজার জলচর পাখি রোদ পোহাচ্ছে। সাদা মাথা বিশিষ্ট একটি ঈগল নদীর উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে শ্যেন দৃষ্টিতে, মাছের সন্ধানে।

লেডি হয়টিটয়টি বিস্ময়ের সাথে হাত প্রসারিত করে বললেন, 'নদী দেখে প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের মতো লাগছে।' আমার কনুই ধরে তিনি বালির উপরই বসে পড়লেন। তার পাশে আমিও বসলাম। আমাদের পা নদীর তীরে ঝুলে আছে। সেখানে ময়লার অসংখ্য গর্ত। তিনি সিগারেট জ্বালালেন। 'এটা ঘটেছে কৃষ্ণের ভাই বলরামের জন্যে। যমুনার ওপর তার যৌন কামনা চরিতার্থ করতে না পেরে মাতাল হয়ে সে যমুনাকে চুলে ধরে হিন্দুস্থানের সমতল ভূমির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নেয়ার ফলেই যমুনার গতি এমন হয়েছে।'

একটি মাছ লাফ দিয়ে পানির উপরে উঠে।

দূরে শিকারীদের বন্দুকের গুলীর শব্দ শোনা যায়। অপর তীরের পাখীগুলো ঝটপট আকাশে পাখা মেলে। চিৎকার করতে করতে আমাদের উপর দিয়ে উড়ে যেতে থাকে। নানা প্রজাতির পাখি। নদীর উপর চক্রাকারে ঘুরে আমাদের থেকে একশ গজ দূরে পুনরায় নেমে আসে। পরিস্থিতি শান্ত হয়। সাদা মাথা বিশিষ্ট ঈগলকে পুনরায় দেখা যায়।

একটু পর লেডি হয়টিটয়টি আমার হাঁটুর উপর তার চোখ রেখে জিজ্ঞেস করেন, 'এই নদীও কি তোমাদের পবিত্র নদীর একটি?'

'গঙ্গার চেয়ে কিছুটা কম। যমুনার একটি অংশ সরযু, সূর্যের কন্যা, তার আরেক নাম ত্রিয়ামা। ত্রিয়ামার বোন হচ্ছে মৃতদের শাসক। তার জন্ম হয়েছে কালিন্দা পর্বতে। সে জন্যে তার আরেক নাম কালিন্দা নন্দিনী, কালো পর্বতের কন্যা। পবিত্র গ্রন্থ বেদ এই নদীর বন্যায় বিধৌত।

কৃষ্ণ-এর পানিতে স্নান করেছেন। ম্যাডাম, 'যমুনা নদীর পবিত্রতাও এমন যে, এর পানিতে একটি ডুব দিলে গোটা জীবনের পাপ ধুয়ে যাবে। আসল কথা হচ্ছে আপনাকে যদি একটা ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দেই, তাহলে আপনার প্রতি দারুণ অনুগ্রহ হবে।' আমার হাত তার হাতের উপর রাখি।

তিনি তার হাত ঝাড়েন। ব্রেসলেটের সোনালী মুদ্রা বেজে উঠে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে হিপ পকেট থেকে প্যাকেট বের করে লাইটারটা আমার হাতে দিলেন এবং ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট।

তার সিগারেট জ্বালিয়ে দিলাম। তার দিকে তাকালাম। তিনি আমার দিকে। আমাদের চোখে চোখ। তার দু'চোখ জলভারে আনত আকাশের নিচে বঙ্গোপসাগরের পানির মত নীল। তিনি জানেন কী করে চোখের ব্যবহার করতে হয়। আমার মনে হলো তার চোখের তীর আমার চোখে আঘাত করে গলদেশে গিয়ে ঠেকেছে। আমার দৃষ্টি নামিয়ে নিলাম। আমার মুখের উপর তিনি সিগারেটের ধুঁয়া ছুড়ে দিলেন। 'থ্যাংকস'-বলে লাইটারটা নিজের হাতে নিলেন। তার হাত আবার আমার হাঁটুতে রাখলো। তার ব্রেসলেটের সোনালী কয়েন নিয়ে আমি খেলছি। কয়েনগুলোতে পুরুষ মানুষের নাম খোদিতঃ জিম, ফ্রেডি, ডেনিস, জ্যাকি। লেডি বললেন, 'সব আমার বয়ফ্রেন্ডদের নাম।' কথাটা বলে তিনি দাঁত বের করে হাসলেন। হলদে দাঁত। হাসি আটকে যাচ্ছে কফের কারণে। পাশ ফিরে গলা খাকারি দিয়ে কফ ফেললেন।

আমি মন্তব্য করলাম, 'সবাই নিশ্চয়ই ধনবান এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের।' একটি কয়েনে 'আলী' নামটিও উৎকীর্ণ। তিনি বললেন, 'না, সবাই ধনী নয়। এদের অনেককে আমি নিজ ব্যয়ে তৈরি করেছি। তাছাড়া সব দেশেরও নয়। এ সবের মধ্যে ভারতীয় নেই। সম্ভবত এবার একজন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্ত করবো।' আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি বালিতে পুঁতে বললেন, আমাকে শীঘ্র তিলপাতের খননকৃত স্থানগুলো দেখে শেষ করতে হবে। এরপর কী যেন নামটা বললে...সুরাজ সুরাজ-কুণ্ড।' আমার দাড়িতে আবার মৃদু চাপড় দিলেন। উঠে তার ক্ষুদ্রাকার নিতম্ব থেকে বালি ঝাড়লেন। আমাকে নির্দেশ দিলেন। 'আমার সাথে এসো।' তার হাত আমার কাঁধে। তাকে বেশ উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। সামনে এগিয়ে চলেছেন। আমি তার পিছনে। তাকে কিছু করতে পারছি না। এই ক্ষুদ্রাকৃতির, শক্ত, যৌন কামনাহীন মহিলাকে কিভাবে বর্ণনা করবো।

একটু দূরে জঙ্গলের উপর ধূলির মেঘ উড়তে দেখলাম। শিকারীদের জীপ চলার সাথে নিশ্চয়ই ধূলি উড়ছে। ওরা আমাদের দেখলো। লেডি হয়টিটয়টি দাঁত বের করে আমার দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে তাকালেন। কারণ কালো হরিণটি তারা পায়নি। তারা বুঝলো।

এক শিকারী মুষ্টি উঁচু করলো এবং গালি দিল।

লেডি জিজ্ঞেস করলো, 'সে কী বলছে?'

'সে বলছে কুকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্যে আমাকে যেতে।'

'সন্দেহ নেই, এটাই প্রাচ্য সংস্কৃতি।' তিনি বললেন।

তালবাগানের মধ্য দিয়ে এই পুরুষোচিত মহিলা আমাকে নিয়ে গেলো মন্দিরের পাশে রক্ষিত রোলস রয়েসের কাছে। গাড়ির পাশে আবার কিছু উৎসুক মানুষের ভিড় জমেছে। আমরা পৌঁছার পর তারা সরে গেল। আমরা কফি পান করে তিলপাতের দিকে রওয়ানা হলাম।

গ্রাম্য বালকদের সাথে মেম সাহেবের ব্যবহার আশপাশের এলাকায় চাউড় হয়ে গেছে। গাড়িতে লাগানো রাষ্ট্রীয় প্রতীক এবং ইউনিফর্মধারীর কারণেও কিছু আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের মাতব্বর ও তার সঙ্গী সাথীরা আমাদের স্বাগত জানালো, 'নমস্কার, জয় হিন্দ, সালাম' ইত্যাদি উচ্চারণ করে। হয়টিটয়টি তাদের প্রতি মাথা ঝুঁকিয়ে অভ্যর্থনার জবাব দিলেন। ঘোমটায় মুখ ঢাকা এক মহিলা ট্রেতে গ্লাসভর্তি চা হাজির করলো। হয়টিটয়টি ঘোমটার ফাঁক দিয়ে মহিলার মুখ

দেখলেন। সকলে হেসে উঠলো। তিনি চা পান করলেন না। কিন্তু এক কৃষকের হাত থেকে হুক্কার নল টেনে নিয়ে তাতে দম লাগালেন। লোকজন এই দৃশ্যে হাততালি দিলো এবং শিশুদের সারল্যে হাসলো। আমার মাধ্যমে তারা লেডিকে জানালো যে, খননকৃত জায়গাগুলো এখন উন্মুক্ত। তিনি জানতে চাইলেন, বাড়ি তৈরির সময় বা হালচাষের সময় তারা অদ্ভুত বা পূর্বে দেখেনি এমন কোনো বস্তু পেয়েছে কিনা। তারা মাথা নাড়লো, 'না।' আমরা তিলপাত থেকে বিদায় নিলাম। বদরপুরে আমরা বাম দিকে মোড় নিলাম। রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং অতিক্রম করে আবার বামের রাস্তা ধরলাম। সংকীর্ণ এক রাস্তা ধরে নিচের দিকে নামছি। একটি ময়ূর চোখে পড়লো। আপন মনে ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে।

হয়টিটয়টি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'একটি সত্যিকার জীবন্ত ময়ূর!'

'এই স্থানটি ময়ূরে পরিপূর্ণ।'

'এবং মানুষ দ্বারাও পূর্ণ। গোটা ভারতই মানুষে পরিপূর্ণ।' তিনি সুরাজ কুণ্ডের পার্কিং লটে বাস, স্কুটার, গাড়ি, বাই সাইকেলের লোকদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। বনভোজনে আগত লোকজন এদিকে সেদিক ছড়িয়ে আছে। সাপুড়ের বাঁশির আওয়াজের সাথে প্রতিযোগিতা করছে ট্রানজিস্টার, টেপরেকর্ডার, গ্রামোফোনের গান। আমাদের উপস্থিতিতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। রেস্ট হাউজের বারান্দায় উঠার পর গানের শোরগোল কমে গেল। তিনজন সাঁপুড়ে তখনো তাদের পেটমোটা বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। এক বৃদ্ধ একটি গোখরো সাপ গলায় পেঁচিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হলো। হয়টিটয়টি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'ক্রিসমাস! আমি সাপ পছন্দ করি না। বন ভোজনকারীদের হৈ হুল্লোরও আমার অপছন্দ।' তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট বিরক্তি। জানতে চাইলেন, 'এখানে আমাদের কতক্ষণ কাটাতে হবে?'

এখানেই সেই প্রাচীন অট্টালিকা। দুই মাইল দূরে একটি পুরনো বাঁধ রয়েছে। অনঙ্গপুর গ্রামটি আরো এক মাইল দূরে। অনঙ্গপুরকে রক্ষা করতে যে প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিলো, তার ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়েছে। এগুলো দেখতে আমাদের পুরো বিকেল-সন্ধ্যা কেটে যাবে। লেডি হয়টিটয়টি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার মহিলা। তিনি ইউনিফর্মধারীকে নির্দেশ দিলেন গাড়ি থেকে ঝুড়ি আনতে। রেস্ট হাউজের কক্ষে প্রবেশ করে পরখ করলেন চারদিক। এরপর বাথরুম দেখলেন। টাওয়াল শুকলেন। টয়লেটের পাশে রক্ষিত সংবাদপত্রগুলো দেখলেন। ড্রাইভারকে দিনের কার্যসূচি বলে দিলেন। "গাড়ি নিয়ে যাও। রাত নয়টার মধ্যে ফিরে আসবে।" আমাকে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন অনুভব করলেন না যে, রাত নয়টা পর্যন্ত আমি ফ্রি আছি কিনা।

ইউনিফর্মধারী ঝুড়ি সুটকেস এনে মেঝের উপর রাখলো। সে এবং ড্রাইভার লেডিকে স্যালিউট দিয়ে বিদায় নিলো। তিনি একটি আর্ম চেয়ারে বসলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পানীয়ের জন্যে আমার বুকটা শুকিয়ে আছে। আমার কাছের মানুষের মতো জিন ও টনিক মিশিয়ে যাও। আর তুমি নিজে যা পছন্দ করো- স্কচ, শ্যাম্পেন, বিয়ার, জিন...সবই আছে তোমার বৃদ্ধ প্রেসিডেন্টের বদৌলতে।' আমি এখন লেডির বাটলার। তাকে জিন ও টনিকের মিশ্রণ দিলাম। নিজে স্থির করছি কী পান করবো। তাকে আরেক গ্লাস মিশিয়ে দিতে হলো এবং তার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলাম। নিজের জন্যে ড্রাই ম্যাটিনি নিয়ে বিছানার প্রান্তে বসলাম। চিয়ার্সের জন্যে গ্লাস উঁচু করে ধরলাম। আমার আগ্রহকে অবজ্ঞা করে বললেন, 'আমাকে সুরাজ কুণ্ড সম্পর্কে কিছু বলো।'

'কুণ্ড শব্দটা উচ্চারণে জার্মান কুণ্ড-এর মতো। এর অর্থ পুকুর।' আমি তাকে সপ্তম ও অষ্টম শতকে দিল্লী শাসনকারী তোমারা রাজপুতদের সম্পর্কে বললাম। তাদের প্রধান সুরাজ পাল, যার নামানুসারে অট্টালিকার নাম হয়েছে।

তিনি গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে আরেক পেগ চাইলেন, 'আমার প্রিয় লোকের মত হও।'

আমি তার প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করি এবং আরেকটি জিনটনিক দেই। 'আর এই বাঁধ ও গ্রাম

সম্পর্কে বলো।' আর্ম চেয়ারের দুই হাতলে দুই পা এমনভাবে তুলে দিলেন যেন তার মধ্যে প্রবেশের জন্যে কোনো লোককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এমন অবাধ্য অবস্থায় দুই উরু প্রসারিত করে রাখলে আমার পক্ষে কি করে তোমারা রাজপুতদের সম্পর্কে বলা সম্ভব? তার মধ্যাঙ্গ থেকে আমার মনকে দূরে সরাতে চেষ্টা করলাম। 'বাঁধটি নির্মাণ করেছিল আরেক তোমারা, যার নাম অনঙ্গপাল। তিনি সুরক্ষিত নগর অনঙ্গপুরও নির্মাণ করেন। বিকেলে আমরা সেখানে যেতে পারি। এক পর্যায়ে তিনি তার রাজধানী পশ্চিম দিকে নিয়ে যান এবং লাল পাথরে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, যার নাম 'লাল কোট।'

আমার ভাষণের প্রতি তার মনোযোগ নেই। তার চোখ বুঁজে আসছে। আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'বলে যাও।' আমি কঠোরভাবে বলি, 'না, আমি বলবো না। আপনি ঘুমুচ্ছেন।' তিনি হাসলেন। কাশি দিয়ে থুথু ফেললেন। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ মেঝেতে নিক্ষেপ করে পায়ের চাপে নিভালেন। 'আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলাতে হবে।' স্যুটকেস খুলে একটি স্কার্ট বের করে বাথরুমে প্রবেশ করলেন। বাথরুমের পর্দায় দরজার মাঝখানের অংশ শুধু ঢাকা যায়। তা সত্ত্বেও তিনি দরজা বন্ধ করলেন না। প্যান্টের চেন খুলে একটি হুকে ঝুলিয়ে রাখলেন। ক্ষুদ্র নিম্নভাগ আবৃত করতে লেডি হয়টিটয়টি সাদা লেসের প্যান্টি পরলেন। মুখ ধোয়ার জন্যে বেসিনের উপর ঝুঁকলেন। আমি নিশ্চিত যে, তিনি এসব করছেন আমার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে। আমার আগ্রহ জাগ্রত হলো। তিনি টাওয়েলে মুখ ঢাকলেন। ঘুরে আবার ঝুঁকলেন এবং স্কার্ট পরিধান করলেন। বাথরুম থেকে বেরিয়ে হিন্দীতে বললেন, 'চলো, জলদি', ইজ দ্যাট রাইট?' আমরা বাইরে এলাম। পরিবেশ এখন শান্ত। সাপুড়েরা তাদের ঝুঁড়ি গুটিয়ে গাছের নিচে বসে আছে। বনভোজনকারীরা ট্রানজিস্টার ঘিরে বসেছে। মহিলারা পুরি ভাজছে। ছেলেরা পরেছে আটসাঁট ট্রাউজার। মেয়েরা ততোধিক আটসাঁট জামা পরে দৃশ্যমান সুপুষ্ট স্তন নিয়ে প্রাচীন নিদর্শন দেখে বেড়াচ্ছে।

হয়টিটয়টি কাটাওয়ালা ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়ালেন। আশপাশে তাকালেন। এক পাশে রোমান স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত গোলাকৃতির অট্টালিকা। বিরাট সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে পানিতে। অপরদিকে ঘন অরণ্য। আকাশবিহারী গাছের ভিড়ে কিছু বুনো খেজুর গাছও দেখা যাচ্ছে। বিস্মিত হয়ে তিনি হাততালি দিয়ে উঠলেন। 'তাহলে এই সেই অরণ্যানী। চমৎকার, একেবারে নিখুঁত। সূর্য মন্দিরটা কোথায়?' তিনি জানতে চাইলেন। অট্টালিকার অন্য পাশে সিঁড়ির ধাপগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম এবং সেখানে নেমে গেলাম। এরপর ধ্বংসপ্রাপ্ত সূর্য মন্দিরের সিঁড়ির কয়েকটি ধাপ ডিঙালাম। সেখান থেকে দূরের গ্রামগুলো দেখলাম। বড় বড় পাথরের চাঁই এবং কোনো কোনোটা আচ্ছাদিত হয়ে আছে লতাগুল্মে।

'সকালের খাবার ভালোই হয়েছিল। কিন্তু এখন আমি উত্তপ্ত এবং ক্ষুধার্ত। আপনি কি ক্ষুধার্ত নন?' আমি জানতে চাই। তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ও কে, আমার ঘড়ি বলছে যে, আরেক দফা জিনটনিক পান ও খাবারের সময় হয়েছে।'

আমরা রেস্ট হাউজে ফিরে এলাম। আমি তাকে জিনটনিক মিশিয়ে দেই। সাথে প্লেটভর্তি তন্দুরি চিকেন এবং রুশ সালাদ টেবিলে রাখি। আমি কাবাব খাই এবং আকণ্ঠ পান করি। তিনি লাঞ্চ শেষ করে আমাকে রুম থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ দেন। 'আমাকে এখন বিশ্রাম নিতে হবে। সাড়ে চারটায় আমাকে জাগিয়ে দিও। সন্ধ্যায় আমরা বাঁধ ও প্রাচীর বেষ্টিত নগর দেখবো।' রেস্ট হাউজে আরেকটি কক্ষ আছে কিনা, অথবা বসে বিশ্রাম নেয়ার মতো চেয়ার আছে কিনা তা জানার তোয়াক্কা না করেই আমাকে বের করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। 'আমাকে জোরে ডেকো। আমার ঘুম খুব গভীর।

আমি কিচেন থেকে একটা চেয়ার সংগ্রহ করলাম এবং তাতে বসে সামনের পিলারে পা ঠেকিয়ে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলাম। বনভোজনকারীরা তখনো গাছের নিচে আড্ডা দিচ্ছে।

ঘুমে আমার মাথা ভারি হয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করলাম। সাপুড়েদের বাঁশির শব্দে জেগে উঠলাম। বনভোজনকারীরা তাদের মালপত্র গোছাচ্ছে। সাপুড়েরা তাদের নিকট হতে আরো কিছু আদায় করা যায় কিনা তার শেষ চেষ্টা করছে। আমি ঢুলছি। বাস, কার, স্কুটার চলে যাওয়ার শব্দ পাচ্ছি। সাপুড়েদের বাঁশির সুর ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে। কয়েকটি কুকুর আবর্জনার মধ্যে খাবার খুঁজছে। আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি, হয়টিটয়টি আমাকে আসক্ত করতে চেষ্টা করছে। আমাকে আসক্ত করা কঠিন কাজ নয়। ভাগমতীর বেলায় আমার কোনো বিচার বুদ্ধি কাজ করে না। ভাগমতী একজন বেশ্যা। তার ব্যাপারে নিজেকে অপরাধী ভাবার কি আছে। আমি যখন হয়টিটয়টিকে গ্রহণ করছি, তখন ভাগমতী এসে হাজির হয় এং আমাকে বলে যে, 'এই বুড়ির চাইতে ভালো কাউকে কি আর পেলে না?' ভালো হতো যদি হয়টিটয়টি তরুণী হতো এবং তার মুখ থেকে জিনটনিকের গন্ধ না বেরুতো, তামাকের গন্ধ না আসতো। তার বার্ধক্যও একটি সমস্যা।

এখন সাড়ে চারটা। আমি হয়টিটয়টির রুমের দরজা চাপ দিয়ে খুলে ফেলি এবং ভিতরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেই। সাদা চাদরে আবৃত মৃতদেহের মতো তিনি বেডশীট দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে রেখেছেন। আমি যেখানে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিলাম, সেটা তার কাঁধ। তিনি মুখ থেকে চাদর সরালেন।'

'এখন ক'টা বাজে?' আমি তাকে সময় বলি। তিনি আড়মোড়া ভাঙ্গেন। তার বদলের লোম হলদেটে। বালিশের সাথে নিজেকে পিষ্ট করে বেডশীট জড়ো করে থুতনির নিচে রাখলেন। 'ভালো ছেলের মতো একটি সিগারেট ধরিয়ে দাও।' আমি তাকে সিগারেট ধরিয়ে দেই। সিগারেটে সুখটান দিয়ে নাক দিয়ে ধুঁয়া ছাড়েন। তৃপ্তির আওয়াজ তুলেন। 'আমার ড্রেসিং গাউনটা দাও।' বাথরুমের দরজার হুকে ঝুলানো ড্রেসিং গাউনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন। আমি তাকে ড্রেসিং গাউন দেই। তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন। সম্পূর্ণ উদোম শরীর। ছোট্ট, কুঞ্চিত স্তন। বোটা নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। ভাঁজ করা পেট এবং নাভীর নিচে সামান্য স্ফীতি। কোকড়ানো ধূসর লোম উরুসন্ধিতে। আমি তার কাঁধের উপর দিয়ে গাউন পেচিয়ে হাত দু'টো স্তনের উর এনে চাপ দেই। তিনি পাথরের মতো স্থির। 'তুমি কি করতে চেষ্টা করছো, বলবে কি?' তিনি জানতে চান। 'আমি...আমি...'

'ভালো কথা...তুমি...তুমি কী? মাথায় কোনো কুবুদ্ধি এনো না।' নিজের প্যান্ট ও শার্ট তুলে নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করেন। তিনি দরজা বন্ধ করেন না। আমিও সেদিকে তাকিয়ে থাকতে ইতস্তত করি না। তিনি ফিরে আসেন। আমার কাঁধে হাত রাখেন। 'সীমা লংঘন কোরো না।' আমাকে ক্ষমা করার মত অনুমোদনের ভঙ্গিতে আমার নাকের উপর একটি চুমু দেন। আমার অনুভূতি আহত হয়েছে। আমিও তাকে আহত করতে চাই। তার অতি দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস আমাকে তার প্রতি ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তিনি জানতে চান, 'তোমার রসিকতাটা যেন কী ছিল।'

'আপনি আমাকে দিল্লী নগরীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, ধ্বংসাবশেষই কোনো প্রাচীন সৌধের গৌরব ঘোষণা করে।'

তার কপাল কুঞ্চিত হয়। 'এটা বলার মতো কোনো ভাল কথা নয়।' আমরা অপরিচিত মানুষের মতোই রেস্ট হাউজ থেকে বের হলাম। আমাদের মাঝে নীরবতার প্রাচীর নিয়ে হাঁটছি। এখন গরম পড়েছে। স্যান্ডস্টোনের বিশাল এক একটা চাঁই রোদে পুড়ছে। গাছের ছায়ায় ময়ূর বসে ঠোঁট ফাঁক করে বিশ্রাম নিচ্ছে। কোনো কথা না বলে এবং কারো প্রতি না তাকিয়ে আমরা মাইলখানেক হাঁটলাম। আমরা একটা চড়াই-এর প্রান্তে এসে পৌঁছলাম। সামনে শস্যক্ষেতে গম ও সরিষার চাষ হয়েছে। সবুজের সমতল সমুদ্র এবং পাথুর হলদেটে পাথুরে দ্বীপ আবৃত হয়ে আছে গাছের সুউচ্চ শিখা দ্বারা। দ্বীপের অদূরেই অনঙ্গপুর গ্রাম। ভুল বুঝাবুঝির দুর্লংঘ প্রাচীর নিয়ে কেউ এ ধরনের চমৎকার দৃশ্যেরও প্রশংসা করতে পারে না। আমি লেডি হয়টিটয়টির হাত ধরে বললাম, কী চমৎকার, তাই না? তিনি প্রতি উত্তর করলেন, 'সত্যিই, চলো কোথাও বসি।'

তার হাত ধরে রেখেই আমরা অনঙ্গপুর বাঁধে অবতরণ করি। শস্যক্ষেতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খেজুর বাগানের উপত্যকার দিকে মুখ করে বসি। পঞ্চাশ ফুট নিচে পানি দেখতে পাচ্ছি। স্ফটিক স্বচ্ছ পানি। খেজুর বাগান থেকে একটি মাছরাঙ্গা উড়ে এসে পানির উপর হেলিকপ্টারের মতো ঘুরতে ঘুরতে সহসা পানির নিচে চলে যায় পাথরের মতো দৃঢ়তায় এবং একটি মাছ ঠোঁটে ধরে ভেসে ওঠে। কিছু পর পানি আবার শান্ত হয়। হয়টিটয়টি আরেকটি সিগারেট ধরান এবং সিগারেটের গোড়া পানিতে নিক্ষেপ করেন। খাবার মনে করে কিছু মাছ আসে এবং হুড়োহুড়ি করে। বিকেলের অবশিষ্ট সময়ে আমরা অনঙ্গপুরের মাঠে হাঁটতে থাকি। আমরা উট দ্বারা চালিত একটি ইরানি গাড়ি দেখলাম। এক গুজ্জার মহিলা মহিষের গোবর দেয়ালে শুকাতে দিচ্ছে, তাও দেখলাম। আমরা ঘুরে ঘুরে অনঙ্গপুরের প্রতিরক্ষা প্রাচীর দেখছি, ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়েছে। আমরা খেজুর বাগানের মাঝ দিয়ে রেস্ট হাউজে ফিরে এলাম। তখন সূর্য ডুবে গেছে।

কোন একজন মানুষকেও চোখে পড়লো না। চৌকিদার চেয়ার ও টেবিল পেতে তার কোয়ার্টারে চলে গেল। আমি প্রেসিডেন্টের স্কচের বোতল বের করি। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আমরা আয়েশের সাথে হুইস্কি পান করতে পারি। দীর্ঘ হাঁটাহাঁটির পর হুইস্কি পানের সাথে সাথে যেন জীবনীশক্তিও ফিরে আসছে। আমার হাত তার দিকে বাড়িয়ে দেই। তিনিও তার হাত দেন ধরে রাখার জন্যে। আমরা আকাশকে আলোকিত ধূসর হতে প্রত্যক্ষ করছি। পাখিরা তাদের বাসায় ফিরছে। ময়ূর ডাকছে খেজুর বাগান হতে। রেস্ট হাউজের ছাদেও দুটি ময়ূর বসেছে। হয়টিটয়টি ওঠে হাত পা ঝাড়লেন। তার মাথা আমার বুকে স্থাপন করলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই আমার মুখে চুমু দিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। দিনটা চমৎকার কাটলো।' আমি তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরি এবং তার গা শূন্যে তুলে ধরে তার চর্মসর্বস্ব মুখের সর্বত্র চুমু দিতে শুরু করি। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে?'

'অবশ্যই! ভিতরে চলুন।' আমরা বারান্দায় উঠেছি। এ সময়ই প্রেসিডেন্টের রোলস রয়েসের হেডলাইটের আলো এসে পড়লো। আমি সংখল্পবদ্ধ। সঙ্গম অনিবার্য। কিন্তু মিলনটা হতাশাব্যঞ্জক! একেবারে পানসে, সাদামাটা। তবু কোনোভাবে দেহের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভের তৃপ্তি তো আছে। এমন একটি বিধ্বস্ত মহিলার মধ্যে আমার বীর্য বিনষ্ট করার মানে হয় না। ভাগমতীর জন্যে সংরক্ষণ করতে পারি। সে সব সময় নববিবাহিতার মত আনন্দদায়ক এবং তার মুখে এলাচের সুগন্ধ থাকে।

হয়টিটয়টি পুনরায় লেডিশীপে ফিরে এলেন- শীতল ও নিরাসক্ত। গাড়িতে এক কোণে বসেছেন। আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই তিনি খুব শুকনোভাবে বললেন, 'সবকিছুর জন্যে ধন্যবাদ। লন্ডনে গেলে আমার সাথে দেখা করো।'

'ইট ওয়াজ এ প্লেজার।' আমি তাকে আমন্ত্রণ জানানোর সৌজন্য দেখাই না। বুধ সিং তার লাঠি হাতে দণ্ডায়মান। আমি রোলস রয়েস থেকে নামা মাত্র সে অ্যাটেনশন হয়ে আওয়াজ তোলে, 'প্যারেড, প্রেজেন্ট আর্মস!' হয়টিটয়টি মাথা বাড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় নেয়ার সময় বুধ সিং পাঞ্জাবীতে যা বললো, তার অর্থ দাঁড়ায়, 'ঈশ্বর আমাদের মহামান্যা রাণীকে রক্ষা করুন।'

আমি হয়টিটয়টির উদ্দেশে হাত নাড়ি। বুধ সিং-এর স্যালিউট গ্রহণ করে জানতে চাই, 'খবর কী?' সে নিজেকে নির্দেশ দেয়, 'প্যারেড, স্লোপ আর্মস! সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আপনার হিজড়া ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছে। আমি তাকে ভিতরে যেতে দিয়েছি। কারণ, কাল আপনি আমার ওপর খুব রাগ করেছেন। মেয়ে হোক, বালক হোক, কিন্তু একজন হিজড়ার সাথে...এ কথা বলার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।' আমি তার বাক্য সম্পূর্ণ করি, 'কাজটা ভালো নয়।' দ্রুত আমি দরজা বন্ধ করি।

পাবলিক লাইব্রেরী

৩

ভাগমতী

ভাগমতী আর্মচেয়ারে দুই পা তুলে একটি বই-এর পাতা উল্টাচ্ছিল। তার বাম হাতের দুই আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেট। সিগারেটে সুখটান দিয়ে সে কার্পেটের উপরই ছাই ঝাড়লো। মাথার চুলে সে প্রচুর তেল মেখেছে এবং প্রজাপতির মত করে চুল বেঁধেছে। কৃত্রিম সিল্কের চকচকে গোলাপী রং-এর শাড়ি তার পরনে। ব্লাউজের রং ঘন নীল। সাদা স্যাটিনের উপর আঙ্গুলের দিকে বো টাই-এর মত করা। ভাগমতী দিল্লীর সবচেয়ে বাজে পোশাকে সজ্জিতা বেশ্যা।

টেবিল ল্যাম্পের আলোতে দেখা গেল তার মুখের উপর পাউডার ও রোজের পুরু প্রলেপ। এর দ্বারা তার গায়ের কালো বর্ণ বা গুটি বসন্তের দাগ কোনটাই গোপন করা যায়নি। চোখে কাজলের দাগ টেনেছে লম্বা করে। ঠোঁটে সস্তা কড়া রংয়ের লিপস্টিক। পান খেয়ে সে দাঁত রঙ্গিন করে ফেরেছে। এভাবে ভাগমতীকে দেখা যাচ্ছে দিল্লীতে সচরাচর দৃষ্ট বেশ্যার মতই।

'এই যে, আপনি বিলাত থেকে ফিরেছেন।' আমাকে প্রবেশ করতে দেখেই সে বললো এবং কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে চললো, 'আপনার কাছে এগুলো কেমন বই? কোন ছবি নেই!' কথার প্রতিটি শব্দ উচ্চারণের সাথে সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এবং হিজড়াদের সহজাত ভঙ্গিতে হাত নাড়ছে। 'ছবি ছাড়া কালো অক্ষরগুলো যেন মরা মাছি।' এবার সে প্রসঙ্গ পাল্টায়, 'লন্ডনে গোরা খচ্চরগুলোর উপর যখন সওয়ার হয়েছেন, তখন কি এই হতভাগী ভাগমতীর কথা আপনার মনে পড়েছে?' ভাগমতী আসলেই দিল্লীর সবচেয়ে কর্কশ, রূঢ় বেশ্যা।

ভাগমতী অন্যান্য মহিলাদের মত নয়। সে আমাকে তার অতীত জীবন সম্পর্কে কিছু বলেছে। বাকিটা আমি নিজে আবিষ্কার করেছি। জুমা মসজিদের কাছে ভিক্টোরিয়া জেনানা হাসপাতালে ভাগমতীর জন্ম। তার পিতা যখন ডাক্তারের কাছে জানতে চাইলে যে, 'এটা কি, ছেলে না মেয়ে?' ডাক্তার উত্তর দিয়েছিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।' তার বাবা মার ইতোমধ্যে তিনটি পুত্র সন্তান ছিল। অতএব তাদের চতুর্থ সন্তানের নাম রাখলো মেয়ের নামে- 'ভাগমতী'। তাদের বাড়িতে যখন একদল হিজড়া নাচতে ও গাইতে এলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'আপনাদের বাচ্চা দেখান। সে ছেলে না মেয়ে, অথবা আমাদের একজন- আমরা দেখতে চাই।' তার পিতা হিজড়াদের কষে গালি দিলো এবং নাচগানের জন্যে টাকা পয়সা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলো। যখনই তারা সেই মহল্লায় আসতো তখন তাদের দরজায় থেমে বলতো, 'আপনাদের ছোট বাচ্চাটাকে দেখান, সে যদি আমাদের মত হয়, তাহলে তাকে আমাদের হাতে তুলে দিন।'

ভাগমতীর মায়ের আরো দুটি সন্তান হলো- দুটিই মেয়ে। এই মেয়ে দুটি হবার সময়ও তার পিতা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল এবং ডাক্তারকে পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ জানিয়েছিল যে, সে ছেলে না মেয়ে। দুইবারই ডাক্তার তার গোপন অঙ্গ পরীক্ষা করে বলেছিল, 'আমি নিশ্চিত নই। দুই এর মিশ্রণ।' ভাগমতীর বয়স যখন চার বছর তখন তার বাবা মার শেষ সন্তান হলো। হিজড়াদের আগমন ঘটলে তার বাবা তাদেরকে একুশ টাকা দিয়ে বললেন, 'এখন আমার তিন ছেলে দুই মেয়ে। তোমরা একে নিয়ে যেতে পারো। সে তোমাদেরই একজন।'

হিজড়াদের দল ভাগমতীকে নিয়ে এলো। তারা তাকে গান গাইতে, হাততালি দিতে এবং হিজড়াদের মতো নাচতে শিখালো। যখন তার বয়স তের বছর, তখন তার গলার স্বর পুরুষের মত হয়ে গেল। তার ঠোঁটের উপর লোম গজাতে শুরু করলো। থুতনির পাশে এবং বুকে

লোমের উদগম হলো। অন্যদিকে তার স্তন ও নিতম্ব ছেলেদের চেয়ে আকৃতিতে বাড়লো, অথচ তার বয়সী মেয়েদের মতোও হলো না। কিন্তু তার ঋতুস্রাব শুরু হলো। গোপনাঙ্গের গঠন মেয়েদের মত হলেও তাতে বৈচিত্র্য ছিল। তার ভগাঙ্কুর আকৃতিতে বড়, বাকি সবকিছু মেয়েদের মত। এ সময় সে নিজেই ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার বললো, 'একটা মেয়ে যা করতে পারে, তার সবই তুমি করতে পারবে; কিন্তু তোমার বাচ্চা হবে না।'

হিজড়াদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই আছে। কিছু হিজড়া প্রায় ছেলের মত, কিছু প্রায় মেয়েদের মত। কিছু আছে ছেলে ও মেয়ের মিশ্রণ। সেজন্যে বলা মুশকিল যে, কার মাঝে কি অবস্থা লুকিয়ে আছে। মেয়েদের পোশাক পরার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের একটা কারণ হতে পারে যে, পুরুষশাসিত সমাজে গ্রহণযোগ্য মান অপেক্ষা ভিন্নতর কিছুকে অপুরুষোচিত বিবেচনা করা হয়। তার চেয়ে বরং মহিলারা উদার।

ভাগমতী মেয়ে হিজড়া। তার বয়স যখন পনের বছর তখন হিজড়া দলের নেতা তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। তার আরো দুটি হিজড়া স্ত্রী ছিল। এটা কোন ব্যাপারই নয়। আগের স্ত্রীরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করার চাইতে বরং তার বিয়ের পোশাক পরানো থেকে বাসর শয্যা রচনা করা পর্যন্ত সব কাজ করলো আনন্দচিত্তে। তার আগে ভাগমতীর দেহের বিভিন্ন স্থানে গজানো অবাঞ্ছিত লোম চেছে তাকে গোলাপ জলে গোসল করিয়ে দিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাসর রাতের লীলা দেখা ও কথা শোনার চেষ্টায় লিপ্ত হলো।

ভাগমতী সতের বছরে পড়লে গুটি বসন্তে আক্রান্ত হলো। হিজড়ারা তাকে মৃতদের মধ্যে গণ্য করে হাসপাতালে ছেড়ে এলো। সেখানে লোক মরছিল মাছির মত। 'শীতলা মা (বসন্ত রোগের দেবী) আমাকে বাঁচিয়ে রাখলেও তার আঙ্গুলের ছাপ রেখে গেল আমার মুখের উপর।' পুরুষেরা যখন তাদের লালসা চরিতার্থ করতে হিজড়াদের কাছে আসতো, তখন বিস্ময়কর মনে হতো যে, কতক লোক হিজড়াদের মহিলাদের মতই ব্যবহার করে। ভাগমতী মেয়ে হিসেবেও ব্যবহৃত হতো, সমকামীদেরও তার উপর উপগত হতে দিতো। সে আরো আবিষ্কার করেছিল যে, কিছু খদ্দের নিজেরাও মেয়েদের মত আচরণ পাওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও খদ্দেরকে তৃপ্তি দেয়ার মত উৎস তার সীমিত, তবু সে শিখে নিয়েছিল কিভাবে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। ভাগমতীর কাছে কোন যৌন প্রক্রিয়াই অস্বাভাবিক মনে হতো না, অতএব সে নিজেও মজা পেয়েছে। খুব সাধারণ হিজড়া হওয়া সত্ত্বেও বৃদ্ধ, তরুণ, সক্ষম, ধ্বজভঙ্গ, সমকামী, মর্ষকামী সব ধরনের খদ্দের তাকে কামনা করতো।

ভাগমতী যৌন শয্যাকে প্রতিযোগিতায় মত্ত দু'জন কুস্তিগীরের কুস্তির স্থানের মতই বিবেচনা করতো। ভাগমতী পুরুষ-নারীতে আসক্ত যৌন বিকারগ্রস্তদের ভোগের উপকরণ। যদিও ভাগমতী তার পেশার ব্যাপারে উদার, তবু তার স্বামী ও সতীনদের সাথে লাল কুয়ানেই বাস করতো। যা আয় হতো, তা স্বামীর হাতে তুলে দিত। বিনিময়ে মাথার উপর একটি ছাদ আর খাবার জুটতো তার। অসুস্থ হলে তারা তাকে সেবা করতো। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জামিনে ছাড়িয়ে আনতো। সাজা হলে জরিমানা দিয়ে মুক্ত করে আনতো।

ভাগমতীর সাথে কিভাবে আমার সম্পর্ক হলো? সে এক লম্বা কাহিনী- পরে সে সম্পর্কে বলবো। আমার কাছে সে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো কেন? সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই। জীবনে আমার দুটি মাত্র আবেগ আছে; একটি আমার প্রিয় নগরী দিল্লীর জন্যে, আরেকটি ভাগমতীর জন্যে। উভয়ের মধ্যেই দুটি বিষয়ে বিরাট সামঞ্জস্য ঃ উভয়েই আনন্দের অফুরন্ত উৎস এবং উভয়েই বন্ধ্যা।

সোফায় বসে আমি জানতে চাই, 'তুমি কোথায় গিয়ে মুখ কালো করে এলে?'

সে আঙ্গুল দিয়ে গাল, থোঁচাতে থোঁচাতে বলে, 'কি বলছেন, আমি মুখ কালো করতে গেছি, আর আপনি বড় গাড়ি আর গোরা বুড়ির উপর সওয়ার হয়ে বেড়াচ্ছেন। এ কেমন বিচার?'

'নিশ্চয়ই বুধ সিং-এর সাথে তোমার কথা হয়েছে?'

'সেই পাগল! সে আমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সে বলেছে যে, আপনি আগামী পনের দিনেও ফিরবেন না। কিন্তু আমার মন বলছিল, আপনি ফিরে এসেছেন।' সে টেবিলের উপরই সিগারেটটা চাপ দিয়ে নিভিয়ে সেটা কানের পিছনে গুঁজে রাখে। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা

দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরি করে আরেকটি হাতের তর্জনী তার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে ও বের করে বলে, 'এটা কেমন?' আগেই বলেছি সে দিল্লীর সবচেয়ে কর্কশ বেশ্যা।

'তুমি এতো বাজে হয়েছো?'

সে বিস্ময়সূচক ধ্বনি করে, 'আজ আপনি আমাকে বাজে বলছেন। ভগবান জানেন, কাল কি বলবেন?' সে চেয়ার থেকে উঠে এসে ফ্লোরে বসে আমার পা থেকে জুতা, মোজা খুলে নিয়ে পা টিপতে শুরু করে। বেশ আরাম লাগছে। সে ক্রমান্বয়ে আমার হাঁটু, উরু ঢলতে থাকে। তার কাজ সে করে যায়। আমি বাধা দেই না। কোন চেষ্টাও করি না। প্যান্টের জিপার খুলে মধ্যাঙ্গে আস্তে করে চুমু দেয় এবং আমার উপরে উঠে আসে। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আমাকে কিছু করতে হয় না। আমি আনন্দের পুরোটাই উপভোগ করি। কে কখন কি চায়, ভাগমতী তা জানে।

আমার জীবনে ভাগমতী কিভাবে প্রবেশ করলো? সেটা অতীত- তিন বছর আগের কথা।

তখন আমি একজন শিল্পপতির জীবনী লিখার কাজে ব্যস্ত। আমাকে একজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট দেয়া হয়েছিল। দিল্লীর নতুন শহরতলি প্যাটেল নগরে আমাদের জন্যে কয়েকটি কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। জায়গাটা এক সময় পুরনো ও নতুন দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে ছিল।

অফিসে যাতায়াতের সংক্ষিপ্ত রাস্তা খুঁজে পেতে আমার কিছুদিন সময় লেগেছিল। রাস্তাটা উঁচু। যেখান থেকে নতুন ও পুরনো দিল্লীর দৃশ্য অবলোকন করা যায়। রাস্তার অপর পার্শ্বে কিছু ঝোপঝাড়, গাছপালা, লতাগুল্ম, লাল বেলে পাথরের চাঁই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাছাড়া আছে নানা জাতের ফুলগাছ। কিন্তু নানা কারণে রাস্তাটির বদনাম হয়েছে।

একটি বা দুটি গাড়ি আটক করে ডাকাতি হয়েছে। বাকি কাজ করেছে সংবাদপত্রগুলো। পথচারী ও সাইকেল আরোহীরা রাস্তাটি এড়িয়ে চলে এবং গাড়ি এ রাস্তায় না থেমে দ্রুত অতিক্রম করে। বলা যায় রাস্তাটি পরিত্যক্ত। এই রাস্তার উপরই ভাগমতীর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। প্রথম সাক্ষাতের ঘটনা আমার মনের উপর এমন দাগ কেটে থাকলেও বাদবাকি ঘটনা দ্রুত মুছে গেছে।

প্রথম সাক্ষাতের বিস্তারিত আমি মনে করতে পারি।

এপ্রিলের কোন একদিন খুব গরম পড়েছে। আমাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে কয়েক ঘন্টা কাজ করতে হয়। ভারি পর্দার কারণে কক্ষে দিনের আলো প্রবেশ করে না বলে টেবিল ল্যাম্পের আলোতে কাজ করি। হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেল। এখনকার মতো তখনো যখন তখন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার ঘটনা দিল্লীতে স্বাভাবিক ছিল। কিছুক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকলাম। তখন দুপুর। আকাশ ধূলি ধূসরিত। গরম বাতাসে আরো ধূলি উড়ছে। আমি গাড়িতে উঠে রাস্তায় এলাম। দূরের বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে ঝোপের ফাঁক দিয়ে। কিন্তু কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। একটি চিলও উড়ছে না। আমার একশ গজ দূরে দু'জন সাইকেল আরোহী বাতাসের বিপরীতে যাচ্ছে কষ্ট করে। তাদের থেকে আরো একটু দূরে উত্তপ্ত রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি দেহ নজরে এলো। সেটির দিকে সাইকেল আরোহীদের তাকাতে দেখলাম। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। তারা সাইকেল থেকে নামলো। কাছে পৌঁছে আমিও থামলাম।

দেহটা একটি মেয়ের। ক্রুশবিদ্ধের মত হাত পা ছড়িয়ে আছে। চোখ আধ খোলা। মুখ থেকে রক্তের ক্ষীণ ধারা বেরুচ্ছে। তার বুকের দিকে তাকালাম তার শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কিনা দেখতে। শাড়ির ভাঁজে নিশ্চিত হওয়া মুশকিল। সাইকেল আরোহীদের লক্ষ্য করে বললাম, 'সে কি মরে গেছে?'

তারা মেয়েটির মুখের দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলো। একজন বললো, 'মৃগী রোগী।' লোকটি দুই পাটি দাঁতের ফাঁকে একটি ছোট ডাল ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, 'এর ফলে তার জিভে কামড় লাগবে না।।' এক পায়ের চামড়ার জুতা খুলে মেয়েটির মুখের উপর রাখলো, 'পুরনো চামড়ার গন্ধ মৃগী রোগীর জন্যে সর্বোত্তম ওষুধ?'

আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটির বুক ওঠানামা করছে। তার স্তন খুব ছোট। প্রায় অস্তিত্বহীন স্তন আবৃত রয়েছে সস্তা ফুলওয়ালা সিল্কের ব্লাউজে। আর কী দেখলাম? পা দুটো খুব কালো। পায়ের নখে উজ্জ্বল নেলপলিশ। হাতের তালুতে মেহেদীর রঙ। সে খাটো এবং একটু মোটা। বয়স

বিশের মতো। সব মিলিয়ে তার গায়ের কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় রূপের মানদণ্ডে আকর্ষণীয়। মুখের উপর গুটিবসন্তের কিছু দাগও দেখলাম।

সাইকেল আরোহীদের উদ্দেশ্যে বললা, 'এখানে সে কী করছিল?'

তাদের একজন উত্তর দিলো, 'গুরুই জানেন।'

আরেকজন মন্তব্য করলো, 'দিনকাল খুব খারাপ।' মেয়েটির মুখের উপর থেকে জুতা সরিয়ে নিয়ে নিজের পায়ে পরতে পরতে বললো 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে সেরে উঠবে।' আমাকে কোনোকিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তারা দু'জনেই সাইকেলে উঠে চলে গেল।

মেয়েটি গোঙাতে গোঙাতে মাথা ঝাঁকাতে শুরু করলো। সে হাত তুলে আঙ্গুলে একটি বৃত্ত আঁকলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছো?'

সে মাথা ঝাঁকালো। আমি তার মুখ থেকে রক্তের দাগ মুছে দিলাম শাড়ির আঁচল দিয়ে এবং উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম। তার শরীর থেকে ঘাম ও প্রস্রাবের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

সে বললো, 'মাথাটা চক্কর দিয়েছে। দয়া করে আমাকে একটু বাসস্ট্যান্ডে পৌছে দিন।' তার কণ্ঠস্বর পুরুষালী ধরনের।

আমি দ্বিধাগ্রস্ত। এ কোনো ফাঁদ নয়তো। আমি শুনেছি, এভাবে লোকদের প্রতারণা করা হচ্ছে। আমার তেমন দুর্ভাবনা নেই। আমার বিবেক স্বচ্ছ। গাড়ির পেছনের আসনে ওকে বসতে সাহায্য করলাম। সে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলো। সাইকেল আরোহীদের অতিক্রম করলাম। রিয়ার ভিউ মিররে দেখলাম, তাদের একজন সাইকেল থেকে নেমে নোটবুকে কিছু লিখছে। সন্দেহ নেই যে, আমার গাড়ির নম্বর টুকে নিচ্ছে। কোনো ঝামেলায় পড়তে যাচ্ছি না তো?

'তোমাকে কোথায় নামিয়ে দিলে ভালো হয়?

উত্তর নেই। পিছনে ফিরলাম। সে ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা আবার বেহুশ হয়ে গেছে। এখন আমার কী করণীয়? হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া? তারা আমাকে জেরা করবে এবং পুলিশ ডাকবে। থানায় নিয়ে যাব? না, দিল্লীর পুলিশের কাছে নয়। এক সহস্র বছরেও নয়।

আমি লোহিয়া হাসপাতাল, পার্লামেন্ট স্ট্রীট, কনট সার্কাস অতিক্রম করলাম। সহসা নিজেকে মস্ত এক আহম্মক মনে হলো। যে কোনো ট্রাফিক পয়েন্টে কেউ লক্ষ্য করতে পারে যে, গাড়ির পিছনের সিটে মরার মত একটি মেয়ে পড়ে আছে এবং হাঙ্গামা শুরু হতে পারে। গাড়ি ঘুরিয়ে পার্লামেন্ট স্ট্রীট হয়ে পালাম বিমানবন্দরের রাস্তা ধরলাম। একটি জনহীন রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে মেয়েটিকে জাগালাম। কপালে হাত দিলাম। জ্বর নেই। আস্তে ঝাঁকুনি দিলাম। সে চোখ খুলে বললো, 'ঘুমাতে দিন, আমি খুব ক্লান্ত।' আবার সে ঘুমিয়ে পড়লো।

অ্যাপার্টমেন্টে পৌছার আগে আরো এক ঘন্টা গাড়ি চালালাম। আমার জানালার পাশে যেখানে বরাবর গাড়ি পার্ক করি, সেখানেই গাড়ি রাখলাম। গুরু অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পড়শীদের কেউ অথবা তাদের চাকররা বাইরে নেই। পিছনের দরজা খুলে মেয়েটিকে জোরে টান দিয়ে বললাম, 'সাথে এসো।' তাকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করলাম।

'তুমি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এখানে থাকতে পারো'- ঘরে ঢুকে বললাম। 'আপনার দাসীর যথেষ্ট ঘুম হয়েছে। হুজুর যদি দয়া করে বাথরুমটা দেখিয়ে দেন, তাহলে দাসী অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবে।'

তার মুখে চমৎকার হিন্দুস্থানী ভাষা আমাকে বিস্মিত করলো। আমি তাকে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে কিভাবে গরম ও ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করতে হবে বুঝিয়ে দিলাম এবং একটি পরিষ্কার তোয়ালে, আমার প্রিন্সটন টি-শার্ট, ট্রাউজার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, 'আমার ঘরে মেয়েদের কোনো কাপড় নেই। তোমার শাড়ি না শুকানো পর্যন্ত এগুলো পরতে পারো।'

সে দীর্ঘক্ষণ বাথরুমে কাটালো গোসল করতে ও ময়লা শাড়ি ধুতে। বাইরে এলে দেখলাম, টি-শার্ট খুব ঢিলেঢালা। দু'হাত দিয়ে ট্রাউজার তুলে ধরেছে। আমি হাসলাম। গুটিবসন্তের দাগে ভরা তার মুখেও হাসির ছটা। 'এগুলো খুব বড়।' আমি ওর জন্যে গ্লাসে কোক ঢেলে ডাইনিং টেবিলে প্লেটভর্তি আম খেতে ডাকলাম। আম নিতে নিতে সে বললো, 'আমি খুব ক্ষুধার্ত। কাল

থেকে কিছুই খাইনি।'

'দুপুর বেলায় ঐ নির্জন স্থানে তুমি কী করছিলে?'

'তিহার থেকে বাড়ি ফিরছিলাম।'

'তিহার?'

'আপনি জানেন! তিহার জেল! গত সন্ধ্যায় ওরা আমাকে ছেড়েছে। আমার কাছে একটি পয়সাও ছিল না। এক শ্রমিক ঝুপড়ির বাইরে রাতটা কাটিয়েছি। তারা ঘরেও জায়গা দেয়নি। এরপর হাঁটতে শুরু করেছি। তিহার- শহর থেকে বহু দূরে।'

'কী কারণে তুমি তিহার জেলে গিয়েছিলে?'

সে আমার চোখে চোখে তাকিয়ে নর্তকীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'অসামাজিক কাজের জন্য আমাকে ধরেছিল। আমি একজন বেশ্যা।'

'তোমার নাম কী?'

আমার নাম দিয়ে আপনি কী করবেন? আপনার দাসী ভাগমতী নামে পরিচিতা। তার চওড়া বুক ও পুরুষ কণ্ঠের পাশাপাশি অন্যকিছু সন্দেহ হলো আমার, যা অন্য মেয়েদের থেকে তাকে ভিন্নতর করেছে। জানতে চাইলাম, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'সন্ধ্যা আমাকে যেখানে নিয়ে যায়, আমার মাদুর বিছিয়ে সেটাকেই বাড়ি বলি। আমার ছাদ স্বর্গের তারকায় পরিপূর্ণ। আপনার ক্রীতদাসীর গরীবী আস্তানা লাল কুয়ানে।' আমার সন্দেহ প্রবল হলো। লাল কুয়ান হিজড়াদের পাড়া। আমার আগ্রহ জাগ্রত হলো। আমি কোনো হিজড়াকে চিনি না। দূর থেকে তাদের দেখেছি চার-পাঁচজন নাচতে এবং পিছন দিকে তালি বাজাতে। আমি তাদের যৌন জীবন ও যৌনাঙ্গ সম্পর্কে বিচিত্র সব গল্প শুনেছি। ভাগমতী সম্পর্কে আরো আবিষ্কার করার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও জানতে চাইলাম যে, তাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে আসবো কিনা।

'হুজুর বোধহয় আমার কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যস্ত।'

'না ,তা নয়। কিন্তু তোমার লোকজন কি দুশ্চিন্তায় থাকবে না?'

'কেউ আমার ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তায় নেই। আমার যখন খুশি যাই, আসি। আমার স্বামী যা জানতে চাইবে তা হলো কত কামিয়ে এনেছো?'

'তোমার স্বামীও আছে?'

'আমি এমন কী গুনাহ করেছি যে, আমার স্বামী থাকা উচিত নয়? আমি যখন বৃদ্ধ হবো এবং পুরুষের কোনো কাজে লাগবো না, তখন সেই তো আমার দেখাশুনা করবে।'

সে বুঝতে পেরেছে যে, আমি যৌন বিষয়ে শুনতে আগ্রহীদের একজন। সে বললো, 'হুজুর কি কখনো আমাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি?'

'না কখনো না।'

'ইনশাল্লাহ, আপনার চরণদাসী সেই সম্মান লাভ করবে।'

আমি কোনো মেয়ের কাছেও প্রস্তাব পেতে অভ্যস্ত নই- আর এ তো মেয়েও নয়, হিজড়া। আমি প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলাম, 'তোমার কাপড়গুলো নিশ্চয়ই শুকিয়েছে। চলো।' সে কক্ষ অতিক্রম করে কাছে এসে মাদুরে বসে আমার পায়ের উপর তার মাথা রাখলো।

'প্রভু রামের নামে অনুরোধ করছি, আমাকে বের করে দেবেন না। আমি কাজে ফিরে যাওয়ার মত সুস্থ নই। আমাকে যদি রাতটা কাটানোর অনুমতি দেন, আল্লাহর নামে শপথ করছি, আপনাকে আর কখনো বিরক্ত করবো না। আপনার গুরুর দোহাই, আমাকে দয়া করুন।' সে কী করে এক মুখেই ভগবান, আল্লাহ ও গুরুর দোহাই দিচ্ছে! তার চোখ অশ্রুতে পূর্ণ।

আমার অ্যাপার্টমেন্টে মহিলারা কাটিয়েছে রাতের পর রাত। কিন্তু তারা ইউরোপীয় অথবা পাশ্চাত্যের শিষ্টাচারে অভ্যস্ত ভারতীয় মেমসাহেব। কোনো ছোট জাতের হিন্দিভাষী হিজড়া বেশ্যা অবশ্যই নয়। যাদের উপর যৌন লালসা মেটায় শ্রমিক শ্রেণীর লোক, গৃহভৃত্য, সেপাই, পুলিশ- যারা প্রতিবারে কয়েক টাকার বিনিময়ে। ভাবলাম, আমি নিজেই জানি না একে কী বলা উচিত। তাছাড়া এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু নেই। অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। কিন্তু চাকর আসার আগে আমাদের বাড়ি ছাড়তে হবে। সে রাতের জন্যে এসে চলে যাওয়ার পর আমাদের ফিরতে হবে এবং খুব সকালে তোমাকে চলে যেতে হবে। তোমার কাপড় নিশ্চয়ই

শুকিয়েছে, যাও জলদি পরে নাও।'

সে ঝুঁকে আমার পদচুম্বন করলো। শার্টের কোনো দিয়ে চোখের পানি মুছলো। উঠে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াতেই ট্রাউজার কোমর থেকে পায়ের গোঁড়ালিতে খসে পড়লো। শ্রমজীবী মানুষের শক্ত হাতে নিপিষ্ট ভাগমতীর পশ্চাদদেশ ক্রীড়াবিদদের মতো দৃঢ়। পিছন ফিরে সে বিব্রত হওয়ার মত হাসলো এবং ট্রাউজারটা কোমরে তুলে বাথরুমের দিকে দৌড় দিলো।

সে যখন কাপড় পাল্টাতে ব্যস্ত, তখন আমি রাতের পরিকল্পনা করছি। ডাইনিং টেবিলে দুটি মোমবাতি জ্বাললাম। আমার মূর্খ বাবুর্চিকে বোঝানোর জন্যে এটাই আমার পদ্ধতি। একটি মোমবাতির অর্থ 'বাইরে খাবো।' দুই মোমবাতির অর্থ 'সকালে বেডটি নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করবে না।'

অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হতে কারো দৃষ্টিতে পড়তে হলো না। গাড়িতে উঠে ভাগমতী বললো, 'আপনি আমাকে যখন গাড়িতে ওঠাবার মত দয়া দেখিয়েছেন, তাহলে আমি কিছু নির্মল বায়ু সেবন করতে চাই। আপনার দাসীর কিসমতে বারবার গাড়িতে ওঠার সুযোগ নেই।'

'তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'দাসীকে যেখানে নিতে হুজুরের মর্জি হয়।'

এ এক ভিন্ন ভাগমতী- আয়েশী। আত্মসচেতন। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে ড্যাশবোর্ডে তবলার মতো বাজাতে শুরু করলো। অশোকা হোটেল অতিক্রম করে কূটনৈতিক এলাকায় পড়তেই সে বিভিন্ন অ্যামবেসীর নাম উচ্চারণ করতে শুরু করলো, 'আমেরিকান অ্যামবেসী, পাকিস্তানী, জাপানি, জার্মানি...

'তুমি সব অ্যামবেসী চিনলে কী করে?'

'আপনার দাসীর সুযোগ হয়েছে বহু বিদেশী ভদ্রলোকের সাথে মেলামেশার।' আমার প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছে সে।

'ওরা নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা দিয়েছে তোমাকে?'

'হয়তো তারা দেয়। কিন্তু দালাল আর অ্যামবেসীর ড্রাইভাররা তাদের ভাগ নিয়ে নেয়ার পর আপনার দাসীর আঁচলে অবশিষ্ট কয়েক টাকা পড়ে। এর উপর আছে আমার স্বামী। আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, যা থাকে তা দিয়ে এক বাটি ডাল, একটা চাপাতি জুটে যায় পেট ভরতে।' সে তার পেটে চাপড় দিয়ে দেখায়।

'তুমি কিভাবে তাদের সাথে কথা বলো?'

সে মাথা দোলাতে দোলাতে বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, 'বারে, এ আবার কেমন প্রশ্ন? আমার সাথে তাদের কথার কী প্রয়োজন। তারা হুইস্কি পান করে। নিজেদের ভাষায় গিটমিট করতে করতে আমার সেবা নেয়। কিছু অবাক করার মত অভ্যাস আছে এসব বিদেশীদের।'

'তারা কী করে?'

'এক দফায় সব কিছু করে না। আজ একটু, কাল একটু। কিন্তু অবাক করার মত। অদ্ভুত উপায়ে তৃপ্তি আদায় করে। তাদের এসব অভ্যাসের কথা ভাবলেও আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।' সে জানালা দিয়ে বাইরে থুথু ফেলে।

'হুজুর কি আমাকে ক্ষুধায় মেরে ফেলবেন? আমাকে একটা সুন্দর হোটেলে নিয়ে কিছু পোলাও খেতে দিন। সাথে মুরগির রোস্ট, আইসক্রিম। তাহলে আরো কিছু বলতে পারি।'

'তোমার সাথে লোকজনের মধ্যে দেখা দেব? তুমি চাও, আমি নিজের নাকটা কেটে ফেলি?'

সে যথার্থই বিব্রত। আমার নিজেরও খারাপ লাগলো। কিন্তু আমি দুর্বল না হতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পুরনো শহরের দিকে গাড়ি ঘুরালাম। দিল্লী গেট দিয়ে ফৈয়াজ বাজারে ঢুকলাম। মোতিমহলের বাইরে গাড়ি থামিয়ে তাকে গাড়িতে রেখেই দু'জনের খাবারের প্যাকেট নিয়ে গাড়িতে ফিরে এলাম, 'তুমি যা যা খেতে চেয়েছো তার সবই এনেছি।' সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

প্রাচীন নগরপ্রাচীর বরাবর রাস্তা ধরে গাড়ি চালাচ্ছি। তার নিরবতা আমাকে বিব্রত করছে এখন। 'তুমি যদি এমন ভাব করে থাকো, তাহলে এখানেই গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব তোমাকে।' তার দিকে ফিরলাম। সে ঘাড় ফিরিয়ে রেখেছে এবং নাক ঝাড়ছে।

'তুমি এমন আচরণ করলে তোমাকে লাল কুয়ানেই রেখে আসবো।'

কাশ্মীরী গেটে এসে শহরের দিকে ঘুরলাম। চাঁদনী চক ধরে ফতেপুরী মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়ে বামে লাল কুয়ানের দিকে গাড়ির মুখ ফিরালাম। সে যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে তা টের পেলাম, 'আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন....'

'আমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি।'

হিজড়া পাড়ার কাছাকাছি হতেই সে বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'হায় রাম।' নিচু হয়ে ক্ল্যাচের উপর রাখা আমার পা আঁকড়ে ধরলো 'আপনি যা চান, আমি তাই করবো, কিন্তু রামের দোহাই এখানে ফেলে যাবেন না।'

'তুমি প্রতিজ্ঞা করো ভালো হবে।'

'আমি সারাজীবন আপনার দাসী হয়ে থাকবো।' গাড়ির গতি মন্থর করি। দালালরা রাস্তার ওপারে ফুটপাতের উপর থেকে চিৎকার করছে লোকদের পটানোর জন্যে, 'সুন্দরী, একেবারে নতুন, আনকোড়া, যেন প্যাকেট খোলা হয়নি এমন, কলেজ গার্ল...তের বছরের কুমারী...ইত্যাদি। ভাগমতী মুখ লুকিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিধাতার নাম উচ্চারণ করছিল, 'হায়, রামজী, ইয়া আল্লাহ।'

লাল কুয়ান থেকে 'কাজী কা হাউজে' এসে আবার নগর প্রাচীর বরাবর চলছি। একসময় ঘোষণা করলাম, 'আজমিরী গেট।'

সিটের উপরে উঠে বসার আগে সে আস্তে আস্তে মাথা তুলে যাচাই করে নিলো। 'হুজুর মজা করতে পছন্দ করেন। ওরা যদি আপনার দাসীকে গাড়ির মধ্যে দেখতো, তাহলে তার কল্লা কেটে ফেলতো।'

'তুমি আবার গম্ভীর হলে এখানে ফিরিয়ে আনবো।'

কনট সার্কাসের ড্রাগ স্টোরের কাছে গাড়ি থামালাম। ফিরে এলে সে মন্তব্য করলো, 'আমাদের শত্রুদের রোগবালাই হোক। আমার বিশ্বাস, আপনার শরীর ভালো আছে।'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, বয়সের ভার। একটা ট্যাবলেট ক্ষুধা বাড়ানোর জন্যে। আরেকটি যা খাই তা হজমের জন্যে। তৃতীয়টি সুনিদ্রার জন্যে। চতুর্থ ট্যাবলেট যথাসময়ে জাগ্রত হওয়ার জন্যে এবং পঞ্চমটি পুরো শারীরতন্ত্র ঠিক রাখার জন্যে।' তার মুখ দেখেই বুঝতে পারি, সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

নৈশ প্রহরী বুধ সিং আমার অ্যাপার্টমেন্টে মেয়েদের নিয়ে আসার ব্যাপারটা দেখতে অভ্যস্ত। প্রতি মাসে আমি তাকে বখশিশ দেই। যদিও সে পাগলাটে ধরনের। কিন্তু আমার কোনো অসুবিধা ঘটায়নি। অন্ধকারে সে বলতে পারবে না বাড়িতে আমি কী আনছি। যদিও সাথে বাজারের অতি সাধারণ হিজড়া বেশ্যা, তবু আমার কাছে নববধূকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে বরের বিব্রতকর অবস্থার মত মনে হচ্ছে।

খাওয়ার সময় আমাদের খুব কম কথাবার্তা হলো।

ভাগমতী একটু রহস্য করে বললো, 'একজন শিখ ভদ্রলোকের কাছে একটি সিগারেট চাওয়া বোধহয় বাড়াবাড়ি।' আমি সিগারেট বক্স এনে তার সামনে রাখলাম। সে দু'টি সিগারেট তুলে নিয়ে একটি কানে গুজলো এবং অন্যটি জ্বালানোর প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সিগারেটে অগ্নিসংযোগের পর সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আমার চোখে চোখ রাখলো এবং আমার মুখে ধুঁয়া ছুড়লো। এরপর নিজের হাতেই ধুয়া ছড়িয়ে দিলো।

ড্রয়িং রুমের ফ্যান ছেড়ে দিয়ে তাকে সোফার উপর আরাম করে শুতে বললাম, 'তোমার যদি কোনো কিছু প্রয়োজন পড়ে তাহলে দরজায় নক করো।' আমি বেডরুমে চলে এলাম।

এয়ার কন্ডিশনারের গুঞ্জনে আমার কক্ষ থেকে অন্যান্য শব্দ বিদূরিত হলো। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলাম, সে এখন কী করছে? আমি কি তাকে অপমান করেছি? বেশ্যালয়ে বসবাস করার কারণে সে নিশ্চয়ই তার অন্য সহযোগীকে আনুকূল্য দেখাতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হতে অভ্যস্ত। যাই হোক, আমি জানি না যে, কোনো লোক একজন হিজড়ার সঙ্গে কী করে। এ ছাড়া আজ বিকেলেই তার মৃগীজনিত সংজ্ঞালোপ হয়েছিল। সে কিভাবে ঘুমাবে? আমি তার কাপড় বদলাবার মত কিছু দিইনি। সে কি উলঙ্গ? সে সুন্দরী নয়। কিন্তু নিরাভরণ একজন হিজড়াকে দেখতে কেমন লাগে?

হঠাৎ আমার মধ্যে তীব্র যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগলো। মন থেকে অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করলাম।

সে একজন অসুস্থ হিজড়া। একটি ম্যাগাজিন তুলে নিলাম। তার নগ্ন অবয়ব ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠার উপর ভেসে উঠলো। হিজড়ার স্তনের আকৃতি কেমন? তার যৌনাঙ্গ দেখতে কেমন? সে কি গোপন স্থানের অবাঞ্ছিত লোম বিনাশ করে?

ম্যাগাজিনটা এক পাশে রেখে বাতি নিভিয়ে দিলাম। নিজেকে আর সাহায্য করতে পারছি না। মন থেকে কিছুতেই দূর করতে পারছি না যে, আমার অ্যাপার্টমেন্টে একটি অদ্ভুত জীব রয়েছে। আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার পূর্ণ করার এমন সুযোগ হয়তো আর আসবে না।

আমি আবার বাতি জ্বেলে ম্যাগাজিনের পাতায় মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করলাম।

বেডরুমের দরজাটা ঠেলে খোলা হলো। টেবিল ল্যাম্পের আলো ভাগমতীর ছায়াকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে। তার গায়ে কিছু নেই। আমার যা সন্দেহ হয়েছিল- ওর আসলে কোনো স্তন নেই, শুধু স্ফীতি। দুই হাত দিয়ে উরুসন্ধি ঢেকে রেখেছে। সে অনুমতি চাইলো, 'আমি কি কক্ষে প্রবেশ করতে পারি? আপনি আমাকে যে দয়া প্রদর্শন করেছেন, তার বিনিময়ে এই গরীবের দেয়ার মত কিছু নেই।'

আমার পাশে তার জায়গা করে দিলাম। সে মুখটা ঘুরিয়ে বসলো। আমি তার পেট ও নাভির নিচে হাত দিলাম। আমার অনুভূতি দ্রুত জেগে উঠলো। তাকে টেনে আমার পাশে আনলাম। বিছানার নিচ থেকে কনডম বের করে সেটি পরলাম এবং তার উপর উপগত হলাম। সে নিজেই এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করলো। একটি নারী থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়। সে ঘামছে। আমি তার মুখ এড়িয়ে থাকলাম। সে চরমে পৌঁছে যাচ্ছে এমন ভান করে দুই পা দিয়ে আমার কোমর পেঁচিয়ে ধরে গোঙাতে লাগলো। আমি নিঃশেষিত হয়ে অবতরণ করলাম। নিজেকে অপরিচ্ছন্ন মনে হলো।

বাথরুমে গেলাম এবং দাঁত ব্রাশ করলাম। আমি যখন শাওয়ার ছেড়ে ভিজছি, ভাগমতীও প্রবেশ করলো। আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করেই আঙ্গুলে টুথপেষ্ট নিয়ে মাড়ি ডলতে শুরু করলো। আমি শাওয়ার বন্ধ করে গা মুছলাম, সে গোসল করতে শাওয়ার ছাড়লো। তার মাঝখানের আকৃতিটা ঠিক কেমন তা দেখার জন্য তার উপর থেকে আমার দৃষ্টি সরাতে পারছিলাম না।

তাকে বাথরুমে রেখেই আমি বিছানায় এলাম। তাকে আর চাই না। আমার এই ইচ্ছাটাকে স্পষ্ট করার জন্য আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম। আমি শাওয়ার থেমে যেতে শুনলাম। সে এসে আমার বিছানার প্রান্তে বসলো। সে আমার সুগন্ধি মেখে এসেছে। তার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিলাম। কিছু সময়ের জন্য সে আমার হাতের উপর মাথা রেখে নিশ্চল পড়ে রইলো। এরপর সে আমার স্তনের বোঁটা নিয়ে খেলতে শুরু করলো। প্রথমে আঙ্গুল দিয়ে, পরে জিভ ব্যবহার করে। ক্রমে সে তার মাথা আমার বুকে রাখলো এবং আমার পেটে ধাক্কা দিতে লাগলো। সে আঙ্গুল ও জিহ্বার ব্যবহার চালিয়ে যাচ্ছিল। আমার অনিচ্ছা দূর না হওয়া পর্যন্ত তার এসব ক্রিয়া অব্যাহত ছিল। আমি পাশ ফিরে বালিশের তলায় হাত দেয়ার চেষ্টা করতেই সে মাথা ধরে বিড়বিড় করলো, 'ওটার দরকার পড়বে না, আমি পরিচ্ছন্ন।' সে আমাকে আরেকবার তার মধ্যে প্রবেশের দিক নির্দেশ করলো এবং তার দুই পায়ের মাঝখানের পাপে আমাকে আটকে রাখলো। সে তার জিহ্বা দিয়ে আমার কানে সুড়সুড়ি দিতে এক ধরনের শিরশিরে কাঁপুনি আমার শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। আমার উপর মুখটা আঠার মত লাগিয়ে রেখেছে। এবার আর কোনো ভান নেই। কয়েকটি প্রচন্ড ঝাঁকুনির সাথে সে আমার উত্তপ্ত তরল শুষে নিল।

আমি তার উপর এলিয়ে পড়েছি-ক্লান্ত, অবসন্ন।

আমরা আবার একত্রে গোসল করলাম। আমি অদ্ভুত এই সৃষ্টিকে ভালবাসলাম। তার বসন্তের দাগ আরো কালো দেখাচ্ছে। জর্দা ও পানের প্রভাবে তার দাঁত রঞ্জিত। আমার উৎসুক দৃষ্টির সামনে সে তার নগ্নতা ঢাকার চেষ্টা করে বলে, 'আপনি অমন করে কী দেখছেন?'

'কী আর দেখবো, তোমাকে দেখছি।' আমার মধ্যে আর কোনো ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাকে ধরে বিছানায় আনলাম এবং আমার পাশে ঘুমাতে দিলাম। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। সকালের দিকে একটা স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। স্বপ্নটা বাস্তব ও রহস্যময়তায় মিশ্রণ।

ভাগমতী প্রস্রাবে পূর্ণ একটি রাস্তার উপর শুয়ে আছে। হঠাৎ সে আমার ঘাড় ধরে কুস্তিগীরের কৌশলে আমাকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করছে। আমি উপলব্ধি করলাম, এটা স্বপ্ন নয়। ভাগমতী আসলেই আমার উপরে চেপে আছে। সে আমাকে স্বপ্নের মাঝে এক কামনাময় বিশ্বে নিয়ে গেছে। একটি পুরুষ একজন মেয়ের সাথে যেভাবে আচরণ করে সেও আমার সাথে সেই আচরণ করছে। আমার মাথা আঁকড়ে ধরছে, গলায় কামড় বসাচ্ছে, এমন প্রবলভাবে আমার মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছে, যার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার নেই। শেষ পর্যন্ত তার কামনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম। অনুভব করলাম, আমার মাথা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত একটা ঘূর্ণি উঠেছে এবং জীবনের যা গতি সব মধ্য অঙ্গ দিয়ে লাভার মত বিস্ফোরিত হয়ে বের হচ্ছে। যৌনকর্মের তিনটি উপায়ের সঙ্গে অতীন্দ্রিয়বাদের সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়। প্রথমতঃ রাগ হচ্ছে সাময়িক যন্ত্রণামুক্তি। দ্বিতীয়তঃ কামনা এবং তৃতীয়ত চূড়ান্ত কর্ম, যা ব্যক্তিকে ধ্বংস (ফানা) করে এবং দুটি আলোকে একটিতে পরিণত করে। সহজ কথায় বলা যায়, ভাগমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক হচ্ছে হস্তমৈথুনের প্রক্রিয়া। কিন্তু এখনো আমি বুঝি না, ভাগমতীর মত একজন হিজড়া কিভাবে একটি মেয়ে থেকে ভিন্ন।

ভোর পাঁচটা। ভাগমতী যখন তার শাড়ি পরছিল, আমি উঠে বুক সেলফের পিছনে লুকানো সেফ খুলে এক বান্ডিল দশ টাকার নোট বের করলাম। নোটগুলো যখন তার হাতে গুঁজে দিচ্ছি সে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এগুলো কী? টাকা গুনে উচ্চারণ করলো, একশত টাকা। আপনাকে টাকা দিতে হবে না।' দ্রুত মন পরিবর্তন করে বললো, 'আমার স্বামী কিছু দিলে কি অস্বীকার করতে পারি।'

'এক লক্ষ স্বামী।'

সে দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'আল্লাহ আমার সাক্ষী, এরপর শুধু আপনিই থাকবেন। আপনি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন। আমি চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী।'

আমি তার হাত ছাড়িয়ে বললাম, 'চলো।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করছেন না?' সে নোটগুলো পুনরায় গুনে আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'ঠিক আছে, আমি দশটি টাকা নিচ্ছি। আমার স্বামীকে দেয়ার জন্য। বাকিগুলো আমার জন্যই রেখে দিন। আরেক দিন নিতে আসবো।'

বাইরে পরিষ্কার হয়েছে কিনা দেখলাম। বুধ সিং তার চারপায়ার উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা পা টিপে টিপে বের হলাম এবং নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দও প্রহরীকে তার সুখনিদ্রা থেকে জাগাতে পারলো না। আমরা জনশূন্য কনট সার্কাস, মিন্টো ব্রিজ, আজমিরী গেট অতিক্রম করলাম। ভাগমতী স্টিয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে বললো, 'আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন।'

গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দিলাম। সে আমার হাতে চাপ দিলো, 'আপনার দাসী লক্ষ বার সালাম জানাচ্ছে আপনাকে। আমাকে ভুলে যাবেন না।' জনহীন রাস্তার মাঝখান দিয়ে সে নগ্ন পায়ে হেঁটে গেল। ভাগমতী আমার নামটাও জানার প্রয়োজন অনুভব করেনি। সে আমার ফোন নম্বর, আমার অ্যাপার্টমেন্ট কোন ব্লকে কিছুই জানতে চায়নি। সে কী করে তার টাকা নিতে আসবে? লাল কুয়ানের হিজড়া পল্লীতে তাকে খোঁজার জন্য যাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

দিন, সপ্তাহ গড়িয়ে যাচ্ছে। সময় কেটে যাওয়ার সাথে আমিও ভাবতে শুরু করেছি যে, ভাগমতীকে আগে যেমনটি ভেবেছিলাম, সম্ভবত সে সেই ধরনের বেশ্যা নয়। তার সঙ্গে এক রাতের স্মৃতি আমার মধ্যে বেদনাবোধের সৃষ্টি করেছিল। আমি তাকে পুনরায় দেখার আশা হারিয়ে ফেললাম।

ভাগমতী যেভাবে আমার জীবনে পুনরায় প্রবেশ করলো, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, ঈশ্বর আমার খরচেই মজা লুটারও ব্যবস্থা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমার স্বাভাবিক রুটিন অনুসারে কাজ করতে শুরু করেছি। সকালে কয়েক ঘন্টা কাজ। বিকেলে গলফ খেলা, সন্ধ্যায় ককটেল পার্টিতে যোগদান, যা সমাপ্ত হয় বিলম্বিত ডিনারের মধ্য

দিয়ে। দিল্লীতে একজন মানুষের পক্ষে বছরের তিনশ পয়ষট্টি দিনের মধ্যে পানীয় ও খাদ্যের যোগান পাওয়া কষ্টকর কিছু নয়। কূটনৈতিক মহলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। কূটনীতিকদের কাছ থেকে আমি প্রয়োজনমত ক্যানের খাবার ও পানীয় পাই। কনট সার্কাসে প্রতি বোতল স্কচ হুইস্কির দাম একশত পঞ্চাশ টাকা, তার এক কার্টুন আমি পাই মাত্র ত্রিশ টাকায় অথবা একেবারে বিনে পয়সায়। কূটনীতিকরা আমার অন্যান্য প্রয়োজনও মেটায়। দিল্লীতে একশ'র বেশি অ্যামবেসী, হাইকমিশন ও অন্যান্য কূটনৈতিক দফতর রয়েছে। এখানে কূটনীতিকদের খুব একটা কাজ করতে হয় না। তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারত সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মদ্যপান ও খাওয়ানোর কাজে। তাছাড়া তাদের জাতীয় দিবসগুলো পালন এবং বেসরকারী ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগসূত্র স্থাপনও তাদের আরেকটি কাজ। ফলে বিদেশীদের হাঁপিয়ে ওঠা স্ত্রীকেও খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না এবং এভাবে আমদানিকৃত পানীয় ও যৌনতার সরবরাহ নিশ্চিতও হয়ে যায়।

ভাগমতীর সঙ্গে আবার যখন দেখা হলো তখন আমি পশ্চিম জার্মানীর দূতাবাসে কর্মরত এক মহিলা স্টেনোগ্রাফারকে পটাতে ব্যস্ত ছিলাম। এক কনসুলার অফিসের রিসেপশনে সে বসা ছিল। সে নতুন এসেছে এবং নবাগত অনেক বিদেশীর মতই ভারতীয়দের ব্যাপারে তার উৎসুক্য ছিল প্রবল। খুব আকর্ষণীয় নয় সে-ত্রিশোর্ধ বয়স, ধূসর চোখ, পাতলা ঠোঁট, দীর্ঘাঙ্গী এবং হাড্ডিসার তার সবগুলো চুল একত্রে বেঁধে রাখায় তাকে আরো কুদর্শন লাগছিল।

ফ্রাউলিন ইরমা ওয়েসকারম্যান খুব সহজে বাগে এসেছিল। এক রোববার আমি তাকে দিল্লীর স্মৃতি সৌধগুলো ঘুরিয়ে আনলাম এবং তার অ্যাপার্টমেন্টে ব্যাভারিয়ান বিয়ার পানের সুযোগ পেলাম। পরের রোববার আমি তাকে লাল কিল্লার 'সাউন্ড এন্ড লাইট' দেখিয়ে মোতি মহলে ডিনার করালাম। রেস্টুরেন্টে পানীয় দেয়ার অনুমতি নেই বলে আমি একটি ফ্লাস্কে করে মদ ভরে এনেছিলাম। ওয়েটার যখন কাছে থাকতো না তখন তার কোকের গ্লাসে ভারতীয় হুইস্কি ঢেলে দিলাম। তাকে ব্যাখ্যা করলাম। একজন ভারতীয়ের পক্ষে এটুকুই সম্ভব। কারণ স্কচের দাম আকাশ ছোঁয়া। সে কথাটার মর্ম বুঝলো। কূটনীতিকদের ক্ষেত্রে এই ইঙ্গিত সবসময় কাজে লাগে। এরপর যখনই তাকে আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সে সাথে স্কচের বোতল এনেছে অথবা তার সাথে পান করতে ডেকেছে।

দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফ্রাউলিন ইরমা খুব আগ্রহী ছিল না। তার চেহারার মধ্যে যেহেতু কোনো আকর্ষণ ছিল না, অতএব এক ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল সে আয়ত্ত করেছিল। আমি যেদিন প্রথম তার কোমরে হাত রাখি সে বলে উঠেছিল, 'তুমি কি আসলেই তা বোঝাতে চাচ্ছো'। আমি হ্যাঁ-সুচক উত্তর দিয়ে যোগ করলাম, 'কারণ আমি তোমাকে পছন্দ করি।' এরপর সে আমায় চুমু দিতে মুখটা বাড়িয়ে দেয়। এক সন্ধ্যায় তাকে বললাম, 'ইরমা তোমাকে যতটা ভালো লাগা উচিত, তার চেয়ে বেশী ভালো লাগতে শুরু করেছে।' সে উত্তর দেয় 'খুব ভালো কথা' এবং একটি চুমু দেয়। আরেকদিন বলি, 'ব্যাপারটা ভয়াবহ, কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসায় পড়তে যাচ্ছি' এ কথায় কোনো মেয়েই নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। সে বলে এর আগে কতজন মহিলাকে এ কথাটা বলেছো?' অবশ্য তার ঠোঁটে চুমুও দিতে দেয়। প্রতিবার আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। এরপর আমার হাত তার দেহের বিভিন্ন স্থান আবিষ্কার করে বেড়ায়। কখনো কখনো সে বাধা দেয়। কিন্তু একজন মহিলার স্তন পুরুষের হাতে নিষ্পিষ্ট হতে থাকলে সে কতক্ষণ নিজেকে প্রতিরোধ করে রাখতে পারে। আমার হাত আরো কিছু আবিষ্কার করে। হাত যদি তার মধ্যাঙ্গের খুব কাছে পৌঁছে সে তার ধূসর চোখ বড় বড় করে তাকায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করে 'না'। কিন্তু সেটা সময়ের ব্যাপার মাত্র। এক সন্ধ্যায় আমি নিজেকে তার দুই উরুর মাঝখানে অনুভব করলাম। বললাম, 'তুমি এর জন্য প্রস্তুত?' তার শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে এবং বলে, 'না এ কিছুতেই হতে পারে না।' হাতটা তার কটির নিচ থেকে বের করে দেয়। আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে মর্মাহত হয়েছি এমন ভান করি। সে জবাব দেয়, 'এ জন্য আমিও দায়ী। আমাকে একটা চুমু দেয় সে, যা আমার মনে জ্বালা ধরায়। তার সঙ্গে সম্পর্ক চিরতরে ঘুচে গেল এমন ভাবিনা। পরবর্তী মোকাবিলায়, ভারত-জার্মান সম্পর্ক নিশ্চয়ই

চূড়ান্ত হবে।

ভাগমতীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর প্রায় দু'মাস অতিবাহিত হয়েছে যখন ফ্রাউলিন ইরমা আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসে নৈশভোজে বসেছে। এক ধরনের অবাক হওয়ার ভান, উচ্চকণ্ঠে আলোচনা, জোর করে হাসা এসবের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে মনস্থির করে ফেলেছে। খাবার অর্ধ পর্যায়ে তার আনা হুইস্কি শেষ করে ফেলি। সে কফির সাথে কনিয়াকের কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে পান করার চেষ্টা করে। বাবুর্চি চলে যাওয়া মাত্র আমরা ড্রয়িং রুমে সোফায় বসি এবং জড়াজড়ির জন্য অগ্রসর হতে থাকি। তার কানে ফিস ফিস করি, 'আমরা কি মিলিত হবো?' সে বিড় বিড় করে 'যদি তোমার ইচ্ছা হয়। আমাকে প্রস্তুত হতে দাও।' সে হ্যান্ডব্যাগ তুলে নিয়ে বাথরুমে যায়। আমি বেডরুমে গিয়ে এয়ারকন্ডিশনার ছেড়ে দেই। ফ্রাউলিন ইরমা আমার ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে এসেছে। সে বলে, 'আমার দিকে তাকিও না। আগে লাইট অফ করে দাও।' আমি হেসে তার কোমর জড়িয়ে ধরে বলি, 'হিন্দুস্থানীতে একটি কথা প্রচলিত আছে, তুমি যদি গর্ভবতী হও তাহলে দাইকে পেট দেখাও। তুমি যদি ভালোবাসার খেলা খেলতে চাও তাহলে তোমাকে উদোম হতে হবে।' সে গাউন রেখে আমার সঙ্গে বিছানায় আসে।

ফ্রাউলিন ইরমা চিৎ হয়ে শোয় এবং উরু প্রসারিত করে। আমি খুব আবেগ ছাড়াই তার উপর উপগত হই। সে আদৌ কুমারী নয়। সে যথেষ্ট সিক্ত, কিন্তু উত্তেজিত নয়। গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে সে চরমাবস্থায় শুধু সামান্য গোঙানির মতো 'আহ' আওয়াজ তুলে চোখ দুটো বন্ধ করলো। আমরা কোনো কথা না বলে দীর্ঘক্ষণ জড়াজড়ি করে থাকলাম। এতে দু'জনের কেউই বেশি কিছু পেলাম বলে মনে হলো না। কিন্তু কেউই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে সাহসী হলাম না। ভাগমতীর সঙ্গে মিলনের চেয়ে কতটা পার্থক্য!

এয়ারকন্ডিশনারের গুঞ্জনের মধ্যে কলিং বেলের আওয়াজ ভেসে আসে। আমি সেদিকে তাকাই। আবার বেল বাজে। ইরমা সতর্ক হয়ে বলে, 'কেউ কি দরজায়?' আমি উত্তর দেই, 'সে রকমই মনে হয়। কিন্তু কে তার তোয়াক্কা করে?' তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলি।

'সে আমাকে ঠেলে তুলে দেয়, একটা টেলিগ্রাম বা এর মতই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।' আমি উঠে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে ধীর পা ফেলে দরজার গ্লাস দিয়ে তাকাই। ভাগমতী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

বেল বাজানো অব্যাহত থাকে। আমি নিঃশব্দে ফিরে আসি। ফ্রাউলিন ইরমা বিছানার উপর বসে আছে। জানতে চায় 'কে এসেছে?'

'একজন মহিলা, সে আমার কাছে কিছু টাকা পায়।'

ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে 'একজন মানুষের কাছে আসার এটাই কি সময়?'

আমি জোর করে বলি, 'সে রকম কিছু নয়, মহিলাটি অসুস্থ। একদিন সকালে আমি তাকে রাস্তার উপর থেকে তুলে এনেছিলাম?'

বেল তখনো বাজছে।

ইরমা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে 'আমি একটা মস্ত আহাম্মক। নিজের কাপড় তুলে বাথরুমে গেল এবং কাপড় পরে বেরিয়ে এলো, 'তোমাকে চিনতে পেরেছি সে জন্য ধন্যবাদ মিঃ সিং। বিদায়! তোমার সুন্দর সময় কাটুক।' দরজা খুলে ক্লান্ত ভাগমতীর আপাদমস্তক দেখে 'এক্সকিউজ মি, ম্যাডাম' বলে দ্রুত পায়ে তার ফোকসওয়াগনে গিয়ে উঠলো।

আমি সোফায় বসে দুই হাতে মুখ ঢাকলাম। দরজা বন্ধ করতে শুনলাম এবং ভাগমতীকে বলতে শুনলাম, 'আপনার দাসী যদি অপরাধ করে থাকে তাহলে সে শত সহস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করছে।'

আমি তার দিকে তাকালাম না, 'তুমি আসার আর সময় পেলে না।'

'হুজুর, মিশরের অ্যামবেসিতে আপনার দাসীর ডাক পড়েছে। ভাবলাম, আপনার কাছে কিছু টাকা রেখে যাই এবং যদি আপনাকে কোনো সেবা দিতে পারি। কিন্তু এখন দেখছি আমার উপর আপনি রুষ্ট। আপনার দৃষ্টির বাইরে যাওয়ার আগে অবশ্যই আপনার কাছ থেকে ক্ষমা পেতে

হবে।

আমার পদপ্রান্তে বসে সে পা মর্দন শুরু করলো 'আপনার দাসী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর আপনি তার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছেন। সে আমার দুই উরুর মাঝে তার হাত রাখলো। বললো 'জিরাফের খবর কী?'

কর্কশভাবে জবাব দিলাম, 'তোমাকে দেখাচ্ছি'। তার উপর জবরদস্তি প্রয়োগ করলাম। সে বিস্মিত হলো, 'সব পুরুষ অভিন্ন প্রজাতির। এই মুহূর্তে এক নারীর সঙ্গে, পরের মুহূর্তে আরেকজনের সঙ্গে।'

আজ পনেরই জুন। দিল্লীতে আজ প্রথম মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয়েছে। এর ফলে গত কয়েকদিনের ধূলিময় অবস্থার অবসান ঘটেছে। নির্মল বাতাস নীল আকাশে তুষার ধবল মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাটি থেকে সোদাগন্ধ বেরুচ্ছে। বাতাসে আরো বর্ষণের আভাস। এ অবস্থায় কে ঘরের মধ্যে থাকতে পারে?

মেহরুলি বা ওখলা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মেহরুলিতে উদ্যানসহ কুতুবমিনার, স্মৃতিসৌধ এবং আমবাগান আছে। ওখলায় কোনো স্মৃতিসৌধ নেই। প্রচুর পানি আছে। যমুনা নদী থেকে একাধিক খাল পানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দূরে। বর্ষায় যমুনার বিস্তার অপূর্ব লাগে। মেহরুলি আর ওখলাই হোক, সাথে একজন মাশুকা থাকা প্রয়োজন এই মধুর চমৎকারিত্ব উপভোগের জন্য। মাশুকার কানে ফিসফিস করা যাবে- 'তোমার পশ্চাদদেশ কর্দমাক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে বৃষ্টিতে ভিজাতে চাই।'

একটা টোঙ্গা থামার আওয়াজ শুনলাম, টোঙ্গাওয়ালা আর যাত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। টোঙ্গাওয়ালা চিৎকার করছে 'টোঙ্গা চালানোর চেয়ে লুচ্চামিতে অনেক পয়সা কামানো যায়।' যাত্রী বলছে, 'আরে যা, কে তোর সঙ্গে লুচ্চামি করবে। কেউ তোর নোংড়া অঙ্গে থুথুও দেবে না।'

ভাগমতী ছাড়া কে আর এমন বলতে পারে।

সে বেল বাজানোর আগে আমি দরজা খুললাম। ঘরে এসেই ধপ করে বসে সে টোঙ্গাওয়ালার উদ্দেশ্যে গালি ছুড়লো। 'শালা বানচোৎ। বানচোৎকে লাল কুয়ান থেকে এখান পর্যন্ত এক টাকা ভাড়া দিলাম। সে আরো চাচ্ছে। এ দুনিয়ায় কোনো বিচার নেই।' আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আজ কি ঘরে বসে থাকার দিন। আপনি বোরখা পরা মেয়ে মানুষের মত বসে আছেন। আমি ভেবেছি, আপনি আমাকে মোটর গাড়িতে করে আম আর বাতাস খাওয়াতে নিয়ে যাবেন।'

আমি বের হওয়ার একটা অজুহাত খুঁজছি। ভাগমতীকে ছাড়া এখন ভাবার আর কেউ নেই। কিন্তু তার এমন বিশ্রী পোশাকে অবশ্যই নয়। সে লাল ও নীল রং-এর শাড়ি পরেছে এবং মাথার চুল বেঁধেছে প্রজাপতির মত। আমি তার জন্য একটা প্যান্ট ও শার্ট কিনে রেখেছি। সে জামাগুলো পরতে আমার বেড়রুমে যায়।

সে মুখের পাউডার লিপস্টিক, রোজ ধুয়ে ফেলে। মাথার প্রজাপতি খুলে রাখে এবং চুলগুলো পিছনে গুচ্ছ করে বাঁধে। এখন ভাগমতীকে সম্পূর্ণ ভিন্নরকম লাগছে। কেউ বলতে পারবে না যে হিজড়া অথবা বালিকাসদৃশ ছেলে।

ঘর থেকে বের হয়ে ভাগমতী বললো, 'আজ ওখলা যাওয়ার দিন। বৃষ্টি ঝরার সময় আম খেতে খুব মজা হয় সেখানে।' আমি বলি, 'ওখলা নয়, আমি ভিড় পছন্দ করি না। বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের। তারা যেখানে যায় চিৎকার করে, খায়, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে।'

'আপনি যদি মনে করেন যে, আমাকে নিয়ে ভিড়ে বের হওয়া ঠিক হবে না, তাহলে আমি গাড়িতেই থাকবো।' কথাটা সত্য। কিন্তু আমি তার দিনটা নষ্ট করে দিতে চাই না। 'গুরুর নামে শপথ করে বলছি, তোমার ধারণা সঠিক নয়। ওখলায় আসলেই খুব ভিড় হয়। অনেক বানর ও সাপ আছে সেখানে। একবার আমি পাঁচটা সাপ মেরেছিলাম। একটার পর একটাকে।' সাপের

কথায় সে চুপ করে। আমরা মেহরুলি যাওয়া স্থির করি। মেহরুলির পথে অন্তহীন মিছিল। সাইকেল, টোঙ্গা, স্কুটার, গাড়ি এবং পায়ে চলা পথিক। সবাই হো হো করছে বা সিনেমার গান গাইতে গাইতে চলেছে। একটা গরুর গাড়িতে কয়েকজন বোরখাধারী মহিলা ও কিছু বাচ্চা। চালক তার সামনে থেকে লোকজন সরিয়ে দিতে চিৎকার করছে। সাইকেলে যাচ্ছিল এমন এক শিখ পরিবারের উপর সে প্রায় গাড়িটি তুলে দিয়েছিল। কোনোমতে তারা রক্ষা পেলেও শিখ বেচারী রীতিমত ভড়কে গেছে। একটি মুসলিম পরিবারের উদ্দেশে যত কঠোর গালি তার ঝুলিতে ছিল সেটা ছুড়ে দেয়, 'শুয়োরের জন্মারা। তোমরা আমাদের খুন করতে চাও?' বোরখার আড়াল থেকে একটি ছয় বছরের বালক উঠে দাঁড়ায়। সে প্যান্টের চেন খুলে তার ছোট খতনা করা লিঙ্গটা বের করে চিৎকার করে, 'এই যে শিখ, হারামীর বাচ্চা। তুমি আমার কুতুব মিনারে উঠতে চাও?'

ছেলেটার কুতুব মিনার বড়জোর আড়াই ইঞ্চি দীর্ঘ। আসল কুতুব মিনারের উচ্চতা ২৮৩ ফুট। ভাগমতী হাসিতে ফেটে পড়ে 'ওর কী সুন্দর ছোট লিঙ্গ। হিন্দুদের মাথা ঢাকা জিনিসটার চাইতে অনেক সুন্দর। আপনার সঙ্গীটি কি খতনা করা?'

'তোমার জানা উচিত?'

'যখন ওরা উৎক্ষিপ্ত তখন সবগুলোই একরকম। এরপর আপনারটা যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন দেখবো।'

আমরা কুতুব মিনারে নামি। কার পার্ক গাড়িতে পূর্ণ। বাগানে লোক গিজগিজ করছে। আমরা কোথেকে শুরু করবো মনস্থির করতে করতে জোরে বৃষ্টি এলো এবং সবাই আশ্রয়ের জন্যে দৌড়াতে লাগলো। আমি দ্রুত গাড়িতে উঠে বলি, 'এখানে নয়।' গাড়ি চালিয়ে মেহরুলি শহরে প্রবেশ করি। আউলিয়া মসজিদের পাশে গাড়ি থামাই। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। শামসি তালাবের আশেপাশের পানি গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। আমরা গাড়িতেই বসে থাকি এবং দু'জন খেলতে থাকি। ভাগমতী সিটের নিচে বসে পড়ে এবং আমার দু'পা প্রসারিত করে। আমি নার্ভাস। যে কোনো মুহূর্তে কেউ উঁকি দিতে পারে জানালায় এবং জিজ্ঞেস করতে পারে সে কী করছে। আমি বলি, 'এখানে নয়।' ওর মাথাটা টেনে উপরে তুলি এবং বলি 'জাহাজ মহলে চেষ্টা করা যাবে।'

আমি গাড়ি আরো উপরের দিকে নিয়ে জাহাজ মহলের পাশে পার্ক করি। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। লোকজন যারা আছে তারা বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে। গাড়ি থেকে নেমে এগুতে তারা আমাদের পথ করে দেয়। ভাগমতীকে নিয়ে পরিত্যক্ত সিড়ি দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাই, যেখানে মেঝে প্রায় পানি ছুঁই ছুঁই করছে। আমি ভাগমতীকে হাতের মধ্যে আবদ্ধ করে জোরে চাপ দিতে শুরু করি। সে প্রতিবাদ জানায়, 'আপনি আমার হাড্ডি গুড়িয়ে ফেলতে চান? আমাকে খুন করতে চান?'

আমি বলি, তুমি এখানে মরলে সোজা স্বর্গে চলে যাবে। শামসি তালাবের পানি অনেক সাধু সন্ন্যাসীর স্পর্শে ধন্য।'

'ও এই কথা। এখন আপনি আমাকে মারতে চান। আমি মরে গিয়ে তাদেরকে বলবো যে, আমার প্রেমিকের হাতে নিহত হয়েছি। আল্লাহ আমার পাপ মার্জনা করবেন। পুনর্জন্মে আমি ইন্দিরা গান্ধীর মতো হয়ে জন্মাবো এবং ভারতের এক মহান কন্যায় পরিণত হবো।'

আমাদের বাক বিনিময় অব্যাহত থাকে। কিন্তু কারো এক কান, এক চোখ এবং অর্ধেকটা মন যৌনাবেগের মধ্যে রেখে, অন্য কান, চোখ ও অর্ধেক মন সহসা কোনো ব্যক্তির আবির্ভাবের জন্য খোলা রাখতে হয়, তখন মজাটা খুব জমে না। দ্রুত কাজ সারার দুই দফা চেষ্টা করি। দু'বারই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা লোকের কণ্ঠস্বরে বাধাগ্রস্ত হই। আলো-আঁধারির অবস্থায় কেউ বলতে পারবে না যে ভাগমতী ছেলে না মেয়ে-অথবা দু'টোই। হিন্দুস্থানীরা দু'টি ছেলের মধ্যে সমঝোতা

বুঝতে পারে। কিন্তু একজনকে আরেকজনের উপগত হতে দেখলেই শুধু কাজটাকে নিন্দনীয় বিবেচনা করে। আমরা এমন ভান করি যে, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস স্থাপত্য বিষয়ে আমাদের খুব আগ্রহ। আমি দিয়াশলাই জ্বালিয়ে টালি পরীক্ষা করি এবং শিলালিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করি।

বৃষ্টি অঝোর ধারায় ঝরছে। আকাশের কোনো একটি স্থানে বিরতি নেই। আমরা ম্যাচলাইট জ্বালিয়ে অন্ধকার কোনাগুলো পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছি। সহসা একটি পাথর নজরে পড়লো। অন্যান্য সব পাথরের মতই পড়ে আছে। কিন্তু কিছু একটা লেখা। আমি পাথরটা তুললাম এবং আলোর কাছে আনলাম। উপরের দিকে স্বস্তিকা চিহ্ন উৎকীর্ণ। তার দুইদিকে দু'টি পদ্ম ফুল ও 'আল্লাহ' লিখা। নিচে ফারসি ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী 'মহান আল্লাহর অনুগ্রহভাজন পীর হজরত খাজা নিজামুদ্দিনের দাস ও ভক্ত চাগন লাল কায়স্থের পুত্র মুসাদ্দি লাল কায়স্থ তার দোয়ার বরকতে একটি সন্তান লাভ করেছে, যার নাম কমল কায়স্থ। তখন হিন্দুস্থানের শাহানশাহ ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন।'

৪

হযরত খাজা নিজামুদ্দিন ও মুসাদ্দি লাল

আমি মুসদ্দিলাল। লালা চাগন লালের পুত্র। দিল্লীর মেহরুলি এলাকার হিন্দু কায়স্থ। চোখে ছানি পড়ায় এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছি। দ্বিতীয় চোখেও ছানি পড়বে বলে আশংকা করছি। সেই সাথে আমার জীবদ্দশায় পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর স্মৃতিও ম্লান হয়ে আসবে। ঈশ্বর বা আল্লাহ, রাম বা রহিম সাক্ষী যে, আমি যা লিখছি তা সত্য এবং কোন কিছুই গোপন করা হয়নি বা উহ্য রাখা হয়নি। আমার জন্ম ৬৩৩ হিজরী অর্থাৎ ইংরেজী ১২৬৫ সালে। তখন ভারতে গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসনকালের শুরু। আমার পূর্বপুরুষরা দিল্লীর শাসকদের সেবায় বরাবর নিয়োজিত ছিলেন। তারা রাজপুত রাজা অনঙ্গপালের অধীনে লালকোট ভবন নির্মাণ করেন এবং নগরীর কেন্দ্রস্থলে ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র লৌহ স্তম্ভ স্থাপন করেন। তারা রাজা পৃথ্বীরাজ চৌহানের অধীনেও চাকরী করেন, যিনি দিল্লীর নাম দিয়েছিলেন 'কিলা রায় পিথোরা'। মোহাম্মদ ঘোরী যখন রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন আমার পূর্বপুরুষরা তুর্কী, আরবী ও ফারসী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করে এবং নতুন শাসকের অধীনে সেবা অব্যাহত রাখে। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের অধীনে চাকরী করেন এবং তিনি কুওয়াতুল ইসলাম বা জামিয়া মসজিদের নির্মাণ কাজ প্রত্যক্ষ করেন। তার জীবদ্দশাতেই সুউচ্চ বিজয় স্তম্ভ কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। আমার ঠাকুরদা কুতুবউদ্দিন আইবেকের জামাতা এবং উত্তরাধিকারী সুলতান ইলতুৎমিশের অধীনে চাকরী করেন। মহানবী (সঃ)-এর অশ্ব 'বোরাক'-এর পদচিহ্ন দেখে সুলতান সেই স্থানে 'শামসি তালাব' নামে যে পুকুর খনন করেন আমার ঠাকুরদা একজন সাধারণ শ্রমিক হিসেবে তার খনন কাজে অংশ নেন। এছাড়া দরবেশ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযার নির্মাণের জন্য তিনি নিজের মাথায় পাথর বহন করেন। তিনি ১২২০ সালে কুতুব মিনারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়াও প্রত্যক্ষ করেন। আমার ঠাকুরদা শামসি তালাবের পাশে পাথর দিয়ে একটি বাড়ি তৈরী করেন যেখানে আমার জন্ম হয়। তিনি সুলতান ইলতুৎমিশের কন্যা রাজিয়া সুলতানার অধীনেও চাকরী করেন, যিনি সাড়ে তিন বছর ধরে ভারতে শাসন কাজ পরিচালনা করেন। আমার বাবা লালা চাগন লাল মেহরুলির কোতোয়ালীতে একজন কেরানী ছিলেন। তখন ভারতে সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবনের শাসন চলছিল। ১২৬৫ থেকে ১২৮৭ সাল পর্যন্ত তেইশ বছর শাসনকালের মধ্যে আমার বাবা পনের বছর সুলতানের অধীনে চাকরী করেন। বাবা মারা যান ১২৮০ সালে।

আমার কায়স্থ পূর্বপুরুষদের মত আমাকেও শাসকদের অধীনে কেরানীর চাকরী করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। একজন পন্ডিত আমাকে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা দেন। আমার বাবার প্রভাবের কারণে আরবী, তুর্কী ও ফারসী শিখার জন্য আমাকে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। প্রথমে তুর্কী ও ইসলামে দীক্ষিত হিন্দু ছেলেরা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো। কিন্তু যখন আমি তুর্কী ভাষা আয়ত্ব করলাম এবং একজন তুর্কীর মত পোষাক পরতে শুরু করলাম, তখন থেকে তারা আমাকে আর বিদ্রূপ করতো না। তাছাড়া মুসলিম ছেলেদের কাছে যাতে নাজেহাল হতে না হয় সেজন্য মৌলভী সাহেব আমার একটি মুসলিম নাম দিলেন-আবদুল।

ছেলেরা আমাকে ডাকতো আবদুল্লাহ বলে। আমি বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান ছিলাম। একটি বালিকার সাথে আমার বিয়ে স্থির করা হয়। এই বালিকার সাত সদস্যের পরিবারটি বসবাস করতো মথুরায়। আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার বিয়ে হয় রাম দুলারীর সাথে। ওর বয়স তখন সাত বছর। চার বছর পর আমি স্ত্রীর শয্যায় যাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হলাম তখন বাবা-মা সেই নরসুন্দরকে মথুরায় প্রেরণ করলেন, যে আমার বিয়ের আয়োজন করেছিল। কিন্তু তার বাবা-মা আমাদের ইচ্ছা পূরণে অস্বীকৃতি জানালো। কারণটা আমি পরে ব্যাখ্যা করবো। এরপর কিছু দুঃখজনক ঘটনা আমাদের পরিবারকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। আমার বাবা মারা গেলেন। কয়েকদিন পর মা তার সাথে যোগ দিলেন। মাত্র তের বছর বয়সেই এই পৃথিবীতে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম।

কোতোয়াল সাহেব আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি যখন আমাকে সমবেদনা জানাতে এলেন, তখন বাবার পদটিতে আমাকে স্থলাভিষিক্ত করার কথাও বললেন।

এ সময় আমার মুসলিম বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিল যে, আমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি তাহলে আমার ভবিষ্যত আরো উজ্জ্বল হবে। এমনকি আমাকে মেহরুলির কোতোয়াল পদটিও দেয়া হতে পারে এবং নব দীক্ষিতদের মধ্য থেকে আমার জন্যে বউ খুঁজে পাওয়াও খুব অসুবিধা হবে না। যদি আমি ভাগ্যবান হই তাহলেই আমি বিধবা কিংবা খাঁটি তুর্কী, ইরানী বা আফগান বউও পেতে পারি। একজন তো বলেই ফেললো, "তুমি যদি মুসলিম হও, তাহলে যে নারীকে পছন্দ করবে তাকেই পাবে। শুধু তাই নয়, যদি একটিতে টিকে যেতে পারো, তাহলে এক সাথে চারটি বউও রাখতে পারবে।"

"তুর্কী নারী কখনো ক্লান্ত হয় না
হিন্দুস্থানীর সুগোল স্তন
দুগ্ধভারে বিস্ফোরিত যেন
ইরানী নারীর প্রতিটি অঙ্গ যেমন দৃঢ়
ছিনালিপনায় তেমনি চৌকশ
উজবেক নারীর কাছে পরাজয়
জনা তিনেকের জন্যে চরম শিক্ষা।"

জানি না, এমন কিছু একটা কারণ ছিল, যা আমাকে ইসলামে দীক্ষিত হতে বাধা দিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, যে কারণে আমার স্ত্রীর বাবা-মা তাকে আমার কাছে পাঠাতে অস্বীকার করেছিলেন তা হচ্ছে, এমন একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, আমার বাবা-মা মুসলমানদের কায়দাকানুন গ্রহণ করেছেন। আমি যদি মুসলমান হয়ে যেতাম তাহলে তারা বলতেন, "আমরা কি তোমাদের বলিনি? আমরা কি করে একজন নোংরা ম্লেচ্ছের কাছে আমাদের মেয়ে দেব?" আমার মায়ের মৃত্যু পরবর্তী শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শেষ দিবসে আমার স্ত্রীর কাকা সমবেদনা জানাতে এলেন মথুরা থেকে। তার আসল উদ্দেশ্য ছিল আমি কেমন এবং আমি হিন্দুরীতি অনুসরণ করি কি না সেটি দেখা। নিজ চোখে তিনি দেখলেন যে, আমি আমার মস্তক মুন্ডন করেছি, মন্ত্রপূতঃ পৈতা ধারণ করেছি এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করিয়েছি। আমি নরসুন্দরকে বললাম তার সাথে আমার স্ত্রীকে পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। কাকা কিছু না বলেই মথুরায় ফিরে গেলেন।

কিছুদিন অপেক্ষা করে আমি কোতোয়াল সাহেবের কাছে গেলাম। তখন লোকজন ভাবতো যে ভাগ্য আমার সাথে বিরূপ আচরণ করছে এবং তারা আমার প্রতি সহানুভূতিশীলও ছিলেন। কোতোয়াল সাহেব আমার স্ত্রীর বাবা-মা'র বিরুদ্ধে একটি অভিযোগনামা লিখিয়ে নিলেন যে, তারা আমার দাম্পত্য অধিকারে বাধা দিচ্ছেন। অভিযোগনামাটি তিনি মথুরার কোতোয়ালের কাছে প্রেরণ করলেন তার সুপারিশসহ যাতে তিনি যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা যদি কোন আপত্তি উত্থাপন করে তাহলে তাদেরকে গ্রেফতার করে মেহরুলিতে পাঠিয়ে দেয়ার সুপারিশও ছিল।

এক সপ্তাহ পর স্ত্রীর কাকা আমার স্ত্রী ও শ্যালিকাকে নিয়ে হাজির হলো। কয়েকদিন পর স্ত্রীকে

রেখে কাকা ও শ্যালিকা মথুরা চলে গেলো।

রাম দুলারী একজন হিন্দু স্ত্রীর মতই আচার ব্যবহার শুরু করলো। প্রতিদিন সকালে সে আমার পদস্পর্শ করতো এবং সিঁথিতে সিঁদুর দিতো। কিন্তু সারাক্ষণ সে কাঁদতো। তাকে আদর করতে আমার হাত যতই আন্তরিকতার সাথে তার কাঁধে রাখতাম সে ছিটকে আমার কাছ থেকে সরে যেতো। একদিন রাতে আমি তার বিছানায় যেতেই সে কান্না শুরু করলো। কান্নার শব্দে আমাদের পড়শী জাগ্রত হয়ে চীৎকার করে জানতে চাইলো, সবকিছু ঠিক আছে কি না। আমি রীতিমতো বিব্রত হলাম। একমাস পরও আমার পক্ষে জানা সম্ভব হলো না যে আমার স্ত্রী দেখতে কেমন। কারণ সে তার ওড়নার প্রান্ত দিয়ে সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রাখতো। শুধু তার গলা ও হাত দেখে আমার ধারণা হলো যে সে ফর্সা। আমি এটাও লক্ষ্য করেছিলাম যে, তার স্তনযুগল সুগঠিত এবং নিতম্ব আকর্ষণীয়।

আমার স্ত্রী যে আমাকে শয্যায় নিতে আগ্রহী নয় এটা বুঝতে আমার কয়েক সপ্তাহ লেগে গেল। সে পৃথক হাঁড়িতে তার খাবার রান্না করতো এবং মথুরা থেকে নিয়ে আসা থালায় খেতো। তার কাছে আমি ছিলাম নোংরা ও মুসলিম ম্লেচ্ছ। আমি তাকে শয্যায় নিতে বলপ্রয়োগ করলাম। তাকে মারধোর করলাম। কোন ফল হলো না। তার কাছে জানতে চাইলাম, সে বাবা মা'র কাছে ফিরে যেতে চায় কি না। সে বললো, তাকে তাড়িয়ে দিলেই সে যাবে অথবা মৃত্যুর পর শবাধারে তুলে তাকে বিদায় দিতে হবে। এ অবস্থায় আমার কি করণীয়? কোতোয়ালের কাছে গিয়ে কি আমার স্ত্রীর দুই পা প্রসারিত করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আবেদন করা উচিত ছিল? ক্রমান্বয়ে আমি ভাগ্যের সাথে আপোস করলাম। আমরা একই ছাদের নিচে ঘুমাতাম। কিন্তু কখনই একই খাটিয়ার উপর নয়।

একদিন সকালে রাম দুলারীকে কুতুব মিনার দেখাতে নিয়ে গেলাম। আমরা মিনারের সর্বোচ্চ তলায় উঠলাম এবং সেখান থেকে রাম দুলারীকে কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযার, শামসি তালাবের পাশে আউলিয়া মসজিদ এবং আমাদের ছোট্ট বাড়ি দেখালাম। আমাদের ঠিক নিচে সুলতান ইলতুৎমিশের মাযার। নিচে নেমে এসে তাকে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের দিকে নিয়ে যেতেই সে আপত্তি করলো। আমি তাকে একটি পাথরের ফলক দেখালাম, যেটি একজন হিন্দু কারিগরের তৈরী এবং মুসলিম বিজয় সৌধে লাগানো হয়েছে। তাতে লিখা শ্রী বিশ্বকর্মা প্রসাদ রাচিতা। তাকে বললাম তুর্কীরা সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মূর্তি প্রবেশদ্বারের নীচে প্রোথিত করেছিল, যাতে প্রার্থনা করতে আগত মুসলিমরা তাদের পদদলিত করতে পারে। মুসলিম বিজয়ের সাথে হিন্দু, জৈন মন্দির ও মূর্তি ধ্বংস করার কাহিনী তাকে ভারাক্রান্ত করেছিল। সে এগিয়ে যেতেই লক্ষ্য করলো দেবদেবীর মূর্তির খন্ডিত অংশ। নাক নেই। হাত ভাঙ্গা। স্তন উধাও। সে একটি পিলারে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে শুরু করলো। কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল। আমি ভান করলাম যে, সে সুস্থ বোধ করছে না এবং তাকে ঠেলে সাথে নিয়ে বের হয়ে এলাম। আমার পরনে যদি মুসলিম পোশাক না থাকতো এবং আমার স্ত্রীর গায়েও যদি বোরকা (তখন সকল মর্যাদাবান হিন্দু নারী বোরখা পরতো) না থাকতো তাহলে পরিস্থিতি খুব ভালো হতো না। বাড়িতে ফিরে তাকে খুব গালমন্দ করলাম।

মুসলমানদের প্রতি হিন্দুরা যে ঘৃণা পোষণ করে তা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। মুসলমানরা হিন্দুস্থান জয় করেছে। আমাদের দেবতারা তাদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারেনি কেন? গজনীর সুলতান মাহমুদ সতের বার হিন্দুস্থানে অভিযান চালান। একবার বা দু'বার নয়, সতের বার। তিনি থানেশ্বরে চক্রস্বামী মন্দির ধূলিস্যাৎ করেন। কিন্তু তার কিছুই ঘটেনি। এরপর সোমনাথ মন্দির। হিন্দুরা বলতো যে, এমনকি সমুদ্রও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দু'বার সোমনাথের পদস্পর্শ করতো। কিন্তু সুলতান মাহমুদের হাত থেকে সোমনাথজীকে রক্ষার জন্য সমুদ্রও স্ফীত হয়নি। তারা বলে যে, মাহমুদ যুদ্ধে পরাজিত হিন্দু রাজাদের আঙ্গুল কর্তন করতেন এবং তার ভান্ডার হিন্দুদের আঙ্গুলে পরিপূর্ণ ছিল। সুলতান মাহমুদ নিজেকে ভূষিত করেছিলেন 'ইয়ামিনুদ্দৌলাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর ডান হাত' এবং 'জিল্লেল্লাহি' অর্থাৎ 'পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া' বলে।

মুসলমানরা হিন্দুস্থানের মালিক হিসেবে আবির্ভূত হলো। তারা আমাদেরকে হিন্দু হিসেবে

জীবনযাপন করতে দিতে ইচ্ছুক ছিল, যেমনটি আমরা কামনা করতাম। শুধু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তারাই শাসক। কিন্তু হিন্দুরা অর্থহীন অহংকার পোষণ করতো "এটি আমাদের দেশ, আমরা এই গরুখোর, আমাদের মন্দির বিধ্বংসকারীদের বিতাড়ন করেই ছাড়বো।" বিশেষত যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল তাদের প্রতি হিন্দুরা এমন আচরণ করতো যেন তারা অস্পৃশ্যের চাইতেও নিম্নস্তরে।

হিন্দুরা তাদের অতীত গৌরবের জাবর কাটতো। হিন্দুদের প্রতিটি আলোচনায় তারা তোমারা ও চৌহানদের মহান দিনগুলোর কথা বলতো। কে অস্বীকার করবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা মহান ছিলেন। আমার হিন্দু বন্ধুদের সাথে আমি তর্ক করতাম, 'কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে যে, আমরা মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে পারবো না। তারা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী এবং যুদ্ধংদেহী। আমাদের শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করা উচিত। কিন্তু হিন্দু মস্তিষ্কে কখনো যুক্তি প্রবেশ করে না। বিশ্বে সবাই জানে যে, দাঁড়িপাল্লার একদিকে যদি চারটি বেদ এবং অন্যপ্রান্তে 'সাধারণ বুদ্ধি' রাখা যায় তাহলে সাধারণ বুদ্ধির পাল্লাই ভারী হবে। কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে-এর ব্যতিক্রম ঘটবেই।' এসব বলায় হিন্দুরা আমার প্রতি বাঁকা চোখে তাকাবে এবং আমাকে মুসলমানদের ভাঁড় বলে ডাকবে। তাদের মহান বীর, পৃথ্বীরাজ চৌহান, যিনি ১১৯১ সালে তরাইন প্রান্তরে মোহাম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু পরের বছরই একই যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ চৌহান ঘোরীর কাছে পরাজিত ও নিহত হন। এ সম্পর্কেও তাদের একটি উত্তর আছে। পৃথ্বীরাজের একমাত্র ভুল ছিল যখন ঘোরীকে পরাজিত করেছিলেন তখন সেই ম্লেচ্ছকে জীবিত রাখা। আসলে কেউই পৃথ্বীরাজের আসল সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। চান্দ বরদাই নামে একজন কবি তার নামে একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছিল। মহান বীর পৃথ্বীরাজ বহুসংখ্যক রমণীকে বিয়ে করেছিলেন এবং পার্শ্ববর্তী রাজার মেয়েকে অপহরণ করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুদের কাছে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা যাবে না। শ্রী রামচন্দ্রজীর পরই হিন্দুরা সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের পূজা করে থাকে।

ক্রমে আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমি মুসলমান বা হিন্দু কারো কাছেই গ্রহণযোগ্য নই। আমি কি করে আমার স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করবো যে, দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অর্ঘ্যের উপরই হিন্দু ব্রাহ্মণরা জীবনধারণ করে। রাজপুত ও জাঠদের জমি আছে। আহীর ও গুজ্জারদের গরু মহিষ আছে। বেনিয়াদের দোকান আছে। কিন্তু দরিদ্র কায়স্থদের আছে শুধুমাত্র মস্তিষ্ক ও কলম। তারাই একমাত্র লোক যাদেরকে তাদের মস্তিষ্কের জন্য বেতন দেয়া হয় এবং তাদের কলম মুসলমান শাসকদের কাজে নিয়োজিত।

হিন্দুরা আমাকে অস্বীকার করতো এবং আমার স্ত্রীও আমাকে শাসাত। মুসলমানরা আমাকে অবজ্ঞা করতো, আমার সাহচর্য পছন্দ করতো না। বাস্তবিকপক্ষে আমার অবস্থা ঠিক একজন হিজড়ার মত। যে পুরুষও নয়, নারীও নয়-অথচ সকলে তার সাথে অপব্যবহার করে।

এ সময় আমি নিজামুদ্দিনের কথা শুনলাম। 'যমুনা নদীর তীরে গিয়াসপুরের দরবেশের কাছে গমন করো। তাহলে তোমার সব সমস্যা সমাধান হবে।' লোকজন তাকে বলতো আউলিয়া। অনেকে খাজা সাহেবও বলতো। অনেক শিক্ষিত মুসলমান তাকে বলতো ভন্ড, যে শীঘ্রই দুর্ভোগের শিকার হবে। একজন ভদ্র কায়স্থ হিসেবে আমি কোন অভিমত ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকলাম এবং অপেক্ষা করলাম, কোনদিকে বাতাস বয় তা দেখার জন্য।

যথাসময়ে সুলতানের দরবারে নিজামুদ্দিনের ডাক পড়লো, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্য। তার বিচারের দিনে আমি অফিস থেকে ছুটি নিলাম এবং দরবারে গমন করলাম।

তখনকার দিনে গিয়াসউদ্দিন বলবনের নাম শোনামাত্র লোকজন কাপড় নষ্ট করে ফেলতো। তার রাগ ছিল সীমাহীন এবং তার দিকে কেউ চোখ তুলে কথা বললে তাকে হত্যা করা হতো। দু'জন বিশালদেহী নিগ্রো তার পাশে থাকতো, যারা ইশারা পাওয়া মাত্র মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তদের শিরোচ্ছেদ করতো।

বিচারের দৃশ্য অদ্ভুত। সুলতান তার সিংহাসনে সমাসীন। নিগ্রো দেহরক্ষীরা দু'পাশে দন্ডায়মান। কয়েকশত শশ্রুমন্ডিত তুর্কী সেনাপতি স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। সিংহাসনের এক পার্শ্বে রেশমী বস্ত্র পরিহিত পাঁচজন উলেমা দাঁড়িয়ে আছেন। তাদের দিকে মুখ করে দন্ডায়মান এক

যুবক, যার বয়স আমার চেয়ে বেশি নয়। তার পরণে মোটা কালো পশমী পিরহান এবং মাথায় সবুজ রং এর পাগড়ী। তার সাথে তিন অনুসারী, পরনে তার মতই স্বল্পমূল্যের বসন। ইনিই নিজামুদ্দিন। গিয়াসপুরের সুফী দরবেশ।

সুলতান প্রথমে নিজামুদ্দিনকে সম্বোধন করলেন, "দরবেশ, উলেমারা অভিযোগ করেছেন যে, আপনি মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ স্বীকার করেন না এবং আপনি আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করেন। আপনার কথাবার্তায় এমন শব্দাবলী ব্যবহার করেন যার ফলে মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না। আপনার অনুসারীরা মসজিদ চত্বরে নৃত্যগীত করে এবং এভাবেই পবিত্র শরীয়তের আইন লংঘন করে। আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য আপনার কি কোন বক্তব্য আছে?'

নিজামুদ্দিন হেসে জবাব দিলেন, 'হে ক্ষমতাধর সুলতান, একথা সত্য যে, আমি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করি না। কারণ আমি উভয়কেই আল্লাহর সন্তান বলে বিবেচনা করি। উলেমারা নবীর নাম নিয়ে মন্দির ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয় এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে ভালো হওয়ার জন্য বিধর্মীদের হত্যা করে। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহর নির্দেশ যথাযথ প্রতিপালন করার উত্তম পন্থা হচ্ছে তার সৃষ্টিকে ভালোবাসা। মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করা সম্পর্কিত অভিযোগের জবাবে আমি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করবো। আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন, "ইমাম ব্যতীত যে মৃত্যুবরণ করে সে আসলে বিধর্মী হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।" আমরা সুফীরা এই বিশ্বাসেই ভর করে অনুসরণ করি এবং এটাও বিশ্বাস করি যে, শুধু কেতাবের জ্ঞান আহরণ করেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব নয় অথবা যুক্তিতেও নয়। তার পয়গম্বরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এ সম্পর্কে তিনি জানেন কিনা? জবাবে তিনি বলেছিলেন, "না, আমিও জানি না। আল্লাহ হচ্ছেন অভিজ্ঞতা।"

সুলতান উলেমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তাদের নেতা সিংহাসনের সামনে হাঁটু গেড়ে সিংহাসনের সামনের ভূমি চুম্বন করলো। 'জাঁহাপনা, আপনি সর্বজ্ঞ এবং সকল সম্রাটের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ। আমরা থাকতে এই কীটানুকীটাধমের কোন প্রয়োজনই নেই আপনার কাছে। মহামহিম নিশ্চয়ই জানেন যে, নিজামুদ্দিন নিরীহ মানুষের চোখে ধূলা ছিটিয়ে প্রেমের কথা বলে।' তিনি কোরআন শরীফের আবরণ উন্মুক্ত করে কপালে স্পর্শ করলেন এবং একটি আয়াত পাঠ করলেন। জনতা 'বাহ্ বাহ্, সোবহান আল্লাহ' ধ্বনি তুললো। অধিকাংশই আরবী জানেনা, 'তবু ধ্বনিতে অংশ নিলো। আয়াতের তুর্কী তরজমা যখন উচ্চরণ করা হলো তখন আরো কমসংখ্যক লোক বুঝতে পারলো।

সুলতান দরবেশের দিকে ফিরলেন এবং আল্লাহর সাথে তার মিলনের দাবী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। নিজামুদ্দিন অত্যন্ত কাব্যিক ভাষায় বলেন, "প্রিয় সুলতান, শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ আমার প্রিয় উলেমাবৃন্দ এবং সমবেত জনমন্ডলী, আপনারা কি জানেন প্রেম কি এবং প্রেমিক কে? সম্ভবতঃ সবাই নারীর প্রেম এবং সে প্রেম উপভোগ করা সম্পর্কে অবহিত। আমাদের সুফীদের প্রেম আল্লাহর সাথে, আর কারো সাথে নয়। আমরা যখন ঐশ্বরিক চেতনার অধিকারী হয়ে শব্দ উচ্চারণ করি, সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে মনে হতে পারে যে আমরা আল্লাহর সুরে কথা বলছি। কিন্তু এটাকে গুরুতররূপে গ্রহণ করা উচিত নয়। আপনারা নিশ্চয়ই সেই ঘুঘুর গল্প জানেন যে তার সঙ্গীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেনি। পুরুষ ঘুঘু আবেগে বলেছিলো, "তুমি যদি নিজেকে সমর্পণ না করো তাহলে আমি বাদশাহ সোলেমানের সিংহাসন উল্টে দেব।" তার কথা বাতুতাড়িত হয়ে সোলেমানের দরবারে পৌছলো। তিনি ঘুঘুকে ডেকে তার কথার ব্যাখ্যা দিতে বললেন। ঘুঘু উত্তর দিয়েছিল, "হে আল্লাহর রসূল! প্রেমিক প্রেমিকার কথার কোন ব্যাখ্যা আশা করা উচিত নয়।" ঘুঘুর উত্তরে বাদশাহ সোলেমান প্রীত হলেন। আমিও আশা করি আমার উত্তরে সুলতান বলবন সন্তুষ্ট হবেন।

জনতার মধ্যে 'বাহ বাহ গুঞ্জন শোনা গেল।'

সুলতান সঙ্গীত সম্পর্কে উলেমাদের ব্যাখ্যা দাবী করলে তারা আরেকটি কেতাব খুললো। (তারা বহুসংখ্যক কেতাব সঙ্গে এনেছিল)। তাদের নেতা আরবীতে কিছু পাঠ করে তুর্কী ভাষায় তরজমা করলো এবং প্রশংসা পাওয়ার জন্য জনতার দিকে তাকালো। জনতার এক অংশ বাহ বাহ

ধ্বনি তুললো।

সুলতান আবার নিজামুদ্দিনের দিকে ফিরলেন। দরবেশ কোন কেতাব আনেনি। স্মৃতি থেকে তিনি সঙ্গীত ও নৃত্য সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বললেন, "যখন কারো মাঝে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রবেশ করে তখন সেই ব্যক্তি সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে। আল্লাহ যদি এভাবে উল্লাস প্রকাশকে গ্রহণ করেন তাহলে আমি বলি, 'আমিন'।"

সুলতান এক মুহূর্তের জন্য বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন এবং দাড়িতে অঙ্গুলী চালনা করে উঠে আসা চুলগুলো পরখ করলেন। তখনকার নিরবতা ছিল ভয়ংকর। অবশেষে তিনি গলা পরিষ্কার করে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, "গিয়াসপুরের দরবেশ নিজামুদ্দিনের বিরুদ্ধে উলেমাদের আনীত অভিযোগ আমি নাকচ করে দিলাম।"

জনতা আনন্দে চীৎকার করে উঠলো এবং সুলতানের ন্যায় বিচারের জন্য তার প্রশংসা করলো। অনেকে নিজামুদ্দিনের দিকে ছুটে গিয়ে তার মোটা পশমী পিরহানের প্রান্তদেশ চুম্বন করলো।

পরদিন সকালে আমি কোতোয়াল সাহেবকে নিজামুদ্দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "তিনি ওইখানে উঠে গেছেন। তিনি বহু বিধর্মীকে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। যে কোন বৃহস্পতিবার অথবা নতুন চাঁদ উঠার দিনে তার কাছে যাও, তাহলে তুমি দেখতে পাবে তার অলৌকিক ক্ষমতা।"

পরবর্তী বৃহস্পতিবার আমি একটি এক্কা ভাড়া করে গিয়াসপুর রওয়ানা হলাম। মেহরুলি থেকে গিয়াসপুরের দূরত্ব এক ক্রোশের বেশি। নিজামুদ্দিনের খানকায় পৌছে একজন খাদেমকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমি তাকে দেখতে পাবো কি না। লোকটি বললো, খাজা সাহেব তার কামরায় ধ্যানমগ্ন আছেন। শুধুমাত্র সন্ধ্যায় তিনি দর্শণার্থীদের সাক্ষাত দেন। আপনি এখন যান এবং লঙ্গরখানায় ভোজন করুন।

লঙ্গরখানায় গিয়ে দেখলাম সেখানে মুসলিম, হিন্দু, ধনী ও দরিদ্রের ভীড়। সকলে একটু সব্জী, একটু ডাল এবং মোটা রুটির জন্য অপেক্ষা করছে। একটি রুটি পাবার আশায় ভিড় ঠেলে আমিও রাস্তা করে নিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে খানকার চত্বরে বসলাম। একদল কাওয়াল হিন্দীতে গান গাইছিল। একজন বললো, গানটি রচনা করেছেন জনৈক আবুল হাসান, যিনি খাজা সাহেবের অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো সবার মাঝে যে, দরবেশ তার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন। লোকজন তাকে ঘিরে আছে মৌমাছির মত ভিড় করে। ভিড় ঠেলে আমি এগিয়ে গেলাম এবং কাছে পৌছে তার পিরহানের প্রান্তদেশ চুম্বন করলাম। সহসা আমার চোখে অশ্রুবান ডাকলো। দরবেশ আমার মাথায় তার হাত রাখলেন। অদ্ভুত এক অনুভূতি আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। তিনি আমার অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে ধরলেন এবং বললেন, "আল্লাহ তোমার দুঃখগুলোকে আমার দুঃখে পরিণত করুণ।" একটা আলোকচ্ছটা যেন ভেসে বেড়াতে লাগলো।

তিনি বললেন, "আবদুল্লাহ, তুমি হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযারের কাছে বাস করো। প্রত্যেক সকালে সেখানে গিয়ে মহান আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম উচ্চারণ করবে। তাহলে তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে। দুঃখে যখন বুকটা ভারী হয়ে উঠবে তখন আমার কাছে এসো। আমার জীর্ণ কুটিরের দরজা কারো জন্যেই কখনো রুদ্ধ হয় না।"

মেহরুলি ফেরার পথে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কি করে জানলেন যে, আমি বখতিয়ার কাকীর মাযারের কাছে বাস করি। কি করে তিনি জানলেন যে, আমার মুসলিম বন্ধুরা আমাকে আবদুল্লাহ বলে ডাকে। কেউ যদি তাকে বলেও থাকে যে, আমার মুসলিম বন্ধুরা আমাকে আবদুল্লাহ বলে ডাকে, কেউ যদি তাকে বলেও থাকে যে, আমি কে এবং কোথায় থাকি, তাহলে এটা কি করে সম্ভব যে তিনি জানেন না আমি হিন্দু এবং আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আমি নাও জানতে পারি। নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। যেহেতু মনের বোঝা হালকা করার জন্য আমার আর কেউ ছিল না, আমি স্ত্রীকে সব খুলে বললাম। বিয়ের পর এই প্রথম রাম দুলারী আমার প্রতি কিছু আগ্রহ ব্যক্ত করলো। আমার কথা যখন ফুরিয়ে গেল তখন সে অত্যন্ত শান্তভাবে আমাকে বললো, 'একদিন আমাকে কেন সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাও না" আমি উল্লসিত

হয়ে তার হাত চেপে ধরলাম।

চান্দ্র মাসের প্রথম দিবসে আমি রাম দুলারীকে গিয়াসপুরে নিয়ে গেলাম। এক্কা, গরুর গাড়িতে করে আরো বহু নরনারীকে গিয়াসপুর অভিমুখে দেখলাম। সেখানে বিপুল জনতার ভিড়। আশে পাশে চুড়িওয়ালা, মিষ্টি বিক্রেতা, কাপড় বিক্রেতা, ঔষধপত্র বিক্রেতা সমন্বয়ে মস্ত বাজার গড়ে উঠেছে। আমার ভয় হলো, রাম দুলারী পবিত্র ব্যক্তির 'দর্শন' লাভের সুযোগ পাবে না। আমি তাকে লঙ্গরখানায় নিলাম না, কারণ সে মুসলমানের পাকানো কিছু খাবে না। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দোকানগুলো দেখলাম। তামাশগীরদের তামাশা দেখলাম। এরপর একটি গাছের নিচে বসলাম। এক ঘন্টা পর সূর্য ডুবে গেল এবং এক্কা চালক অন্ধকার হওয়ার পূর্বেই মেহরুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতে লাগলো। আমি চিন্তায় ডুবে ছিলাম। এমন সময় একজন দরবেশ কাছে এসে বললেন, 'আবদুল! তোমার নাম কি আবদুল বা আবদুল্লাহ নয়? খাজা সাহেব তোমাকে খুঁজছেন।' লোকটি আমাদেরকে মসজিদের পিছনে একটি দরজার কাছে নিয়ে এলো। ভিতরে পবিত্র ব্যক্তিটি দর্শণার্থীদের সাক্ষাৎ দিচ্ছেন। দরবেশ ভিড়ের মধ্যে পথ করে আমাদেরকে তার কাছে নিয়ে গেলেন।

আমি পবিত্র ব্যক্তির পিরহানের প্রান্তদেশ চুম্বন করলাম। রাম দুলারী তার সামনের মাটিতে কপাল স্পর্শ করে প্রণাম জানালো। খাজা সাহেব তার হাত প্রসারিত করে তাকে আশির্বাদ করলেন, "বৎস, আল্লাহ তোমার মনের বাসনা পূরণ করুন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমার গর্ভ ফল ধারণ করবে। শান্তিতে থাকো।" তার বাক্য শেষ হলো। ভিড়ের মধ্যে আমরা পিছিয়ে এলাম।

তার গর্ভে ফল আসবে? ইশ্বরের এই ব্যক্তি, যাকে বলা হয় যে, তিনি গ্রন্থ পাঠ করার মতই মানুষের মনের কথা বলতে পারেন, তিনি রাম দুলারীর মনের খবর জানেন না। যেভাবে রাম দুলারী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ,তাতে আমার বিশ্বাস পবিত্র ব্যক্তির কথা তাকে বিব্রত করেছে। মেহরুলি ফেরার পথে সে আমাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকলো। আউলিয়া মসজিদের বিপরীত দিকে আমরা এক্কা থেকে নামলাম। এমনভাবে দু'জন বাড়ি ফিরলাম যেন পরস্পরের কিছুই করণীয় নেই। আমি দোকানপাটের বন্ধ দুয়ারের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলাম যেন এ দৃশ্য পূর্বে কখনো দেখিনি। আমার পিছনে রাম দুলারীর মুখ বোরখায় আবৃত।

বাড়িতে ফিরেই সে সকালে রান্না করে যাওয়া খাবার গরম করতে চুল্লী জ্বালালো। আমি প্রদীপ জ্বালালাম এবং দিনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করলাম। সে আমার খাবার দিয়ে রান্না ঘরে গেল খেতে। খেয়ে দেয়ে শূন্য কাঁসার থালাটি তাকে দিয়ে পান খাওয়ার জন্য বের হলাম।

আমার ফিরে আসার সময়ের মধ্যেই রাম দুলারী বাসন কোসন মেজে নিজের খাটিয়ার শুয়ে পড়েছে দেয়ালের দিকে মুখ করে। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে আমিও আমার খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুমাতে পারছিলাম না। পবিত্র ব্যক্তির কথাই ভাবছিলাম যে, আমাদের সন্তান হবে। কি করে রাম দুলারীর সন্তান হবে, আমি যদি তাকে না দেই? ভাবছিলাম, সেও কি আমার মত একই কথা ভাবছে? এক ঘন্টা পর আমি পাশ ফিরে কোমল কণ্ঠে ডাকলাম, 'রাম দুলারী!'

'হ্যাঁ জী।'

'তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছো?'

'জী নেহি।'

কোতোয়ালীতে মধ্য রাতের ঘন্টা বাজলো। আরো একবার রাম দুলারীকে প্রশ্ন করলাম। সে ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। সে বললো, 'না।' সহসা মনে হলো তাকে স্পর্শ করলে সে সম্ভবতঃ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাবে না। আমি উঠে তার খাটিয়ার কাছে গেলাম এবং বললাম, "আমি কি তোমার সাথে শুতে পারি। আমার খুব শীত লাগছে।" সে আমার জন্যে জায়গা করে দিয়ে বললো, "তোমার যদি ইচ্ছা হয়, শুতে পারো।"

আমি তার পাশে শুয়ে পড়লাম। মাসের পর মাস আমি যে আবেগকে জড়ো করে রেখেছিলাম তা উথলে উঠলো। বন্যার তোড় যেমন সামনে যা কিছু পায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমার কামনাও একইভাবে আমার ভয়কে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ক্ষুধার্ত সিংহের মত আমি তার উপর পতিত হলাম। তার শাড়ি ছিন্ন করে ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলাম। সে আমাকে গ্রহণ করার জন্য উরুদ্বয় প্রসারিত করলো। কিন্তু কিছু ঘটার আগেই আমি নিঃশেষিত হলাম। নিজের

কাছেই লজ্জিত হলাম।

রাম দুলারী উঠে গেল পরিচ্ছন্ন হতে। কলসী থেকে লোটায় পানি ভরলো। শাড়ির প্রান্তদেশ তুলে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন হলো। তারকার মৃদু আলোতে আমি তার দেহ, সুগোল স্তনের উপস্থিতি এবং গুরু নিতম্বের রেখা ও স্ফীতি দেখলাম। শাড়ি ঠিক করে ঘরে প্রবেশের পর সে স্থির করতে পারছিল না কোন খাটিয়ায় শোবে। আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে হাতটা নিয়ে আমার পাশে শুয়ে পড়লো। আমার কামনা আবার জাগ্রত হলো। তার শাড়ি অপসারিত করে আমার আলিঙ্গনে দেহ উষ্ণ করতে সে সম্মতি দিলো। এবার দীর্ঘ সময় নিজেকে ধরে রাখতে সক্ষম হলাম। সেও আমাকে গ্রহণ করতে অধিকতর আগ্রহী ছিল। তার ঠোট দিয়ে কাতর ধ্বনি বের হলো। আমি উপলব্ধি করলাম, অবশেষে রাম দুলারীকে আপন করতে পারলাম।

আমি পুনরায় প্রদীপ জ্বালালাম এবং বিছানার চাদরে লেগে যাওয়া রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে তাকে সহায়তা করলাম। এ কাজ শেষ করতে না করতেই পরস্পরকে পাওয়ার জন্য আমাদের দেহ আবার ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো। এভাবে আমরা পুরো রাতটা কাবার করে দিলাম।

সূর্যালোক যখন আমার মুখে পড়লো এবং মাছির ভন ভন শব্দ কানে বাজলো তখন আমি ঘুম থেকে জাগলাম। রাম দুলারী স্নান করে সকালের খাবার তৈরী করেছে। বঁধূ বেশে যে শাড়ি পরে সে মেহরুলিতে এসেছিল রাম দুলারী সেই শাড়ি পরেছে। আমাকে দেখে সে ঘোমটা দিল না এবং বিছানা থেকে উঠতে দেখে হাসলো। ঘরে থেকে বাইরে বের হওয়ার জন্য সে দৌড় দিলো। আমি তাকে অনুসরণ করে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এরপর থেকে আমি আর রাম দুলারীকে ছেড়ে থাকতে পারি না। তার উপর থেকে আর দৃষ্টি সরিয়ে নিতে পারি না। তার শরীরের প্রতিটি আন্দোলন তাকে গ্রহণ করার জন্য আমাকে আহ্বান করে। তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রতিটি মুহূর্ত যন্ত্রণার মতো এবং দ্রুত ফিরে আসতে হয় তাকে আলিঙ্গন করার জন্য। এরপর সে আহলাদ করতো, বায়না ধরতো। আমি লাল রুবী বসানো একটি নাক ফুল কিনে দিলাম। সব কটি রং-এর কাঁচের চুড়ি কিনে দিলাম। কয়েক মাসের জন্য আমাদের পৃথিবীটা একটা ছোট্ট খাটিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, যার উপর আমরা দিবারাত্র খেলতাম।

রাম দুলারী এবং আমি এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে পরিগণিত হলাম যারা হিন্দু মন্দির ও সূফীর খানকায় প্রার্থনা করতে যেতাম। আমরা মুসলিম ও হিন্দু উৎসব পালন করতাম। দশহরার দিনে আমরা রাম লীলায় যেতাম, দিওয়ালীর দিনে তেলের বাতি জ্বালাতাম, হোলী উৎসবে হিন্দু বন্ধুদের গায়ে রং ছিটাতাম। ঈদের দিনে পরিচিত মুসলমানদের উপহার সামগ্রী দিতাম। মুসলিম সূফী-দরবেশদের মৃত্যু বার্ষিকীকে কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযারে গিয়ে প্রার্থনা করতাম এবং অন্তত মাসে একবার আমরা গিয়াসপুরে নিজামুদ্দিনের খানকায় যেতাম।

রাম দুলারী হিন্দু মেয়েদের পোশাকই পরতো। সে সিঁথিতে সিঁদুর এবং কপালে টিপ পরতো এবং গলায় মঙ্গল সূত্র ধারণ করতো। আমি তুর্কীদের মতোই পোশাক পরতাম এবং মাথায় টুপি ও পাগড়ী পরতাম। তুর্কীদের মতোই সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি ও গোফ ছিল আমার। কথাও বলতাম তাদের মতোই। তারা যদি বলতো, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি উত্তর দিতাম 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম।' তারা যদি জিজ্ঞেস করতো, আমি কেমন আছি। উত্তর দিতাম, 'আলহামদুলিল্লাহ'। কিন্তু তারা যখন জানতে চাইতো, 'আবদুল্লাহ, তুমি কখন সত্যিকার মুসলমান হবে?' জবাবে বলতাম, 'আল্লাহর যদি ইচ্ছা হয় তাহলে খুব শীঘ্রই ইনশাল্লাহ।' কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো যে, 'আমরা হিন্দু না মুসলিম', আমরা উত্তর দিতাম, 'দুটোই'। মুসলিম সংকীর্ণতার দাহ এবং হিন্দুদের ক্রোধের বর্ষণের বিরুদ্ধে নিজামুদ্দিন ছিলেন আমাদের ছাতার মতো।

এভাবেই দিবস, সপ্তাহ ও মাস অতিবাহিত হচ্ছিল। বছরের শেষ প্রান্তে এসে রাম দুলারী গর্ভধারণ করলো এবং প্রসব পর্যন্ত দিনগুলো কাটানোর জন্য তাকে মথুরায় বাবা-মা'র কাছে যেতে হলো। যেদিন আমার পুত্রের জন্মের খবর পেলাম সেদিন কোতোয়াল সাহেব এবং আমার সকল মুসলিম ও হিন্দু বন্ধুদের কাছে মিষ্টি প্রেরণ করলাম। কয়েক সপ্তাহ পর আমি স্ত্রী-পুত্রকে আনার জন্য মথুরায় গেলাম। রাম দুলারীর বোন অর্থাৎ আমার শ্যালিকারা আমাকে খুব ঠাট্টা করে কথা বললো, 'জামাই বাবু, আপনি কি ছেলেকে খতনা করাবেন? আপনি কি ওর নাম মোহাম্মদ বা আলী রাখবেন?' ওদের যা মুখে এলো বললো, আমি কোন আপত্তি করলাম না বরং ওদের হাসি ঠাট্টা

উপভোগ করলাম। আমি আমার পুত্রের খতনা করালাম না। তার মাথা কামিয়ে ব্রাহ্মণের কাছে নিয়ে গেলাম মন্ত্রপূত করার জন্য। তার নাম রাখলাম কমল। এটা হিন্দু, মুসলিম উভয়ের নাম হতে পারে। যোগমায়া মন্দিরে নিয়ে গেলে পুরোহিত তার কপালে চন্দনের টিপ দিলো। এরপর তাকে গিয়াসপুরে নিয়ে গেলাম খাজা সাহেবের দোয়া নিতে। তার নাম একটি পাথরে খোদাই করে এনে সেটি আমার বাড়ীর বাইরের প্রাচীরে লাগিয়ে দিলাম আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

যেসব লোকের কোন গুরু বা পীর নেই তাদের পক্ষে কখনো উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয় যে, শিষ্যদের কাছে তারা কি। শিষ্যের কাছে তারা বাবা-মা'র চেয়েও অধিক। একজন শিষ্য তার পিতার চেয়ে গুরুকেই অধিক শ্রদ্ধা করে। মায়ের চাইতে গুরুর প্রতি সে অধিক নিবেদিত থাকে। বাস্তবিক পক্ষেই গুরু বা পীর শিষ্যদের এতো বেশি প্রিয় যে, এই আবেগ বয়ের প্রতি কনের আবেগের চাইতেও অধিক। কারণ শিষ্য গুরুর কাছে 'তন-মন-ধন' সবই নিবেদন করে। গুরু হচ্ছে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি। সত্যিকার গুরু যদি দূরে কোথাও চলে যায় অথবা কেউ যদি ভুল গুরু পছন্দ করে তাহলে কি ঘটতে পারে তার ভূরি ভূরি নজীর আমাদের কাছে আছে। খাজা সাহেব যখন পাঞ্জাব চলে গিয়েছিলেন তখন দিল্লীর ছোট ছোট শহরগুলোর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সেই রমণীর মত যার স্বামী বিদেশে চলে গিয়েছে। ধূলিঝড় বইতে শুরু করেছিল। একটির পর একটি দুর্যোগ আসছিল।

মঙ্গোলদের সাথে যুদ্ধে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র যুবরাজ মোহাম্মদ নিহত হয়। যে ক্ষমতাধর সুলতান দীর্ঘ বাইশ বছর লৌহ কঠিন হস্তে ভারত শাসন করেছেন, পুত্রের মৃত্যুতে তিনি রমণীর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আহার, নিদ্রা এমনকি রাষ্ট্রীয় কার্যাদিও তিনি বর্জন করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তবুও রাজবৈদ্যকে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে দিলেন না। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি কংকালসার হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন। সিংহাসনের দাবীদার ছিল অনেক। তারা একে অন্যকে হত্যা করার প্রতিযোগিতায় নামলো। তাদের সবার নাম পর্যন্ত আমার মনে নেই। এরপর খিলজী বংশের এক বৃদ্ধ যার এক পা কবরে প্রবেশ করেছে- জালালউদ্দিন ফিরোজ দিল্লীর মসনদে বসলেন। তার পুত্রেরা তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে রাজি ছিল না। তাদের অনেকে সিদি মওলা নামে এক ভন্ড গুরুর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো।

সিদি মওলার নিজের একটি খানকা ছিল। তিনি সেখানে একটি লঙ্গরখানাও চালাতেন। রাজকীয় রন্ধনশালায় যা রান্না হতো তার লঙ্গরখানাতেও একই ধরনের খাবার রান্না হতো এবং তা বিতরণ করা হতো ধনবান ও ক্ষমতাবানদের মধ্যে। সিদি মওলার একদল অনুসারী তার প্রশংসা সঙ্গীত গাইতো। সিদি মওলার খানকায় যেসব রাজন্য ও যুবরাজের পদধূলি পড়তো সঙ্গীতে তাও উল্লেখ করা হতো। তারা বলতো সিদি মওলা এককড়ির তুল্য পার্থিব সম্পদের ধার ধারেন না এবং ক্ষমতা লোভী নন। তাকে কাজীর পদ দিতে চাইলে তিনি নাকি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা আরো প্রচার করে যে, রাজন্যদের কন্যারা তাকে বিয়ে করার আগ্রহ ব্যক্ত করলেও তিনি তাদের কাউকেই বিয়ে করেননি। কিন্তু আমি নিজে নিজে বলতাম, "ইয়া আল্লাহ, ইনি কেমন দরবেশ? তার এক পা আল্লাহর নৌকায় এবং আরেক পা রাজ দরবারে। সম্ভবতঃ তিনি তাদেরই একজন যিনি ক্ষমতা দখলের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে আছেন।"

সিদি মওলাকে দেখার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে, এই ব্যক্তি আমার পীর নিজামুদ্দিনের পায়ের ধূলি চুম্বন করারও যোগ্য নয়। লোকটি দেখতে আস্ত বদমাশের মত। কাঁচা দাড়ি। গোঁফের দুই প্রান্ত কাঁকড়া বিছার লেজের মতই বাঁকানো। সে অভিজাত ব্যক্তির হাবভাব প্রকাশ করতো এবং সুগন্ধি ভেজানো তুলা সাথে রাখতো ঘ্রাণ নেয়ার জন্য। সিদি মওলা বয়সে তরুণ হলেও তোষামোদকারী দল সৃষ্টি করেছিল। সবকিছু মিলিয়ে একজন অন্ধের পক্ষেও আন্দাজ করা সম্ভব যে, সিদি মওলা ধর্ম কর্মে বিশ্বাসী নয়। সে ধনবান ব্যক্তিদের উপদেশ দানে এতো ব্যস্ত থাকতো যে, দরিদ্রদের জন্য কোন সময়ই অবশিষ্ট থাকতো না। সে ছিল অত্যন্ত অহংকারী, কবি মুসতারাফ বলেছেন, "সেই আহম্মকদের বলো, ক্ষিপ্ততায় যাদের গলার শিরা স্ফীত হয়, অহংকার ধর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত, মনকে দুর্বল এবং খ্যাতিকে ধ্বংস করে। অতএব প্রতীক্ষা করো।" এ কথা যথার্থই বলা হয়েছে যে, এক খাপে যেমন দু'টি তরবারি থাকতে পারে না,

তেমনি এক দেশে দুই রাজা থাকতে পারে না। দিল্লীতে আমাদের ছিল খিলজী বংশের জালালউদ্দিন খিলজী এবং আরেকজন ছিল সিদি মওলা যে সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সুলতানেরই এক পুত্রের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

বৃদ্ধ সুলতান কি করে দরবেশকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন এ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। কিছু সংখ্যক লোক তাকে জানিয়েছিল যে, সিদি মওলা সুলতানের শত্রুভাবাপন্ন একটি গ্রুপকে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং বিনিময়ে সুন্দরী রাজকন্যা লাভের আশ্বাস পেয়েছে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র সুলতান সিদি মওলাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলেন। সিদি মওলা এবং তার কতিপয় অনুসারীকে হাতকড়া পরিয়ে যখন আনা হয় তখন আমি কোতোয়ালীতে ছিলাম। আমি জানতাম এখন রক্ত প্রবাহিত হবে এবং সিদি মওলা তার শত্রুপক্ষ অবলম্বনকারীদের অভিশাপ দেবেন। ভন্ড হলেও একজন দরবেশের ক্রোধের ঝুঁকি নেয়ার কি প্রয়োজন। আমি কোতোয়াল সাহেবের কাছে তিনদিনের ছুটির আবেদন করলাম আমার পেট খারাপের অজুহাত দেখিয়ে।

ছুটিতে থাকাকালেই আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে আসা কোতোয়ালীর কেরানীর কছে জানতে পারলাম সিদি মওলার ভাগ্যে কি ঘটেছিল? কোতোয়াল তার স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টায় তাকে বেদম প্রহার করে অন্ডকোষ থেতলে দেয়, গুহ্যদ্বার দিয়ে লাল মরিচের গুঁড়া প্রবেশ করিয়ে দেয়, তার মুখে মলমূত্র ভরে দেয়া হয়। কিন্তু সিদি মওলা কথা বলতে অস্বীকার করে। সুলতান আরো রেগে যান। তিনি সিদি মওলা ও তার অনুসারীদের আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, "এরপরও যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে আমি বিশ্বাস করবো যে, তারা নিরীহ এবং তখন ছেড়ে দেব।" পরদিন এক বিশাল চিতা প্রস্তুত করা হলো মেহরুলির কাছেই বাহারপুর গ্রামে। সিদি মওলা অলৌকিক কার্য সাধনে অভ্যস্ত বলে খ্যাতি ছিল। অতএব এ দৃশ্য দেখার আগ্রহ আমারও ছিল।

সুলতান স্বয়ং এ দৃশ্য দেখতে এলেন। চিতায় আগুন দেয়া হলো। সিদি মওলা ও তার অনুসারীদের চিতার দিকে ঠেলে দেয়া হলে সুলতান কিছুটা বিচলিত হলেন। উলেমাদের ডেকে তিনি জানতে চাইলেন তিনি আগুন দিয়ে যে পরীক্ষা করতে চাইছেন তা ধর্মসিদ্ধ কিনা। উলেমারা মাথা নাড়লেন, আগুনের ধর্মই হচ্ছে জ্বালানো। সুলতান তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে প্রাসাদে ফিরে এলেন। সিদি মওলাকে আবার কোতোয়ালীতে নেয়া হলো। সুলতান রাগতভাবে কোতোয়ালকে বললেন, তোমরা যদি কথা বলাতে না পারো, তাহলে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তার পাপ মুখ খুলতে বাধ্য করবো।

রাম দুলারীর আপত্তি সত্ত্বেও আমি অন্যান্য কেরানীর সাথে 'শহর-ই-নাও' অর্থাৎ নতুন শহরে গেলাম। শহরটি হাজার স্তম্ভের প্রাসাদ 'কসর-ই-হাজার'-এর কাছেই গড়ে তোলা হচ্ছে। সিদি মওলা ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের ইতিমধ্যে সেখানে হাজির করা হয়েছে। সুলতানের চেহারায় ক্রোধ স্পষ্ট। তিনি বললেন, "তোমরা অপরাধ স্বীকার করো। তা না হলে তোমার জিভ খুলে ফেলবো।' স্বীকার করলেও তার মাথা কেটে ফেলা হবে।

তিনি নির্দেশ দিলেন, 'বদমাশটাকে আমার কাছে আনো।' সিদি মওলাকে সুলতানের নিকটবর্তী করা হলো। বৃদ্ধ সুলতান মসনদ থেকে নেমে এলেন, 'শয়তানের বাচ্চা। তুই নিজেকে সাধু বলে রাজকার্যে নাক গলাতে আসিস।' সুলতান সজোরে দরবেশের গালে চপেটাঘাত করলেন। সিদির ভাবান্তর বুঝা গেল না। যদিও তার মুখে প্রহারের কালো দাগ এবং মুখ ফুলে যাওয়ায় চোখ দু'টি প্রায় বন্ধ, তবুও তার গোঁফের দুই প্রান্ত খাড়া এবং তেজ পূর্ববৎ। সুলতান তাকে আবার আঘাত করে বললেন, 'কথা বল শয়তান।' সিদি এবার মুখ খুললো, পরিষ্কার ও উচ্চ কণ্ঠে বললো, "জালালউদ্দিন, আল্লাহর দরবেশ সিদি মওলার কথা শোন।" সিদি যেন তার ক্রীতদাসের সাথে কথা বলছে, "আল্লাহ তার বান্দাকে আঘাত করার অপরাধে তোমাকে শাস্তি দেবেন। তোমার বংশের লোকের হাতেই তুমি নিহত হবে।" সহসা সিদি মওলা তার রক্ত ও কফ মিশ্রিত থুথু ছুড়ে দিলো সুলতানের মুখে। মুখ ও তার শ্বেত শুভ্র দাড়িতে তা একাকার হয়ে গেল।

সুলতান ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে চীৎকার করলেন, "মুজি (কাজী প্রহরী), হারামজাদা, শুয়োরের

বাচ্চা।" ওমরাহদের দিকে তাকিয়ে তাদের গালি দিলেন, "কাপুরুষের দল, তোমরা সব তোমাদের শাসককে কুকুরের মতো অপমানিত হওয়ার তামাশা দেখছো।" সিদি মওলার বিরুদ্ধবাদী একদল দরবেশ দরবারে উপস্থিত ছিল। তারা সিদি মওলার উপর চড়াও হলো এবং একটি রক্তপিন্ডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আঘাতের পর আঘাত হানলো। তারা তাকে টেনে বাইরে এনে ফেললো একটি বস্তার মত। সিদি তখন জ্যান্ত কি মৃত- আমি জানি না। এরপর একটি হাতী আনা হলো সিদি মওলার মাথা গুড়িয়ে দেয়ার জন্য। হাতীর পায়ের চাপে তার মাথা নারকেল ফাটার মত সশব্দে ফেটে গেল। রক্ত ও মাখনের মত ঘিলু ছড়িয়ে পড়লো। আমার হাঁটু বেঁকে গেছে। আমার কাঁপুনি কিছুতেই থামছে না। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম এবং প্রার্থনা করতে শুরু করলাম। স্বাভাবিক হতে আমার একটি ঘন্টা লেগে গেল। বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করলো বাড়ি যেতে।

কি ভয়ঙ্কর একটি দিন কাটলো। সিদি মওলাকে যখন 'শহর-ই-নও' এ নেয়া হয় তখন ছিল উজ্জ্বল সূর্যস্নাত সকাল। তার মৃত্যুর সাথে সাথে আকাশ কয়লার মত কালো রং ধারণ করলো। বিপুল পঙ্গপালের মেঘ নগরীর উপর আপতিত হলো। প্রতিটি গাছ ও ঝোপ ছেয়ে গেল উড়ন্ত পঙ্গপালে। মুহূর্তের মধ্যে বৃক্ষ পত্রহীন হলো এবং ঝোপগুলো যেন শুকিয়ে গেল। এরপর শুরু হলো ধূলি ঝড়। এমন দুর্যোগ আগে কখনো দেখিনি। যেন কালো হাতীর পাল দেয়াল ভাঙ্গছে। গাছ উপড়ে ফেলছে। বালির তোড়ে মানুষ, পশু অন্ধ হয়ে গেল। পরিবেশ এতো অন্ধকার যে কখন সূর্য ডুবেছে কেউ বলতে পারে না। রাম দুলারী বললো, "এসব হচ্ছে সিদি মওলার অভিশাপে।"

সিদি মওলা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা ফলে গেল। সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ তার নিজ ভাতিজা ও জামাতা আলাউদ্দিন খিলজীর হাতে নিহত হলেন। আমি জানি না মৃত সুলতান দোজখের আগুনে জ্বলছেন কিনা, কিন্তু দোজখের যন্ত্রণা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ দিল্লীকে জ্বলন্ত চুল্লীতে পরিণত করলো। সূর্যতাপ এতো প্রচন্ড যে প্রতিদিন বিশ থেকে ত্রিশজন লোক মারা পড়তো। বৃষ্টির লেশমাত্র ছিল না। কূপগুলো শুকিয়ে গেল। তৃষ্ণায় গো মহিষ মরতে লাগলো। ফসল পুড়ে গেল। বাজারে আটা, চাল ও ডাল নেই। খাদ্য সামগ্রী দূর গ্রাম হতে সংগ্রহ করতে হতো উচ্চমূল্যে। নগরী পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভিখারীতে এবং তারা রাস্তায় মরে পড়ে থাকতো। হিন্দুরা তাদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করতো। মুসলমানরা আল্লাহর কাছে অনুগ্রহ চাইতো। আমরা খাজা সাহেবের ফিরে আসার জন্য প্রার্থনা করতাম।

আমাদের প্রার্থনার সুফল পাওয়া গেল। পাঞ্জাব প্রত্যাগত একজন দরবেশ একদিন সকালে জানালেন যে, খাজা সাহেব মেহরুলি থেকে মাত্র দু'দিনের দূরত্বে আছেন। সেদিন বিকেলে লোকজন কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাজারে জড়ো হয়ে তার সম্বর্ধনার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করলো।

সেই মহাদিবসে নাগরিকবৃন্দ নগরীর প্রবেশপথে সমবেত হলো খাজা সাহেবকে অভ্যর্থনা জানাতে।

খাজা সাহেব ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তিনি খালি পায়ে উত্তাপের মধ্যে, ধূলিময় রাস্তায় হাজার ক্রোশের বেশি পথ অতিক্রম করেছেন। তার চেহারায় ক্লান্তি স্বাভাবিক। তবু তার মুখে অমলিন হাসি এবং সবার জন্য শুভ কামনা। উৎফুল্ল মানুষের ভিড় থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য দরবেশরা বেষ্টনী তৈরী করলো। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বাজারে 'খোশ আমদেদ' লিখিত তোরণ তৈরী করা হয়েছে। ছাদের উপর থেকে নারীরা তার উপর গোলাপের পাঁপড়ি বর্ষণ করছে। মালা পরিয়ে দিচ্ছে অনেক লোক। কাওয়াল দলের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান বাজার হয়ে তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাজারে। খাজা সাহেব তাকে একাকী ছেড়ে দেয়ার জন্য সকলের কাছে আবেদন করলেন। এরপর আউলিয়া মসজিদের ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা আটকে দিলেন।

রাতে আমরা মেঘের গর্জন শুনলাম। বর্ষাকালেও মেহরুলিতে এক ফোটা বৃষ্টি পড়ে না, এই জেলায় ভারী বর্ষণ হয়ে গেল। অবিশ্বাসীদের মুখে গোবর ঠেসে দেয়া হোক।

পরবর্তী বৃহস্পতিবার আমি কমল ও রাম দুলারীকে নিয়ে খাজা সাহেবের দর্শনের উদ্দেশ্যে গেলাম। গিয়াসপুরে এর আগে এতো ভিড় দেখিনি। দিনটি ছিল উত্তপ্ত এবং আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। খাজা সাহেবের বাণী বেহেশতের পার্বত্য ঝর্ণার পানির মতো শীতল পরিবেশ এনে দিতো, "পৃথিবীতে আল্লাহ মাত্র একজন, যদিও আমরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকি। তার কাছে পৌছার অসংখ্য পথ আছে। যে পথকে একজন নিজের জন্য উত্তম বিবেচনা করে সে পথেই সে অগ্রসর হোক। তার পথ মসজিদে নিতে পারে তাকে, প্রতিমায় পরিপূর্ণ মন্দিরে কিংবা নির্জন পর্বত গুহায় নিতে পারে। কোন্ পথ তুমি বেছে নিলে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তোমার আচরণ। তোমার হৃদয়ে যদি কোন ভালোবাসা না থাকে তাহলে উত্তম পথও তোমাকে মন্দ দিকে নিয়ে যাবে।"

তিনি হযরত মূসার জীবনের একটি ঘটনা আমাদের বলতেন। হযরত মূসা একজন দরিদ্র মেষপালককে প্রার্থনা করতে শুনলেন, 'তুমি কোথায় যে আমি তোমার সেবা করবো, আমি তোমার জন্য জুতা তৈরী করবো, চুল আঁচড়ে দেব এবং আমার মেষের দুধ দেব।' আল্লাহর প্রতি এ ধরনের বক্তব্যে মূসা মেষপালককে ধমক দিলেন। আল্লাহও এর ফলে মূসাকে ধমক দিলেন, 'তুমি আমার এক সত্যিকার বান্দাকে তাড়িয়ে দিলে।' এরপর হযরত মূসার কাছেই আল্লাহ ধর্মের মূলকথা বলেছিলেন, 'যখন আমি অসুস্থ ছিলাম তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন আমাকে খাবার দাওনি।' মূসা বলেছিলেন, 'হে আমার রব, আপনিও কি অসুস্থ ও ক্ষুধার্ত হতে পারেন?' উত্তরে আল্লাহ বলেন, 'আমার অমুক-অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল, আমার অমুক-অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল। তুমি যদি একজনকে দেখতে যেতে এবং আরেক জনকে খাবার দিতে তাহলে আমাকে তাদের সাথেই দেখতে।' খাজা সাহেব আমাদেরকে কিছু সূফী বাণী মুখস্থ করতে বলতেন,

"জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে?
একজন, যিনি পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেন।
সকল দরবেশের দরবেশ কে?
যিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও বদলাতে রাজী নন।
ধনবানদের মধ্যে ধনী কে?
যিনি পরিতৃপ্ত।
কার চাহিদার পরিসমাপ্তি নেই?
যার কোন পরিতৃপ্তি নেই।"

কিভাবে পরিতৃপ্ত হতে হয়? নিজেকে প্রশ্ন করতাম। নিজের মনকে যে প্রশ্ন করেছি ,খাজা সাহেব তাও শুনতে পেয়েছেন। তিনি বললেন, 'তোমার চাহিদা ন্যূনতম পর্যায়ে হ্রাস করো এবং নফসকে জয় করো।'

তার খানকা হতে বের হয়ে দেখি সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। আমার কোলে কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। এক্কাওয়ালারা মেহরুলিতে ফিরে যাওয়ার জন্য চিৎকার করছে। তখন আসলেই বিপদজনক সময়। আমাদেরকে জাঠ ও গুজ্জার অধ্যুসিত গ্রামের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এরা ভয়ংকর ডাকাত। আমরা দশ বারোটি এক্কার একটি দল গঠন করলাম। দু'পাশে তরবারি ও বর্শাধারী দুই ডজন লোক। কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ছাড়াই আমরা মেহরুলিতে পৌছলাম।

একটা দীর্ঘদিন কাটলো। কমলকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। রাম দুলারী আমাকে এক গ্লাস দুধ এনে দিলো। শোয়ার আগে দুধ পান করা আমার অভ্যাস। আমি তাকে আমার কোলে টেনে নিলাম। সে প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, সারাটা দিন তোমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণের জন্য বাণী শুনলে। কিন্তু অন্ধকার হওয়া মাত্র তুমি এই করতে চাও।'

'আরে, তুমি কেমন পাজী! সারাদিন তুমি প্রেম সম্পর্কে বাণী শুনলে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই যা শুনেছ সব ভুলে গেলে।'

'খাজা সাহেব এই রকম প্রেমের কথা বলেননি। তিনি কি বারবার একথা বলেননি যে, তোমরা যদি ইশ্বরের কাছে পৌছতে চাও তাহলে তোমাকে প্রথমেই নিজের বাসনাকে জয় করতে হবে। এভাবেই বুঝি তুমি নফসকে জয় করবে? এভাবে তুমি ইশ্বরের নৈকট্য অর্জন করতে পারবে না।'

'প্রথমে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন হোক। এরপর আমরা বিধাতার সাথে মিলনের কথা ভাববো।' আমি উত্তর দেই।

এভাবে দিন কাটে। আমাদের কোতোয়াল বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আর কাজ চালাতে পারেন না। তাকে অবসর নিয়ে মক্কায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। তার জামাতা কোতোয়াল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলো। নতুন কোতোয়াল অত্যন্ত সংকীর্ণমনা। তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু কথাবার্তা বলতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর প্রিয়পাত্রে পরিণত হলেন তিনি। আলাউদ্দিন খিলজী দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যগুলো প্রায় কব্জায় এনে ফেলেছেন। তার সেনাপতি মালিক কাফুর তার রাজত্বের সীমানা সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সাথে নিয়ে এলেন হাজার হাজার দাস, শত শত হাতী, উট ও গরু গাড়ি বোঝাই স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথর। হিন্দুদের প্রতি নিগ্রহ হলো। 'তরবারির বিজয় ক্ষণস্থায়ী' মর্মে খাজা সাহেবের উপদেশের প্রতি সুলতান কর্ণপাত করলেন না।

পরিবেশ এতোটা পাল্টে গেল যে, আমার মতো হিন্দু, যে মুসলিম রীতি গ্রহণ করেছে, তার জীবনও দুর্বিসহ হয়ে উঠলো। আমি আমার কাজ করে যেতাম, বেতন তুলতাম এবং মুখ বন্ধ করে রাখতাম। মুসলমানদের কেউ আমাকে খোঁচালে আমি গিয়াসপুরে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী 'সিকান্দার-ই-সানী' (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) উপাধি ধারণ করে দিল্লীকে ঘোষণা করলেন 'দারুল খলিফা' হিসেবে, যিনি মঙ্গোল আক্রমণকারীদের পরাভূত করেছেন। তিনি নতুন নগরী 'শিরি' গড়ে তুললেন এবং 'হাউজ-ই-আলাই'-এর পাশে এক বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। এছাড়া তিনি কুতুব মিনারের দ্বিগুণ উচ্চতাবিশিষ্ট আরেকটি বিজয় মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। এই মহান বীরও খাজা সাহেবের সামনে চোখ তুলে কথা বলতে সাহস করতেন না। একবার তিনি গিয়াসপুরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে খাজা সাহেব বলেছিলেন, "রাজ রাজড়াদের সঙ্গে আমাদের করণীয় কিছুই নেই। আমার খানকার দু'টি দরজা আছে। সুলতান এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে আমি অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবো।"

একদিন আমি কোতোয়ালীতে খাজা সাহেবের প্রশংসাসূচক গান গাইছিলাম। একজন কেরানী, যার জিহবায় শুধু বিরূপ সমালোচনা, সে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলো, "তোমার মত অপলোকের ব্যাপারে কে কি বলতে পারে। যে যতই বলুক তা কিছুতেই পর্যাপ্ত হবে না। একদিকে তুমি কায়স্থ মুসাদ্দি লাল, অন্যদিকে শেখ আবদুল্লাহ। কাউকে তুমি 'রাম রাম' বলে শুভেচ্ছা জানাও। আবার কাউকে সালাম দাও। মুসলমানদের সাথে তুমি কাবার দিকে নত হও। হিন্দুদের সাথে তুমি শিব লিঙ্গ চুম্বন করো। তুমি কোতোয়ালীতে একজন চাকুরে, খানকায় দরবেশ, এক পা মাজারে, আরেক পা তোমার রমণীর খাটিয়ায়। তুমি দুই পৃথিবীর উত্তমগুলোই ভোগ করছো। তোমাকে কেউ প্রশংসা করলে তা পর্যাপ্ত হবে না।"

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি আর কোতোয়ালীতে ফিরে গেলাম না। বাড়ির চত্বরে খাটিয়া বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ধূসর আকাশের পানে তাকিয়ে কেরাণীর কথাগুলো স্মরণ করছিলাম। যদি আমার ক্ষমতায় কুলাতো তাহলে তাকে আমি বাজারে নিয়ে পাজামা খুলে নিয়ে লোকদের বলতাম তার পশ্চাদ্দেশে থুথু দিতে।

রাম দুলারী আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

'কিছুই না।'

'তুমি ঠিক বলছো না। কিছু ঘটেছে এবং তোমার মুখ দেখে তা বুঝতে পারছি। আমাকে বলছো না কেন?'

আমি তাকে খুলে বললাম। সে শান্তভাবে শুনলো। আমার কথা শেষ হলে সে দেয়ালের দিকে তাকালো, আমি আকাশ পানে। তাকে বললাম, 'আমাদের মত আরো অনেকে আছে। আবদুল হাসান নামে একজন কবি আছেন যিনি নিজেকে 'সুলতানী' ও 'আমীর খসরু' বলে

ভাবেন। তার বাবা মুসলিম, মা হিন্দু। হিন্দুদের জন্য তিনি হিন্দিতে লিখেন এবং মুসলমানদের জন্য ফারসীতে। ভারতবাসীর জন্য ভারতের সবকিছুর প্রশংসা করে লিখেন এবং মুসলমানদের জন্য মুসলিম দেশের সবকিছুর প্রশংসা করেন। তিনি সুলতান এবং খাজা সাহেবকে তোষামোদ করেন। উভয়েরই প্রিয়পাত্র তিনি। ওমরাহদের প্রশংসাসূচক কবিতা লিখে তিনি বহু অর্থ আদায় করেন। তিনি আবার দরবেশ হওয়ার ভানও করেন। তিনি মুসলমান বলে কেউ তার সম্পর্কে কিছু বলতে সাহস করে না। আমাদের মত দরিদ্র হিন্দু যারা মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের বন্ধুত্ব কামনা করে তাদের প্রতি উভয়েই থুথু ছিটায়। আমরা হিন্দু নই, মুসলমানও নই। আমাদের সাথে তাদের আচরণ এমন যেন আমরা 'হিজড়া'।

রাম দুলারী রেগে বলে, 'আমাদের শত্রুরাই হিজড়া। তুমি আবদুল হাসান না খসরু কি নাম বললে তার সাথে কথা বলে তার উপদেশ নাও।'

'লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। সে খুব চতুর লোক।'

'তুমি ভালোভাবে কথা বললে, তিনি তোমার বন্ধুও হতে পারেন।'

'আরে, তুমি খুব বোকা। দুনিয়ার রীতিনীতির কিছুই তুমি জানো না। চতুর লোকরা শুধু পছন্দ করে তাদের তোষামোদকারীদের। খসরু ধনবান ব্যক্তি এবং চতুর। আমি তার কাছে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই। তাছাড়া তার কৃপা লাভের জন্য আমি সময় নষ্ট করবো না।'

যাহোক, পরদিন গিয়াসপুরে গিয়ে আমি সরাসরি আবদুস হাসান আমীর খসরুর কাছে গেলাম। বরাবরের মতো তিনি তোষামোদকারী পরিবেষ্টিত ছিলেন। বরাবরের মত তার কণ্ঠই শোনা যাচ্ছিল। আমাকে দেখেই তিনি একটা কাঁটা ছুঁড়ে দিলেন, 'লালা মুসাদ্দি লাল ওরফে আবদুল্লাহ আমাদের মাঝে শুভাগমন করেছেন।' আমি তার পানে না তাকিয়ে অন্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম। তার বন্ধু, আরেক কবি আমীর হাসান দেহলভী যথেষ্ট অমায়িক। তিনি বললেন, 'ভাই আবদুল্লাহ, তোমার দিনকাল কেমন কাটছে?' বসতে বসতে উত্তর দিলাম, 'আল-হামদুলিল্লাহ।'

খসরু বুঝতে পারলেন যে, আমি রুখে দাঁড়িয়েছি এবং সামলে উঠতে চেষ্টা করলেন। বললেন, 'ভাই আবদুল্লাহ, তোমার জন্যে হিন্দীতে একটি নতুন ধাঁধা তৈরী করেছি,

"মাথা কাটলাম কুড়িটির
কারো জীবন গেল না
রক্তও ঝরলো না"

আমি আসার পূর্বে নিশ্চয়ই তিনি অন্যদেরকেও ধাঁধাঁর জবাব দিতে বলেছেন। তারা সুর করে বললো, 'এটা খুব চমৎকার ধাঁধা।' আমি এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝলাম না। খসরু ব্যঙ্গ করে বললেন, 'আহম্মক। ধাঁধাঁর মধ্যেই জবাব দেয়া আছে। এটা হচ্ছে 'নখ'। তুমি কি দেখ না যে নখ কাটলে রক্ত বেরোয় না। খসরুর ধাঁধাঁর জবাব দিতে তোমার মাথায় ঘিলু থাকা চাই।'

আমিও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'আল্লাহ আপনাকে জ্ঞান দিয়েছেন, ঈশ্বর আমাকে দান করেছেন মার্জিত আচরণ।' খসরু তার সুর পাল্টালেন। তিনি এরকমই। এই মুহূর্তে উত্তপ্ত, আবার পর মুহূর্তেই শীতল। তিনি বললেন, 'আমার কথাকে খারাপভাবে নিও না। আমরা তো ধর্ম ভাই। ঠিক আছে, এটা চেষ্টা করো,

"সারাটা রাত সে আমার সাথে কাটালো
ভোর হতেই সে চলে গেল
তার বিদায়ে হৃদয় ভেঙ্গে গেল
হে বন্ধু, সে কি আমার প্রেমিক
না বন্ধু, এ হচ্ছে....।"

'এ হচ্ছে...? এ হচ্ছে...?' খসরু তুড়ি বাজিয়ে আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন।

সৌভাগ্যবশতঃ একজন একটি উত্তর দিলো। 'না বন্ধু, এ হচ্ছে বাতি।' খসরু একটার পর একটা ধাঁধাঁ তৈরী করতে লাগলেন। একজন তোষামোদকারী বললো, 'ভাই সাহেব, ভবিষ্যদ্বাণী তো আছে যে, আপনি ইরানের 'খাকানীর' চাইতে বড় কবি হবেন এবং তা পূরণ হবে। খসরু অস্বীকার করলেন না। বললেন, 'তবু আমি খাজা সাহেবের পায়ের ধূলির তুল্য। মহান নিজামুদ্দিন আমাকে যদি 'তুত-ই-হিন্দ' (হিন্দুস্থানের তোতা) খেতাব দেন এবং হিন্দুস্থানের শেখ সাদী বলে ডাকেন তাহলে পৃথিবীতে আর কার ক্ষমতা আছে যে আমাকে সর্বকালের সেরা কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হতে বাধা দেয়। খাজা সাহেবের রশ্মিই আমাকে আলোকিত করেছে।'

এই বাগাড়ম্বরের মধ্যে কে কি বলতে পারে। এ কথা সত্য যে, যখন কেউ সাফল্য অর্জন করে তাহলে লোকজন তাকে অন্যের সাথে তুলনা করতে শুরু করে এবং তার মধ্যে নতুন মেধার সন্ধান করতে চেষ্টা করে। খসরু সম্পর্কেও তাই হচ্ছে। একজন যদি বলে যে, খসরু বিরাট কবি, অন্যজন বলবে, খসরু মহান সঙ্গীত শিল্পী। তৃতীয়জন বলবে, খসরু একজন মহান নেতা। চতুর্থজন বলবে খসরু সবচেয়ে বড় যোদ্ধা। নিজের সম্পর্কে গল্প ছড়ানোর শিল্পে খসরু অদ্বিতীয়। মুসলমানদের মধ্যে এটা অনেকটা রেওয়াজ, বিশেষতঃ তারা পশ্চিম দেশ হতে আসার কারণে তার উল্লেখ করে থাকে। খসরু আমার চাইতে কালো হওয়া সত্ত্বেও তুরস্ককে নিজের দেশ বলে চালাতেন। কাব্যে তিনি নিজের সম্পর্কে যা বলতেন তাতে তার জন্মের মহত্ব, ক্ষমতা ও সম্পদের কথা থাকতো। প্রথমে তিনি ছিলেন সুলতানী। যখন খসরু হলেন, তখন যোগ করলেন আমীর। আল্লাহ তাকে ঘিলু ও মেধা দিয়েছেন। কিন্তু তার মেজাজের কাছে সবকিছু হার মানে। যে দাম্ভিক নিজেকে শেখ সাদীর সাথে তুলনা করেছে সে নিশ্চয়ই পাঠ করেনি তাদের সম্পর্কে, যারা নিজেদের প্রশংসা করে,

"যে ব্যক্তি নিজের জিহবা ব্যবহার করে আত্ম-প্রশংসায়
তাকে কি কখনো জ্ঞানী বলা যায়;
একজন নারীর পক্ষে কি পরিতৃপ্তি সম্ভব
যদি সে নিজ হাতে নিজের স্তন মর্দন করে?"

খাজা সাহেব আবির্ভূত হতেই খসরুর মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। ঠিক অভিনেতাদের মুখোশ পরিবর্তনের মতো। এক দৃশ্যে গোঁফের প্রান্ত থাকে সুউচ্চ ও গর্বিত। অপর দৃশ্যে তা ঝুলে থাকে নিপীড়িতের মতো। ক্ষিপ্ত বক্তা মুহূর্তে পরিণত হলো পিরহানের প্রান্তভাগ চুম্বনকারী ও অশ্রু বিসর্জনকারী হিসেবে এবং সেখানে উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে খাজা সাহেব একমাত্র তার মাথায়ই হাত রেখে প্রশ্ন করেন, 'আব্দুল হাসান, সব খবর ভালো তো?'

মেহরুলিতে যখন ফিরে আসছিলাম তখন আমার মনে খসরু সম্পর্কে অনেক রাগ জমা হয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব যে, অন্য কেউ এই লোকটির দু'মুখো ভূমিকা দেখতে পায় না? তিনি অসংখ্য মনিবের সেবা করেছেন। কেউ যদি জানে যে, কখন অস্তমান সূর্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে উদীয়মান সূর্যের প্রার্থনা শুরু করতে হবে, তাহলে সেটি আমীর খসরু। তিনি প্রথমে সুলতান বলবনের ভাতিজা মালিক চাজ্জুর সাথে ছিলেন। কিভাবে চাজ্জুর সাথে তিনি প্রতারণা করেছেন? এরপর সুলতানের কনিষ্ঠ পুত্রের সাথে জড়িত হয়ে মালিক চাজ্জুর নিন্দা শুরু করেন। তিনি অযোধ্যার শাসকের অধীনেও চাটুকার ছিলেন। শাসক বংশে যখন অর্ধেক হিন্দু ব্যক্তির আবির্ভাব হলো, তখন খসরু তার শিরায় হিন্দু রক্তের বিদ্যমানতার কথা প্রচার করে হিন্দুস্থানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন। তিনি হিন্দুস্থানের পানপাতা ও কলা এবং দাবা খেলোয়াড় ও সঙ্গীত শিল্পীদের প্রশংসা করতেন। ক্ষমতায় যখন মুসলিম শাসক তখন একই আমীর খসরু উচ্চকণ্ঠে বলতেন, 'হিন্দুদের মানুষ বলে গণ্য করো না। কারণ তারা গরুকে পূজা করে। টিয়ার চাইতে কাককে সেরা মনে করে এবং মন্ত্রপাঠ করে গাধার আওয়াজে।' তার মতে, ভারত যে পৃথিবীর সেরা একটি দেশ তা খসরুর কারণে। আমি মনে মনে বলি, খসরু একজন ধূর্ত চাটুকার। তার পিছনে আমার সময় কেন ব্যয় করবো। আমার এক্কা যখন আউলিয়া মসজিদের পাশে দাঁড়ালো, খসরুর সাথে সমঝোতা করলাম, আমার কাছে সে একজন সফল জোকার, ভাঁড়।

রাম দুলারী আমার পদশব্দ শুনে দরজা খুললো। কমল ঘুমিয়ে পড়েছে। সে দুধ গরম করে আমাকে দিয়ে পাশে বসলো। গিয়াসপুরে কি ঘটেছে তাকে বললাম। আমি নখের ধাঁধাঁটিও বললাম, 'সারা রাত কাটিয়ে ভোরে চলে যাওয়া'। সে আমার পেটে খোঁচা দিল, 'এটা ছাড়া তোমার মনে কি আর কিছু নেই?' আমি তার হাত তুলে নিলাম। বোকা মেয়ে, যা ভাবছো তা নয়, এর উত্তর হচ্ছে বাতি, প্রদীপ।'

সে উঠে প্রদীপ নিভিয়ে দিলো।

বছর গড়িয়ে চললো। আমরা শত সহস্রবার মিলনের পরমানন্দ উপভোগ করলাম। রামদুলারীর গর্ভে আমার বীর্যের অব্যাহত প্রবাহ সত্ত্বেও তা কোন ফল প্রসব করলো না। আমার মাথার চুল উঠতে উঠতে প্রথমে হালকা হলো এবং পরে সব চুলই উঠে গেল। আমার ডান চোখ ধূসর হতে লাগলো। হাকিমের ওষুধপত্র আমার চোখের ছানিপড়া বন্ধ করতে পারলো না। ক্রমশঃ তা বাম চোখেও প্রভাব ফেললো। রাম দুলারীর চুলও পাকতে শুরু করেছে। রজঃস্বলা বন্ধ হওয়ার পর থেকে সে মেদবহুল হয়ে উঠলো। বিছানা থেকে উঠে বসতে তাকে বিশ্রাম নিতে হতো। মাঝে মাঝে আমরা একই খাটিয়ায় শুয়ে থাকতাম। আমরা একে অন্যের অঙ্গ চুম্বন করতাম। আমরা এক সময় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ঈশ্বর আমাদের যথেষ্ট দিয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, ধর্মকাজে মনোনিবেশ করা। কমল এখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। হাউজ-ই-আলাই-এর মাদ্রাসায় সে তুর্কী ও ফারসী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করেছে। কোতোয়ালীতে আমার পদে কমলকে নিয়োগ করার জন্য আমি কোতোয়ালের কাছে সুপারিশ করলাম এবং ১১টি সুবর্ণ মুদ্রা নজরানা দিলাম। রাম দুলারী একটি কায়স্থ পরিবার হতে কমলের জন্য স্ত্রী সংগ্রহ করলো। এই পরিবারটিও যোগমায়ার মন্দির ও গিয়াসপুরের খানকার সাথে যোগাযোগ রাখতো। কমল ও তার স্ত্রী যেভাবে চলতো তাতে আমরা আশ্বস্ত হলাম যে, আমাদের জীবনাবসানেও কায়স্থদের সঙ্গে সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটবে না।

মেহরুলিতে আমাদের নিজ বাড়ির চেয়ে আমরা গিয়াসপুরে খাজা সাহেবের খানকায় অধিক সময় কাটাতে শুরু করলাম। এরপর আমরা গিয়াসপুরেই ঘর ভাড়া করে বসবাস করতে লাগলাম। আমরা মেহরুলিতে যেতাম ছেলে ও তার স্ত্রীকে দেখার জন্য। তাও মাসে একবার। কমল তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে যেতো।

আমরা প্রতিদিন খাজা সাহেবের দর্শন লাভের সুযোগ পেতাম। খসরুকে পূর্বের চাইতে অধিক সময় সেখানে দেখা যেতো। বয়সের ভারে তার দাঁত পড়েছে এবং জিহ্বায়ও জড়তা এসেছে। তিনি এখন বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছেন এবং রাম দুলারীকে ভাবী বলে ডাকতে শুরু করেছেন। আমিও তার বন্ধুত্বে সাড়া দিয়েছি এবং উভয়ে উভয়ের বাড়িতে বেড়াতে যেতাম।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষের আর কি আকাংখা থাকে? শান্তি, প্রার্থনা, নিরাপত্তা, বন্ধু-বান্ধব সবই হয়েছে বিশাল বটবৃক্ষ মাহবুবে ইলাহী খাজা সাহেবের ছত্রছায়ায়। আমরা পৃথিবীর কোন অংশ না হয়েও পৃথিবীতে আছি। আমরা সেইসব লোকের মত যারা কোন কিছু খরিদ না করে বাজারে ঘোরাফেরা করে।

আমাদের পবিত্র স্থানে পার্থিব কিছু অনুপ্রবেশ করতো না। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মৃত্যুর ঘটনা আমার মনে পড়ে। প্রথমে আমি শুনেছিলাম যে ঘুমের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে এবং তার ক্রীতদাস মালিক কাফুর যাকে তিনি সেনাপতি পদে উন্নীত করেছিলেন, তিনি প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ওমরাহদের দ্বারা উত্তরাধিকার মনোনয়ন করা পর্যন্ত মালিক কাফুরই দায়িত্বে থাকবেন। এরপর শুনলাম, কাফুর তার প্রভুর জ্যেষ্ঠা বিবিকে গ্রহণ করে সুলতানের দুই পুত্রের চক্ষু উৎপাটন করেছেন এবং আরো অনেককে হত্যা করেছেন। খাজা সাহেব যিনি সুলতানদের আগমন ও নির্গমনের ধার ধারতেন না, তিনি দু'হাতে কান বন্ধ করে উচ্চারণ করলেন, 'তওবা'। আমীর খসরু যিনি প্রতিটি শাসনামলে মিথ্যা কাহিনী তৈরী করেন, তিনিও মালিক কাফুর সম্পর্কে একটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে গিয়াসপুরের সমাবেশে আবৃত্তি করলেন। আমরা জানতাম, খাজা সাহেব কারো বিরুদ্ধে কিছু বললে, তার কপালে শাস্তি অবধারিত। প্রাসাদের ভৃত্যরা মালিক কাফুরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো এবং তার পঙ্কিল রক্তে তাদের ছুরির তৃষ্ণা মেটালো।

কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ পরবর্তী সুলতান হলেন। তিনি খাজা সাহেবকে পছন্দ করতেন না। সুলতানের হৃদয়ে প্রতিশোধের স্পৃহা ও ঘৃণার ছাই উড়াতে চাটুকাররা বিলম্ব করলো না। তারা বললো, 'নিজামুদ্দিন লোকদের বলে বেড়ায় যে, সে কাউকে একটি কানাকড়িও দেয় না। রাজ আজ্ঞাকে সে প্রত্যাখ্যান করে প্রজাদের কাছে মহান সুলতানের মর্যাদাকে খাটো করার জন্য। (খাজা সাহেব শুক্রবারের জু'মার জামাতে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে উপস্থিত হতেন না বলে এই অভিযোগ)। আপনার ও খসরু খানের ব্যাপারে সে সকল প্রকার গুজব ছড়ায়।'

কে এই খসরু খান?

গুজরাট অভিযানের সময় গ্রেফতারকৃত এক হিন্দু পাওয়ার গোত্রীয় বালক। গুজরাটের লোকজন দেখতে সুন্দর; কিন্তু মেয়েলি ধরণের। গুজরাটীদের মধ্যে আবার পাওয়াররা আরো সুন্দর এবং একই সময়ে মেয়েদের মতো। আমি কখনো, বালকটিকে দেখিনি। বলা হতো, সে অত্যন্ত সুন্দর, হরিণের মতো টানা চোখ তার, বাঁকানো ভুরু এবং নারীদের মত গুরু নিতম্বের অধিকারী। সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ বিকৃত যৌন রুচির লোক ছিলেন। তার হেরেমে তুরস্ক, ইরান ও হিন্দুস্থানের সুন্দরী শ্রেষ্ঠাদের সমারোহ ছিল। কিন্তু তিনি বিকৃত উপায়ে তার যৌন ক্ষুধা মেটাতেন। গুজরাটী বালককে দেখা মাত্র সুলতান তার প্রেমে মশগুল হলেন। বালকটি তার ঠোঁট রাঙাত এবং কালো চোখে কাজল দিয়ে নিজেকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতো। উভয়ে একই পাত্রের মদ্যপান করতো এবং বিকৃত প্রণয় বাসনা চরিতার্থ করতো। সুলতানের এহেন কর্মকান্ডের খবর লোকজনের কানে আসা মাত্র এর সাথে আরো মশল্লা যোগ হতো।

সুলতানের কর্মকান্ডে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা বেশি বিব্রত ও বিচলিত হলো। তারা বলতো, এটা তুর্কীদের জন্য অবমাননা। কি করে তাদের পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব যে, একজন পুরুষোত্তম তুর্কী একজন বিধর্মীর উপর উপগত হবে, ঘোড়া যেমন গাধার উপর হয়। সুলতানের ধারণা হলো, মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ, তার প্রেমিক একজন হিন্দু। তিনি বালককে ধর্মান্তরিত করে মুসলিম নাম দিলেন খসরু খান। উভয়ে মধ্যপান করে, মাতাল হয়ে ধর্মান্তকরণের উপলক্ষ পালন করলো। বাজারে গুজরাটি ঘোড়া ও তুর্কী গাধার মিলন সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়া কথাবার্তা সুলতানের কানেও এলো। যেসব উলেমা খাজা সাহেবকে ঘৃণা করতো তারা সুলতানকে বললো যে, তার ও খসরু খান সম্পর্কে নোংরা কাহিনীর উৎস গিয়াসপুরের খানকা।

সুলতান তাদের কথায় বিশ্বাস করে গিয়াসপুরের খানকায় খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ নিষিদ্ধ করে দিলেন। গিয়াসপুরে যাতায়াতকারী লোকদের উপর দৃষ্টি রাখার জন্য একটি থানা প্রতিষ্ঠা করা হলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্নরকম। খাজা সাহেব ছিলেন সকল সুলতানের সুলতান। তিনি এক টুকরা কাগজে আল্লাহর নাম লিখে তা খানকার প্রবেশপথের উপরে সেঁটে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, লঙ্গরখানায় পাকানো খাবারের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। আল্লাহ সাক্ষী, আমাদের আটা, ডাল, লবণ, ঘি এবং অন্যান্য সামগ্রীর কোন অভাব হয়নি। ওমরাহদের খানকায় আগমণ বন্ধ হলেও দরিদ্রদের আগমণ পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এ ঘটনা সুলতানের চড়া মেজাজে উত্তপ্ত তরকারিতে আরো মরিচ ঢেলে দেয়ার মত কাজ করলো। তিনি খানকা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আল্লাহর পথ রহস্যময়। তিনি তার প্রিয় বন্ধুর দুর্দশার কথা শুনলেন এবং সুলতানকে শিক্ষা দিতে সিদ্ধান্ত নিলেন। বালকের সঙ্গে অবৈধ ও বিকৃত যৌনাচারের কুফল ছিল ভয়াবহ। রাজ পুরুষাঙ্গে ফোঁড়া উঠে প্রস্রাবের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। হাকিমরা সকল প্রকার দাওয়াই প্রয়োগ করলেন। কিন্তু ফোঁড়া সারলো না এবং এক ফোটা প্রস্রাবও নির্গত হলো না। আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাওয়াই এ কি কাজ হবে এবং মানুষ প্রস্রাব না করে কতক্ষণ বাঁচতে পারে? কয়েক ঘন্টার মধ্যে সুলতান যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে শুরু করলেন। তার মা গিয়াসপুরে এসে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন এবং ধূলি মাখতে শুরু করলেন। তিনি খাজা সাহেবের পা জাপটে ধরে তার পুত্রকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত পা ছাড়লেন না। খাজা সাহেব বললেন, 'তোমার পুত্রকে বলো ক্ষমতা ছেড়ে রাজ্য আমাদের হাতে ছেড়ে দিতে।' আমরা জানতাম, আল্লাহর প্রিয় বান্দার মনে আরো রহস্য আছে। রাজমাতা দ্রুত প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সুলতানের যন্ত্রণা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তিনি রাজী হলেন, যে মুহূর্তে

প্রস্রাব করতে পারবেন তখনই রাজ্য ছেড়ে দেবেন। খাজা সাহেব সুলতানের দূতকে বললেন, 'না, প্রথমে ক্ষমতা ছাড়ো, অতঃপর প্রস্রাব করো। নিজ হাতে ক্ষমতা ত্যাগ করার দলিল লিখে সিলমোহর করে দাও।'

সুলতান যখন ক্ষমতা ছাড়ার দলিলে সই করলেন তখন তিনি মৃত্যুর প্রান্তে। দলিলে মোহর লাগানোর সাথে সাথে বিস্ফোরিত প্রায় মূত্রথলি হতে বিষাক্ত প্রস্রাব বেরুলো এবং দ্রুত নিঃশেষিত হলো। রাজ মাতা তার পুত্রের মূত্রভর্তি পাত্র মাথায় নিয়ে খালি পায়ে প্রাসাদ থেকে গিয়াসপুর পর্যন্ত এলেন। প্রাসাদের নারীকুল, খোজা ও প্রহরীরা তার সঙ্গে ছিল। খাজা সাহেবের কাছে এসে তিনি তার পায়ের কাছে দলিল রাখলেন। খাজা সাহেব দলিল খুলে পাঠ করলেন, 'গিয়াসপুরের দরবেশ হযরত খাজা নিজামুদ্দিনের কাছে সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহ হিন্দুস্থানের শাসনভার ন্যস্ত করেছেন।' তিনি দলিলটি দুমড়ে মুচড়ে প্রস্রাবের পাত্রে নিক্ষেপ করে বললেন, 'এভাবেই দরবেশরা পার্থিব রাজত্বের মর্যাদা দেয়।'

মানুষের প্রবৃত্তি যদি খারাপ হয়, অনুশোচনা তার কাছে দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং তার জন্যে যে কল্যাণ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতাও হয় ক্ষণস্থায়ী। সুলতানের পুরুষাঙ্গ সেরে উঠা মাত্র তিনি এর অপব্যবহারে পূর্বের মতই নিয়োজিত হলেন। খাজা সাহেব ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল নিয়ে কি করেছিলেন তা যেহেতু সকলেই জানে সে কারণে তার প্রতি সুলতানের কৃতজ্ঞতা সকলেই আশা করেছিল। সুলতান একটি ফরমান জারি করলেন যে, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য নতুন চাঁদ উঠার প্রাক্কালে সকল মুসলমানকে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে হাজির হতে হবে। তিনি জানতেন যে, খাজা সাহেব মাসের এই দিনটিতে তার মরহুমা মায়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করে থাকেন। খাজা সাহেব ফরমান শুনে মায়ের কবরের কাছে গিয়ে তার নির্দেশ কামনা করলেন। প্রার্থনার পর তিনি কবরের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি বললেন যে, স্বপ্নে তিনি এক ভয়ঙ্কর ষাড় দেখেছেন তার প্রতি তেড়ে আসতে। তিনি শিং ধরে ষাড়কে ধরাশায়ী করলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য আমরা কারো সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করলাম না।

সেই অবশ্যম্ভাবী দিনটি এলো। খাজা সাহেব বিকেলের প্রার্থনা সমাবেশে স্বাভাবিকভাবেই অংশ নিলেন। পশ্চিমের ছায়া মসজিদের চত্বর অতিক্রম করলো। খাজা সাহেব আমাদের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছাদে উঠলেন চাঁদ দেখার জন্য। শহর-ই-নও এর শেষ প্রান্তে যখন সূর্য ঢলে গেল তখন আমরা ম্লান, রূপালী চাঁদ দেখলাম। খাজা সাহেব সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করলেন। দুই হাত, চোখ ও দাড়ির উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনলেন এবং একটি ফারসী কবিতা আওড়ালেন, যা মোটামুটি এ রকমঃ

"হে শৃগাল, তুমি কেন তোমার গর্তে থাকো না
সিংহের সাথে মিলিত হয়ে তুমি কেন
নিজের সর্বনাশ ডেকে আনো?"

আমরা ছাদে মুক্ত সন্ধ্যা উপভোগ করতে করতেই সূর্য এবং চাঁদ দুটোই হারিয়ে গেল। ক্ষণস্থায়ী সন্ধ্যা অন্ধকার রাতে পর্যবসিত হলো। সহসা পশ্চিম দিগন্তে আলোকশিখা জ্বলে উঠলো। আমরা অশ্বখুরের আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হচ্ছিল একটি সৈন্য দল মশাল নিয়ে আমাদের পানে এগিয়ে আসছে। তাহলে কি সুলতানের বাহিনী খাজা সাহেবকে পাকড়াও করতে আসছে? কোতোয়াল স্বয়ং হাজির হলো। তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে গ্রেফতার করতে আসেননি, বরং এই খবর জানাতে এসেছেন যে, সুলতানকে হত্যা করা হয়েছে এবং নগরীতে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে।

পরদিন সকালে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম যে কি ঘটনা ঘটেছিল। জানা গিয়েছিল যে, সুলতান ও তার বালক বন্ধু একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল যে, তারা একদিন পর পর পরস্পর বর ও কনের ভূমিকা পালন করবে। তাদের লীলা আরো পাকাপোক্ত করার জন্য তারা বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো। এক সন্ধ্যায় সুলতানের আবির্ভাব ঘটলো তুর্কী বর বেশে।

পাওয়ার বালকের সাথে বিয়ের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সুলতান তাকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলেন। এরপর চাটুকারদের বিয়ের ভোজে আপ্যায়িত করা হলো। পরদিন এই ঘটনারই পাল্টা অভিনয় চলবে। দৃশ্যতঃ সেই অনিবার্য দিনের সন্ধ্যায় সুলতানের মেয়ে সাজার পালা। সুলতান তুর্কী বধূর সাজে সজ্জিত। মুখের উপর স্বচ্ছ পর্দা। পরণে ঢিলেঢালা রেশমী পোশাক। পাওয়ার বালক রাজপুত বরের সাজে প্রাসাদে এসে উঠলো। তার সাথে বাদকদল। হিন্দু রীতিতে তাদের বিয়ে হলো। অগ্নিকুন্ডের চারপাশে প্রদক্ষিণ, মন্ত্রপাঠ সবই হলো। বালক বর তার তুর্কী কনেকে নিয়ে অন্দরে প্রবেশ করলো বস্ত্র উন্মোচন করার জন্য। পাওয়ার বালক যখন তুর্কীর উপর উপগত হতে উদ্যত তখন সে মৃদু প্রতিবাদের ঢং করলো, কুমারী তার কুমারীত্ব মোচনের প্রথম পর্যায়ে যেমন করে থাকে। পাওয়ার যখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন সে সদ্য আরোগ্য লাভকারী পুরুষাঙ্গ নিয়ে খেলতে শুরু করলো। পাওয়ার বালকের উত্তেজনা যখন চরমে সে সুলতানের উপর উপগত হলো বিপুল বিক্রমে। সুলতান আর্তনাদ করে উঠলো। প্রজাদের যারা এই বিকৃতি সম্পর্কে জানতো তারা পুরুষে পুরুষে বিয়ের ঘটনাকে কি ভাবতো কে জানে। তাদের কুকর্মের এক পর্যায়ে পাওয়ার বালক এতোটা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে সুলতানের অন্ডকোষে প্রচন্ড চাপ দিয়ে গুড়িয়ে ফেললো। সে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে সুলতানের মস্তক কেটে ফেললো এবং দেহ মেঝেতে নিক্ষেপ করলো। এরপর সে সুলতানকে নিহত করার কথা ঘোষণা করে বললো যে, জনগণ এ ধরণের অধঃপতিত শাসকের দ্বারা শাসিত হতে চায় না। এভাবেই সমকামী দুরাচার সুলতান কুতুবুদ্দিন মুবারক শাহের শাসনের অবসান ঘটলো। তখন ১৩২০ সাল।

দিল্লীর মসনদে নতুন শাসক এলো। এক সমকামীর স্থলে আরেকজনের আবির্ভাব হলো। হিন্দু রাজপুত যুবক, যার নাম দেয়া হয়েছিল খসরু খান সে নিজেকে হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করে নতুন নাম ধারণ করলো নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ। আমরা বিস্ময়ের সাথে অপেক্ষা করছিলাম যে, পূর্ববর্তী সুলতানের পাপের দোসর কি কোন শাস্তিই লাভ করবে না?

নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ ওমরাহদের আনুগত্য 'ক্রয়' করতে সচেষ্ট হলো। সে দূরবর্তী প্রদেশসমূহের গভর্ণরদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করলো। অধিকাংশই তা গ্রহণ করে বিনিময়ে তাকেও উপঢৌকন প্রেরণ করলো। কিন্তু একজন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক, যিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে পশ্চিম সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি উপঢৌকন রক্ষিত পাত্রে পদাঘাত করলেন। তিনি বললেন, কোন তুর্কী একজন দ্বিমুখী হিজড়াকে তার সম্রাট হিসেবে গ্রহণ করবে না।

ভারতের মুসলমানরা নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে জেগে উঠলো। সে সাহায্যের আশায় রাজপুত ও জাঠদের শরণাপন্ন হলো। তাদেরকে 'শহর-ই-নও'-এর প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হলো। শহরের উপকণ্ঠে যুদ্ধ সংঘটিত হলো। কিন্তু নগরীর মুসলমানরা রাজপুত ও জাঠদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েই ছিল। তারা স্বধর্মীদেরকে যুদ্ধে সমর্থন করলো। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নাসিরউদ্দিনের প্রতিটি অঙ্গ এক এক করে কর্তন করে কেল্লার বাইরে নিক্ষেপ করলো। নাসিরউদ্দিনকে সমর্থনের অভিযোগে হাজার হাজার নগরবাসীকে হত্যা করা হলো। আমি এবং রাম দুলারী রাতের অবশিষ্ট সময়টুকু আমাদের পুত্র ও পুত্রবধূর নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করে কাটালাম। কিন্তু তারা বুদ্ধিমান কায়স্থের মতো নিজেদেরকে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে দরজার '৭৮৬' সংখ্যা উৎকীর্ণ করে দিয়েছিল, যাতে মনে হতে পারে যে, এটি একটি মুসলিম বাড়ি। এভাবে তারা রক্ত পিপাসু তুর্কীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলে গেছেন যে, শাসকের মুখের আঁচিলের দিকে প্রজার তাকানো উচিত নয়, প্রজার কর্তব্য হচ্ছে শাসকের আভিজাত্য দেখা। নতুন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জন্ম উচ্চ বংশে। তিনি এক হিন্দু রাজকন্যাকে বিয়ে করেন। তার পুত্র যুবরাজ জুনাও বিয়ে করেছিল এক অভিজাত হিন্দু পরিবারে। পরিবারে হিন্দু স্ত্রী ও হিন্দু পুত্রবধূর অবস্থানের কারণে সকলের ধারণা ভ্রান্ত হয়েছিল যে, অমুসলিমদের প্রতি তার ভূমিকা হবে অত্যন্ত নমনীয়। কিন্তু সে ধারণা অমূলক প্রমাণিত হলো। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক কঠোর স্বেচ্ছাচারী শাসক হিসেবে আবির্ভূত হলেন। চাটুকাররা সুলতান ও খাজা সাহেবের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হলো। তারা বললো, 'জাঁহাপনা, আপনিই যেহেতু পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি সে কারণে বৃদ্ধ দরবেশের উচিত

আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা।

মেহরুলি ও গিয়াসপুরের মাঝামাঝি স্থানে গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একটি নগরীর পত্তন করলেন। এতে ব্যবহার করা হলো সুবর্ণ রং-এর ইট। নগরীর নাম দেয়া হলো 'তুঘলকাবাদ'। তিনি আশা করলেন যে, সকলে এসে তার কাজের প্রশংসা করবে। সবাই প্রশংসা করলো, খাজা সাহেব ছাড়া। গিয়াসউদ্দিন যখন-এর কারণ জানতে চাইলেন, খাজা সাহেব ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, নতুন নগরী শীগগির বিরান হয়ে যাবে এবং সেখানে বাস করবে গুজ্জার ডাকাত দল।

এ কথা যখন সুলতানের কানে পৌছলো, তখন তিনি খাজা সাহেবকে উচিত শিক্ষা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। এই আহম্মকটি জানতো না যে, আল্লাহ তার প্রিয় দরবেশ নিজামুদ্দিনের মাধ্যমে কথা বলেছেন। সুলতান নিজেকে অত্যন্ত অহংকারী ভাবলো এবং কয়েকটি যুদ্ধে তার সাফল্য তাকে আরো উৎসাহিত করে তুললো। চাটুকাররা অবশিষ্ট কাজ সমাধা করলো। তারা বললো, 'হে মহা শক্তিধর সুলতান, কৃষক যেভাবে ক্ষেতের গম কাটে, আপনি ঠিক সেভাবে আপনার শত সহস্র শত্রুর মাথা কেটেছেন। আপনি কি এই সামান্য দরবেশকে ধ্বংস করতে পারেন না?' গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দিল্লী থেকে সামান্য দূরে শিবির স্থাপন করে নির্দেশ প্রেরণ করলেন যে, তার রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বেই গিয়াসপুরের খানকা মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে।

কোতোয়াল কাঁদতে কাঁদতে গিয়াসপুরে এসে সুলতানের আদেশনামা খাজা সাহেবের পদতলে স্থাপন করলেন। খাজা সাহেব তাকে আশ্বস্ত করলেন, "বৎস, আমি বহু সুলতানের আগমন ও প্রস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। আমি যখন দিল্লীতে এলাম, তখন ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন। এরপর কায়কোবাদ ও জালালউদ্দিন ফিরোজ। এরপর এলো খিলজী বংশের আলাউদ্দিন ও কুতুবুদ্দিন। অতঃপর নাসিরউদ্দিন। এখনকার সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক। অর্থাৎ আমি সাতজন সুলতানকে দেখেছি। রাজা আসে, রাজা যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা চিরন্তন।"

খাজা সাহেবের কথার অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেননি কোতোয়াল। তিনি বললেন, "ওগো আল্লাহর প্রিয়তম, আপনি আমার পিতা-মাতার চাইতেও অধিক প্রিয়। সুলতান দিল্লী থেকে মাত্র তিন ক্রোশ দূরে। আমি কি করবো?" খাজা সাহেব বললেন, "খুশী মনে বাড়ি ফিরে যাও। হনুজ দিল্লী দূর অস্ত।" দিল্লী এখনো অনেক দূর।

কোতোয়াল 'শহর-ই-নও' এ ফিরে যাওয়ামাত্র খবর শুনলো যে, সুলতান দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছেন। পরদিন বার্তাবাহকরা তার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলো। তাকে সম্বর্ধনা দেয়ার জন্য নির্মিত একটি তোরণ অতিক্রমকালে সেটি তার উপর ভেঙ্গে পড়ে এবং তিনি নিহত হন। বাস্তবিক পক্ষেই আল্লাহ সবচেয়ে বড় পরিকল্পনাকারী এবং দুর্বলের বল। খাজা সাহেব যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক সেভাবে গিয়াসউদ্দিনের গড়ে তোলা নগরী জনশূন্য হয়ে গেল। যমুনা নদীর পানি হ্রাস পাওয়ায় কূপগুলো পানি শূন্য হলো। তুঘলকাবাদ শৃগাল, পেঁচা, বাঁদুড় এবং গুজ্জার দস্যুদের আস্তানায় রূপান্তরিত হলো। সোনালী প্রাচীর ধসে পড়তে লাগলো- এসবের মধ্যে যা টিকে থাকলো তা হচ্ছে গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কবরের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ। হয়তো আল্লাহ চেয়েছিলেন যে, সে দেখুক তার দাম্ভিক কর্মকান্ডের পরিণতি।

আল্লাহ হচ্ছেন ভাগ্যলিপি নির্ধারক। এই ভাগ্যলিপিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত লিপিবদ্ধ। ভবিষ্যতে কি ঘটবে আল্লাহ তা জানার ক্ষমতা খাজা সাহেবকে দান করেছেন। একদিন খাজা সাহেব তার বাণীতে উল্লেখ করলেন, "মৃত্যুর জন্য কারো ভয় করা উচিত নয়। কারণ মৃত্যু হচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে তার প্রেমাস্পদের মিলনের সময়। নব্বই বছর ধরে আমি আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। এই নব্বই বছরের প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘন্টা আমি তার সাথে মিলিত হওয়ার আকাংখা পোষণ করেছি।"

তার এ কথার পর গিয়াসপুরে বিষাদের ছায়া নামলো। আমি খাজা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলাম। যখন তার সামনে এলাম তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। তিনি বললেন, 'তোমার এ কান্না যদি আমার জন্যে হয় তাহলে তোমাকে বলছি শীঘ্রই আমার অনুগামী হবে।'

আমি কান্নায় আকুল হয়ে বললাম, 'ওগো আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আমাকেও সাথে নিয়ে যান যাতে বেহেশতেও আপনার সেবা অব্যাহত রাখতে পারি।'

হতাশায় আমি ভেঙ্গে পড়লাম। নিজেকে এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে, আমার বেঁচে থাকা

অর্থহীন। কারণ আমি প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন এবং কারো সহায়তা ছাড়া চলতে ফিরতে অক্ষম। মৃত্যুই আমাকে বার্ধক্যজনিত দুর্ভোগের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। তবুও মৃত্যুতে আমার ভয়। আমি বরং অসুস্থতা ও যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকতেই পছন্দ করবো। আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা আমার নেই। দন্তহীন রাম দুলারী আমার জন্যে যথেষ্ট ভালো।

৭২৫ হিজরীর রবিউস সানী মাসে অর্থাৎ ১৩২৪ সালে আমাদের বললেন যে, তিনি ফেরেশতাদের সম্বর্ধনা সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার পূর্বে তিনি চল্লিশ দিন রোযা রাখলেন। আমরা বললাম, 'ওগো আল্লাহর প্রিয়তম, হাকিম সাহেবরা বলেছেন, আপনার দেহের পরিচর্যা দরকার। এই শরীরে এক সপ্তাহের উপবাসও সহনীয় নয়।' তিনি আমাদের উল্টো ভর্ৎসনা করলেন, 'আমার কাছে কি তোমরা এই শিক্ষাই লাভ করেছো? তোমরা কি জান না, রোজা এবং নামায আমাদের পার্থিব জীবনের চাইতেও উত্তম জীবনের খাদ্যস্বরূপ?"

গিয়াসপুরের উপর বিষাদের সুর। খাজা সাহেব আমাদের উদ্বেগ উপলব্ধি করে বললেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমি তোমাদের সাথে থাকবো। শুক্রবার আমি তোমাদের থেকে বিদায় নেব। এই চত্বরেই আমাকে কবর দিও। খসরুকে (তিনি তখন লক্ষ্ণৌতে ছিলেন) আমার কবরের কাছে আসতে দিও না, শেষে আমি প্রকৃতির আইন লংঘন করে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য কবর থেকে উঠে আসি। আল্লাহ ও রসূল (সঃ)-এর বাণী তোমরা লাভ করবে আমার প্রধান মুরীদ মাখদুম নাসিরউদ্দিনের মাধ্যমে। আঁধার পৃথিবীতে সে তোমাদের পথ নির্দেশ করবে। কারণ সে হচ্ছে 'রোশন চিরাগ দিল্লী'। দিল্লীর স্বর্গীয় আলোর উৎস।

খাজা সাহেব ঠিক যেমনটি বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই ঘটলো। ৭২৫ হিজরীর ১৮ই রবিউস সানী অর্থাৎ ১৩২৪ সালের ৩রা এপ্রিল শুক্রবার সকালে তার রূহ বেহেশতের পথে পাখা মেললো। আকাশে কান্নার রোল। নিকটস্থ শহরগুলো থেকে হাজার হাজার শোকার্ত জনতা সমবেত হলো গিয়াসপুরে। মহিলারা বুক চাপড়ে মাতম করতে লাগলো, 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ'। হযরত রোশন চিরাগ, যাকে খাজা সাহেব উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, বাইরে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, শরীয়তের আইনে এভাবে শোক প্রকাশ নিষিদ্ধ। তিনি শোকার্ত জনতাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে কুরআন তেলাওয়াতের উপদেশ দিলেন।

খাজা সাহেবের মরদেহ ধৌত করা হলো। জানাযা নামাযের জন্য তার মরদেহ বহনকারী খাটিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে আনা হলো। এরপর শোক মিছিল সহকারে গিয়াসপুর প্রদক্ষিণ করা হলো। কাওয়ালরা মিছিলে শরীক থেকে শোক গাঁথা উচ্চারণ করলো।

"লোকজন তোমার মুখ দেখতে চাইছে,
কেন তুমি পৃথিবী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে?
হে প্রিয়, আল্লাহর প্রিয়তম
কার সাথে তুমি সাক্ষাৎ করতে চলেছো?"

একজন চীৎকার করে বললো, খাজা সাহেব কাফনের বাইরে তার হাত বের করেছেন। খাটিয়া মাটিতে নামানো হলো এবং জনতা খাটিয়া ঘিরে ধরলো। শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে কিছু সময় লাগলো। খাটিয়া বহনকারীরা বললো, তারা খাজা সাহেবকে শোক সঙ্গীতে উচ্চারিত প্রশ্নের জবাব দিতে শুনেছে। হযরত রোশন চিরাগ খাজা সাহেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'ওগো আল্লাহর প্রিয়তম, আমার কি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে, মৃত্যুর পর কথা বলা আল্লাহর নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। আপনি শান্তিতে আল্লাহর সাথে মিলিত হোন।' তিনি খাজা সাহেবের হাত কাফনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। শোক মিছিল আবার শুরু হলো।

মসজিদ চত্বরে খাজা সাহেবের কবর খনন করা হলো এবং মরদেহ স্থাপন করা হলো। অনেকে কবরে তেলের বাতি জ্বাললো। কাঁচা মাটিতে কেউ কেউ আগরবাতি পুঁতে দিলো। অনেকে কবরের গায়ে কান পাতলো এই ভেবে যে, সেখান থেকে কোন আওয়াজ উত্থিত হতে পারে।

আমীর খসরু লক্ষ্ণৌ থেকে ফিরে এলেন। তিনি কি করেন এবং খাজা সাহেব তাকে আলিঙ্গন করার জন্য কবর থেকে উঠে আসেন কি না দেখার জন্য বহু লোক জড়ো হলো। খসরু চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এবং মহিলাদের মতো বুক চাপড়ে খানকায় এলেন। হযরত রোশন চিরাগ তাকে শক্ত আলিঙ্গনে বাঁধলেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে কান্নার পর দরবেশ তাকে বললেন যে, খাজা সাহেব তাকে তার কবরের কাছে যেতে নিষেধ করে গেছেন। খসরু কবর থেকে কয়েক গজ দূরে একটি কেওড়া ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে কবরের দিকে তাকালেন যেখানে তার প্রিয় বন্ধু ঘুমিয়ে আছেন। অশ্রু তার দাড়ি বেয়ে ঝরছে। শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে খসরু ঠিক তেমনি কাঁদছিলেন। তিনি আবৃত্তি করলেন,

"আমার প্রিয়তম শুয়ে আছে বিছানায়
তার কালো চুল মুখের উপর ছড়ানো
খসরু, এখন তো তোমার বাড়ি ফেরার সময়
পৃথিবীতে সন্ধ্যার ছায়া প্রসারিত হয়েছে।"

হিন্দুরা যেমন তাদের বাবা-মা-এর মৃত্যুতে মস্তক মুন্ডন করে খসরুও অনুরূপ মস্তক মুন্ডন করলেন। নিজের সম্পত্তি মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সুফীদের জন্য নির্দিষ্ট কালো পশমের মোটা আলখিল্লা পড়তে শুরু করলেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মাত্র কয়েক সপ্তাহ পর তিনি ইন্তেকাল করলেন। আমরা তাকে কেওড়া ঝোপের পাশেই কবরস্থ করলাম।

আমি জীবন গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে উপনীত হয়েছি। এ অধ্যায় আমাকে দ্রুত লিখতে হচ্ছে। কারণ আমার ডান চোখেও ছানি পড়ছে। আর বেশি দিন আমার পক্ষে কোন কিছু লিখা সম্ভব হবে না।

অনেক দিন পর কমল তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে এলো আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখার জন্য। সে বললো, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলক পাগলের মতো হয়ে গেছেন। অনেক দিন ধরেই আমরা তার খামখেয়ালী স্বভাবের কথা শুনে আসছিলাম। তিনি উদারভাবে লাখ লাখ টাকা দান করে দেন, যখন উন্মত্ত হন তখন হাজার লোকের মাথা কেটে ফেলেন। তিনি সোনা ও রূপার মুদ্রার স্থলে তাম্র মুদ্রা প্রচলন করলেন। ধূর্ত লোকজন তাম্র মুদ্রা জাল করে সোনা ও রূপা হাতিয়ে নিলো। রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। কমল বললো, সুলতান চীন দখল করার কথা ভাবছেন এবং সেই সাথে এশিয়ার অবশিষ্টাংশ। এখন তিনি আদেশ জারি করেছেন যে, তার রাজধানী দিল্লী থেকে জাহান্নামের দিকে ৭শ মাইল দূরে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করবেন। তিনি সকল নারী, পুরুষ ও শিশুকে তুঘলকাবাদ খালি করে তার সাথে দক্ষিণের পানে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন। কি অদ্ভুত পাগলামি! দিল্লী যে নামেই হোক- লালকোট, মেহরুলি, শহর-ই-নও বা তুঘলকাবাদ সবসময়ই হিন্দুস্থানের সম্রাটের রাজধানী ছিল। দিল্লীবাসী পৃথিবীর যে কোন শহরে যাওয়ার চাইতে বরং দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করবে। হতভাগ্য কমলকে রাজকর্মচারী হিসেবে আদেশ পালন করতে হবে। কিন্তু কোন সুলতানের আদেশই কখনো হযরত খাজা নিজামুদ্দিনের পবিত্র মাযারে প্রবেশ করতে পারবে না।

৫

ভাগমতী

মে মাস। সূর্য যেন জাহান্নামের আগুন ছড়াচ্ছে। প্রখর রৌদ্রতাপ, ধূলির প্রবাহ, চোখ ঝলসানো আলোকছটা এবং পীচঢালা রাস্তা যেন গলানো রূপার মত চমকাচ্ছে। কোথাও জীবনের অস্তিত্ব নেই- এমন মনে হয়। রাস্তায় একটা পাগলা কুকুরও নেই। শুধু দ্বিপ্রহরের সূর্য তার জ্বলন্ত অস্তিত্ব জাহির করে আছে।

গাড়ীর সিট পুড়ে যাচ্ছে। সিটে বসেই ভাগমতী চমকে পাছা তুলে, 'হায় রাম'। সে অবস্থায় থাকে ঠান্ডা হওয়ার অপেক্ষায়। আমিও চীৎকার করি, 'উফ্! পুড়ে যাচ্ছে!' ভাগমতীর হাত স্টিয়ারিং হুইলে রাখি, 'স্টিয়ারিং হুইলে হাত দিয়ে দেখো।' সে ধরেই ঝাঁকুনি দিয়ে হাত সরিয়ে নেয়, 'কোন ডাক্তার কি আমাদেরকে বাইরে গিয়ে সূর্যের তাপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে?' আমরা কুতুব মিনারের রাস্তা ধরি। সফদর জং এর মাজার অতিক্রম করে ইউসুফ সরাই এর পর একে একে খিলজী, তুগলক ও মোগল সৌধের ধ্বংসাবশেষগুলো পিছনে ফেলে এগিয়ে যাই। এই সৌধগুলোই এক সময় পুরো এলাকা জুড়ে ছিল। কুতুব মিনারের কাছে এসে গাড়ী বামে ঘুরিয়ে লাদো সরাই গ্রামে প্রবেশ করি। সেখানে মানুষের তৎপরতা লক্ষ্যণীয়। জাঠ মহিলারা বলিষ্ঠতার সাথে ভিস্তি ভরে পানি তুলে তাদের কলসীতে ঢালছে। দু'জন তরুণী গোসল করছে। গায়ে একটুও আবরণ নেই। তারা দুই হাতে উরুর মধ্যস্থল ঢাকে এবং পিছন ফিরে দাঁড়ায়। আমি গাড়ীর গতি মন্থর করি তাদের শুরু নিতম্ব ভালোভাবে দেখার জন্য। একটি মহিলা একদলা কাদা তুলে আমাদের দিকে ছুড়ে মারে। আমি হাসি। ওরাও হাসে। এই জাঠ মহিলারা দীর্ঘাঙ্গী। তাদের স্তন বিশাল, কোমর সরু এবং দেহ সুগঠিত। পানির কলসীগুলো তারা মাথায় বহন করে এবং ঘাগরা এমনভাবে ফুলিয়ে চলে যেন আমাজোনিয়ার রাণী চলেছে। আমি ভাগমতীকে জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি মনে করো না যে, হিন্দুস্থানে জাঠ মহিলারাই সবচেয়ে শয্যামোহন রমনী?'

'অন্য লোকের বউ আর বোনরাই একজনের কাছে সব সময়ই তার নিজেরটার চেয়ে অধিক শয্যামোহন। ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর।' ভাগমতী প্রবাদ বাক্যে বিশ্বাস করে।

আমরা লাদো সরাই ছেড়ে আবার খোলা প্রান্তরে পড়েছি। সেই একই উত্তাপ, চোখ ঝলসানো রাস্তা। গাড়ীর ছায়া আগে আগে ছুটে চলেছে। বামদিকে এবার একটি প্রাচীর। পাথরের বিশাল প্রাচীর ধূসর ও লাল বর্ণের এবং প্রাচীরের উচ্চতা অনেক স্থানে মাটি থেকে ষাট ফুট। আমরা একটি খিলানওয়ালা ফটক, যা তুঘলকাবাদ দুর্গের পথ নির্দেশ করছে। ডানদিকে নির্মাতা গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সৌধ। সৌধের লাল প্রাচীর ও সাদা মার্বেলের গম্বুজ দুর্গের মত বেষ্টনীর উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। দর্শকদের গাড়ী দেখে রাখে যেসব টোকাই তারা সব কোথায় গেছে? এখন সপ্তাহের মাঝামাঝি। গ্রীষ্মেরও মাঝামাঝি সময়। অতএব, দর্শক নেই, টোকাইও নেই।

উইন্ড স্ক্রীন আঁকড়ে ধরা কালো থাবা, ধারাল নখের লোমশ হাত দেখে ভাগমতী চিৎকার করে উঠে, 'ওটা কি?' দেখা যায়, ওটা একটা রেসাস বানর। আমাদের দিকে তাকায় খাদ্যের অনুরোধ নিয়ে, 'খো-খো-খো-খো।' ভাগমতী ভয় পেয়ে আমাকে আঁকড়ে থাকে। বানর ভীত হয়ে লাফ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে আমাদেরকে তার উজ্জ্বল লাল পশ্চাদদেশ দেখিয়ে। আমি ভাগমতীর হাত ছাড়িয়ে নেই। গাড়ীর দরজা ঘেসে কেউ দাঁড়িয়েছে। একটি বালক। সে বলে, 'স্যার, আমি আপনার গাড়ী দেখে রাখবো।' আমি তাকে 'ঠিক আছে' বলার পূর্বেই আরেকটি বালকের

আবির্ভাব ঘটে, 'স্যার, এখন আমার পালা। সে এর আগের গাড়ী দেখেছে। দেখিসনি তুই?' ওরা ঝগড়া শুরু করে, 'স্যার, আমি কি প্রথমে বলিনি?' 'স্যার, এখন আমার পালা- আপনিই বলুন।' আরো টোকাই এর আগমণ ঘটে এবং গাড়ী দেখে রাখার অধিকার নিয়ে চিল্লায়। আমি কয়েক পা এগিয়ে একটার জামা ধরে ঘোষণা করি, 'এই ছোকরা আমার গাড়ী দেখবে। শুধু একেই আমি পয়সা দেব।'

ঝগড়া নিষ্পত্তি হয়ে যায়। হয় কি আদৌ? চারটি টোকাই তুগলকাবাদ দুর্গের ফটক পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে। 'স্যার, আমরা আপনাকে তুগলকাবাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবো।' আমি ওদেরকে বলি, 'সবকিছু আমার জানা। আমাদের কোন গাইডের প্রয়োজন নেই।'

'স্যার, এটা হচ্ছে দুর্গের প্রধান ফটক।'

'আমি জানি। তোমাকে বলতে হবে না। তুমি যাও।'

'বামের এই ফাঁকা জায়গাটা পুকুর ছিল। এখান থেকে তুগলকাবাদে পানি সরবরাহ হতো।'

'আমি তোমাকে বলেছি, আমার কোন গাইডের প্রয়োজন নেই। যাও।'

'স্যার, এ হচ্ছে মীনাবাজারের ধ্বংসাবশেষ, মেয়েদের মার্কেট।' এবার আমি রুষ্ট হই। তাদের ফিরিয়ে দেই, 'ভাগো, কেটে পড়ো।' টোকাইরা দৌড়ে একটু দূরে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে, 'ভাগো।' ভাগমতী এবং আমি ধ্বংসাবশেষের মাঝ দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকি। কামান স্থাপনের স্থান, মসজিদ, মার্কেট ইত্যাদি চোখে পড়ে। চারদিকে তাকাই, পশ্চিমে কুতুব মিনার, দক্ষিণে গিয়াসুদ্দিন তুগলকের সৌধ, পূর্বদিকে 'কাসর-ই-হাজার' ও 'শহর-ই-নও' এর ধ্বংসাবশেষ। আমরা দুর্গের এক দূর প্রান্তে এসেছি। আমাদের একশ' ফুট নীচে একটি জলাশয়ে অনেক মহিষ দেখলাম। এই হচ্ছে তুগলকাবাদ দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কিছু ইট ও মাটির ঘর আছে। আশেপাশের এলাকা কোথাও পাথুরে, কোথাও সমতল এবং মাঝে মধ্যে লাল ছত্রাকের মতো অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ।

ভাগমতী আমার হাত ধরে।

'আরে হিজড়াটা সরদারের হাত ধরেছে।' বেজন্মারা দেখছি এখনো পিছু ছাড়েনি। ভাগমতী এবার মুখ খুলে, 'হারামজাদারা এখান থেকে যাবি, না ঠেঙ্গানি খাবি?' সে ধমক দিয়ে ধাওয়াও করে। তারা জোরে দৌড় লাগায়। ভাগমতী বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরে আসে। আমরা পাথরের চাতালে বসি। সে তার মাথা আমার বুকে রাখে, 'আমাকে দয়া করে বলুন, কিছু বানরের অন্ডকোষ এবং পশ্চাদদেশ লাল কেন?'

'আমি জানি না। কিন্তু শুনেছি যখন তারা উত্তেজিত হয় তখন লাল হয়।'

'আপনার অন্ডকোষও কি লাল বর্ণ ধারণ করে যখন 'ছোট মিয়া' 'বড় মিয়ায়' পরিণত হয়?'

কথাটা বুঝে উঠতে আমার কয়েক মুহূর্ত লাগে, 'আমি কখনো তাকিয়ে দেখিনি। তাছাড়া আমি বানর নই।'

'আমাদের পিতাদের পিতারা বানর ছিলেন।' সে পন্ডিতের মত উচ্চারণ করে। 'এরপর আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে। আমি সাথে করে একটা ফ্লাশলাইট আনবো।'

আমরা বসি এবং আমাদের নীচে বিশ্ব অবলোকন করি। ভাগমতী আমার কানে সুড়সুড়ি দেয় এবং অনুভব করতে চেষ্টা করে যে, আমার 'ছোট মিয়া' যথাস্থানে আছে কিনা?

সূর্যালোকের প্রখরতা হ্রাস পায়। সূর্য বিশাল কমলা রং এর বেলুনে পরিণত হয়। অসংখ্য কাক নগরীর উদ্দেশ্যে তাদের পাখা মেলেছে। টিয়া পাখীর দল বেঁধে ধূসর আকাশ অতিক্রম করছে। তুগলকাবাদ গ্রাম হতে লক্ষ লক্ষ চড়ুই উড়ে কীকার গাছগুলোর উপর বসে কিচিরমিচির করছে রাতের প্রস্তুতির জন্য।

কমলা রং এর সূর্য ধূলির আস্তরণের মধ্যে বিলীন হলো। গ্রাম্য বালকেরা তাদের মহিষগুলোকে জলাশয় থেকে উঠালো। মহিষের আওয়াজ, চড়ুই-এর কিচিরমিচিরের সাথে যুক্ত হলো। কিছু কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। এরপর হঠাৎ করেই সুচপতন নিস্তব্ধতা নেমে এলো প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে। ভাগমতীর কথাও যেন ফুরিয়ে গেছে। আমি এমন এক ভাষায় নিরবতার বৈচিত্র সম্পর্কে বলি যা তার বোধগম্যতার বাইরে।

"এখানে নিস্তব্ধতা, কোন শব্দ নেই
এই নিস্তব্ধতায় কোন শব্দ থাকতে পারে না
গভীর অতলস্পর্শী সাগরের শীতল তরঙ্গে
অথবা বিস্তীর্ণ মরু, যেখানে জীবনের নিশানাও নেই।"

সান্ধ্য তারা ধূসর আকাশে চমকাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে এখন। উত্তপ্ত বাতাসের পর বেশ শীতল লাগছে এখন। আমার চোখ ঘুমে ভারী হয়ে আসছে। আমি ভাগমতীর চুলে হাত বুলাই। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমিও চোখ বন্ধ করে এবং বিশ্ব থেকে হারিয়ে যাই।

কেউ আমার দিকে তাকিয়ে আছে এমন একটি অনুভূতি নিয়ে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলাম। পূর্ণ চাঁদ আমার মুখের উপর পড়েছে। একটা পাপিয়া উড়ে এসে কয়েক ফুট দূরে এক প্রাচীরের উপর বসলো। পাখীটি চাঁদের দিকে মাথা তুললো এবং ভুতুড়ে পরিবেশে অদ্ভুতভাবে ডেকে চললো।

কিছুদিন পর আমি মৌমাছির কবলে পড়লাম। দিল্লীতে বহু প্রজাতির মৌমাছির বাস। একটি প্রজাতি অবশ্যম্ভাবীভাবে দিল্লীর ইতিহাস প্রেমিক। কারণ তারা অতীতের প্রতি দুর্বল। তাদের বাসস্থান মোগল পূর্ব, মোগল আমলের, মোগল পরবর্তী স্থাপত্য কর্মে, বিশেষতঃ সুউচ্চ খিলানে। মৌচাকের আকৃতিঃ মৌমাছির জগতে সবচেয়ে বিশাল। প্রাকৃতিক দুশমনঃ দিল্লীর টোকাই বাহিনী, যারা ইটপাথর, গোবর জ্বালিয়ে ও ধুঁয়া দিয়ে মৌচাকে আক্রমণ করে। প্রাকৃতিক শিকারঃ অজ্ঞাত পরিচয়, ভুলো মনা, বৃদ্ধ এবং যারা ঐতিহাসিক সৌধ দেখতে এসে দিবাস্বপ্ন দেখে।

এক দুপুরে আমি 'হাউজ খাস' এ গেছি। সময়টা এপ্রিল মাসের শেষদিকে এবং বেশ গরম পড়েছে। এই প্রাচীন মাদ্রাসাটা এমন কৌশলে নির্মিত যে উত্তপ্ত বাতাস প্রবেশ করলে প্রাচীরের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে যায়। একটি বেলে পাথরের কলামে ঠেস দিয়ে বারান্দার মেঝেতে বসে আছি। বামদিকে একটি গোছানো উদ্যান। মাঝখানে একটি ফোয়ারা, যার পানির ছটায় রংধনুর সৃষ্টি হয়েছে। আমার সামনে দেখা যাচ্ছে সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি। এর গম্বুজ কালের পরিক্রমায় কালো রং ধারণ করেছে। আমার ডানদিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে একটি পুকুর অনেক মহিষের গাদাগাদি ভিড়ে কালো হয়ে গেছে। এই বিশাল পুকুরটি হচ্ছে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর দ্বারা খননকৃত হাউজ-ই-আলাই এর অন্তিম অবস্থা। তিনি শিরি নামে যে নতুন শহর তৈরী করেছিলেন সেখানে পানি সরবরাহ হতো এই পুকুর হতে। এই শহরের অস্তিত্ব বলতে প্রাচীরের কিছু ধ্বংসাবশেষ ও ভগ্নপ্রায় একটি ফটক আছে।

গরম বাতাস আমার কানে শীতল হয়ে প্রবেশ করছে। আমার মাথার উপর ঘুলঘুলিতে কিছু পাখীর বাসা। নীচ থেকে হিন্দী গান ভেসে আসছে। তাছাড়া আছে তাস খেলায় মগ্ন কিছু লোকের কণ্ঠ। এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রলম্বিত ছায়ায় গ্রামের ছেলেরা গোল্লাছুট খেলছে। ভাগমতী আমার সাথে নেই। আশেপাশের নিরুপদ্রব ও নিস্তব্ধ পরিবেশ দিবাস্বপ্নের খুবই অনুকূল।

এই মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেয়া হতো? জ্যোতিবিদ্যা, গণিত, রসায়ন এবং কোরআন? ছেলেরা সারি বেঁধে সুর করে পড়তো? শিরি এবং এই বিশাল পুকুরের এই দশা হলো কেন? লেংড়া মঙ্গোল তৈমুর যখন দিল্লীর ৫০ হাজার বাসিন্দাকে হত্যা করেছিল তখনও কি শিরির অস্তিত্ব ছিল? দিল্লীকে পুনরায় জনঅধ্যুসিত করতে কতদিন সময় লেগেছিল?

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, হাউজ-ই-আলাই এর আশেপাশেই ঘটেছে হত্যালীলা। লোকেরা বসে আছে হাত পিছনে বাঁধা অবস্থায় এবং তাদের মাথা নীচু। খঞ্জরের এক কোপে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে দেহ থেকে। রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে শিরদাঁড়া সোজা, খানিক সময় কাঁপছে। মা, স্ত্রী ও বোনেরা আর্তনাদ করছে। শিশুরা বোবা হয়ে গেছে। মোঙ্গলদের পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া আমি যেখানে উপবিষ্ট তার কাছাকাছি কোন অবস্থান থেকে এই দৃশ্য উপভোগ করছে। আমি যদি দূরবীণ সংযুক্ত আধুনিক শার্পশুটার রাইফেল হাতে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারতাম তাহলে একটি বৃক্ষে আরোহণ করে সেখান থেকে ঘোড়া বেজন্মাকে গুলী করে মারতাম। আমি তার সেনাপতিদের ধরে এনে একটার পর একটাকে জাহান্নামে প্রেরণ করতাম। মোঙ্গল, তাতার, তুর্কী এবং অন্যসব মধ্য এশীয় বর্বরদের বাহিনীতে ভীতি সঞ্চার করতাম। দিল্লীবাসীরা তখন তাদের

বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। তাদেরকে ছাগলের মতো হাজারে হাজারে হত্যা করতো এবং বাকীদের প্রেরণ করতো সমরখন্দে।

একটি নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাত হতে অল্পের জন্য আমার মাথা রক্ষা পেল। পাথর গিয়ে পড়লো মেঝের উপর। একদল টোকাই হৈচৈ করতে করতে ফিরোজ শাহ তুগলকের মাজার এলাকায় ঢুকছে। আমি চিৎকার করি, 'এই হারামীর বাচ্চারা....।' আমি ওদের মা ও বোনদের সাথে কি করবো তা বলার পূর্বেই ইতিহাস প্রেমিক মৌমাছির ঝাঁক আমার উপর পড়লো। আমি হাত দিয়ে মৌমাছি তাড়াতে চেষ্টা করি। যেন শয়তান আমাকে তাড়া করেছে, এমনভাবে দৌড়াই। আমার মুখের উপর ওরা হামলা চালিয়েছে। গলা, হাতে হুল ফুটাচ্ছে। আমার পাগড়ীর ভাঁজ খুলি এবং মুখ, হাত আবৃত করে মাটির উপর গড়াগড়ি দিতে শুরু করি। আমি শুনতে পাচ্ছি তাস খেলোয়াড়রা দৌড়াতে দৌড়াতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। পাঁচ মিনিট ধরে আক্রমণ অব্যাহত ছিল। আমি আমার দেহ থেকে মৃত মৌমাছিগুলো অপসারণ করি। আমার দাড়িতে দু'টো মৌমাছি আটকা পড়েছে। সে দু'টো ছাড়াতে আমার আঙ্গুলে হুল ফুটে। আমার পেশী ফুলতে শুরু করে। হাতের আঙ্গুল মোটা হয়ে উঠে। গোটা শরীর জ্বলতে শুরু করে। আমি দৌড়ে গাড়ীর কাছে আমি এবং যত জোরে সম্ভব গাড়ী চালিয়ে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে পৌঁছি।

ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে পৌঁছার সময়ের মধ্যেই আমার চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশ অসার হয়ে পড়েছে। লোকজনের ভিড় ঠেলে অগ্রসর হচ্ছিলাম। মনে হলো জায়গাটা দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের থার্ড ক্লাশ প্যাসেঞ্জার ওয়েটিং রুমের মতো। এক শশ্রুমন্ডিত বৃদ্ধ স্ট্রেচারে শুয়ে আছে দেয়ালে পা ঠেকিয়ে। ডাক্তারের টেবিল ঘিরে অনেক লোক। আমি তাদের ঠেলে পথ করে নিলাম। তাদের সবার চেয়ে আমার অবস্থা গুরুতর। গলা ও কানে মৌমাছির হুল তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ছাড়া মারাত্মক পরিণতি আনতে পারে। ডাক্তার ফোনে কথা বলছে। বাম হাতে একটা যন্ত্র ধরা, ডান হাতে সিরিঞ্জ। কথার ফাঁকে সিরিঞ্জের সুই দিয়ে বাতাসটুকু বের করে। তার সামনে চৌদ্দ বছরের এক কিশোরী। তার শেমিজ কাঁধ পর্যন্ত তোলা। আমার প্রায় বন্ধ হওয়া চোখ তার সদ্য প্রস্ফুটিত স্তনের উপর পড়ে। মেয়েটির মা আমার দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে ডাক্তারকে ভৎর্সনা করে, 'আপনি আমার মেয়েকে সারা দুনিয়ার কাছে মেলে ধরতে চান?' ডাক্তার বলে, 'এক মিনিট'। তিনি টেবিলে ফোনের রিসিভার রাখেন। মেয়েটির পেটের এক স্থানে সুইটা ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের ওষুধটুকু নিঃশেষ করেন এবং পরের দিন তাকে আবার আসতে বলেন। তিনি পুনরায় রিসিভার তুলেন। আমি অসহিষ্ণু হয়ে বলি, 'ডাক্তার সাহেব আমাকে মৌমাছি কামড়েছে। দয়া করে.....'। তিনি ইংরেজীতে ফোনে বলেন, 'এক্সকিউজ মি' এবং পাঞ্জাবীতে আমার উদ্দেশ্যে বলেন, 'আপনি তো মরে যাচ্ছেন না। আপনার পালা আসুক।' ফোনের অপর প্রান্তের কাছে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে তার প্রিয় রেস্টুরেন্টগুলোর নাম বলতে থাকেন, 'মোতি মহল, গেলর্ড, ল্যাগুনা।' সাথে ঠাট্টাও করেন যে, মুরগীর বদলে যেন কাকের গোশ্ত অথবা কুলফীতে চোষ কাগজ মিশিয়ে সার্ভ না করে। হাঁ, হাঁ- । আমার অসার, দুর্বল হাতে টেবিলে সজোরে চাপড় লাগাই এবং গর্জে উঠি। ডাক্তার ফোনে বলে, 'সরি, অনেক রোগী। আমি পরে তোমাকে ফোন করবো, বাই..।' এরপর অত্যন্ত ক্ষেপে আমার দিকে তাকান এবং পাঞ্জাবীতে চিৎকার করেন, 'এই যে, মৌমাছির হুলওয়ালা, আপনি কি দেখছেন না, আমি ব্যস্ত?' আমি কেম্ব্রিজের ইংরেজী উচ্চারণে বলি, 'ব্যস্ত, মাগীবাজীর জন্য! কোন্ বান্ধবীর সাথে রেস্টুরেন্ট আর খাবারের গল্প করছো, আর রোগীরা অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো। প্রতিটি সংবাদপত্রে চিঠি লিখবো। তুমি নিজেকে কি ভেবে বসে আছো?' স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষা যাদুর মত কাজ করে। ডাক্তার আমার হুল ফুটানো জায়গা পরীক্ষা করে, ইঞ্জেকশন দেয় এবং আমাকে বলে যে, আমি ভাগ্যবান যে এখনো বেঁচে আছি। এরপর বিনীতভাবে বলে, 'বিলম্বের জন্য দয়া করে ক্ষমা করবেন। আমি এখনো ইন্টার্নী।'

ইঞ্জেকশনে আমার দৃষ্টির কোন উন্নতি হয় না। আমি কাছের দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হই। একটি কক্ষে প্রবেশ করি। সেখানে একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। একজন পুলিশও আছে। সে আমাকে

দেখে বলে, 'তুমি কি মৃত ব্যক্তির আত্মীয়?'

'না আমি নিজেই মৃতদেহ। আমার দেহে মৌমাছির হুল ফোটানোর চিহ্নগুলো গননা করো।' সে আর কিছু বলার পূর্বেই আমি দ্রুত পা চালিয়ে গাড়ীতে উঠি।

বুধ সিং আমাকে দেখে চমকে উঠে। সে জানতে চায় কিভাবে এবং কোথায় এমন হলো। আমি যতটা পারলাম তাকে বললাম। সে একটা আঙ্গুল তুলে বললো, 'আমি বহুবার আপনাকে সতর্ক করেছি কবরস্থানের কাছে না যাওয়ার জন্য। জায়গাগুলো ভূতে পূর্ণ। যেসব জায়গায় শত শত, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে শত শত, হাজার হাজার ভূতও আছে। আপনাকে মৌমাছি আক্রমণ করেনি। তৈমুর লং এর হাতে নিহতদের আত্মা আক্রমণ করেছে।'

আমি বুধ সিং এর সাথে যুক্তি তর্কে অবতীর্ণ হতে চাই না। আমি তার খাটিয়া আমার দরজার কাছে আনতে বলি, যাতে আমার চিৎকার সে শুনতে পায় এবং সাহায্য করতে আসে। ঘরে গিয়ে শরীরের তাপ দেখি ১০৩ ডিগ্রী। আমার মত বয়স্ক মানুষের প্রলাপ বকার অবস্থার জন্য যথেষ্ট।

আমার ঘুম খুব কম হয়। নিজের জন্য দুঃখ হয়। আমি মৃত্যুর কতটা নিকটবর্তী হয়েছি? আমার অতীত জীবনের দৃশ্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ভাসতে থাকে চোখের সামনে। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবতে থাকি তৈমুর লং এর কথা, যে নিরীহ লোকদের উপর বর্বরতায় আপতিত হয়েছিল! আমি তার স্মৃতিকথা পড়েছি। তার নিজের ভাষায় বর্ণনা, আমি তাতে কিছু যোগ করছি।

৬

তৈমুর লং এর দিল্লী অভিযান

আমার বয়স যখন বাষট্টি বছর তখন এক বসন্তের রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। নিজেকে ফলভারে আনত বৃক্ষ সম্বলিত এক বাগানে দেখলাম। গাছে গাছে অনেক পাখীর বাসা এবং বহু পাখী খুঁটে খুঁটে ফল খাচ্ছে। পাখী তাড়ানোর জন্য মালীরা শব্দ করছে। আমি বাগানে প্রবেশ করলাম একটি বাটুল ও ব্যাগ ভর্তি নুড়িপাথর নিয়ে। বাটুল ছুড়ে আমি পাখী তাড়ালাম এবং পাখীর বাসাগুলোও বিনষ্ট করলাম। মালীরা আমার কাছে এসে আল্লাহর প্রশংসা করলো যে ফল ধ্বংসকারী পাখী তাড়াবার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।

আমার পরিকল্পনা নিয়ে আমি যখন খুব চিন্তাভাবনা করতে শুরু করি, তখনই সেগুলো স্বপ্ন হয়ে আমার কাছে আসে। আমি দরবেশ শেখ জয়নুদ্দিন আবুবকর তাতীয়াবাদীকে স্বপ্নের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলাম। শেখ, যিনি ধর্মের উজ্জ্বল এক নক্ষত্র আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে, আমি দূরের এক দেশে অভিযানে যাচ্ছি। যে দেশে অভিযানে যাচ্ছি সে দেশে বহু সংখ্যক শাসক কলহ কোন্দলে লিপ্ত। আমি সেইসব শাসকদের বিতাড়ন করে তাদের রাজ্যগুলোর দখল নেব এবং তাদের প্রজারা আমার পদচুম্বন করবে। তখন আমার মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, আমার চীন জয় করা উচিত হবে কিনা- অথবা হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমি দীঘল কেশী দরবেশ মোহাম্মদ গেসুদরাজ এর সাথে আলোচনা করলাম। আমি ধর্মীয় ব্যাপারে তাকেই পীর হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। তার ব্যাখ্যা আরো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তিনি স্বপ্নটিকে ব্যাখ্যা করলেন, 'মহানবী (সঃ) তোমাকে তার তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করেছেন এ জন্যে যে, তুমি ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করবে।'

আমি ততোদিনে এশিয়ার অধিকাংশ রাজ্য জয় করেছি। এখন হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরীণ কোন্দল-এ দরজা আমার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন বিশ্বে তাই ঘটে থাকে। আমার রাজ মাতার গর্ভ থেকে বসন্তের যে দিনটিতে আমার জন্ম সেদিন নাকি আমার দুই হাত রক্তাক্ত ছিল। রাজ গণকরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, আমার তরবারি কামারের নেহাই এর মত ফুলকি ছুটাবে এবং আমি রক্তের নদী দিয়ে অতিক্রম করবো। আমার পিতা আমার জন্যে দোয়া নিতে শেখ শামসুদ্দিনের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের আয়াত উচ্চারণ করে বললেন, 'তুমি কি নিশ্চিত যে, যিনি বেহেশতে বাস করেন তিনি তোমাকে পৃথিবীর কাছে গিলে ফেলতে দেবেন না এবং পৃথিবী কম্পিত হতে থাকবে।' কম্পন (তৈমুরা) থেকে পিতামাতা আমার নাম রাখলেন তৈমুর। আমার হস্তরেখায় এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমি সকল যুগের সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্রাটে পরিণত হবো এবং ধর্মকে রক্ষা করবো, মূর্তি ধ্বংস করবো এবং নিজ জাতির পিতা হিসেবে পরিগণিত হবো। আমার বয়স যখন সাতাশ বছর তখন এক দুর্ঘটনায় আমার পা খোড়া হয়ে যায় এবং এর ফলে আমাকে পা এর চাইতে অশ্বের উপর অধিক নির্ভর করতে হয়। আমি জানতাম, আড়ালে লোকজন আমাকে তৈমুর লং (লেংড়া তৈমুর) বলে ডাকে। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে তারা আমাকে সম্বোধন করে সাতটি ভূখন্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট বলে।

আমি ওমরাহ ও সর্দারদের ডেকে তাদের কাছে আমার স্বপ্নের বর্ণনা করলাম এবং জ্ঞানী

ব্যক্তিরা স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও বললাম। আমি তাদের বললাম, আমার লক্ষ্য হচ্ছে, হিন্দুস্থানে অভিযান চালানো এবং সেখানকার বিধর্মীদের সত্য ধর্মে দীক্ষিত করে বহু ঈশ্বর ও মূর্তিপূজার নোংরামি থেকে দেশটিকে সংস্কার করা। আমি তাদের মাথায় সাহসিকতার শিরস্ত্রাণ পরিয়ে দিলাম। দৃঢ় সংকল্পের অস্ত্র তুলে দিলাম। তাদের তরবারি ব্যবহারের এমন প্রক্রিয়া শিক্ষা দিলাম, কুমীর রক্তের নদীতে যেন ডুব দিচ্ছে। বিজয়ী হলে তারা সেই সব খ্যাতিমান যোদ্ধার মত পরিচিত হবে যারা ইসলামের পতাকা পৃথিবীর দূর দিগন্তে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হলে তারা শহীদ হয়ে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আমি তাদের হিন্দুস্থানের অতুল বৈভবের কথা বললাম। চকচকে ইট দিয়ে নির্মিত তুগলকাবাদের কথা বললাম। সেই সাথে বিধর্মীদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কথা বলে তাদের সতর্কও করলাম। এ কথা বললাম যে, আমরা যদি বিধর্মীদের ধ্বংস করে তাদের মুখ সীসা দিয়ে বন্ধ করে না দেই তাহলে মুসলিম সুলতানদের রেখে যাওয়া কীর্তি, ঐতিহ্য সবই তারা গিলে ফেলবে। গজনীর সুলতান মাহমুদ হিন্দুস্থানের মসনদে এসেছেন, মোহাম্মদ ঘোরী, কুতুবুদ্দিন আইবেক, ইলতুৎমিশ ও তার কন্যা সুলতানা রাজিয়া, গিয়াস উদ্দিন বলবন, জালাল উদ্দিন, আলাউদ্দিন খিলজী, তুগলক বংশের গিয়াসুদ্দিন তুগলক, মোহাম্মদ তুগলক, ফিরোজ শাহ ও নাসির উদ্দিন। তাদের শাসনকাল স্থায়ী ছিল দুই শতাব্দীর উপর।

তুর্কীদের মন তাদের চোখের মতই ছোট। তুর্কীদের সমর্থন আদায় এবং তাদের জিহবা বন্ধ করতে হলে তাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইসলামী জজবা জাগিয়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, তাদের মধ্যে সোনাদানার লোভও জাগ্রত করা জরুরী। আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, অতীতে যে কোনো বিজয় অর্জনের পর আমাদের হাতে যে সম্পদ এসেছে আমি সেগুলো তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। নিজের জন্য কিছুই রাখিনি। অতএব হিন্দুস্থান অভিযানেও আমরা স্বর্ণ, রৌপ্য, গবাদিপশু, ক্রীতদাস ইত্যাদি যা কিছুই লাভ করবো সবই বন্টন করে দেব।

ওমরাহ ও সর্দাররা আমার কথায় আকৃষ্ট হলো। উপস্থিত সকলে তরবারি বের করে বিজয় অর্জন অথবা বেহেশতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো।

আমার দৌহিত্র যুবরাজ পীর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে আমি হিন্দুস্থানে একটি অগ্রবর্তী বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলাম। যুবরাজের বয়স মাত্র তেইশ বছর। কিন্তু ওই বয়সেই সে আমার সাথে কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছে এবং আমি উপলব্ধি করেছি যে তার ভাগ্য তারকা জ্বল জ্বল করে উদিত হচ্ছে। আমি তাকে আমার তাবুতে ডেকে তার সকল কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করলাম। আমি তাকে বললাম, 'যে ব্যক্তি রাজকন্যাকে আলিঙ্গন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে তরবারির আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আমি তোমাকে গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবো। সেখান থেকে তুমি হিন্দুস্থানের দিকে অগ্রসর হবে এবং মুলতান শহর দখল করবে।' এরপর আমি তাকে দিল্লীতে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক তার প্রজাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে রাখার পরিবর্তে মাদ্রাসা, মসজিদ, সরাইখানা নির্মাণ এবং খাল খনন করার কাজে অধিকতর সময় ব্যয় করছেন। মহানবী (সঃ) যথার্থই বলেছেন, 'একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ এবং সেই ছায়ায় থেকে জনগণ তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।' কিন্তু সুলতান ফিরোজ শাহ বিধর্মীদেরকে মাথা উঁচু করার সুযোগ দিয়েছেন। আমার কব্জা থেকে পালিয়ে গেছে এমন বহু বিশ্বাসঘাতককে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। এভাবে তিনি আমার সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। দশ বছর পূর্বে ফিরোজ মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু সর্বোচ্চ শাসকের প্রতি অশ্রদ্ধার যে বীজ তিনি বপণ করে গেছেন তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে এবং এ কারণে আমি তার প্রতি অসন্তুষ্ট। দিল্লীতে উত্তরাধিকারের দ্রুত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় ফিরোজ শাহের পুত্র ও দৌহিত্ররা মসনদে বসলো এবং এখন তুগলকদের মসনদে বসেছে মাহমুদ। অবশ্য মাহমুদ খান হিন্দুস্থান শাসন করছে না। দু'জন ভুঁইফোড় ব্যক্তি ক্ষমতার চাবিকাঠি ঘুরাচ্ছে। এই দু'জন হচ্ছে শরং খান, যিনি তার ভাই-এর সাথে মিলে মুলতান নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং মাল্লু খান ইকবাল, যিনি তুগলকবাদ ও কসর-ই-হাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন। অসার দম্ভের ধুঁয়া তাদের মস্তিষ্ককে ঘোলাটে করে রেখেছে।

যুবরাজ মোহাম্মদ শীঘ্রই গজনী থেকে রওয়ানা হলো। সিন্ধু নদী অতিক্রম করে মুলতান দখল ও শরং খানকে বন্দী করলো।

আমি দেশের সর্বত্র দূত প্রেরণ করে ঘোষণা করলাম যে আমরা দিল্লী অভিযানের জন্য প্রস্তুত। অভিযানে অংশগ্রহণ করতে এতো বিপুল সংখ্যক লোক জড়ো হলো, যেন বৃষ্টির ফোটা। তাদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক হচ্ছে আমার নিজস্ব বারলাস বংশের চুগতাই তুর্ক গোত্রের। তারা আমার সাথে বহু অভিযানে শরীক হয়ে লাভের অংশীদার হয়েছিল। বসন্তকালে গাছের ডালগুলোতে যখন সবুজ পত্রপল্লবের অপূর্ব শোভা তখন আমার অশ্বারোহী বাহিনীতে লোকবল দাঁড়ালো ৯০ হাজার। আমি কাফিরিস্থানের পর্বতে একটি ছোট টাস্ক ফোর্স প্রেরণ করলাম এবং যারা আমাদের অগ্রাভিযানে বাধা দিতে এলো সেইসব বিধর্মীদের পাইকারীভাবে হত্যা করলাম। এরা মেসিডোনিয়ার আলেজান্ডারকেও প্রতিহত করেছিল।

আমরা পাখীর মত দ্রুত অগ্রসর হয়ে সিন্ধু নদীর তীরে পৌছলাম। নদী অতিক্রম করে আমরা তুগলকদের ভূখন্ডে উপনীত হলাম। ইতিমধ্যে আমার দৌহিত্র মুলতান দখল করেছে। ছোটখাট বাধা নির্মূল করে আমরা পাঞ্জাবের নদীগুলোও অতিক্রম করলাম।

পাক-পাত্তান নামক স্থানে ফরিদ উদ্দিন গঞ্জে শাকার এর মাজারে থামলাম প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে এবং সেখানে প্রতিজ্ঞা করলাম দরবেশের দোয়া তার উত্তরাধিকারী দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে পৌছানোর জন্য। জ্যোতিষী এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সতর্কতার সঙ্গে আমি হিন্দুস্থান অভিযানের দিনক্ষণ স্থির করেছিলাম। আমার পরামর্শদানকারী ব্যক্তিরা সূর্যের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত ছিল। আমি যখন পাঞ্জাব অতিক্রম করছি তখন বর্ষণজনিত কারণে মাটি ছিল কর্দমাক্ত। আমি যখন যমুনার তীরে পৌছলাম তখন প্রকৃতি শীতল। আকাশ আমার প্রাসাদের ছাদে টালির মতই নীল এবং বাতাস সমরখন্দের বসন্তের নির্মল বায়ুর মতই মৃদুমন্দ।

আমি যমুনার তীর ধরে অগ্রসর হয়ে সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের নির্মিত শহরটি দেখলাম, যার নাম ফিরোজাবাদ বা কোটলা ফিরোজ শাহ। ফিরোজ শাহ তার প্রাসাদের শীর্ষে সম্রাট অশোকের সময়কার একটি স্তম্ভ স্থাপন করেছেন। দেড় হাজার বছর পূর্বে এই বিধর্মী হিন্দুস্থান শাসন করেছিলো। এই স্তম্ভে সম্রাট অশোকের ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম বুদ্ধের বাণী উৎকীর্ণ করা রয়েছে। আমাদের ক্ষত-বিক্ষত করার পূর্বেই আমি এর বিনাশ সাধনে সক্ষম হলাম। মাহমুদ তুগলক তার উজির মাল্লু খান ইকবালের পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে ১৩৯৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বিপুল সৈন্যবাহিনী সহকারে রণদামামা বাজিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলেন আমার বাহিনীকে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে। তার সেনাপতিরা প্রথমে সমাবেশ ঘটালো এক সারি হাতীর। হাতীর পিঠে মারণাস্ত্রধারী যোদ্ধা দল। এটি যেন মন্থর গতির চলন্ত দুর্গ। আমরা এ জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের অশ্বারোহী বাহিনীর ঠিক পিছনেই মাটিতে তীক্ষ্ণ শলাকা পুঁতে দিয়েছিলাম। আমরা কশাকদের মত ঝটিকা হামলা চালিয়ে পশ্চাদাপসরণের কৌশলের উপর নির্ভর করতাম। আমাদের অশ্বারোহীরা তাদের হস্তিবাহিনীর উপর আপতিত হয়ে তীর ছুঁড়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করলো। এই প্রক্রিয়া বারবার চালানোর ফলে তুগলক বাহিনীর বহু সৈন্য হতাহত হলো। সেনাপতিরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের সৈন্যদের উপর চড়াও হলো। তাদের হাতী অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। কারণ হাতীর পা আমাদের পুঁতে রাখা তীক্ষ্ণ শলাকায় গেঁথে যাওয়ায় হাতী অস্থির হয়ে উঠলো এবং তাদের সামনে ঠেলে দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়লো। আমরা শত্রুবাহিনীর দুই পার্শ্ব থেকে আমাদের উষ্ট্র বাহিনী চালনার নির্দেশ দিলাম। প্রাণীর মধ্যে হাতী উটকেই ভয় করে। উটগুলোর পিঠে ছিল খড়। খড়ে আগুন লাগিয়ে দেয়ার পর হস্তিবাহিনী আতংকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে হস্তিকুল বিতাড়িত হওয়ায় তুগলকের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী আমাদের মুখোমুখি হলো। আমরা 'আল্লাহু আকবর' শব্দে গগণ বিদীর্ণ করলাম। তুগলকের বাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দিলো। সেনাপতিরা শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো। সৈন্যরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলো। আমি আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। আল্লাহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তিনি আমাদের তরবারিকে বিজয়ের সম্মান দান করলেন।

দু'দিন পর ২১শে ডিসেম্বর আমরা বিশাল পুকুর 'হাউজ-ই-আলাই' এর পাশে অবস্থিত

মাদ্রাসায় শিবির সংস্থাপন করলাম। ফিরোজ তুগলকের সমাধিতে ফাতেহা পাঠ করলাম এবং যোহর নামাজের পর শিরি, জাঁহাপনা এবং মেহরুলির অধিবাসীরা এসে আমার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করলো। তারা হাজারে হাজারে এসে আমার কাছে নজরানা পেশ করলো। মাথা থেকে পাগড়ী ও টুপি খুলে আমার পদতলে নিবেদন করে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। একদল উলেমা পবিত্র কোরআন আমার হাতে তুলে দিয়ে নিবেদন করলেন যে, একজন মুসলিম হিসেবে আমি যেন আর মুসলিম রক্তপাত না করি। তারা নগরীর চাবি আমার হাতে অর্পণ করলেন এবং আমাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমি তাদের অনুরোধ গ্রহণ করে তাদেরকে আমার সেনাপতির সাথে বিস্তারিত আলোচনা করার পরামর্শ দিলাম।

পরদিন শুক্রবার কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে আমার উপস্থিতিতে জু'মার খোতবা পাঠ করা হলো। আমি কুতুব মিনার পরিদর্শনের পূর্বে সুলতান ইলতুৎমিশ, সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর মাজারে ফাতেহা পাঠ করলাম। তাদের নির্মাণ কৌশলে আমি বিমুগ্ধ হলাম। এই হিন্দুস্থানীরা এতো বিশাল কাজ হাতে নিয়ে স্বর্ণকারের মত নিপুণভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে। আমি তাদের নির্মাণ কুশলীদের আমার সাথে নিয়ে সমরখন্দের মসজিদ নির্মাণের কাজে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এরপর আমি মেহরুলিতে গিয়ে দরবেশ কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাজার জিয়ারত করলাম। আউলিয়া মসজিদেও গেলাম, যেখানে মহান দরবেশ কৃচ্ছসাধন করেছিলেন। নগরবাসীরা আমাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বিপুল আয়োজন করেছে। মসজিদের পাশে শামসি তালাবে সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। আমি সর্বত্র ভীতির চিহ্ন কাটিয়ে উঠার পরিবেশ প্রত্যক্ষ করলাম।

আমার হারেমের নারীরা 'কাসর-ই-হাজার' দেখার জন্য উদগ্রীব ছিল। হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারে ফাতেহা পাঠ করতে গিয়াসপুর যাওয়ার সময় আমি তাদেরকেও সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিলাম।

হিন্দুস্থানের মানুষের মন আমাদের প্রতি তোষামোদী থেকে ঘৃণায় পর্যবসিত হতে দীর্ঘ সময় লাগলো না। আমরা তাদের প্রতি যে ক্ষতিপূরণের অর্থ দাবী করেছিলাম তা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য অজুহাত দেখানো শুরু করলো। রাতের অন্ধকারে অনেকে তাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ শিরি, মেহরুলি ও জাঁহাপনা থেকে পালিয়ে গেল। নগরীর প্রবেশ পথে আমরা যে রক্ষী বসিয়েছিলাম তাদেরকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। আমি সৈন্যদেরকে এই শহরগুলোতে প্রবেশ করে আমার ধ্বংসের হাত প্রসারিত করে প্রতিটি সক্ষমদেহী পুরুষকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস হিসেবে বন্দী করার নির্দেশ দিলাম। পরবর্তী দশটি দিন আমার সৈন্যদের তরবারি রক্তের মাঝে নৃত্য করলো। অগণিত লোক নিহত হলো। কেউ বলে ৫০ হাজার, অন্যেরা বলে ৫ লাখ। আমার সৈন্যরা কি পরিমাণ মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ ও রৌপ্য হাতিয়ে নিতে পেরেছিল তারও কোন পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। আমার বাহিনীর একজন দুর্বল পদাতিক সৈনিক ও অন্ততঃ দুই ডজন দাসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দিল্লীতে তারা যে সম্পদ দখল করতে সক্ষম হলো তা তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত টিকবে। আমার স্মরণ হলো যে, এক রাতে মহানবী (সঃ) স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, আমার বংশের ৭২তম উত্তরাধিকারী সার্বভৌম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে। সেই ভবিষ্যদ্বাণী পরিপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলেই মনে হয়। আমি আর বিলম্ব না করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দিল্লীর সম্পদ দ্বারা আমরা অসংখ্য হাতী ও উঠের পিঠ বোঝাই করলাম। এছাড়া হাজার হাজার দাস নিয়ে আমরা গৃহাভিমুখে যাত্রা শুরু করলাম। যমুনা অতিক্রম করে আমার সৈন্যদল মীরাট তছনছ করলো। এরপর আমরা পর্বতের পাদদেশ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। পথে একস্থানে হিন্দু ব্রাহ্মণরা আমাকে সতর্ক করলো, আমি যেন তাদের দেবতা কৃষ্ণের মূর্তি স্পর্শ না করি। এই দেবতা নাকি এতোই শক্তিশালী ও বীর্যবান যে, এক রাতে তিনি ১৬শত রমণীকে গর্ভবতী করতে পারেন। কৃষ্ণের সুবর্ণ মূর্তি একজন মানুষের উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল। ক্রন্দনরত ব্রাহ্মণদের চোখের সামনে আমার সৈন্যরা সুবর্ণ মূর্তিটি টুকরো টুকরো করে ফেললো এবং ব্রাহ্মণদের শিরোচ্ছেদ করা হলো।

এক মাস পর আমার বিজয়ী বাহিনী সমরখন্দে ফিরে এলো।

এদিকে দিল্লী থেকে খারাপ সংবাদ আসতে লাগলো। আমি জানতে পারলাম, আমরা দিল্লী

ছেড়ে আসার পর মৃতদের কবর দেয়ার মত লোকও ছিল না। মৃত দেহের পচনে মহামারি শুরু হয়। যারা জীবিতও ছিল তারা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেকগুলো মাস দিল্লী ছিল কাক, চিল, শকুন, পেঁচা, শিয়াল ও হায়েনার শহর। কিন্তু আমার জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণ হয়েছে। আমি আমার যৌবনে উপলব্ধি করেছিলাম যে, যেহেতু বেহেশতে একজন মাত্র আল্লাহ আছেন, অনুরূপ পৃথিবীতেও মাত্র একজন বাদশাহ থাকতে পারে। আমাকে যখন আল্লাহ সুযোগ দিলেন তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে আমার শাসনাধীনে আনতে চেষ্টা করেছি। আমার সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমি এক হাতে ন্যায়বিচার এবং আরেক হাতে সাম্যের ঝান্ডা তুলে ধরেছি। এই দুই-এর আলো আমার রাজপ্রাসাদকে আলোকিত রেখেছে। অনেকে আমাকে দোষারূপ করে রক্তপাত ঘটানোর জন্য। এক সময়ে মুর্খ খাজা ওবায়েদ আমার নামে খোতবা পাঠ না করার জন্য মুসলমানদের প্ররোচিত করে। কারণ আমার হাতে মুসলিম রক্তের দাগ। সেই রাত্রিতে মহানবী (সঃ) স্বপ্নযোগে খাজা ওবায়েদকে সাক্ষাৎ দিলেন এবং তার সালাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিরস্কার করলেন, তৈমুর যদিও আমার উম্মতের অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, তবু সে আমার বন্ধু, অনুসারী এবং আমার বংশধরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তুমি কেন লোকদের নিষেধ করছো তার জন্য দোয়া করতে?

আমি যদি কোন পাপ করে থাকি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।

৭

ভাগমতী

রাতে বৃষ্টি হয়েছে এবং আমি ঘুম থেকে জাগা মাত্র ভেজা মাটির গন্ধ আমার নাকে লাগলো। ঠান্ডা পড়ছে। আমার পায়ের কাছে হটওয়াটার বটল তার উত্তাপ হারিয়েছে এবং লেপের নিচে আমি কাঁপছি। আমার অ্যাপার্টমেন্টের পাশে এক ধরনের আওয়াজ পাচ্ছি, পানি পড়ার শব্দের মত। টেবিল ল্যাম্পের সুইচ অন করলাম। ভোর সাড়ে চারটা। সুইচ অফ করলাম। আবার ঘুমাবার চেষ্টায় উরুর মাঝে দুই হাত গুজে দিলাম। আওয়াজটা আসছেই। এই শীতের সকালে, প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে লোকগুলো কি করছে?

শেষ পর্যন্ত আমাকে উঠতে হলো যখন বাবুর্চি ধুমায়িত এক মগ চা নিয়ে বিছানার পাশে এলো। সে ইলেকট্রিক হীটারটা চালু করে দেয়ায় বেডরুম উষ্ণতায় ভরে উঠলো। বললাম, 'বেশ ঠান্ডা পড়েছে।' বাবুর্চি বললো, 'হ্যাঁ, রাতে বৃষ্টি পড়েছে। আমি কি আপনার নাশতা দেব? সকাল সকাল বাইরে বেরুতে চাই।'

'কেন?'

'কুচকাওয়াজ দেখার জন্য। আজ প্রজাতন্ত্র দিবস। লোকজন আরো কত ভোরে উঠে যাচ্ছে সামনের দিকে একটা ভালো জায়গায় বসতে, যাতে ভালো করে কুচকাওয়াজ দেখতে পার। বুধ সিংও আজকের দিনের জন্য ছুটি চায়।'

'দু'জনই যদি না থাকে তাহলে এর চাইতে আর ভালো কি হতে পারে। ভাগমতী যদি জানতে পারতো যে আজ ছুটির দিন তাহলে পুলিশ ব্যারিকেড দেয়ার আগেই সে শহরের এই এলাকায় এসে পড়তো। ফায়ার প্লেসের পাশে কার্পেটের উপর আমরা গণতন্ত্র দিবস উদযাপন করতে পারতাম। কিন্তু সে সংবাদপত্র পাঠ করে না অথবা তাকে যে ট্রানজিস্টরটা দিয়েছি তাতে বিবিধ ভারতীর ফিল্মী গান ছাড়া আর কিছুই সে শুনে না। যা হোক, আশা আছে। বহু সপ্তাহ কেটে গেছে কারো সাথে মিলিত হইনি। বিস্ফোরনোন্মুখ অবস্থা হয়েছে। আমি বাবুর্চিকে বললাম টেবিলে নাশতা দিয়ে ড্রয়িং রুমের ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে দেয়ার জন্য।

আমি ড্রয়িং রুমে আসার আগে থেকেই আগুন জ্বলছিল। আকাশ স্বচ্ছ এবং জানালা দিয়ে সূর্যের আলো পড়ছে। রাজপথ ও কনট সার্কাস হয়ে অসংখ্য মানুষ শোভাযাত্রার মত যাচ্ছে গায়ে শাল, গলায় মাফলার জড়িয়ে। নিজেকে একক নিঃসঙ্গতায় সেরা মনে হলো। কুচকাওয়াজ সম্পর্কে আমি সংবাদপত্রে পড়তে পারি। রেডিওতে ধারা ভাষ্য শুনতে পারি। ভাগমতীর যদি তেমন বোধ থাকে তাহলে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে একটা ত্রিরঙ্গা পতাকা উত্তোলনও করতে পারি। আমার এমন আশার কারণ হলো, ভাগমতী সচরাবচর কোন ছুটির দিন মিস করে না।

মানুষের স্রোত প্রায় থেমে গেছে। অ্যাপার্টমেন্টের পর অ্যাপার্টমেন্ট জনশূন্য হয়ে গেছে। সবাই গেছে সুসজ্জিত হাতী, মরুভূমিতে টহল দেয়া উটের বহর, ট্যাংক, উপজাতীয় নর্তকী দল দেখতে। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং দিল্লীতে নিজেকে কিছু একটা ভাবে- তারা সবাই সেখানে উপস্থিত। আমি রেডিও খুলেই কামানের গোলা বর্ষণের শব্দ শুনতে পাই। প্রেসিডেন্টের সম্মানে একুশবার তোপধ্বনি। তিনি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর দলগুলোর সালাম নেবেন

এবং গান্ধীর অহিংসা ও শান্তির বাণী বিশ্ববাসীকে শোনাবেন। এছাড়া থাকবে নেহেরুকে চুম্বন দানকারী শিশুর দল। এই ছোটছোট বেজন্মাগুলোর 'চাচা' হচ্ছে নেহেরু।

একুশবার তোপধ্বনি হয়। আমার দরজার ঘন্টা বাজে। ভাগমতী আমাকে হতাশ করেনি। 'কি চমৎকার সংযোগ। ভেবেছিলাম তুমি ভুলে গেছো। কিন্তু কি করে ট্রাফিক জ্যাম এড়িয়ে এলে?' আবেগ গোপন না করেই কথাগুলো বলি।

'জগতে এমন কোন্ বাধা আছে যা আপনার বিশ্বাস অর্জনকারী দাসীকে বাধা দিতে পারে? এখনো তেমন কারো জন্ম হয়নি।' দু'হাত আগুনের উপর প্রসারিত করে সে বলে। 'বরফ যেন আমার হাড্ডির মাঝে প্রবেশ করেছে। দিল্লীওয়ালারা কেমন চুথিয়া। বছরের পর বছর ধরে এই শীতের মধ্যে একই কুচকাওয়াজ দেখতে যায়।'

আমি তাকে এক মগ কফি দেই। তাতে একটু রাম মিশিয়ে দিয়েছি। কথা বলায় সে এতো ব্যস্ত যে এর গন্ধ বা স্বাদের পার্থক্য সে বুঝতে পারে না। কফি শেষ করে তার ঠান্ডার প্রকোপ কাটে। আমার মধ্যে গণতন্ত্র দিবস উদযাপনের তাগিদ। আমি বিপুল আগ্রহে আমার লক্ষ্যে উপনীত হতে চেষ্টা করি। হাজার কণ্ঠে আওয়াজ উঠে 'জয় হিন্দ।' ষাট সেকেন্ডের মাথায় আমার উন্মাদনা শেষ হয়।

ভাগমতীকে লাল কুয়ানে পৌঁছে দিতে পারলে বাঁচি। কিন্তু আমার কথা মান্য করার কোন ইচ্ছা তার মধ্যে নেই। আমার ব্যাপারে সে হতাশ এবং সেই হতাশায় আমাকেও না জড়িয়ে ছাড়বে না সে। আমি তাকে এতো কিছু শিখিয়েছি, কিন্তু সে প্রথম শিক্ষা পর্যন্ত ভুলে গেছে- ধৈর্যধারণ। তাহলে কি করে মাশুকার জন্য দ্বিতীয় শিক্ষা দেই? তৃতীয় শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ঃ যখন তুমি আলো জ্বালবে, তখন দেখতে হবে আলো নেভার পূর্বেই সব কাজ সেরেছো। দশহরার দিনে জ্বলন্ত শ্রীলংকার মত মাশুকার হৃদয়ে যখন আগুন জ্বলে তখন তুমি ফায়ার ব্রিগেডের পানি শূন্য হোসপাইপ হলে চলবে না।

অসহ্য, অসম্ভব এক কুত্তী! তার শরীরে অগ্নিসংযোগ না করা পর্যন্ত আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। তাকে ঠান্ডা করতে হবে এবং আমাকে আবার উত্তপ্ত হতে হবে। আমি ক্ষমা চেয়ে পরামর্শের ভঙ্গিতে বলি যে, লোকজন তাদের বাড়ীর পথ ধরার পূর্বেই আমাদেরকে বের হতে হবে। কিন্তু সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাতাস ঠান্ডা এবং সূর্যতাপ উষ্ণ। বিশ্ব যেন নিজেকে ধৌত করেছে। পরিষ্কার এবং সবুজ। দিল্লী ফুলে ফুলে শোভিত, গোলাপ, পয়েনসেটিয়া বোগেনভিলিয়া। আমি ভাগমতীকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাচ্ছি সাদা বাঘের পরিবারটিকে দেখাতে। অন্যান্য দর্শকের নিশ্চয়ই একই ভাবনা। প্রবেশ পথে বেশ ভিড়। অতএব চিড়িয়াখানার উত্তর প্রান্ত পুরানো কিল্লার দিকে যাই। জায়গা জনশূন্য। আমি তাকে সিঁড়ি বেয়ে কূঁপের কাছে নিয়ে আসি। ঠান্ডা বরফতুল্য পানি স্পর্শ করি। এরপর ফিরে আসি শেরশাহ মসজিদে। ভাগমতী আঁচল দিয়ে মাথা ঢাকে। আমার সাথে তার পরিচয়ের বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও আমি নিশ্চিত হতে পারিনি যে, সে মুসলমান না হিন্দু। তার মতে, সে দু'টোই। বরং তার চেয়েও বেশী। কারণ সে এখন শিখ। আমরা রোদে হাঁটাহাঁটি করি। তাকে বলি, জায়গাটার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ, দিল্লীর প্রথম নগরী, যা পাণ্ডবরা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ কথায় কিছু সমস্যার সৃষ্টি হলো। কারণ দ্রৌপদী ও তার পাঁচ স্বামী সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানে। তিক্ততার সুরে সে বলে, 'এখনকার পুরুষ মানুষ কেমন, তা দেখে প্রতিটি মহিলার উচিত পাঁচটি স্বামী গ্রহণ করা।'

ভারতীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানগুলো নীল আকাশ অতিক্রম করে যাচ্ছে, সাদা ফিতা আকাশে ছড়িয়ে। এরপর কয়েকটি হেলিকপ্টার গোলাপ ও গাঁদা ফুলের পাপড়ি নিক্ষেপ করতে করতে উড়ে গেল। প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা শের মন্ডল টাওয়ারে আরোহন করি ভালোভাবে দেখার জন্য। তাকে বলি, এটা ছিল একটা লাইব্রেরী, যার নির্মাতা শের শাহ সূরী। অষ্টকোণাকৃতি শূণ্য কক্ষটি নির্দেশ করে সে বলে, 'কিন্তু কোন বই নেই।' তাকে বলি, লাইব্রেরীটা ছিল সাড়ে চারশ' বছরেরও বেশী সময় পূর্বে। সে বুঝতে পারে।

আমরা লক্ষ্য করি বাস, কার, স্কুটারের দীর্ঘ সারি মথুরা রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম প্রান্ত ঠান্ডা এবং বাতাস বইছে জোরে। অতএব আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল পূর্ব প্রান্তে গেলাম। শ্বেত পাথরের গম্বুজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভাগমতী বলে, 'আমি ওটা সম্পর্কে জানি।' জায়গাটা আধ

মাইল দূরে। 'ওটা বাদশাহ হুমায়ুনের মাজার। তার কবরের উপর গম্বুজটা তৈরী করেছে তার বেগম। আমি মারা গেলে কি আপনি আমার জন্য অমন একটা গম্বুজ তৈরী করবেন?'

তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেছে। আমার হাত তার হাতে তুলে নেয়। এক সাথে সংকীর্ণ অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অবতরণ করি। হঠাৎ এক ধাপ নামতে পা ফসকে পড়ে যাই। পাছায় ভীষণ চোট লাগে। ভাগমতী আর্তনাদ করে উঠে, 'ইয়া আল্লাহ, এই খুনী সিঁড়ির ধাপ টপকাতে আরো হুশিয়ার থাকবেন। মুখটা যদি সামনে পড়তো, তাহলে আপনার মাথাটা ভাঙ্গতো।'

'ঠিক বলেছো।' আমি উৎফুল্লচিত্তে বলি, 'চারশ' ত্রিশ বছর আগে ঠিক এই দিনে ১৫৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী সম্রাট হুমায়ুন এই সিঁড়িতে পা ফসকে পড়ে মারা যান।'

আমার জ্ঞানের বহর দেখে ভাগমতী খুশী হয়। কিন্তু পিছনে কথা বলতে সে ছাড়ে না, 'তিনি নিশ্চয়ই তার বেগমের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামছিলেন। আমি আপনাকে বলতে পারি একজন ধৈর্যহীন প্রেমিক সবসময় দুঃখের মোকাবিলা করে।'

'না তিনি বেগমের সাথে শয্যায় যেতে অধৈর্য হতেন না। কিন্তু আজান শুনলে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে উদগ্রীব হয়ে উঠতেন। সে জন্য আল্লাহ তাকে ডেকে নিয়েছেন তার কাছে।'

ভাগমতী মোনাজাতের ভঙ্গিতে দুই হাত তার মুখের সামনে তুলে ধরে এবং মৃত সম্রাটের রুহের শান্তি কামনায় বিড়বিড় করে কিছু উচ্চারণ করে। এরপর আমরা বাড়ি ফিরে আসি।

দিনটি বোধহয় আমার জন্য শুভ ছিল না। আরম্ভটাও ভালো হয়নি। ভাগমতী আমাকে চাঙ্গা করতে সাধ্যমত চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি নিজেকে চাঙ্গা করতে পারছিলাম না। আমি তাকে বলি, আমি বুড়িয়ে যাচ্ছি এবং কোনকিছুই আমাকে আর চাঙ্গা করতে পারবে না। সে বিরক্তির সুরে বলে যে, আমি বুড়ো হচ্ছি না, বরং বদলে যাচ্ছি এবং আমাকে চাঙ্গা করার জন্য প্রয়োজন একজন মেম সাহেবের।

আমার জীবনে অন্যান্য নারীদের ব্যাপারে ভাগমতীর অতিরিক্ত একটি ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। আমি তার সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন এড়িয়ে চলি এবং চোখের দিকে তাকাই না। ছোটখাট বিষয়ে আলাপ করে আমরা বিকেলটা কাটাই। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে নগরীতে আলোকসজ্জা দেখানোর প্রস্তাব দিয়ে তার ক্ষোভ দূর করার চেষ্টা করি। সে কাঁধ ঝাঁকায় এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সচিবালয়, রাষ্ট্রপতি ভবনের চমৎকার আলোকসজ্জার দিকেও তার তেমন মনোযোগ নেই। ভিড়ের মধ্যে খুব ধীরে এগুতে হচ্ছে। পার্লামেন্ট স্ট্রীট, কনট সার্কাস হয়ে আজমেরী গেটের কাছে উপনীত হতে ৯টা বেজে গেল। আমি ভাগমতীর হাতে দু'টি দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে দিলাম। সে নিরাসক্তভাবে টাকার দিকে দেখলো এবং সিটের উপর নিক্ষেপ করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভাগমতীর হলোটা কি? সে ক্রমশঃ হিংসুটে হয়ে উঠছে। একদিন সে একথা বলেও ছিল যে, 'আমি জানি আপনি বলবেন, কোন কিছু সম্পর্কে বা কারো ব্যাপারে আপত্তি জানাবার আমি কে? আমি তো পুরনো কিল্লার মত, যা আপনি জয় করে ফেলেছেন। এখন আপনি চান লাল কিল্লা এবং এর শ্বেতপাথরের প্রাসাদ।' ভাগমতী যেভাবে কথা বলে তার সাথে ব্যঙ্গ করাটা খাপ খায় না। সে আমাকে রীতিমত উত্যক্ত করতে শুরু করেছে। তাকে এড়ানোর যত কৌশল অবলম্বন করি, সে যেন আমাকে তত আঁকড়ে ধরে। অন্যান্য হিজড়াদের সাথে কোন আসর সাঙ্গ করে ফেরার পথে সে আমার অ্যাপার্টমেন্টে খোঁজ নেয় যে, আমি আছি কিনা। আমি না থাকলে সে বুধ সিং-এর কাছে খোঁজ নেয়। বুধ সিং কখনো সদুত্তর দেয় না। তাকে ক্ষেপানোর উদ্দেশ্যেই হয়তো বলে দেয়, 'হুজুর আমেরিকান মিসি বাবার সাথে বাইরে গেছেন।'

আমেরিকান মিসি বাবাটা হচ্ছে ষোড়শী জর্জিন। কিন্তু এই বিদেশী কিশোরীর ব্যাপারে ভাগমতীর উদ্বিগ্ন হবার কি আছে। অন্য কোন মহিলা সম্পর্কে সে কোন রকম তোয়াক্কার ভাবও দেখায়নি। কিন্তু বাজারের একজন সাধারণ বেশ্যার কি অধিকার আছে তার অনেক খদ্দেরের একজন যদি তার সাথে না থাকে তা নিয়ে আপত্তি করার? যা হোক, জর্জিনের ব্যাপারে ভাগমতীর একটা আপত্তির ভাব। জর্জিনের সাথে মাখামাখিতে আমিও কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। আমি

সবসময় তার সম্পর্কে বলি এবং আমিই প্রথমে ভাগমতীকে তার কথা বলেছি।

আমার জন্য বছরটা খুব খারাপ ছিল। আমার লিখার কাজ খুব ছিল না এবং আমি ভারতের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে যা পাচ্ছিলাম তা আমি যে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মোটেও পর্যাপ্ত নয়। সে জন্য আমাকে ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগে গাইড হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়েছিল এবং বিদেশী দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার দফতরগুলোতে আমার কার্ড রেখে আসতাম। পর্যটনের মওসুমে, অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রায় আমার বেশ ভালো আয় হয়, যা আমি অফিসিয়াল রেটের চাইতে অধিক মূল্যে টাকায় রূপান্তরিত করি। আমি হোটেল, কুরিয়ার ডিলার, জ্যোতিষীদের নিকট হতেও কমিশন লাভ করি।তাদের কাছে বিদেশীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিদেশীরা আমাকে তাদের গাইড নিযুক্ত করে। তারা ফিরে যাওয়ার সময় তাদের স্কচ মদের বোতল আমাকে দিয়ে যায়। কখনো কখনো মাঝবয়সী রমণীরা তাদের হোটেল কক্ষে আমাকে আমন্ত্রণ এবং তাদের যে সার্ভিস দিলাম সে জন্য উপঢৌকন দেয়।

কাজটা খুব কঠিন নয়। কিছুসংখ্যক রাজবংশ ও সম্রাটের নাম এবং কখন তারা এদেশে শাসন করেছে তা মুখস্ত করার পর তাতে কিছু রস ও মসল্লা যোগ করে পরিবেশন করাই আমার কাজ। কুতুব মিনারে গিয়ে আমি তাদের বলি যে এখানে কত লোক ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমি তাদেরকে সম্রাট হুমায়ুনের পিতা বাবরের কথা বলি, যিনি পুত্রের রোগশয্যার চারদিকে চারবার প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন পুত্রের ব্যাধি তার দেহে সংক্রমণের জন্য এবং কিভাবে হুমায়ুন আরোগ্য লাভ করেন ও এর কয়েকদিন পরই বাবার মারা যান। লাল কিল্লা এবং সেখানকার প্রাসাদ সম্পর্কে আরো অনেক চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করি। এর নির্মাতা সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল হতে যারা ময়ুর সিংহাসনে আরোহণ করেছে, যাদের হত্যা বা অন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর দুর্গটা দখল করে নেয় বৃটিশরা, সেখানে ফাঁসি দেয়া হয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসারদের, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন কিল্লার উপর থেকে বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নেন এবং ভারতের ত্রিরঙ্গা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তা বিস্তারিত বলি। এর বাইরে আমার আর কোন কাজ থাকে না।

কিছুদিনের মধ্যে আমি কাজটি পছন্দ করতে শুরু করি। যদিও আমি এমন সম্ভাবনা দেখি না যে, কেউ আমাকে বিশ্বটা ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটা ফ্রি টিকেট দেবে। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে যে গোটা বিশ্বই আমার কাছে হাজির হয়েছে। ইংল্যান্ডের এক ফ্যাক্টরীতে চাকরিরত আমার এক চাচাতো ভাই একবার আমাকে বলেছিল যে, একই ফ্যাক্টরীতে কর্মরত কতগুলো শ্বেতাঙ্গিনীকে সে 'হত্যা' করেছে। আমিও তাকে বলেছিলাম যে এই দিল্লীতে বাস করেই এবং চার আনার একটা অচল মুদ্রা খরচ না করেও আমি তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক ইউরোপীয়, আমেরিকান, জাপানী, আরব ও আফ্রিকান মহিলাকে 'হত্যা' করতে সক্ষম হয়েছি। ভাইটি মুখ দিয়ে যেন লালা ঝরতে শুরু করে এবং হিংসায় নিজের অন্ডকোষ চুলকাতে শুরু করে।

কিন্তু আমার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ার কোন সুযোগ কখনো হয় না। সব মেরী, জেনস, ফ্রাংকোসিস, মিকিস আমার সাথে প্রেম করেছে, আমাকে এক বা দু'দিন আনন্দ দান করেছে, বাস এরপরই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আমিও তাদের নাম বা মুখ আর স্মরণ করতে পারি না। শুধু মনে করতে পারি যে, আমি যখন তাদের প্রসারিত উরুর যথার্থ ব্যবহার করতে গেছি তখন তারা কেমন ব্যবহার করেছে। কেউ বিছানায় নির্জীব পড়ে থেকেছে। কেউ চরম অবস্থায় অদ্ভুত আওয়াজ করেছে। কেউ কেউ মুখে বাজে শব্দ উচ্চারণ পছন্দ করেছে, আমার মুখে চড় মেরে বলেছে, 'যা করার ভালোভাবে করো।'

কিন্তু আমেরিকান মিসি বাবা জর্জিনের সাথে সম্পর্কটা ছিল একেবারে ভিন্ন রকমের। মার্কিন অ্যামবেসীতে আমার যোগসূত্র ছিল কার্লাইল নামে এক ব্যক্তির সাথে। আমি জানি না, অ্যামবেসীতে তার কাজ কি। তবে এটুকু জানি যে, কেউ ভারতে এলে তাদের দেখাশুনার ভার তার উপর পড়ে। গাইড নিয়োগ করার কাজটাও তার। একদিন সে আমাকে আশ্বস্ত করে যে, আমি যদি কোন পর্যটকের সাথে হ্যাংকি প্যাংকি না করি তাহলে আমাকে অনেক কাস্টমার জুটিয়ে দেবে। আমেরিকানরা আমার সবচেয়ে ভালো কাস্টমার। তাদের চমৎকার আচার ব্যবহার ছাড়াও

অন্যান্য বিদেশী অপেক্ষা তারা অনেক বেশী উদার। আমি বিশেষ করে কার্লাইলের লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম। আমি তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ, নম্র এবং একটা দূরত্বও রক্ষা করি। তাদের জন্য গাড়ীর দরজা খুলে দেই, বখশিশের জন্য হাত পাতি না অথবা তাদের টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বল পেনের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাই না। (কারণ আমি জানি তারা আমার জন্য কিছু নিদর্শন রেখে যাবে।) আমি কমিশন পাবার লোভে তাদেরকে বড় বড় দোকানে নিয়ে যাই না। তবে যথাসম্ভব কম দামে ভালো জিনিস কেনার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি। বৃটিশ ধাঁচে আমার ইংরেজী উচ্চারণ আমেরিকানদের প্রভাবিত করে অন্য ইংরেজী ভাষীদের চাইতে বেশী। তাদের কাছে আমি ভদ্র গাইড, সম্ভ্রান্ত মানুষ, ভাগ্যচক্রে অবস্থা খারাপ হয়েছে বলে গাইডের কাজ করছি। কথাটা সত্য।

কার্লাইল আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় জর্জিনের সাথে। জর্জিন মিসেস কালাইলের ভাতিজী। দিল্লীতে এসেছে ক্রিসমাস ছুটি কাটাতে। কার্লাইল তার দ্বিতীয় নামটি আমাকে না জানিয়েই বলে, 'এই হচ্ছে জর্জিন।' আমার দিকে দেখিয়ে বলে, 'এ তোমার গাইড।' জর্জিন বলে, 'হাই।'

আগেই বলেছি সে ষোড়শী। মুখে ব্রণ। স্তন বিশাল। গাধার ওলানের চাইতে বড়। ARIZONA লিখিত একটি টাইট ফিটিং সোয়েটার তার গায়ে এবং ততোধিক আঁটোসাটো জিনসের ট্রাউজার। আমি জানতে চাই, কি বিষয়ে তার আগ্রহ অধিক। মানুষ না স্মৃতিসৌধ। সে কাঁধ ঝাঁকায়, মুখ খুলে এবং জবাব দেয় খানিকটা অভিযোগের সুরে, 'কি করে আমি জানবো? দু'টোরই কিছু কিছু বলে আমার ধারণা।' সে আমার হাতে একটা মিনি ক্যামেরা ধরিয়ে দেয় কার্লাইল পরিবারের সাথে তার ছবি তোলার জন্য। জর্জিন দ্রুত কথা বলে এবং যে সব শব্দের শেষে 'শব্দ' 'ing' থাকে তার অধিকাংশ থেকে 'g' বাদ পড়ে যায় 'goin', 'comin', 'gettin', 'seein' ইত্যাদি। তার অঙ্গভঙ্গিও দেখার মত, খুব দ্রুত এবং নীল চোখ ও হাত দিয়ে কথা বলে বেশী। অনেক সময় নাঁকি সুরেও বলে এবং বলার সময় মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে জিহ্বা বের করে দেয়।

ফটো তোলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমার দিকে ফিরে বলে, 'আমরা তাহলে অপেক্ষা করছি কেন?'

আমি গাড়ীর পিছনের দরজা খুলি। সে অবজ্ঞার সাথে ড্রাইভারের পাশের সিটে গিয়ে বসে। আমি পিছনের সিটে বসে বলি, 'মিস...

'আমার নাম জর্জিন!'

'মিস জর্জিন, তুমি কি...'

'মিস্ জর্জিন নয়, শুধুমাত্র জর্জিন। আশা করি কিছু মনে করবে না।'

'আমি বলতে চাচ্ছিলাম, তুমি কি ভারতীয় ইতিহাস কিছু পাঠ করেছো। কারণ আমরা দেখতে যাচ্ছি....'

'একজন আমেরিকান হাইস্কুল ছাত্রীকে এ ধরনের প্রশ্ন করা অনুচিত। যীশুর নামে বলছি, আমাকে কেন ভারতের ইতিহাস পাঠ করতে হবে?' আমি শান্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেই। দিল্লী গেট হয়ে ফয়েজ বাজারে প্রবেশ করি। সে জানতে চায়, 'এই লোকগুলো কি করছে?'

'সব্জী বিক্রি করছে। ওরা সব্জী বিক্রেতা।' সে আমার দিকে তাকায় এটা দেখতে যে, আমি সত্যিই মানুষ কিনা। কারণ আমার কথায় সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

আমরা ফয়েজ বাজার অতিক্রম করছি। বাম দিকে শাহী জুমা মসজিদ। ডান দিকে লালকিল্লার সুউচ্চ প্রাচীর। সে চালককে থামতে বলে এবং ছবি তোলে। আমরা লালকিল্লার ফটক পর্যন্ত যাই এবং অবতরণ করি। আমি টিকেট নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়াই এবং জর্জিন ছবি তুলতে থাকে। চাঁদনী চক, টোঙ্গা, হকার, ভিখারী সবকিছুর ছবি তুলছে। ফটকের প্রহরীদের ছবিও সে তুলে। আমরা বিভিন্ন উপঢৌকন সামগ্রীর দোকানের সারির কাছে পৌছি তখন সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চীৎকার করে। 'আমি সবকিছু নিতে চাই। কত দাম পড়বে?' সে এই দোকান থেকে সেই দোকান- প্রতিটি দোকানে যায়। একটা জিনিস তুলে, দেখে আবার নামিয়ে রাখে। জর্জিন খুব ধূর্ত। সে কিছুই কিনে না। কাঁচের কাসকেটে সাজানো মার্বেলের একটি তাজমহল তুলি। দোকানীর উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকাই। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝতে দেয় যে, এটা জর্জিনকে সে ফ্রি

দিচ্ছে উপহার হিসেবে।

'সত্যিই! কেন?' আমার হাত থেকে নিয়ে সে খুশীতে তার বিশাল স্তনের সাথে চেপে রাখে। 'এটা খুব সুন্দর। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!' সে আমার নাকে তার ঠোঁট ছোঁয়ায়, 'আর এটা তোমার জন্য।'

ফেরার পথে সে আমার পাশে পিছনের সিটে বসে। আমি যখন ড্রাইভারকে বলি জুমা মসজিদের দিকে নিতে। সে আপত্তি জানায়, 'না, এক সকাল, একটা ভবন। ঠিক আছে?'

'তাহলে দিল্লী দেখতে আমাদের এক মাস লেগে যাবে।'

'গুডি। তুমি প্রতিটা সকাল আমার সাথে কাটাতে পারবে। তা কি তোমার ভালো লাগবে না?'

গাড়ী চাঁদনী চক, খারী বাউলি, সদর বাজার দিয়ে চলছে। জর্জিনের মুখে কথার তুবড়ি ছুটছে। সে ছবি তুলছে। কখনো বলছে 'তোমাকে খুব মজার লাগছে দেখতে। গত সপ্তাহে কেউ যদি আমাকে বলতো যে, আমাকে মাথায় ব্যান্ডেজওয়ালা, একজন কালো মানুষ, যার মুখে আগোছালো দাড়ি আছে তার সাথে গাড়ীতে চড়ে ঘুরতে হবে, তাহলে আমি মারা যেতাম।' আমি কিছু বলি না। সে বলেই চলেছে, 'আমি সবসময় আজেবাজে বকি।' আমার বিরক্তি নিশ্চয়ই সে বুঝেছে, 'মনে কিছু করো না।' আমি নিরুত্তর। সে অস্বস্তির উচ্চারণ করে এবং কার্লাইলের বাড়ী পৌঁছা পর্যন্ত আর কিছু বলে না। গাড়ী থেকে নেমেই সে বলে, 'আমি কি তোমার দাড়ি ছিঁড়তে পারি?' আমি দাড়ি রক্ষার জন্য হাত তোলার আগেই সে দাড়ি খামচে ধরে সজোরে টান দেয়। সিটের উপর তিনটে দশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে তাজমহলের প্রতিকৃতি হাতে একটা লাফ দেয়। তার গুরু নিতম্বে প্রবল ঝাঁকুনি তুলে দরজার দিকে দৌড় লাগায়, 'বাই! কাল আবার দেখা হবে।'

আমরা নাকারখানা গেটে আসি। গলা পরিষ্কার করি। সে গাইড বুক খুলে বলে, 'আমাকে বলতে হবে। এখানে দামামা বাজানো হতো, তাই না? সামনের ঐ লাল ভবনটায় মহান সম্রাটরা জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করতেন।'

'ঠিক ধরেছো। এর নাম 'দিওয়ান-ই-আম'। আপনার কোন গাইডের প্রয়োজন নেই। তুমি সবই জানেন।'

'না, আমি জানি না।' গাইড বুক দেখে সে আমাকে জানায়, সম্রাট শাহজাহান সম্পর্কে। তিনি কখন এসব প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন ইত্যাদি সম্পর্কে। সিংহাসনের পিছনর চিত্রমালা দেখে বলে, 'এ হচ্ছে রং মহল, স্বপ্ন দেখার ঘর। অষ্টকোনাকৃতির জেসমিন টাওয়ার। দিয়ারোনি...'

'দিওয়ান-ই-খাস।'

'এখানে সম্রাট ময়ুর সিংহাসনে বসে অভিজাতদের সাক্ষাৎ দিতেন।'

'যথার্থ বলেছো।'

'গুডি। পার্ল মসজিদ তৈরী করেছেন সম্রাটের পুত্র যিনি পিতাকে বন্দী করে রেখেছিলেন। সম্রাট ওরাঙ্গিয়েদি'..

'আওরঙ্গজেব।'

'আমি কি বুদ্ধিমতী নই?'

'খুবই। পেশাদার গাইড হিসেবে তুমি খুব ভালো কামাতে পারবে।'

'তা পারবো! আমি তৃষ্ণার্ত। আমি কি দুধ বা কোক পেতে পারি?'

'কোক পাওয়া যাবে। কিন্তু দুধ পাওয়া যাবে না।'

আমরা গেটের কাছে আসি। সে দুই বোতল কোক পান করে। পেটে চাপ দেয় এবং ঢেকুর তুলে বলে, 'সরি। এখন বেশ ভালো লাগছে।

কোন পর্যটককে লালকিল্লা ঘুরিয়ে দেখাতে আমার দেড় ঘন্টার বেশী সময় লাগে। জর্জিনের লাগলো মাত্র বিশ মিনিট। আমি আপন মনে বিড় বিড় করি, 'কুত্তী!' ওকে যা করা প্রয়োজন তা হচ্ছে পা দু'টো প্রসারিত করে জিনসের ট্রাউজার ফেড়ে ফেলে ওর ভরমুজ আকৃতির বিশাল নিতম্বে প্রবলভাবে কয়েকটি চাপড় মারা এবং এর পর অস্বাভাবিক যৌনকর্ম সম্পন্ন করা।

কফি হাউসে গিয়ে নিজেই আমার স্যাঙ্গাতদের সাথে জর্জিনের ব্যাপারে আলাপ শুরু করি। আমি আমার শিখ সাংবাদিক বন্ধুকে পছন্দ করতে পারলাম না এ কারণে যে, সে জর্জিনকে আমার

'ফাঁদে পতিত আরেকটি শিকার' ভাবছে বলে। রাজনীতিবিদ বন্ধুও ষোড়শী বালিকার কামকলার জ্ঞানের বিরুদ্ধে আমাকে সতর্ক করলো। কফি হাউস থেকে যখন বেরুলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। জাম গাছে পাখীরা কিচির মিচির রব তুলেছে। আমি তার নাম এতো জোরে উচ্চারণ করতে চাইলাম, যা গোটা কনট সার্কাসে প্রতিধ্বনি তুলতে পারে 'জর্জি-ন'। এই আওয়াজে যানবাহন চলাচল রুদ্ধ হয়ে যাবে। জর্জিন শব্দ এবং পাখীর কলতান এক হবে। কনট সার্কাস ও তার চারপাশ জুড়ে শুধু প্রতিধ্বনি শোনা যাবে 'জর্জিন, জর্জিন, জর্জিন।'

সেই সন্ধ্যায় আমি ভাগমতীকে বললাম জর্জিন সম্পর্কে। বরাবরের মতই সে শুধুমাত্র তাকে ছাড়া অন্যান্যের ব্যাপারে আমার অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানোকে পছন্দ করতে পারলো না। আমি তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম যে, জর্জিন আমার চাইতে চল্লিশ বছরের ছোট। কিন্তু তাতে সে আশ্বস্ত হলো না। অতঃপর আমি যখন তাকে স্বাভাবিকের চাইতে বেপরোয়াভাবে গ্রহণ করলাম, সে জানতে চাইলো, 'আজ আপনার কি হয়েছে?' যার অর্থ, আপনি আসলে আমাকে গ্রহণ করছেন না, বরং গ্রহণ করছেন বিশাল নিতম্বের অধিকারিনী ষোড়শী শ্বেতাঙ্গিনীকে।' তার ধারণাই সঠিক।

সকালে আমার মধ্যে উৎসাহ নিতান্তই কম। যা হোক, আমি ঠান্ডা স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুমে বিশ মিনিট ব্যয় করলাম দাড়িতে কলপ লাগাতে। কার্লাইলের বাড়িতে উপস্থিত হলাম, উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিলাম কি ধরনের অভ্যর্থনা পাবো। জর্জিন বাইরে রোদ পোহাচ্ছিল। তাকে আরো বড়সড় লাগছিল। মাথাটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমার চুলের নয়া স্টাইল তোমার কেমন লাগছে?' চুলগুলোকে মাথার উপরে উঁচু করে বেঁধেছে। এতে তার গলা দীর্ঘ মনে হচ্ছে এবং ছোট গোলাপী কান দু'টো বেরিয়ে আছে। বললাম, 'খুব সুন্দর। ঠিক ভদ্রমহিলার মত মনে হচ্ছে।'

'আমি আসলেও তাই।'

গাড়ীতে বসে সে জানতে চাইলো, আমি পাগড়ী মাথায় রেখেই ঘুমাই কিনা।

উত্তর দিলাম, 'তুমি যদি বয়সে আর একটু বড় হতে, তাহলে বলতাম, এসে এবং নিজে দেখে যাও।'

তার মুখ উজ্জ্বলতর হলো, 'তুমি একটা দুষ্ট বুড়ো। তুমি কি আমাকে কিছু বুঝাতে চাচ্ছো?'

এখন আমার বিব্রত হওয়ার পালা। 'আমি বলেছি, যদি তুমি বয়স্কা হতে, অর্থাৎ বেশ বয়স্কা...। আমি নিশ্চয়ই তোমার পিতার চাইতেও বেশী বয়স্ক।

'আমি কি সে ধরনের কাউকে কিনেছি?'

আমাকে এবার চাটুকারিতার আশ্রয় নিতে হয়। শ্বেতাঙ্গরা চাটুবাক্যে অভ্যস্ত নয়। অতএব সহজে ধরা দেয়। সেও আমাকে সুযোগ দেয় অল্প সময়ের মধ্যে আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে, 'আমার সাথে পাগলামী করো না। আমি বাজে কোন ইঙ্গিত করিনি।' আমি হাতটা আঁকড়ে বলি, 'তোমাকে বাজে বলিনি। তুমি হলে সুন্দরতম মিসি বাবা। এমন আর কারো সাথে মিশিনি।'

'মেসি কি?' কণ্ঠ একটু চড়িয়ে সে বলে।

'মেসি নয়, মিসি। মিথ্যা বলছি না' তোমার মত সুন্দরীকে নিয়ে ঘুরার সুযোগ সচরাচর হয় না।'

'আহ! আমি সুন্দরী বা সুদর্শনা নই অথবা সেরকম কিছু নই।' কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আমার কথায় সে তুষ্ট হয়েছে। তার মুখ গোলাপী বর্ণ ধারণ করেছে খুশীতে। এক মুহূর্ত থেমে সে বলে, 'তুমি চমৎকার বুড়ো মানুষ। আমি কি তোমাকে 'পপ' বলতে পারি? আমি তোমার নাম জানি না।'

ষোড়শীদের বাগে আনা খুব সহজ। এর চাইতে এক বা দু'বছরের বড় হলে ততোটা নয়। ষোল বছর বয়সে তারা নিজেদের সম্পর্কে অনিশ্চিত অবস্থায় থাকে এবং তাদের সৌন্দর্য, মেধা-যে কোন ব্যাপারে প্রশংসায় কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। জর্জিনও খুব সহজ মনে হলো আমার কাছে। তাকে কফি হাউসে নিয়ে গেলাম বন্ধুদের দেখানোর জন্য। তার মুখ আবার উজ্জ্বল হলো এবং বললো, 'তুমি আসলেই একটা দুষ্ট বুড়ো। কিন্তু তোমাকে আমি পছন্দ করি।'

কফি হাউসে 'শুধু পরিবারের জন্য' চিহ্নিত করা অংশে বসলাম। আমি তার জন্য একটা কোক অর্ডার দিয়ে বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানাতে গেলাম। জর্জিনের ব্যাপারে তারা ভালো কোন মন্তব্য করলো না। শিখ সাংবাদিক বন্ধু বললো, 'তুমি যেভাবে এর বর্ণনা দিয়েছো, আমি ভেবেছিলাম, তুমি একটা মেরিলিন মনরো ধরেছো। সুন্দর মোটা গোশতের টুকরা। মজাদার।'

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করলো, 'সে মোটেই কোন নূরজাহান নয়। আর দশটা আমেরিকান স্কুল ছাত্রীর মতই। বেশ তুলতুলে পুষি বেড়ালের মতো মনে হচ্ছে। আমি যা ভেবেছিলাম, তুমি দেখছি তার চেয়ে বেশী পাগল হয়েছো। দেখো কোন বাজে কৌশল খাটাতে গেলে একেবারে সাত বছরের সশ্রম কারাদন্ড।'

কুৎসিৎ, অশ্লীল আলোচনা। জর্জিনের কাছে ফিরে যাই। সে জানতে চায়, 'তোমার গার্ল ফ্রেন্ড সম্পর্কে তাদের বক্তব্য কি?'

'গার্ল ফ্রেন্ড? তুমি তাই মনে করছো?' বিস্মিত হওয়ার ভান করি। 'ওরা বললো, তুমি খুব সুন্দরী।'

'মিথ্যুক! একশ' ডলারের বাজী ধরছি, ওরা বলেছে, 'ও রকম বিশ্রী দর্শন একটা মেয়ের সাথে তুমি কি করছো? সতের বছরের নীচের কারো সাথে এ রকম করলে জেলে যেতে হবে। আমার ধারণা সম্পর্কে তোমার কি মনে হচ্ছে?'

'ভুল, ভুল, ভুল!' আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। দেখতে পাচ্ছি, সে খুশী হয়েছে।

এবার সে আমার ফি দেয় একটা খামে ভরে এবং ধন্যবাদ দেয় সবকিছুর জন্য।

সেই সন্ধ্যায় আবেগ ও বিবেক তাড়িত হই। দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে আমি তাকে ফোন করি, যদিও তাকে বলার কিছুই ছিল না। তার চাচা ফোন তুলে, 'তুমি নিশ্চয়ই জর্জিনের মাথাটা খারাপ করে দেবে না। সে তোমার সাথে যে সময় কাটিয়েছে সেই বিল দিয়ে দেব।' আমি কেন ফোন করেছিলাম তা জানতে না চেয়েই সে ফোনটা রেখে দেয়। কিন্তু এটা জেনে উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে, চাচাকে কিছু না বলেই জর্জিন আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে।

এই তথ্যটা একটা উপযুক্ত সময়ে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখি। ইতিমধ্যে সৌজন্য বিনিময়ে আমি সাহসী হয়ে উঠেছি। যেহেতু সে প্রতিদিন চুলের স্টাইল পাল্টাচ্ছে, অতএব আমি তাকে খুশী করার মত মন্তব্য করার প্রচুর সুযোগ পাই। একদিন সে উজ্জ্বল লাল শাড়ী পড়ে। তাকে মানায়নি। সে এটাও জানে না যে, শাড়ী পরে একজন মেয়ে কিভাবে হাঁটে। অধিকাংশ ককেশীয়ের মতো তার মধ্যে এক ধরনের পুরুষালী ভাব আছে। আমি তবুও বলি, 'বাহ, কি চমৎকার মানিয়েছে।' উত্তরে সে বলে, 'ধন্যবাদ! আমি ভেবেছিলাম, তোমাদের দেশীয় পোশাক পরতে দেখলে তুমি খুশী হবে।' আমি তাকে বুঝাই যে, 'শাড়ী পাঞ্জাবীদের পোশাক নয়, পাঞ্জাবী মেয়েরা সালোয়ার-কামিজ পরে এবং তাতে তোমাকে আরো অনেক বেশী মানাবে।' সে খুশীতে উচ্ছসিত হয়ে উঠে, 'সত্যিই। আমার এখনই সেগুলো চাই।' আমি তাকে দর্জির কাছে নিয়ে যাই।' সে যখন কাপড় পছন্দ করছিল তখন আমি দর্জিকে পাঞ্জাবীতে বলি পোশাকটা তৈরী করে বিলসহ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। জর্জিন মনস্থির করতে পারে না। যেটা পছন্দ করেছে, সে বলছে তার জন্য খুব ব্যয়বহুল। অতএব সে দ্বিতীয় পছন্দের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি করলো। দর্জিকে পাঞ্জাবীতে বলি, জর্জিনের প্রথম পছন্দের কাপড় দিয়ে তৈরী করতে। গাড়ীতে বসে আমার কাছে জানতে চায়, 'তুমি সত্যিই বলছো যে, এই পোশাক আমার গায়ে ভালো লাগবে?'

'আমি নিশ্চিত, ভালো লাগবেই। আমাদের ভাষায় একটি শব্দ আছে' জামাজেবী' অর্থাৎ যে কোন পোশাকে মানানোর যোগ্যতা। আমি বিশ্বাস করি, তুমি যাই পরবে সেটাই ভালো লাগবে। (কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়। কারণ তার বিশাল স্তন ও গুরু নিতম্বে কোন পোশাকে তাকে মানানো বা শোভনীয় করার মত নয়।

সে আমার স্তুতিতে বিগলিত না হওয়ার ভান করে, 'আমি জানি, তুমি যত সুন্দর কথাই বলো না কেন কোনটাই সত্যি নয়। কিন্তু তুমি যা বলছো, তাতে ভালো লাগছে। কাজেই না থেমে বলো- ঠিক আছে'। আমার অ্যাপার্টমেন্টে তাকে পাওয়া খুব সহজ। পোশাকের জন্য মাপ নেয়ার দুদিন পর আমি তাকে আমার গাড়িতে ঘুরে বেড়ানোর প্রস্তাব করি। তাকে যখন তুলে আনতে যাই, তখন খুব স্বাভাবিকভাবে বলি, 'তোমার পোশাক আমার অ্যাপার্টমেন্টে ডেলিভারী দিয়েছে।

তুমি কি বেড়াতে যাওয়ার আগে সেগুলো নিয়ে নেবে?'

'ঠিক আছে, চলো।'

সে প্রশংসার দৃষ্টিতে আমার বই, ছবি দেখে। 'সুন্দর, চমৎকার, বাহ, এসব ধ্বনি তুলে।

'ধন্যবাদ। একটু বসবে কি?' সে জুতা খুলে আড়াআড়ি পা রেখে বসে। আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো?'

আমি গালিবের কবিতার উদ্ধৃতি দেই। প্রথমে উর্দুতে, পরে ওর জন্য ইংরেজীতে অনুবাদ করি

"আজ সে আমার বাড়িতে এসেছে'
কখনো আমি তার দিকে তাকাই
কখনো নিজের ঘর দেখি-"

'এর মানে আমাকে এখানে পেয়ে তুমি সন্তুষ্ট হয়েছো। আমার জিনিসগুলো কোথায়?'

আমি প্যাকেটটা এনে খুলি। কাপড় দেখে সে মুখ খুলে, 'আমি তো এটার কথা বলিনি। তোমার মনে আছে এর দাম বেশী? বুড়ো দর্জি আমার উপর ডাকাতি করতে চাইছিল। তোমরা সব ইন্ডিয়ানরা আমেরিকানদের ধরতে চেষ্টা করো। তোমাদের ধারণা, আমরা হচ্ছি শোষক, তাই না?'

'দর্জি এর জন্য তোমার কাছে বেশী নেবে না। সে বুঝতে পেরেছে, এটাই তোমার পছন্দ। তাই সে তোমার জন্যে তৈরী করেছে।'

সে বিব্রত বোধ করে, 'আমি দুঃখিত। সে আসলে ভালো মানুষ। এটা কি?' ওড়নার ভাঁজ খুলে সে বিস্মিত হয়। এটা খুব সুন্দর। কিন্তু এটা তো আমি চাইনি।'

'পোশাকের সাথেই এটা থাকে। বাড়তি দাম দিতে হয় না।' সে মাথা গলিয়ে কামিজ পরে একটা আয়না খুঁজতে থাকে।

'কোথায় পরবো এগুলো?' আমি তাকে বেডরুম দেখিয়ে দেই। আমি খানিক সময়ের জন্য একা। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দ্রুত পান করি। চেয়ার ছেড়ে সোফায় বসি। জর্জিন পাঞ্জাবী পোশাক পরে বেরিয়ে আসে। ওড়নাটাকে মনে হচ্ছে, তারকাপূর্ণ সাদা মেঘমালার মত। পোশাকটা তার গায়ে ঠিকভাবে লেগেছে। মনে হচ্ছে, পাঞ্জাবী পোশাক পরার জন্যই তার দেহকাঠামো তৈরী হয়েছে। পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেমন হয়েছে?'

'তুলনাহীন! তুমি যা পরে থাকো তার যে কোনটার চাইতে অনেক বেশী সুন্দর।'

'ধন্যবাদ! আমারও বেশ পছন্দ হয়েছে।' সে কাছে আসে এবং আমার পাশে সোফায় বসে। হাতব্যাগ খুলে বলে, 'এর জন্য দর্জিকে কত দিতে হবে?'

আমার কণ্ঠ গলায় আটকে গেছে। জোর করে বলি, 'কিছু দিতে হবে না। আমাকে এটা উপহার হিসেবে দেওয়ার সুযোগ দাও। প্লিজ।'

'ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আমি জানি, এ তোমার সাধ্যের বাইরে।'

'তা নয়, সাধ্যের মধ্যেই এবং এতে আমি খুব খুশী হবো।'

'তুমি খুশী হলে আমি অবশ্যই নেব। তোমাকে ধন্যবাদ আবার।' সে চট করে আমার দাড়ির উপর চুমু দেয়। তার চুমু আমাকে বিবশ করে দেয়। খানিক পর, আমি বলতে পারি, 'তাছাড়া আমি তোমার কাছে ঋণী। তোমার নিজের থেকে তুমি আমার ফি দিয়েছিলে, তাই না?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'তোমার চাচাকে ফোন করেছিলাম।'

সে চুপ হয়ে যায়। 'কাজটা ভালো হয়নি। উনি কি বললেন?'

ওর হাত আমার হাতে নেই, 'কিছু ভেব না। তাকে বলিনি যে, তুমি আমাকে টাকা দিয়েছো। এখন কি আমি ভাবল ফি উপার্জন করতে পারি?'

সে হাসে, 'তুমি যথার্থই ধূর্ত, প্রাচ্যের বৃদ্ধ। আমি স্বস্তি লাভ করছি যে আমার চাচা ব্যাপারটা জানে না।'

'তুমি তাকে বলোনি কেন?'

'আমি জানি না।'

এখন আমার উদ্যোগ নেয়ার সময়, 'হয়তো তুমি তার অজ্ঞাতে আমার সাথে থাকতে চেয়েছিলে।'

পিছনে চুল নেড়ে সে বলে, 'হয়তো।'

যে কোন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় জানে যে, একজন টিন এজারের সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করা অনুচিত। কারণ যখন আসল সময় আসে তখন তার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায় অথবা শুধু বলে 'না।' অতএব এটাই উত্তম, হাত দিয়ে দেহের সাথে কথা বলা। এর ফলে তার মাঝে বাকহীন গ্রহণযোগ্যতার উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আমি তাই করি। তার কোমর পেঁচিয়ে ধরি এবং আমার দিকে আকর্ষণ করে তার ঠোঁট, চোখ, নাক, কান, গলায় চুমু দিতে থাকি। সে অসহায়ের মতো গোঙ্গাতে থাকে। তার কামিজের নীচে হাত গলিয়ে স্তনের বোটা দিয়ে খেলতে শুরু করি। এরপর পায়জামার ফিতা খুলি এবং সিক্ত উরুর মাঝে আঙ্গুল দেই। অত্যন্ত নম্রভাবে নাড়াচাড়ায় সে চরম অবস্থায় উপনীত হয়ে গোঙ্গাতে শুরু করে, 'ও গড, ও গড,' সে মানুষের আকৃতির একটি রবারের পুতুলের মত নিঃসাড় পরে আছে। তার স্তনে হাত দেই। সে আমার হাতে চাপড় দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং উঠে পড়ে। নিজেরে কাপড়গুলো তুলে বেড়রুমে প্রবেশ করে। জীনস পরে সে বেরিয়ে আসে। সালোয়ার কামিজ ও ওড়না দলামোচড়া করে ছুড়ে ফেলে এবং অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে যায়। জর্জিনাকে সেই শেষবার দেখি। কার্লাইলের দেয়া শেষ কাস্টমারও ছিল জর্জিন। আমি জানি না, সম্মতির বয়সের চাইতে কম বয়সের মেয়ে যার কামকলার জ্ঞান রয়েছে তার সাথে আমি এমন কি করেছি। মহাভারতের একটি উদ্ধৃতি আমার মনে পড়লো, 'সমুদ্রে ভাসমান দুই খন্ড কাঠ এক পর্যায়ে একত্রিত হলো, আবার বিচ্ছিন্ন হয়েও গেল। যদিও বিশ্বের জীবন্ত সৃষ্টিগুলোর মিলনের রীতিও এ রকম।'

অনেক বছর পর আমি দিল্লীতে এসেছি ট্রেনে। রেলস্টেশনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু চেনা যায় না এমন নয়। পঞ্চাশ বছর আগে প্ল্যাটফর্মে যে নম্বর লাগানো ছিল এখনো সেগুলোই আছে। কুলিরা আগের মতই উজ্জ্বল লাল রং এর সার্ট ও ময়লা ধুতি পরে সার বেঁধে দাড়িয়ে আছে। তাদের হাতে পিতলের একটা পাত যাতে একটা নম্বর লিখা। অনেক ময়নার চীৎকার, গরুর সাথে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত। সেই হকার, সেই পুরনো সুরেলা চীৎকার, 'লেবু সোডা, বরফ; চা, গরম চা।' মল, মূত্র এবং ফিনাইলের সেই দুর্গন্ধ। অক্টোবরের এক ভোর। ঠান্ডাটা উপভোগ্য, শীতের আগমনীতে একটু শিশির ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। প্ল্যাটফর্মের উপর ঘুমিয়ে থাকা লোকদের মাঝ দিয়ে উপরে উঠলাম। রেললাইনের উপর দিয়ে ওভার ব্রীজ অতিক্রম করতে গিয়ে চোখে পড়লো মানুষের মলের স্তূপ। নীচে বিশ্রাম কক্ষের আশেপাশেও অভিন্ন দৃশ্য। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম। স্টেশনের মুখোমুখি কোম্পানী গার্ডেন, যেখানে অবস্থিত হার্ডিঞ্জ লাইব্রেরী। নির্মল, তাজা বাতাস। রাস্তার উভয় পাশে মোটর স্কুটার ও কারের সারি। যতদূর দৃষ্টিতে পড়ে গাড়ী দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভাররা সিটের উপর গা এলিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আমি একটি টোঙ্গাওয়ালাকে ডাকি। তার গায়ে ময়লা শাল জড়ানো। সন্দেহের দৃষ্টিতে সে আমাকে দেখে। সে মুসলিম। আমি শিখ। সে জানতে চায়, 'কোথায় যেতে হবে?' আমি বলি, 'রায়সিনা, কত দিতে হবে?' সে কাউকে নয়াদিল্লীকে রায়সিনা বলতে শোনেনি দীর্ঘদিন। আমি যে একজন পুরনো দিল্লীওয়ালা তা অনুধাবন করে সে দ্রুত ভাড়া নিষ্পত্তি করে। রায়সিনার দূরত্ব চার মাইল। অতএব ভাড়া বেশীই হওয়ার কথা। কিন্তু সে বলে, 'আপনার যা মর্জি দেবেন। ট্যাক্সি নিলে আপনাকে দশ টাকার বেশী দিতে হবে। আপনি আমার প্রথম যাত্রী। বউনিতে কথা বলবো না।' আমি টোঙ্গার পিছনে উঠি এবং বাক্সটা সামনের সিটে তার পাশে রাখি।

শহরের মাঝ দিয়ে তার যাওয়ার ইচ্ছা। এই রাস্তায় গেলে দূরত্ব কমে। ভিড় বেশী নেই এবং জনশূন্য রিং রোড অপেক্ষা নিরাপদ। কোম্পানী বাগ থেকে উঠে ফোয়ারার দিকে অগ্রসর হই। এ ফোয়ারায় গত পঞ্চাশ বছর ধরে পানি উঠেনি। রৌশন-উদ-দৌলার মসজিদের বারান্দায় লোকজন সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে ফজর নামায পড়ার জন্য। তার পাশেই শীশগঞ্জ গুরুদুয়ারা রঙ্গিন আলো সজ্জিত। প্রার্থনাকারীরা যাচ্ছে, আসছে। সুঠামদেহী, দীর্ঘ দাড়িওয়ালা নীল ও হলুদ কাপড় পরা

সশস্ত্র লোক প্রবেশ পথে দন্ডায়মান।

টোঙ্গা বামে মোড় নেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি লাল কিল্লার প্রাচীর। এবার ডানে মোড় নিয়ে টোঙ্গা দারিবায় প্রবেশ করে। সাদা কাপড় পরা হিন্দু রমণীরা পিতলের থালায় ফুল ও নারিকেল নিয়ে যমুনা নদীর দিকে যাচ্ছে। দারিবা থেকে জুমা মসজিদ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পূর্ব দিকের মিনারের চূড়া বরাবর সূর্য উঠেছে। মসজিদের সিড়ির ধাপে শত শত মানুষ কম্বল জড়িয়ে ঘুমাচ্ছে। সারমাদের কবরের মাথায় একটি তেলের বাতি জ্বলছে। কবরের উপর একটি সবুজ চাঁদরে ঢাকা। এর উপর ছড়ানো জেসমিন ও গাঁদা ফুল। দুর্গন্ধযুক্ত উর্দু বাজার অতিক্রম করছি। আশেপাশের গলির একটি গেছে রাজিয়া সুলতানার কবরের দিকে, আরেকটি গলি মসজিদে। পুরনো দিল্লীর প্রাচীর বেষ্টিত এলাকা পার হয়ে এলাম তুর্কমেন গেট দিয়ে। বাতাস এখনো নির্মল। বিশাল রাম লীলা ময়দানে আরএসএস এর কর্মীরা লাঠি হাতে ব্যায়াম করছে। মাঝ বয়সী পাঞ্জাবীরা লাঠি হাতে পায়চারি করছে। নয়াদিল্লীর দিকে উঁচু করা তরবারি হাতে দন্ডায়মান শিবাজীর মূর্তি অতিক্রম করলাম। টোঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কখন বসালো?' মূর্তির দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে সে বলে, 'দুই বছর আগে।' মিন্টো রেল ব্রীজের নীচ দিয়ে কনট সার্কাসে আসি। টোঙ্গাওয়ালাকে বলি, 'আমাকে ওপাশের কফি হাউসে নামিয়ে দাও।' কফি হাউসে নেমে জিজ্ঞেস করি, 'কত দেব?' সে আগের মতই বলে, 'আপনার যা মর্জি। আপনাকে দিয়ে বউনি হলো। আমার ছেলেকে এখনো কিছু খেতে দেইনি।' ঘোড়াকে দেখিয়ে সে বলে। ঘোড়া দুশ্চাতঃ অনেক পানি পান করেছে। কারণ মদের রং এর মত তরল পদার্থে সে পীচঢালা পথ ভাসিয়ে দিচ্ছে। আমি তার হাতে দশ টাকার নোট দেই। ভাংতি দেয়ার জন্য সে পকেটে হাত দেয় তাকে বলি, 'তোমার ছেলেকে ভালো খেতে দিও।' সে আল্লাহর কাছে আমার জন্য এবং আমার জাতি গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থনা করে এবং টোঙ্গা হাঁকিয়ে বিদায় হয়।

আমি ছয়টি ইংরেজী দৈনিক কিনি। এতে আমার ছয়টি পঞ্চাশ পয়সার অপচয় হয়। কিন্তু পুরনো অভ্যাস দূর করা কঠিন। আমি পৃষ্ঠা উল্টাই দিল্লীবাসীদের যারা 'স্বর্গধামে যাত্রা করেছে' তাদের সম্পর্কে ঘোষণা পাঠ করতে। বেশ কয়েকটা ঘোষণা আছে। তাদের কাউকে আমি চিনি না। অথবা এমন কেউ নেই যাদের মৃত্যুতে কবিতা রচনা করা হয়েছে বা নিবন্ধ লিখা হয়েছে। 'দিল্লী ডায়েরী'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরু তেগ বাহাদুরের হত্যাকান্ড স্মরণে আজ শিখদের ছুটি। পাশের কলামে শহরের কিছু কিছু জায়গায় ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা, যাতে ৫ জনের বেশী লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ। পুলিশের আইজি বলেছেন, 'গুন্ডা, দুষ্কৃতকারী এবং সমাজবিরোধী লোকদের পাকড়াও করা হয়েছে।' কি কারণে ধরা হয়েছে তা পাঠ করার প্রয়োজন নেই।

পত্রিকার উপর নজর বুলানো শেষ হতে হতে কফি হাউসের নিয়মিত খদ্দেররা যার যার টেবিল দখল করে বসেছে এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। আমার নিয়মিত আড্ডা ভেঙ্গে গেছে। টাক মাথা মোটা ফটোগ্রাফার স্বর্গে গেছে গত বছর। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বায়ু ত্যাগকারী বন্ধু আমাদের পরিত্যাগ করেছে, তাকে তার কাজের জন্য একটা নামকরণের কারণে। এখন আছে শুধু শিখ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ। তাদেরও যেন কি হয়েছে। শিখ সাংবাদিকের আগমন ঘটে প্রথমে। তার ছড়ানো দাড়ির মধ্য হতে একটি ছিড়ে বলে 'তুমি তাহলে ফিরেছ, কখন?' সে কফির অর্ডার দেয়। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ আসে। আমাকে শুভেচ্ছা না জানিয়েই বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, সকল গুন্ডাকে ধরা হয়েছে সাংবাদিক কোনকিছুর যথার্থতা না জেনে কিছু মন্তব্য করে না। আমি জানতে চাই, 'আজ এসব কি কারণে? পুলিশের সাথে 'বন্দোবস্ত' করে আমরা ১৪৪ ধারা ছাড়াই শতশত বার গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছি।' রাজনীতিবিদ- একজন হিন্দু, সে আমাদের দিকে আরেকটি কাঁটার ঝাপটা মারে, 'তুমি কখনো একজন শিখকে বিশ্বাস করতে পারো না। তাদের গুরুকে যখন হত্যা করা হয়, তখন তারা কিছুই করতে পারেনি। তিনশ বছর পরেও পারবে না। কথাটা কি ঠিক নয়?' শিখ সাংবাদিক গর্জে উঠে। আমরা অনেক আগেই মুসলমানদের সাথে আমাদের হিসাব চুকিয়েছি। এখন হিন্দুদের মা বোনদেরকেই শিখরা ধর্ষণ করছে। তারাই আমাদেরকে প্ররোচিত করেছে। শিখ ও মুসলমানরা বন্ধু হোক- এটা তোমরা সহ্য করতে পারছো না।' আমি উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করি।

'আওরঙ্গজেবের পরিবর্তে দারাশিকো যদি ভারতের সম্রাট হতো তাহলে ভারতের ইতিহাস ভিন্নতর হতো।'

রাজনীতিবিদ তার কথা বলেই চলে, 'তিনি তোমাদের গুরুকে এবং তার ছেলেকে হত্যা করতেন না এবং তাহলে তোমাদের চোয়াল ও চিবুকে এই ছত্রাক জন্মাবার আর কোন অজুহাত খুঁজে পেতে না। ভারতও তাহলে প্রকৃত অর্থেই হিন্দুস্থান হতো- হিন্দুদের আবাসভূমি- এবং এবং'- শিখ সাংবাদিক বাধা দেয়, 'যদি দাড়িওয়ালা খালসারা না থাকতো তাহলে নাদির শাহ বা আবদালীর মত হামলাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য তোমার হিন্দু পূর্বপুরুষদের তাদের উন্মুক্ত পশ্চাদ্দেশ ব্যবহার করতে দেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকতো না। রাজনীতিবিদ উত্তপ্ত হয়ে বলে, 'বক বক করো না।'

'তুমিই সব বাকওয়াস করছো, আমি নই।' এভাবে বর্তমানের উপর অতীতের কথা আসে। দিল্লীর কফি হাউসে ইতিহাসের যে ছায়া পড়লো তা আর কোথাও পড়ে না। আমার বাক্স তুলে নেই। ওরা দু'জন অতীতের তর্ক করুক।

ঘূর্ণিঝড়ের বেগে ভাগমতী প্রবেশ করে এবং হাত নেড়ে মুখে কথার তুবড়ি ছুটায়। 'শিখরা অস্ত্র তুলে নিয়েছে। গোটা শহরে তারা দীর্ঘ তরবারি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিছিল করে চাঁদনী চকে গুরুদুয়ারার দিকে যাচ্ছে। আপনি কি জানেন, ওরা কি বলছে? তিন শত বছর পূর্বে কেউ তাদের গুরুকে দিল্লীতে হত্যা করেছিল। তাই আজ তারা প্রতিটি দিল্লীওয়ালাকে কাটবে। এর কি কোন মানে হয়?'

'তোমার বন্ধু বুধ সিংকে কেন জিজ্ঞেস করছো না?'

'হায় রাম! সে আমার দিকে কিভাবে তাকিয়েছে তা আপনি যদি দেখতেন!' সে আমাকে বলছে, 'তুমি কার দিকে, বাদশাহ আওরঙ্গজেব না, আমাদের গুরুর দিকে?'

'তুমি কার পক্ষে?'

'সে একটা পাগল। আমি ভদ্রভাবে তাকে বলেছি যে, আমি কারো পক্ষে নই- বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পক্ষেও না, তোমার গুরুর পক্ষেও না।' আপনি জানেন এরপর সে কি বললো,

'ও, তুমি তাহলে নিরপেক্ষ? তুমি যদি একটা মহিলা বা পুরুষ হতে তাহলে তোমাকে একটা পক্ষ নিতে হতো।" কিন্তু আমি ওর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছি। সে আমাকে আর কখনো আজেবাজে বলবে না। তাকে বলেছি, 'আরে বুদ্ধু সিং এর বেটা! স্বর্গে যে ভগবান আছেন, তিনি অনেক চমক দেখাতে পারেন। তিনি একজন মেথরকে ব্রাহ্মণে পরিণত করতে পারেন। ক্ষুদ্র বানিয়াকে ক্ষত্রিয় করতে পারেন। একজন হিজড়াকেও পুরুষ বা মহিলায় রূপান্তরিত করতে পারেন। কিন্তু তোমার মত বুদ্ধুর মাথায় কোন বুদ্ধি দিতে পারেন না।" বিজয়ীর ভঙ্গিতে ভাগমতী সোফায় গা এলিয়ে দেয়। একটা সিগারেট ধরায়। জানতে চায়, 'আপনার কি মনে হয় যে, শহরে গোলমাল হবে? সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। চাঁদনী চক, নয়া সড়ক, কাজী কা হাউজ, আজমিরী গেটে গাড়ী ভর্তি পুলিশ।

'হতে পারে।' আমার মধ্যে এক ধরনের অনিচ্ছা কাজ করছে। ভাগমীতর জন্য খুব ক্ষুধা নেই। আমার অসুবিধা দূর করার কিছু উপায় বাতলে দিয়েছে। আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে যাই, 'ঐ রাস্তা দিয়ে বিকেলে শিখদের মিছিল যাবে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের গুরুদুয়ারাসহ সর্বত্র শিখরা জড়ো হবে। লাল কুয়ানেই তোমার স্বামীর সাথে তুমি নিরাপদ থাকবে। আমি তোমাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি।' ভাগমতী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তার দিকে অনুমোদনের দৃষ্টি ফেলি না। বরং বলি যে, নবম গুরু তেগ বাহাদুরের মৃত্যু দিবস আজ। এদিনে প্রার্থনা করতে হয়, ফূর্তি নয়। পবিত্র দিনে যৌনকর্ম না করার ব্যাপারে ভাগমতীর মধ্যে কুসংস্কার প্রবল। সে প্রায়ই বলে, 'এসব করার জন্য তিনশ' চৌষট্টি দিন আছে। একদিনের বিরতিতে আমরা মারা যাবো না।

সে সিগারেট শেষ করেছে। আমি তাকে বিশটি টাকা দেই। নোট দু'টি ব্রার নীচে গুজতে গুজতে জিজ্ঞেস করে 'এটা কি জন্য?' আমি তাকে লাল কুয়ানে নিয়ে আসি।

৮

সম্রাট শাহজাহান ও মেথর জৈতা

দিওয়ালী উৎসবের কয়েক দিন পূর্বে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়লো। কাউকে বাতি জ্বালাবার কিংবা চুলায় আগুন ধরাবার অনুমতি দেয়া হলো না কিছুদিনের জন্য। আমাদের প্রবীণদের কাছে শুনেছি পরবর্তী ৪০ দিবস কাউকে প্রকাশ্যে হাসতে কিংবা সশব্দে হাসতে শুনলে তার শিরোচ্ছেদ করা হয়েছে। আমার মা আমাকে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলার জন্য বাইরে যেতে দিতেন না এবং আমি চীৎকার করতে ও হাসতে ভুলে গিয়েছিলাম। সে কারণে আমি যদিও তখন ছোট্ট বালক ছিলাম আমি কখনো সম্রাটের মৃত্যুর কথা ভুলতে পারিনি।

আমি যখন আমার বাপুর কাছে জিজ্ঞেস করতাম, যে বাদশাহ মারা গেছে তার নাম কি? তিনি বলতেন, 'বাদশাহ'র নাম দিয়ে তুমি কি করবে?' রিকাবগঞ্জের কোন মেথর বা মুচি তার নাম জানতো না। শুধুমাত্র মসজিদের পাশে সরাইখানায় যেসব মুসলমান থাকতো তারা এবং লাখী রায় নামে একজন ঠিকাদার বাদশাহর নাম জানতো। লাখী রায় বিশাল এক পাথরের বাড়ীতে তার কয়েকজন স্ত্রী ও আটজন ছেলে ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে বাস করতো। তারাও বাদশাহর নাম জানতো। এইসব মুসলমান ও লাখী রায়ের পরিবারের সদস্যদের মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তাদের মায়ের মা'র মৃত্যু ঘটেছে। অনেক লোক আছে যারা, বড় লোকের মৃত্যুতে কাঁদতে পারলে নিজেদেরও বড় মনে করে।

আমার বাপু বলতেন, 'আমাদের মতো দরিদ্র অস্পৃশ্যদের কিইবা করণীয় আছে রাজা বাদশাহর মৃত্যুতে। আমাদের কাছে সকলেই সমান। রাজা আসে, রাজা যায়। কিন্তু 'জুলুম' চলতেই থাকে।'

আমি জানতাম না যে, 'জুলুম' কে? যখন একটু বড় হলাম তখন বাপু আমাকে বললেন যে, জুলুম কোন মানুষের নাম নয়। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা দরিদ্রের সাথে যে আচরণ করে সেটাই 'জুলুম'। আমরা অস্পৃশ্যরা দরিদ্রের মধ্যেও দরিদ্রতর। কেউ আমাদের সাথে কিছু করতো না। কিন্তু আমরা তাদের কাছে গেলেই তারা সরে যেতো। বাপু বলতো, 'এটাও এক ধরনের জুলুম। আমাদের 'কর্মেই' এ রকম আছে। পূর্বজন্মে আমরা খারাপ কাজ করেছি। সে কারণে আমরা জন্মেছি কালো হয়ে এবং যত নোংরা কাজ আছে সবই করতে হচ্ছে আমাদের।

আমার বাপু প্রত্যেক বাদশাহকে বলেন, 'জালিম'। তার মতে, যে বাদশাহ'র মৃত্যু ঘটলো, তিনি খুব খারাপ লোক ছিলেন। কারণ তিনি রেলু কাকার চাইতেও বেশী মদ পান করতেন। রেলু কাকা প্রায় সারাক্ষণ মাতাল অবস্থায় থাকতো। রেলু কাকা আমাকে বলেছে যে, বাদশাহ কুড়ি গ্লাস 'আরক' পান করতেন এবং প্রতিদিন কয়েক তোলা আফিম খেতেন। এরপর প্রতি রাতে রাণীর সাথে শয্যায় গমন ছাড়াও হারেমের নারীদের সাথে মিলিত হতেন। তার কাছে আরো শুনেছি যে,

পূর্বে রাণীর অন্যত্র বিয়ে হয়েছিল। যখন তিনি যুবরাজকে দেখলেন এবং জানতে পারলেন যে, যুবরাজই একদিন বাদশাহ হবেন তখন তিনি যুবরাজের মদের গ্লাসে কিছু মন্ত্রপূতঃ গুড়া রেখে দিলেন। মদের সাথে এই গুড়া পান করে যুবরাজ তার প্রেমে পাগল হলেন। যুবরাজ তার স্বামীকে হত্যা করলেন এবং যখন যুবরাজ বাদশাহ হলেন তখন তাকে রাণী হিসেবে বরণ করে নিলেন। রেলু কাকা বলতেন, বাদশাহ নয়, রাণীই হিন্দুস্থান শাসন করতেন।

বাদশাহ'র মদ্যপান বা নারীর প্রতি দুর্বলতার কারণে আমার বাপু বাদশাহ'র প্রতি যতটা না ক্রুদ্ধ ছিলেন, তার চাইতে আমাদের গুরুর প্রতি তার আচরণের কারণে ক্রোধ ছিল অধিক। বাপু বলতেন, 'তিনি কি পরিমাণ মদ পান করেন বা কার মায়ের সাথে সঙ্গম করেন তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমাদের গুরুর বিরুদ্ধে যে হাত তুলে, তাকে ধ্বংস করা উচিত।' আমরা রিকাবগঞ্জের অধিকাংশ অস্পৃশ্য গুরুর পাদপদ্মে আমাদেরকে নিবেদন করেছি এবং নিজেদেরকে নানকের শিখ বলতে শুরু করেছি। কেউই নানক বা গুরুদের দেখেনি, যারা আমাদের রক্ষা করতেন। যে বাদশাহ'র মৃত্যু হলো তিনি আমাদের পঞ্চম গুরু অর্জুনকে হত্যা করেছেন এবং তার পুত্র হরগোবিন্দকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং এই বাদশাহ'র মৃত্যুতে আমাদের বুক চাপড়ানোর কোনো কারণ ছিল না।

আমাদের পরিবারে কারো মৃত্যু হলে আমরা অন্ততঃ এক বছর দিওয়ালীতে আলো জ্বালাতাম না বা রং ছিটাতাম না। কিন্তু মুসলমানদের নিয়মকানুন অদ্ভুত। বাদশাহ'র মৃত্যুর তিন চান্দ্রমাস পর কোতোয়ালী থেকে একজন লোক এসে মসজিদের সামনে ঢাক বাজাতে শুরু করলো। সকলে সেখানে সমবেত হলে লোকটি চীৎকার করে বললো, 'আপনারা সকলে নতুন বাদশাহর ফরমান শুনুন।' এরপর সে বাদশাহ'র নাম বললো, যা রিকাবগঞ্জ থেকে পাহাড়গঞ্জ পর্যন্ত রাস্তার মতই দীর্ঘ- "পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া, রাজাধিরাজ, বিশ্ব সম্রাট, হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহামহিম আবুল মোজাফফর শাহাবুদ্দিন মোহাম্মদ সাহিব-ই-কিরান সানী।" লোকটি আমাদের বাড়ী আলোকমালায় সজ্জিত করতে এবং এই নতুন বাদশাহ'র দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিলো।

আমরা অস্পৃশ্যরা এতোই দরিদ্র যে, ঘরে আলো জ্বালাবার মতো তেল আমাদের ছিল না, প্রার্থনা করার জন্য কোন মন্দিরও ছিল না। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম অন্যেরা কি করে তাদের বাড়ীতে আলোকসজ্জা করে এবং নতুন বাদশাহর দীর্ঘজীবন কামনা করে কিভাবে প্রার্থনা করে, আমরা তাই দেখবো।

আমার মা একটা নতুন সার্ট দিলো আমাকে পরতে। সবাই তার সবচেয়ে ভালো পোশাকটাই পরেছে। রিকাবগঞ্জের মেথর ও মুচিরা একটি দল গঠন করেছে। দলের সামনে পুরুষরা নেচে নেচে ঢাক ঢোল বাজাচ্ছে এবং মহিলারা গান গেয়ে তাদের অনুসরণ করছে। আমি রেলু কাকার হাত ধরেছিলাম। বাপুর সাথে থাকার চাইতে রেলু কাকার সাথে বেশী মজা হয়। বিন্নু কাকী খুব খুশী, 'তুমি কাকার সাথে লেগে থাকবে যাতে সে বেশী মদ পান করতে বা অন্য কোন কুকর্ম করতে না পারে।'

নওয়াবদের বাড়ীর সামনে বিলানো মাগনা শরবত আমরা প্রচুর পান করলাম। ধনী ব্যবসায়ীদের বিতরণ করা মিষ্টিও খেলাম। বাপু আমাকে কোন পয়সা দেয়নি। কিন্তু একজন নওয়াব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে পয়সা ছিটিয়ে দেয়ায় আমিও কিছুসংখ্যক কুড়িয়ে পেলাম।

নতুন বাদশাহ যিনি নিজেকে বলতেন শাহজাহান অর্থাৎ 'বিশ্ব সম্রাট' তার পিতার মতো 'জালিম' ছিলেন না। যদিও তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তার ভাইদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছিলেন, কিন্তু এর বাইরে তিনি কাউকে আঘাত করেননি। রেলু কাকা সবই জানেন। তার মতে, এই বাদশাহও তার পিতা, তার দাদা, পরদাদা এবং তাদের পূর্বের অন্যদের মতই নারীদের পছন্দ করতেন। তার প্রিয়তম রাণীকে তিনি বিয়ের দিন থেকেই গর্ভবতী করে রেখেছিলেন। তাদের বিয়ের চৌদ্দ বছরে রাণী চৌদ্দটি পুত্র কন্যার জন্ম দেয়। কিন্তু তার গর্ভধারণ বোধহয় আর সম্ভব হচ্ছিল না। চৌদ্দতম সন্তান প্রসবের পর রাণীর মৃত্যু হয়। এতে বাদশাহ এতোই ব্যথিত হন যে, তিনি তার কবরের উপর বৃহত্তম এবং সুন্দরতম সৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাহাড়গঞ্জের পাথরের মিস্ত্রীদের জন্য এটা খুব সুখবর ছিল। তারা আগ্রায়

চলে গেল। সৌধ নির্মাণে বিশ বছর সময় লাগলো। আগ্রা থেকে যারা এসেছে তারা বললো, এটি কুতুব মিনারের চেয়েও উঁচু এবং 'আরব কি সরাই' এ নির্মিত হুমায়ুন-এর সমাধি সৌধের চেয়েও সুন্দর। একদিন বিন্নু কাকী রেলু কাকাকে বললো, 'আমি মরলে কি তুমি একটা তাজমহল তৈরী করবে?' কাকা উত্তর দিলো, 'তুমি আগে মরো। তারপর আমরা তোমার জন্য তাজমহলের বিষয় আলোচনা করবো।'

বাদশাহ হওয়ার কয়েক বছর পর বাদশাহ শাহজাহান দিল্লীতে এলেন। আমাদের এই নগরীকে তার খুব পছন্দ হলো এবং তিনি বললেন, 'আমি এখানেই থাকবো'। তিনি তার প্রধান নির্মাতা মোকাররম খানকে ডেকে বললেন, 'যমুনা নদীর তীরে একটি বড় কিল্লা তৈরী করো। কিল্লার মাঝে থাকবে আমার ও রাণীদের প্রাসাদ। আমি বিশ্বের সর্ববৃহৎ মসজিদও নির্মাণ করতে চাই এখানে।' মোকাররম খান তিনবার বাদশাহকে কুর্ণিশ করে বললেন, 'জাহাঁপনা, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাহলে আমি আপনার জন্য আগ্রার মতই বিশাল কিল্লা নির্মাণ করবো। যেখানে থাকবে উদ্যান, পানির প্রস্রবন, ফোয়ারা। বিশ্বের বৃহত্তম ও সুন্দর মসজিদও নির্মিত হবে। মসজিদটি নির্মাণ করবো ভোজলা পর্বতের উপর। তাহলে এটি পালাম ও কুতুব মিনার থেকে দেখা যাবে।' এরপর মোকাররম খান উস্তাদ আহমদ ও উস্তাদ হীরাকে মানচিত্র তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। প্রাথমিক কাজকর্ম সমাপ্ত হলে তিনি বাদশাহকে অনুরোধ করলেন দিল্লীতে তশরীফ আনার জন্য। 'মহান বাদশাহ, শান্তি বর্ষিত হোক আপনার উপর। আপনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করুন। তাহলেই আমরা কাজ শুরু করতে পারি।'

তখনকার দিনগুলো কি আনন্দের। সকলেরই কাজ জুটলো। আমরা মৃত গরু মহিষের চামড়া ছাড়ানো এবং অন্য লোকের মল বহনের কাজ পরিত্যাগ করলাম। লাখী রায় শ্রমিক সরবরাহের ঠিকাদারী পেয়েছেন। যেহেতু আমি এখন বয়স্ক, সে জন্যে তিনি আমাকে মাটি ও পাথর বহনের কাজে নিয়োগ করলেন।

দিল্লী বদলাতে শুরু করলো। প্রতিদিন এক একটি নতুন অট্টালিকা হচ্ছে। প্রতিদিন নগর প্রাচীরের উচ্চতা বাড়ছে। প্রতিদিন নতুন মিনার ও গম্বুজ আকাশে উঠছে। বহু বছর ধরে এমন চললো। কাজ শেষ হলে মজা করার জন্য নয় দিনের সময় ধার্য করা হলো। রাজপুত্রেরা ভিড়ের মধ্যে রৌপ্য মুদ্রা ছড়িয়ে দিতো। বাদশাহ যখন তার সবচেয়ে বড় হাতীর পিঠে নগর প্রদক্ষিণ করতে বের হতেন তখন মুঠোমুঠো স্বর্ণ মুদ্রা ছড়াতেন। তার পারিষদরা বললো, আমরা এই শহরকে আর 'দিল্লী' বলবো না। আমরা এর নাম দেব 'শাহজাহানাবাদ'। কিন্তু দিল্লী দিল্লীই। কোন বাদশাহ বা আমীর ওমরাহ এর আরেকটি নাম দিতে পারেন না।

যখন কোন লোক টাকা বানাতে ব্যস্ত থাকে তখন সে তার ঈশ্বরকে ভুলে যায়। সে নিরানব্বই টাকা কামাই করা মাত্র একশ' টাকা বানাতে চায়। আমি শহরে কাজ করার বছরগুলোতে আমার গুরুর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাপুর মৃত্যুর পর আমি পরিবারের প্রধান হলাম। গুরুর লোক আমার কাছে এলো। তার সাথে আমি গুরুর সেবকের আস্তানায় গেলাম। একটি বড় খাটিয়ার উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। ভাবলাম, তিনিই বোধহয় গুরু। আমি হাঁটু গেড়ে বসে তার সামনের মাটিতে কপাল ঘসলাম।

'তুমি কে?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি রিকাবগঞ্জের জাইতা রংগ্রিতা।' আমি জবাব দিলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি গুরু নানকের অনুসারী শিখ?'

'আমার বাপু যা ছিলো, আমিও তাই' এ কথা বললাম।

তিনি বললেন, 'তোমার বাপুর আত্মার সদগতির জন্য তুমি কিছুই দাওনি। নতুন গুরুর অধিষ্ঠানেও কিছু দাওনি।'

আমি জবাব দিলাম যে, বাপুর মৃত্যুতে আমাকে রিকাবগঞ্জের সকল রংগ্রিতাকে ভোজ দিতে হয়েছে। সে কারণে আমার কাছে আর কোন অর্থকড়ি নেই। তার ভৃত্য আমার ঘাড়ের পিছন দিকে আঘাত করে ক্রোধের সাথে বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'গুরুর সেবকের সাথে তুমি তর্ক করছো!' তাকে দেয়ার জন্য লাখী রায়ের কাছে ঋণ করতে হলো। আমি নিজেকে বললাম, 'অন্ততঃ আমি কিছু একটা, গুরু নানকের শিখ। আমি জানি না, এর মানে কি? কিন্তু কিছু না

হওয়ার চাইতে অস্পৃশ্য রংগ্রিতার জন্য এটা উত্তম।' এরপর থেকে প্রতি বছরই গুরুর এই সেবক দিল্লীতে এলে তাকে অর্থদান করতে হতো। যদিও তিনি কখনো আমাকে তার কাছে ঘেষতে দেননি অথবা আমার দেয়া অর্থ নিজ হাতে স্পর্শ করেননি (তার চাকর এই কাজটা করতো)। আমি ভিন্ন রকম মনে করতাম।

আমাকে বলা হলো, নতুন গুরু লোকদের চুল ও দাড়ি কাটা পছন্দ করেন না। অতএব আমি মাথার চুলের বৃদ্ধিতে আর বাধা দিলাম না এবং পাগড়ী দিয়ে তা ঢেকে রাখলাম। মুখ জুড়ে আমার দাড়িও বড় হলো। মুসলমানরা হিন্দুদেরকে দাড়ি রাখতে দিতো না। কিন্তু অস্পৃশ্যরা কি করছে তা নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না। আমরা দাড়িধারী রংগ্রিতা অস্পৃশ্যরা অন্যান্য অস্পৃশ্যদের চেয়ে দেখতে ভিন্ন রকম হয়ে গেলাম। দিল্লীর নির্মাণ কাজ শেষ হলে আমি পুনরায় মেথরের কাজ শুরু করলাম। কেউ যদি আমার কাছে জানতে চাইতো, আমি কে? আমি উত্তর দিতাম, 'আমি গুরু নানকের শিখ।'

শাহজাহানাবাদ নির্মাণের কয়েক বছর পর বাদশাহ আগ্রার চাইতে দিল্লীকেই বেশী পছন্দ করলেন। এরপর আবার দিল্লীর চেয়ে আগ্রাই তার ভালো লাগতে লাগলো। ক্রমে আমাদের শহরে তার আগমণ কমতে শুরু করলো। ব্যবসায়ী ও শিল্পীরা আগ্রায় ফিরে যেতে লাগলো। লোকজন বলাবলি শুরু করলো যে, শাহজাহানাবাদও শীঘ্রই দিল্লীর অন্যান্য পুরোনো শহর মেহরুলি, শিরি, চিরাগ, তুগলকাবাদ, কোটলা ফিরোজ শাহ, কিলোখেরীর পরিণতি লাভ করবে এবং গুজার দস্যু, শৃগাল, পেঁচা ও হায়েনার আশ্রয়ে পরিণত হবে। নর্দমা ও পায়খানা পরিষ্কার করে আমার খুব বেশী আয় হতো না। ফলে আমাকে বানিয়া ও লাখী রায়ের নিকট ঋণ করতে হতো। আমাকে ঋণের সুদ দিতে হতো। সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তারা আমাকে নতুন ঋণ দিতো না। অর্থাভাব লাঘব করার লক্ষ্যে আমাকে চাঁদনী চকে অবস্থিত কোতোয়ালীর পাশেই জল্লাদখানায় চাকরি নিতে হলো। এটি নিঃসন্দেহে একটি নোংরা কাজ। প্রথমেই আমাকে মানুষের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করার দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হতে হলো। এরপর দেখতাম, হাত ও পা কেটে ফেলা। এসব কাজ হয়ে গেলে আমার কাজ দাঁড়ালো কর্তিত টুকরাগুলো জড়ো করে লোকদের দেখার সুবিধার জন্য বাইরে নিয়ে আসা। সেখানে কাজ শুরু করার পর লক্ষ্য করলাম, লোকজন আমাকে এড়িয়ে চলছে, যেন আমিই হত্যাকারী। প্রতিদিন আমাকে অন্ততঃ তিন-চারটি লাওয়ারিশ মৃতদেহ ঠেলায় তুলে নদীতে অথবা ময়লার স্তূপে ফেলতে হতো। মানুষ তার পেটের তাগিদে কি না করে।

আগেই বলেছি কাজটি আমার খুব পছন্দনীয় ছিল না। ঠেলা ভর্তি মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় 'ডোম', 'ডোম' চীৎকার করতে আমার ভালো লাগতো না। লোকজন আমাকে দেখা মাত্র তাদের বাচ্চাদের চোখ ঢেকে দিতো এবং দুর্গন্ধযুক্ত মৃতদেহ নেয়ার সময় তাদের নাক বন্ধ করে রাখতো- এগুলো আমি পছন্দ করতাম না। এমনকি নগর রক্ষীরাও আমাকে দেখে ঘৃণায় এক পাশে সরে যেতো। আমি বাপুর কথা স্মরণ করে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করতাম, 'বেটা, মাত্র দু'জন লোকই বিনা প্রশ্নে শাহজাহানাবাদের ফটক অতিক্রম করতে পারে ঃ বাদশাহ এবং অস্পৃশ্য।'

একবার দিল্লী সফরকালে বাদশাহ শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিষয়টি তারা গোপন রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাদশাহর বাঁচাল হেকিমের মাধ্যমে অসুস্থতার খবর সবার কাছে পৌঁছে গেল। ঘটনাটা ঘটেছিল এভাবে- বাদশাহ রাতে উঠে রাণীকে জানালেন যে, তার পেটে ভীষণ ব্যথা হচ্ছে। রাণী বাল্লীমারান এ অবস্থানরত হেকিমকে আনতে লোক পাঠালেন। হেকিম ফিরে এসে বহু লোককে বললেন যে, 'তিনি সারাটা রাত একটুও ঘুমাতে পারেননি। কারণ সারা রাত তাকে এমন এক রোগীর পাশে কাটাতে হয়েছে যার নাম তিনি প্রকাশ করতে পারবেন না। এভাবেই বাদশাহ'র অসুস্থতার খবর জানাজানি হয়ে গেল।

আমি কাজ করতে এলে একজন ডোম চীৎকার করে বললো, 'ছুটি'। রাজ দরবার থেকে হুকুম এসেছে আজ আর কারো মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবে না। মৃত্যুদন্ড বন্ধ থাকতো শুধুমাত্র ধর্মীয় ছুটির দিনে অথবা রাজা, রাণী বা রাজপুত্রদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে। দিনের সূর্য লাল কিল্লার প্রাচীরের উপরে উঠার সাথে সাথে লোকজন জড়ো হতে লাগলো এবং কানাঘুষা শুরু হলো।

কসাইদের পশু জবাই নিষিদ্ধ করা হলো। বাদশাহর অসুস্থতা কাটিয়ে উঠার জন্য মোল্লাদেরকে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেয়া হলো। পুরোহিতদের নির্দেশ দেয়া হলো মন্দিরের ঘন্টা বাজাতে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন যথাশীঘ্র বাড়ী ফিরে ভালোভাবে দরজা বন্ধ করে দিলো। রাতের অন্ধকারে লোকজন তাদের চুলার নীচে গর্ত করে স্বর্ণ ও রৌপ্য পুতে রাখলো।

আসলে বাদশাহ আক্রান্ত হয়েছিলেন কোষ্ঠকাঠিন্যে। হেকিম তাকে বিষবৃক্ষের ফল দিয়ে তৈরী জোলাপ দিয়েছিলেন। পরবর্তী দু'দিন, দু'রাত ধরে বাদশাহ পায়খানা করতে করতে তার পেট শূন্য করে ফেললেন। পেটে আর কিছুই না থাকায় বাদশাহর গুহ্যদ্বার দিয়ে রক্ত নির্গত হতে লাগলো। বড় লোকের অসুস্থতাও বড়। রাজ প্রাসাদের জানালা খোলা ও বন্ধ করার শব্দেও মনে হয় দুনিয়ার আজই শেষ দিন। প্রথমে বলা হয়েছিল, বাদশাহ কোষ্ঠকাঠিন্যে মারা যাচ্ছেন। এরপর বলা হলো, তিনি আমাশয়ে মারা যাচ্ছেন।

আমার বাপু বলতেন, বাপ যখন হিক্কা তুলে তখন ছেলেরা তার অর্থের থলে সন্ধান করে। বাদশাহর চার পুত্রের ব্যাপারেও এই তত্ত্ব কথাটিই সত্য। বৃদ্ধ বাদশাহ'র অসুস্থতার সংবাদ শোনামাত্র তার পুত্রেরা নিজ নিজ তরবারির বাটে হাত রাখলো। কিন্তু তরবারি বের করার আগে তারা নিশ্চিত হতে চাইছিলো যে, বাদশাহ যথার্থই মারা যাচ্ছেন। অতএব তারা পিতার জন্য উপহার সামগ্রী দিয়ে দিল্লীতে দূত প্রেরণ করলো। বৃদ্ধ বাদশাহ এই কৌশল জানতেন। কারণ তিনি নিজেও একই কৌশল প্রয়োগ করেছেন তার সময়ে। তিনি প্রাসাদের জানালার পাশে এসে আসন গ্রহণ করলেন, যাতে জনতা তাকে দেখতে পায়। মসজিদে মসজিদে তিনি প্রার্থনায় হাজির হলেন জনগণকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য। তার পুত্রেরা এতে বোকা বনলো না এবং আগ্রা ও দিল্লীর উদ্দেশ্যে অভিযান চালাতে সেনাবাহিনী সংগঠিত করতে শুরু করলো।

পুত্রেরা আগ্রা পৌঁছার পূর্বেই বাদশাহ আগ্রায় গিয়ে সিংহাসনে বসার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ সত্ত্বেও তার পুত্রেরা একের পর এক নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলো। প্রথমে বাংলাদেশে অবস্থানরত যুবরাজ সুজা মাথায় মুকুট পরে ঘোষণা করলো, 'আমিই হিন্দুস্থানের বাদশাহ।' কয়েকদিন পর মুরাদ দাক্ষিণাত্যের কোন এক জায়গায় একটি সিংহাসনে আরোহন করে বললেন, 'আমি হিন্দুস্থানের বাদশাহ।' আওরঙ্গজেব এদের চাইতে চতুর ছিলেন। তিনি মুরাদের কাছে গিয়ে বললেন, 'অন্য ভাইদের পরাজিত করতে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। এরপর আমরা আমাদের বৃদ্ধ লোকটিকে কারাগারে আবদ্ধ করবো। তিনি এখন রাজকার্য চালাতে অক্ষম। তুমি হিন্দুস্থানের শাসনভার হাতে নিলে আমি মক্কায় গিয়ে তোমার জন্য প্রার্থনা করবো।' যুবরাজ দারা শিকোহ ভাইদের মধ্যে বড় এবং বাদশাহর প্রিয়পাত্র। তিনি ভাইদের উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, "আমার পিতা হিন্দুস্থানের বাদশাহ। তার পর আমিই হিন্দুস্থানের বাদশাহ হবো। কারণ আমি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব বেজন্মা। আমি ওদের খুন করে ফেলবো।'

আমরা কেউ নিশ্চিত ছিলাম না যে, এই পুত্রদের মধ্যে কে সবচেয়ে ভালো বাদশাহ হবে। ঠিকাদার লাখী রায় দারা শিকোহর পক্ষে। তার মতে, 'দারা বয়সে বড় এবং জ্যেষ্ঠ পুত্ররাই সব সময়ে পিতার উত্তরাধিকারী। এ ছাড়া দারা ঈশ্বরে ভয় করে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে দেখে।' কিন্তু মুসলমানরা দারাকে পছন্দ করতো না। তারা বললো, দারা একজন কাফের। কারণ সে হিন্দুদের দেবতাদের প্রস্তর মূর্তির মতই আল্লাহ ও রসূলের প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ করেছে। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব।

এ সময় দিল্লীতে একজন ইহুদী ফকির বাস করতো। সারমাদ নামের এই ফকির নাগা সন্ন্যাসীদের মত উলঙ্গ থাকতো। সারমাদ বাজারে সকলকে বলে বেড়ালো, দারা বিজয়ী হবে। দিল্লীর লোকজন সারমাদকে ভয় করতো। কারণ সে ঈশ্বরের বন্ধু এবং ঈশ্বরের কাছে যে কোন সাহায্য চাইতে পারে বলে তারা বিশ্বাস করতো। একদিন সরাইখানায় কথা প্রসঙ্গে এক মুসলমানকে বললাম, সারমাদ কি বলছে। উক্ত মুসলমান মাটিতে থুথু নিক্ষেপ করে উচ্চারণ করলো, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা। এ নির্লজ্জ বেহায়া লোকটি মহিলাদের সামনে তার লিঙ্গ নাচায়। আমি যদি কখনো তাকে একা পাই তাহলে তার লিঙ্গ কেটে কুকুরের কাছে নিক্ষেপ করবো।"

ফকির সারমাদের কথা ভুল। হাড্ডি নিয়ে ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন লড়াই করে বাদশাহর পুত্ররা একে অন্যের সাথে সেভাবে লড়াই এ লিপ্ত হলো। দারার পুত্র সোলায়মান শিকোহ সুজাকে পরাজিত করলো। মুরাদ ও আওরঙ্গজেব দারাকে পরাজিত করলো এবং আগ্রা দখল করে বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করলো। এরপর চতুর আওরঙ্গজেব মুরাদের সাথে কৌশলে খেলতে লাগলো। মুরাদকে মাতাল করে তাকে বাঁধলো এবং অন্ধকারে কুঠুরীতে নিক্ষেপ করলো। এরপর সুজা, দারা ও দারার পুত্রকে বিনাশ করলো। এভাবেই আমরা নতুন বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে পেলাম। বাদশাহ শাহজাহান তখনো জীবিত। সরাইখানার মুসলমানরা খুব খুশী। তারা বললো নতুন বাদশাহ খুব ভালো মানুষ। তিনি মদ পান করেন না অথবা তার উপপত্নী বা নর্তকী নেই। তিনি রাজপ্রাসাদে নৃত্য গীত পছন্দ করেন না। তিনি খান কম, ঘুমান কম এবং ইবাদত করেন প্রচুর। পবিত্র গ্রন্থ হাতে লিখে তা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করতেন। তারা বলতো, সব রাজা যদি তার মত হতো, তাহলে হিন্দুস্থান বহু পূর্বে কাফের মুক্ত হয়ে যেতো। আওরঙ্গজেবের নাম ডাকা হতো 'আলমগীর' জিন্দা পীর।

লাখী রায় সুখী হতে পারলো না। নতুন বাদশাহ তাকে কোন ঠিকাদারী দিলেন না। একদিন তার আঙ্গিনায় উচ্ছিষ্ট ভোজনের সময় তাকে বললাম যে, মুসলমানরা বলছে, আওরঙ্গজেব ঈশ্বরের লোক। কারণ তিনি মদ্য পান করেন না কিংবা নারীভোগী নন। লাখী রায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, 'সেই নোংরা মেয়ে মানুষ হীরা বাঈ সম্পর্কে কি বলবে? হঠাৎ তিনি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং আমাকে কসম করালেন যেন তিনি যা বলেছেন তা কারো কাছে প্রকাশ না করি। কিন্তু আমার মন থেকে হীরা বাঈ-এর নাম সরাতে পারলাম না। আমি সেই বানিয়ার কাছে হীরা বাঈ সম্পর্কে জানতে চাইলাম, যিনি আমাকে কখনো কখনো তার উচ্ছিষ্ট খেতে দিতেন। তিনি তার বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমা দিয়ে একটি বৃত্ত তৈরী করলেন এবং ডান হাতের একটি অঙ্গুলী তাতে প্রবিষ্ট করিয়ে বললেন, 'কিন্তু সেই হীরা বাঈ মারা গেছে।' বানিয়া আওরঙ্গজেবকে পছন্দ করতো না, কারণ তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন। কণ্ঠস্বর নীচু করে আমাকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলছি, তুমি কাউকে বলবে না। মারাঠা উপজাতির লোকজন তাকে শেষ করে দেবে। তাদের নেতা শিবাজী এই মোগলদের পশ্চাদদেশে একটি দীর্ঘ বংশদন্ড ঢুকিয়ে দেবে। তুমি কি শোনোনি যে, শিবাজী কিভাবে নিজ হাতে বাদশাহর একজন সেনাপতির ভুড়ি বের করে ফেলেছিল। ভগবান রামের দোহাই, একটা কথাও যেন মুখ দিয়ে বের না হয়। তাহলে ওরা আমার গলা কেটে ফেলবে।'

আমি কথা হজম করতে পারি না। একদিন সরাইখানার মুসলিম বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলাম সে শিবাজির নাম শুনেছে কিনা? সে প্রায় আমার মুখের উপর থু থু ছিটালো 'এই নাখাস্তা কাফেরের নাম তুমি কোথায় শুনেছো? সেই হারামখোর আমাদের সাহসী সেনাপতি আফজাল খানকে হত্যা করেছে। অথচ সেনাপতি তাকে বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিল। সে এই ধরনের কাপুরুষ। বাদশাহ তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছায় সেই মুষিক গর্ত থেকে বের হবে এবং তাকে ধ্বংস করা হবে ইনশাল্লাহ।'

কয়েক মাস পর মুসলিম বাবুর্চি আমাকে অনেক উচ্ছিষ্ট দিলো। তাকে খুব আনন্দিত মনে হচ্ছিল, "তুমি কি তোমার শিবাজীর কথা শুনেছো? তাকে পাকড়াও করা হয়েছে এবং শৃখল পরিয়ে আগ্রায় আনা হয়েছে। এখন তাকে দোজখে পাঠান হবে।" যখন আমি কথাটা বানিয়াকে বললাম, বানিয়া জানালো, কথাটা মিথ্যা। শিবাজী স্বেচ্ছায় বাদশাহর কাছে এসেছিল আলোচনা করতে। অনেক দিন ধরে দিল্লীবাসীরা শিবাজী প্রসঙ্গে কথাবার্তা বললো। মুসলমানরা বললো, শিবাজী একটি বড় পামর এবং বাদশাহ তার কল্লা কাটবে। হিন্দুরা বললো, সে একজন মহান বীর। এরপর আমরা শুনলাম, শিবাজী পালিয়ে দাক্ষিণাত্যে তার পার্বত্য রাজ্যে ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে। বানিয়া খুশী হয়ে বললো, 'তোমাকে বলিনি মুসলমানরা তাকে ধরতে পারবে না, রামজী তার সহায়।'

বাদশাহ খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বারানসী ও মথুরার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। বানিয়া মুসলমানদের ভয়ে এতোটাই ভীত হলো যে, বাদশাহকে 'জালিম' বলে উল্লেখ করলো। সে বললো, 'যখনই কোথাও জুলুম বেড়ে যায়, ঈশ্বর জালিমকে ধ্বংস করার জন্য অবতার প্রেরণ

করেন। পবিত্র গীতায় এ কথা লিখা আছে।' লাখী রায় যিনি মুসলমানদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেন তিনিও মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'এটা হচ্ছে কলি যুগ। ঈশ্বর আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য অবতার প্রেরণ করবেন।'

জুলুম চলতেই থাকলো। কোন অবতারই এলো না তা বন্ধ করতে। পূর্বদিকে কয়েক ক্রোশ দূরের তিলপাত গ্রামের জাঠ ও ব্রাহ্মণরা যখন তাদের মন্দিরের অধীন জমি দাবী করলো, বাদশাহ তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে গ্রামটি ধ্বংস করে দিলেন। তাদের নেতা গোকুলা জাঠ ও তার সমর্থকদের দিল্লীতে এনে মৃত্যুদন্ড দেয়া হলো। তাদের রক্ষার জন্য কোন অবতার এলো না।

তিন বছর পর নরনাউল নামক স্থানে চরম জুলুম করা হলো। শতনামী নামে এক গোত্রের অসংখ্য সাধুকে হত্যা করা হলো। কিন্তু কোন অবতারের আবির্ভাব ঘটলো না জালিম বাদশাহকে শাস্তি প্রদানের জন্য। আমি লাখী রায়কে অবতারের আগমণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি মাথা ঝাঁকালেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, গুরু অবতার হতে পারেন কিনা? তিনি জানতে চাইলেন, 'কোন্ গুরু? অনেক গুরুই তো আছেন এবং সব গুরুই তাদের প্রতিনিধি পাঠায় শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রাহের জন্য।' লাখী রায়ের কথাটা কেমন অদ্ভুত লাগলো।

গুরুর প্রতি আমার বিশ্বাস হারাতে শুরু করলাম। সরাইখানার মুসলমানরা গুরু সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা করতো। একজন বললো, 'তুমি যার পূজা করছো সেই দস্যুটি কে?' মসজিদের মোল্লা বললো, বাদশাহ খুব শীঘ্রই তোমার গুরুকে আনুগত্যের পথে আনবেন এবং তাকে শিক্ষা দেবেন যে, আল্লাহ তার একমাত্র পয়গম্বর মোহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার পথ দেখিয়েছেন। যদিও আমি গুরু সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, কিন্তু তাকে নিয়ে মুসলমানদের এমন ধারা কথাবার্তা আমার ভালো লাগলো না। গুরুকে আগ্রায় গ্রেফতার করে যখন শৃংখল পরিয়ে দিল্লীতে আনা হলো, মুসলামানরা ব্যঙ্গ করলো, 'আমরা তোমাকে বলেছিলাম, তোমার এই গুরু দস্যু। পুরো দলকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।'

আমি গুরু ও তার সাথে গ্রেফতারকৃত তিনজন শিখকে দেখলাম। নিজেকে বললাম, 'তিনি যদি একজন অবতার হন তাহলে নিজেকে রক্ষা করবেন এং জালিমদের ধ্বংস করবেন।' আমি প্রার্থনা করলাম যেন তিনি তার কারাকক্ষ থেকে উড়ে যেতে পারেন অথবা কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন যাতে আমি রিকাবগঞ্জের মুসলমানদের কাছে আমার মুখ দেখাতে পারি।

কিন্তু হতভাগ্য অস্পৃশ্যদের প্রার্থনার তোয়াক্কা কে করে? বিচারক ছিলেন কাজী আবদুল ওয়াহাব। তার আল্লাহ তাকে এমন বধির করে দিয়েছিলেন যে, লোকে তাকে ডাকতো, 'বেহরা কাজী।' তিনি গুরু ও তার তিন অনুসারীকে মৃত্যুদন্ড দিলেন। তিনি কোতোয়ালীর সামনে তাদের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেকে দেখতে পারে। এই প্রথম শান্তশিষ্ট লাখী রায় সাহসী হয়ে উঠলেন। তিনি আমাকে বললেন, এটা হতেই পারে না। গুরু তার জীবন রক্ষা করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু তার মৃতদেহের অসম্মান আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।' ধনাঢ্য ঠিকাদার আমাকে সম্বোধন করলেন 'জৈতাজী' বলে। এর আগে তিনি সব সময় আমাকে ডাকতেন 'জৈতু' বা আরও খারাপভাবে। 'এই চুরহা (মেথর)' বলে। কি করে আমি জানবো যে লাখী রায় একজন গুপ্তচর নয়। আমি চুপ থাকলাম। নিরবতাই দরিদ্রের সর্বোত্তম বন্ধু।

সেই শরতে দিল্লীতে অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। রামলীলা বা রাবণ ও তার ভাইদের কুশ পুত্তলিকা জ্বালানো ছাড়াই দশহরা অতিক্রান্ত হলো। হিন্দুরা বললো, বাদশাহ হিন্দু উৎসব পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। মুসলমানরা বললো, এটি মিথ্যা প্রচারণা এবং হিন্দুরা কেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ উৎসব পালন করছে না তা তারা জানে। কয়েকদিন পর এলো দিওয়ালী। কারো বাড়ীতে একটি বাতিও জ্বললো না। একটি পটকার শব্দও শোনা গেল না। আতশবাজী পোড়ানো হলো না। কেউ কারো বাড়ীতে মিষ্টি প্রেরণ করলো না। গোটা বিশ্ব যেন একটি জ্যোৎস্নাবিহীন অন্ধকার রাত। যখন লক্ষ লক্ষ তেলের বাতি জ্বলবে বলে সকলে জানে, অথচ একটিও জ্বলে না, তখন অন্ধকার গভীর হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং হিন্দুদের জন্য কোন দিওয়ালী থাকলো না। মুসলমানদের মনে হতে লাগলো যেন তাদের পশ্চাদদেশে পিপড়া হেঁটে বেড়াচ্ছে। সরাইখানার মসজিদের মোল্লা শ্লেষের সাথে লাখী রায়ের কাছে জানতে চাইলেন, 'দিওয়ালীর রাতে তিনি কেন বাতি জ্বালাননি?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'একজন নিকটাত্মীয় মারা গেছে তাই।' মোল্লাজী বিস্মিত হয়ে বললেন, মনে হচ্ছে সব হিন্দুরই কোন না কোন নিকটাত্মীয় মারা গেছে। কিন্তু আশা করি কারণটা এমন নয় যে, কোন নিকটাত্মীয় মারা যাবে। তাই না?"

লাখী রায় কোন উত্তর দিলেন না। মোল্লাজীর রাগ পড়লো আমার উপর। 'এই যে জাইতু। তোমারও কি মায়ের মা মারা গেছে যে দিওয়ালীতে তুমিও বাতি জ্বালাওনি?' আমি বললাম, "মোল্লাজী, গরীবের বাড়ীতে প্রতিদিন কেউ না কেউ মরে। বাতি জ্বালাবার মত তেল থাকে না আমাদের। আপনি যদি আমাকে টাকা দিতেন তাহলে আমি রিকাবগঞ্জের প্রতিটি বাড়ীতে বাতি জ্বালাতাম।' তিনি দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি লম্বা লম্বা কথা বলতে শিখেছো। তাই না?'

দিল্লীর সকলেই বলাবলি করছিলো যে, গুরু তার অলৌকিক ক্ষমতা অবশ্যই দেখাবেন। তারা বললো, গুরু বা তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যারাই হাত তুলেছে তারা অন্ধ হয়ে যাবে। কোতোয়াল তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার জন্য দিল্লীতে কাউকে না পেয়ে পাঞ্জাবের সীমানা হতে জালালউদ্দিন নামে একজন জল্লাদকে ডেকে পাঠালো। জালালউদ্দিন শিখ ও তাদের গুরুদের ঘৃণা করতো।

আলোক সজ্জাবিহীন দিওয়ালী উৎসবের কয়েক দিন পর জালালউদ্দিন গুরুর সাথে ধৃত শিখদের মাথা কেটে ফেললো। জালালউদ্দিন অন্ধ হলো না, কোন কিছুই ঘটলো না তার। এবার গুরুর পালা। বেহরা কাজী বললেন, 'আমরা আগামী বৃহস্পতিবার গুরুর কল্লা কাটবো। তার মৃতদেহ শুক্রবার জনসাধারণের দর্শনের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হবে। দিল্লীর সকলে দেখবে কে শক্তিশালী- ইসলামের তরবারী না একজন বিধর্মীর গলা।' পৃথিবীর সকলেই জানে যে, যখনই দিল্লীতে কোন পবিত্র মানুষের রক্ত ঝরেছে, মহান ঈশ্বর যিনি আকাশে বাস করেন, তিনি তার ক্রোধ সকলকে জানতে দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সূর্য উদিত হলো ঠিক অগ্নি গোলকের মত। সকলে বললো, 'আজ ভয়াবহ কিছু ঘটতে যাচ্ছে'। মুসলমানরাও উদ্বিগ্ন হয়ে আশা করতে লাগলো যে, বাদশাহ পাঞ্জাব থেকে দূরে থাকলেও ঘটনাটা জানতে পারবেন এবং বেহরা কাজীর নির্দেশ বাতিল করে দেবেন। কোতোয়াল আমাকে বললেন যে, তিনি সারা রাত প্রার্থনা করেছেন। তিনি বললেন, 'গুরুকে হত্যা করা হলে মুসলমানদের ভালো হবে না।'

গুরু অলৌকিক কিছু দেখালেন না। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে তিনি জল্লাদ জালালউদ্দিনকে তার মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিলেন। বাদক দল বাদ্য সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করতে করতে ঘোষণা করলে যে, ন্যায় বিচার করা হয়েছে এবং গুরুর দেহ কোতোয়ালীর সামনে দু'দিন দু'রাত ঝুলিয়ে রাখা হবে, যাতে সকলে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

আমি সংবাদটি রিকাবগঞ্জে বয়ে আনলাম। বিকেলে রিকাবগঞ্জের সকল হিন্দু ও মুসলমান একটি গাছের নীচে জড়ো হলো। পুরুষরা হাহুতাশ করলো, মহিলারা কাঁদলো। সরাইখানার মুসলমানরা দূর থেকে আমাদের দেখলো। তারা আমাদের দুঃখে কাতর হয়েছে বলে মনে হলো।

জনতার মধ্যে বসে হাহুতাশ ও কাতর ধ্বনি শুনে আমার মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি এলো। গুরুর জীবন রক্ষার জন্য আমরা কিছুই করিনি। এখন তারা গুরু উলঙ্গ দেহ মানুষের দেখার জন্য ঝুলাবে এবং পশু-পাখী তা খুবলে খাবে। আমরা কেমন ধরনের ভক্ত। আমার রক্ত টগবগ করতে লাগলো। নিজের সাথেই রাগান্বিত হলাম। গুরুর ভক্তদের অধিকাংশই উচ্চ বংশের ক্ষত্রিয় ও জাঠ কৃষক, যারা তাদের সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত। তারা গুরুকে রক্ষার জন্য কিছুই করেনি। আমি একজন অস্পৃশ্য হয়ে উচ্চ বংশের এই লোকগুলোকে শিক্ষা দিতে পারি যে, গুরুর একজন শিখ কি করতে পারে! এর ফলে আমার জীবন যেতে পারে, কিন্তু আমি আমার অস্পৃশ্য ভাইদের জন্য বিশ্বের সম্মান অর্জন করতে পারবো।

আমি আস্তে করে কেটে পড়লাম। লাখী রায় আমাকে উঠতে দেখে আমাকে অনুসরণ করলেন। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমাকে কিছু কাজ করতে হবে। তুমি যদি যথেষ্ট সাহসী হও তো বলি।' এই প্রথম তিনি আমাকে স্পর্শ করলেন। আমি এই ধনবান ঠিকাদার সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম না। ধনী মানুষ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিত হতে পারে না। আমি বললাম, 'আমাকে কোতোয়ালীতে যেতে হবে কাজ করতে।' লাখী রায় বললেন, 'আমিও তোমার সাথে যাবো। কোতোয়ালীতে আমারও কাজ আছে।' এ কোন্ ধরনের খেলা? অতো খোঁজ-খবরে আমার কি দরকার। অবশ্য, আমার কাঁধে লাখী রায়ের চাইতে গুরুর হাতের স্পর্শই অনুভব

করলাম। পৃথিবীর কারো জন্যই আমার ভয় হচ্ছে না। বাদশাহ, বেহরা কাজী অথবা জল্লাদ জালালউদ্দিনের জন্যও নয়। মোগল সৈন্য, কিংবা কোতোয়ালের জন্যও কোন ভয় হলো না।

লাখী রায়ের বেশ ক'টি গরুর গাড়ী রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিল। সেগুলো তুলার গাইটে বোঝাই। তার আট পুত্রও তার সাথে। যেহেতু তিনি একজন সরকারী ঠিকাদার, সে কারণে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা অস্ত্র বহন করতে পারতেন। সকলের কাছে ছিল তরবারি ও বর্শা। লাখী রায়ের বহর সব সময়ই রক্ষী পরিবেষ্টিত থাকতো। সে জন্যে সকলে তাকে চিনতো। আমরা বিকেলে রিকাবগঞ্জ ত্যাগ করলাম।

আমরা যখন পাহাড়গঞ্জে পৌছলাম সূর্য সহসা হারিয়ে গেল। বাতাস থেমে গেল। শত শত চিল আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরছে বৃত্তাকারে। আমরা পশ্চিম দিকে একটি ধূসর প্রাচীর দেখতে পেলাম। নগর প্রাচীরের কাছে পৌছতেই চিলের বৃত্তকে শাহী মসজিদের উপর দেখলাম। এরপর ঝড় এমন রুদ্র রূপ ধারণ করলো যা আমি সম্ভব বলে ভাবিনি। আজমিরী গেটের প্রহরীরা তাদের পাগড়ীর প্রান্ত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে। ঝড়ের বেগ আমাদেরকে কাজী কা হাউজ, লাল কুয়ান এবং চাঁদনী চকের বেগম ফতেপুরী মসজিদ হয়ে কোতোয়ালীতে তাড়িয়ে নিয়ে এলো।

গুরুর অদৃশ্য পরিকল্পনা কে জানে? ধূলিঝড় দিনকে রাতে পরিণত করলো। ধূলির দাপটে প্রতিটি বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রহরীরা ব্যারাকে প্রবেশ করে ফটক বন্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র বাতাসের গর্জন শোনা যাচ্ছে। গুরুর লাশ খুঁজে পেতে আমার কোন অসুবিধা হলো না। আমি তার পদস্পর্শ করে লাশ কাঁধের উপর তুলে নিলাম। তার মাথায় হাত রেখে অন্ধকার ধূলিঝড়ের মধ্য দিয়ে হেঁটে চললাম। লাখী রায় ও তার পুত্ররাও গুরুর পদস্পর্শ করলো। আমরা গুরুর লাশ একটি গরুর গাড়ীতে রেখে তুলার গাইট দিয়ে লাশ ঢেকে গাড়ীর মুখ ফিরিয়ে দিলাম। ধূলিঝড় আমাদেরকে চাঁদনী চক হয়ে একই রাস্তা দিয়ে পাহাড়গঞ্জে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। যখন রিকাবগঞ্জে ফিরে এলাম সহসা বাতাস থেমে গেল। রাত নেমে এল।

লাখী রায়-এর স্ত্রী ও শালীরা বাড়ীর আঙ্গিনায় চন্দন কাঠ দিয়ে একটি চিতা তৈরী করলো। আমরা গুরুর লাশ চিতায় স্থাপন করলাম। পরিবারের সকল সদস্য গুরুর পদস্পর্শ করলো। লাখী রায় সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। তার স্ত্রী একটি শাল এনে গুরুর মাথা তাতে মুড়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, আনন্দপুরে গুরুর পুত্রের কাছে নিয়ে যাও। গুরুই তোমাকে সেখানে নিরাপদে নিয়ে যাবেন।

আমি বের হয়ে পিছনে ফিরলাম নিশ্চিত হতে যে কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কি না। দূরে লাখী রায়ের বাড়ীর চত্বরে গুরুর চিতা থেকে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। ঝড় সম্পূর্ণ বিদূরিত এবং আকাশ স্বচ্ছ হয়ে তারকারাজি ফুটে উঠেছে। পূর্ণিমার পর কয়েক দিন গত হয়েছে। দ্রুত পা চালালাম। ইতিমধ্যে আকাশে চাঁদ উঠেছে। আনন্দপুরের পথে দিল্লী থেকে অনেক ক্রোশ চলে এসেছি।

অবশেষে গুরু তার মহান অলৌকিক লীলা দেখালেন। তিনি মানুষের মল ও পুঁতি দুর্গন্ধময় লাশ বহনকারীকে তার পবিত্র মস্তক বহনের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করলেন। এই ঘটনার পর যে কেউ আমাকে নোংরা, অস্পৃশ্য বলতো তাদের মুখ গোবরে পরিপূর্ণ করার অভিশাপ দিতাম। আমি এখন জৈতা রংগ্রিতা, গুরুর সত্যিকার পুত্র।

৯

ভাগমতী

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে ভাগমতীকে দেখিনি। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো, তার কথা চিন্তাও করিনি। 'আপনার অজানা দিল্লী' নামে দূরদর্শন টিভিতে একটি ধারাবাহিক তৈরীর কাজে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মেহরুলির উপকণ্ঠের সৌধগুলো দিয়ে আমি শুরু করেছি- ইলতুৎমিশ, সুলতান ঘোরী, বলবন এবং জামালী-কামালীর সমাধি সৌধ দিয়ে। আমি কিছু ধ্বংসপ্রায় পরিত্যক্ত মসজিদ ও ভবন জুড়ে দিয়েছি। দূরদর্শনে আমার আবির্ভাব অনাকাংখিত একটি বোনাস এনে দিল। এক মহিলা লিখে পাঠিয়েছে যে, তিনি অনুষ্ঠানটি দেখেন এবং আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। তার নামের প্রথম অংশ দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন- কমলা। মিস বা মিসেস কিংবা আর কিছুই নেই যে, তিনি কে, বয়স কত অথবা জীবিকার জন্য কি করেন। ঠিকানাটি এক আর্মি মেসের রুম নম্বর। সাধারণতঃ যেসব মহিলা পুরুষদের কাছে চিঠি লিখেন তারা জানেন না যে, এর ফলে একজন বিব্রত হতে পারে। যা হোক, কোন কিছুর দ্বারা তাড়িত হয়ে তার চিঠির জবাব দিলাম যে, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি আনন্দিত হবো। ভাগমতীর ব্যাপারে যখন কিছুটা অপরাধ বোধ জেগেছে তখনই এটা ঘটলো।

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার লাইব্রেরীতে এক বা দুই ঘন্টা কাটালাম, যেখানে কমলাকে সাক্ষাৎ করতে বলেছি। যেহেতু ভদ্রমহিলা জানেন যে, আমি দেখতে কেমন, অতএব আমাকে খুঁজে বের করা তার জন্য সহজ। যদিও আমি সাধারণতঃ ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা উল্টাতে পছন্দ করি, কিন্তু আজ সকালে আমি পড়ার প্রতি মন রাখতে পারছি না. বরং যে মহিলাই লাইব্রেরীতে প্রবেশ করছে তাকে দেখছি। মেয়েটি কি পনের বছরের, না পঞ্চাশের? মোটা না ক্ষীণাঙ্গী? ফর্সা না কালো? এবং আমার সাথে পরিচিত হয়ে সে কি জানতে চায়? আমাকে বিরক্ত করতে অথবা তার সাথে শয্যায় যেতে? অবশেষে তার আগমণ ঘটে। হেঁটে সোজা আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলে, 'আমি কমলা।'

আমি উঠে দাঁড়াই, তার হাত নিয়ে উত্তর দেই, 'আপনার সাথে সাক্ষাতে আমি আনন্দিত। চলুন বাগানে গিয়ে কফি পান করি।'

তিনি ছোট, কালো এবং মনে হয়, ত্রিশোত্তীর্ণ। একটি টেবিল দখল করে দুই কাপ কফির অর্ডার দেই। আমিই কথা শুরু করি, 'আপনার পুরো নাম কি? কমলার পর কি?'

'আপনি খুবই উৎসুক মানুষ। আমার নাম কমলা গুপ্ত, ব্রিগেডিয়ার গুপ্তের স্ত্রী। আমাদের তিনটি স্কুলগামী সন্তান আছে- একটি মেয়ে, দু'টি ছেলে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করি, 'তিন বাচ্চার মা! আপনাকে কলেজ ছাত্রীর মত তরুণী মনে হয়।'

তিনি প্রশংসায় বিগলিত। 'আপনি যতটা ভাবছেন আমি তেমন তরুণী নই। আমার বয়স চল্লিশের বেশী। বিয়েই হয়েছে বিশ বছরের উপরে। লোকজন আমার মেয়েকে আমার ছোট বোন বলে ভুল করে।'

'আপনি কি দিল্লীর মেয়ে?'

'না। আমি তামিল। আমার স্বামী এই দিল্লীরই।' 'দিল্লীরই' শব্দের মধ্যে যথেষ্ট ভারতীয়বোধ আছে। এটা এমনও হতে পারে শুধু দিল্লীর।

আমি অনুমান করে বললাম, 'জিসাস ও মেরীর কনভেন্টের ছাত্রী আপনি। মিরান্ডা হাউজে ছিলেন এবং পরিবারের আয়োজনে বিয়ে হয়েছে।'

'তিনটি ধারণাই ভুল। মডার্ণ স্কুল ও সেন্ট স্টিফেন কলেজে আমার স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং বিয়ে করি পরিবারের অজান্তে। আমাদের দুই জাতি, দুই রাজ্যের এই বিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিবার মেনে নিয়েছে। আমার স্বামী বানিয়া গোত্রের এবং আমি মুদালি। সে হিন্দি বলে। আমি তামিল বলি। দু'জন কথা বলি ইংরেজীতে। আমাদের বাচ্চারা তিন ভাষাতেই কথা বলে।'

'শুনে চমৎকার লাগছে। পরিবারের আর সবাই কোথায়?'

আমার স্বামীর পোস্টিং দূরে, যেখানে পরিবার সাথে রাখার ব্যবস্থা নেই। বাচ্চারা মুসুরীর এক বোর্ডিং স্কুলে। আমাকে আর্মি মেসে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ছুটির সময় আমরা একত্রিত হই।'

আলোচনায় ছেদ পড়ে। আমি তার দেহ সম্পর্কে ভাবছি। তিনি কফির কাপে ব্যস্ত। নীরবতা ভেঙ্গে বলেন, 'কি ভাবছেন? আমি বলতে পারি, আপনি কি নিয়ে চিন্তা করছেন- এই মহিলাটি আমার সাথে কেন সাক্ষাৎ করতে চেয়েছে?'

'আপনি বলুন।'

'বলছি। আমার করার মত কোন কাজ নেই। আর্মি অফিসারদের স্ত্রীদের সহ্য করতে পারি না। সে জন্য ভেবেছি, একটা বই লিখবো, বা এ ধরনের কিছু করবো। টিভিতে আপনার অনুষ্ঠানটি আমাকে একটি আইডিয়া দিয়েছে। দিল্লী এবং এর সৌধগুলো সম্পর্কে লিখি না কেন? আপনার কি মনে হয়।'

'এ সম্পর্কে বাজারে শত শত বই আছে।'

'হয়তো আছে। কিন্তু সবই এক রকম। আপনার অনুষ্ঠানে যা দেখাচ্ছেন কোনটাতেই ওসব জিনিস নেই। আমি অসংখ্য পুরনো হাভেলীর কথা জানি যেগুলো সরু গলিতে হারিয়ে গেছে এবং কেউই সে সম্পর্কে জানে না। আমার স্বামী জন্মেছে এবং বড় হয়েছে 'পরাটাওয়ালা গলিতে'। আপনি কখনো নামটি শুনেছেন?'

'শুনেছি, দেখিনি।'

'তাহলে দেখুন। আপনিও জানেন না! কখনো 'গলি নিমকহারাম' এর কথা শুনেছেন? বাজি ধরতে পারি, শুনেননি। আমি যা দেখিনি সেগুলো আমাকে দেখাবেন এবং আপনি যা দেখেননি আমি সেগুলো দেখাব। এবং আমরা একসাথে বইটি লিখবো। আপনি কি বলেন?' চুক্তির অংশ হিসেবে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। আমিও চুক্তির অংশ হিসেবে তার হাতটা নেই, 'বাস।' এবং হাতে ভদ্রভাবে চাপ দেই। হাতটা দৃঢ়, কিন্তু মোটা।

ঘন্টাখানেক আমরা কথা বলি। মনে হচ্ছিল যে, আমরা বহু বছর ধরে পরিচিত। আমার অল্প সন্দেহ ছিল যে, চুক্তি হতে আমি অনেক কিছু আহরণ করতে পারবো। আমি তাকে আর্মি মেসের বাইরে নামিয়ে দেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যদের থাকার জন্য তৈরী পুরনো একটি ভবন। পরবর্তী রোববার তিনি ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে সাক্ষাৎ করবেন। টিভিতে দিল্লীর যেসব স্থান প্রদর্শন করেছি সেগুলো তাকে ঘুরিয়ে দেখাবো। 'মেসের চাইতে সেন্টারই ভালো। অফিসারদের কুন্ডী বউগুলো ট্যারা চোখে তাকাবে' হাত নেড়ে বিদায় দিতে দিতে বললো।

আমার জন্যে তিনি গেটে অপেক্ষা করছিলেন। একটি ছোট বাক্সেটে দু'টি ফ্লাস্ক এবং এক বাক্স স্যান্ডউইচ। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, 'লোকজনের ভীড়াক্রান্ত ক্যাফেটেরিয়া বা ধাবায় যাওয়ার চাইতে নিজেদের খাবার জিনিস সাথে নেয়াই ভালো।'

আমি তাকে পাথরে তৈরী ছোট্ট একটি গনেশ মূর্তি উপহার দেই। আমার কাছে পড়ে ছিল সেটি। তাকে বলি, 'এটি আমার সৌভাগ্যের প্রতীক। আমার মানিব্যাগে সবসময় একটা রাখি। আমাদের বন্ধুত্বে যাতে কোনরকম বিঘ্ন না ঘটে এই মূর্তি তা দেখবে।'

তিনি মূর্তিটি দুই হাতের তালুতে রেখে চুমু দেন, 'ধন্যবাদ। আমি নিশ্চিত যে গনেশ আমার ভাগ্য বয়ে আনবে।' কুতুব মিনার অতিক্রম করতেই তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি যে অতি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কুতুব মিনার একটি হিন্দুসৌধ।'

আমি কৌতুকের সুরে বলি, 'তাজমহল এবং লাল কিল্লা সম্পর্কেও একই কথা বলা হচ্ছে। আপনি কোথা হতে এই আজগুবি তথ্য পেয়েছেন। এই সব সৌধ, ভবনের গায়ে আরবীতে উৎকীর্ণ আছে নির্মাতার নাম, নির্মাণ সমাপ্তির তারিখ। আপনি নিশ্চয়ই হিন্দু ফ্যাসিস্ট প্রোপাগান্ডা পড়াশুনা করছেন?'

সকালটা মেহরুলিতে অতিবাহিত করি। আওলিয়া মসজিদের পাশে গাড়ী পার্ক করি। শামসি তালাবের পাশ দিয়ে হাঁটি। জাহাজ মহল পার হয়ে জনবহুল রাস্তায় আসি। আমি তাকে কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযারে নিয়ে যাই এবং পাশের গোরস্থানে মোগল বাদশাহদের সমাধি দেখাই। সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে আমি তাকে বান্দা বৈরাগী ও তার 'সাতশ' শিখ অনুসারীকে হত্যা করার কাহিনী বলি, 'তার প্রতিটি অঙ্গ টুকরো টুকরো করে কাটার পূর্বে তার নিজের সন্তানকে তার সামনে হত্যা করা হয়েছে।'

'কখন?'

'রোববার, ১৯ জুন, ১৭১৬।'

'আপনি নিশ্চয়ই মুসলমানদের ঘৃণা করেন।' মহিলা উচ্চারণ করেন। 'দিন তারিখ এমনভাবে মনে রেখেছেন, যেন আপনার জন্মদিন।'

'না, আমি মুসলমানদের ঘৃণা করি না।' আমি প্রতিবাদ করি। 'বান্দা বৈরাগী সদলবলে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তিনি হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিলেন। তখন ছিল খুব হাঙ্গামাপূর্ণ সময়।'

আমি তাকে জামালী-কামালী মসজিদে নিয়ে যাই। তিনি কফি ঢেলে আমাকে একটি স্যান্ডউইচ দেন। একটি নোটবুক ও বলপেন বের করেন।

'সকালে যে স্থানগুলো দেখলাম সেগুলোর নাম বলুন। আমি যদি টুকে না রাখি তাহলে সবকিছু ভুলে যাব।'

আমি তাকে বলে যাই এবং তিনি লিখে নেন এবং কফিতে চুমুক দেন। বান্দা বৈরাগীর প্রসঙ্গে যখন আসি, তিনি বলে উঠেন, 'মুসলমানদের আপনি পছন্দ করেন, কথাটা আমি বিশ্বাস করি না।'

আমি আরেকবার প্রতিবাদ করি, 'আমার অধিকাংশ বন্ধুই মুসলিম। হিন্দু বা শিখ নয়।'

আপনি সম্ভবতঃ আওরঙ্গজেবের মত কাউকে পছন্দ করবেন না- যিনি তার ভাই ও ভাতিজাদের হত্যা এবং পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। হিন্দু মন্দিরগুলো তিনি ধ্বংস করেছিলেন এবং আপনাদের একজন গুরুকে প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন। তার মত একটি চরিত্রকে কি করে আপনি পছন্দ করবেন? আপনি যদি আমাকে বলেন, তাহলে আমি বলবো; আমাদের হিন্দু-মুসলিম যে সমস্যা আজ হচ্ছে তার কারণ খুঁজলে আওরঙ্গজেবকেই দায়ী করতে হবে।'

'মাই ডিয়ার ইয়ং লেডী, ভালোভাবেই আপনার মগজ ধোলাই হয়েছে। আপনাকে কখনো বলা হয়নি যে, এই আওরঙ্গজেবই হিন্দু ও শিখদের মন্দির নির্মাণে অর্থ মঞ্জুরীও দিয়েছে।'

'এটা আমার জন্যে একটা খবর। এটি এখনই আপনি তৈরী করলেন।' আর্মি মেসের কাছে রাস্তার কোনায় তাকে নামিয়ে দিতে বলেন। আমাদের পরবর্তী পরিদর্শন স্থল নগরীর মধ্যেই, যেখানে তিনি হবেন আমার গাইড এবং চালক। এবার আমি তাকে স্ফটিক নির্মিত একটি ছোট্ট গনেশ মূর্তি উপহার দেই, 'এটি আপনার ভাগ্যকে দ্বিগুণ করবে।' এটি পেয়ে তিনি আমার দাড়িতে চুম্বন করেন। গাড়ী চালিয়ে লাল কিল্লার কাছে যাই এবং এক স্থানে গাড়ী পার্ক করি। তিনি আমাকে চাঁদনী চকে নিয়ে যান। 'আমি আপনাকে দারিবা অথবা পরাটাওয়ালা গলির ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সেখানে আমার শ্বশুরবাড়ীর অনেকে বাস করে, যারা জানতে চাইতে পারে যে সর্দারজির সাথে কি করছি।'

আমি জবাব দেই, 'আমিও লাল কুয়ানের আশেপাশে নিজেকে দেখাতে চাই না। সেখানে আমার বন্ধুরা থাকে।'

সন্দেহজনকভাবে জানতে চান, 'লাল কুয়ানে বন্ধু? কেমন বন্ধু?'

'খুবই সম্মানিত এবং পছন্দনীয়।' তাদের সম্পর্কে যথাসময়ে আপনাকে বলবো।' নয়াসড়ক থেকে আমরা একটি সরু গলিতে প্রবেশ করি। তিনি বেশ কিছু পুরনো হাভেলী আঙ্গুল দিয়ে দেখান এবং পিপল গাছের নীচে ধর্মশালা। কোন কোন স্থানে খোলা জায়গায় স্তূপীকৃত মলের দুর্গন্ধ অসহনীয়। চড়ে বেড়ানো গরু, ফেরিওয়ালা, স্কুটার, পথচারীর ভিড়ে এগুনো মুশকিল। এর ফলে মাঝে মাঝে তার হাত ধরার অজুহাত পেয়ে যাচ্ছি। তখন তিনি আমার হাতে চাপ দেন। তার পক্ষ থেকে অনুমোদনের ঘাটতি নেই। দেড় ঘন্টা ধরে গলিপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলাম জুমা মসজিদের পিছনে। ময়দান অতিক্রম করে আমরা লাল কিল্লার পাশে পার্কিং লটে গেলাম।

তিনি বললেন, 'আমাকে কনট সার্কাসে নামিয়ে দিন। আমার কিছু কেনাকাটা আছে।' আমি জানি এটা একটা অজুহাত। আর্মি মেসের কেউ যাতে দেখে না ফেলে সে জন্যেই তার এই সতর্কতা। তার এই মনোভাবে আমি খানিকটা বিব্রত। আমি যখন তাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসার জন্যে বলি, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেন। যদিও আমাদের আলোচনার সময় তিনি এ ধরনের জীবনযাপনে তার অসুখী থাকা সম্পর্কে কোন গোপনীয়তাই রক্ষা করেন না। 'একজন আর্মি অফিসারের স্ত্রীর জীবন কেমন করে কাটে? স্বামী সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস বাইরে অবস্থান করেন। যখন কয়েক দিনের জন্য ফিরে আসেন তিনি স্ত্রীর সাথে যৌনসঙ্গম ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না। তিনি যতবার চান ততবার পান, তার স্ত্রী পছন্দ করুক আর না করুক তাতে কিছু যায় আসে না। এরপর তিনি আবার চলে যান, আর তার স্ত্রী রয়ে যায় বুড়ো আঙ্গুল চোষার জন্য।'

অক্টোবরের এক উষ্ণ বিকেলে সেন্টারে আমাদের তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ হয়। এবারও আমি তাকে একটি গনেশ মূর্তি দেই- এটি হাতীর দাঁতের তৈরী। আমার ঠোঁটে চুমু দিয়ে বলেন, 'আমাকে আর কত গনেশ মূর্তি দেবেন?' আমরা গাড়ী চালিয়ে পুরানা কিল্লার দিকে যাই।'

গাড়ীতে তাকে জিজ্ঞেস করি, 'আপনি জানেন, আপনাকে কি দিতে আমার ইচ্ছা করে?'

'না, বলুন।'

'সত্যি সত্যিই, যা দিতে ইচ্ছে করে, তা হলো একটি বাচ্চা।'

তার চোখ ঝলসে উঠে না। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটু পর বলেন, 'এ জন্যে কিছু কাজ করতে হতে পারে। কারণ আমার টিউব সেলাই করে দেয়া হয়েছে তৃতীয় বাচ্চা হওয়ার পর। কিন্তু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। আছে কি?'

এ ধরনের মহিলার সঙ্গে কি একজন কি করে পেরে উঠবে? আমি রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ি। আমি তার হাত আঁকড়ে ধরে হাতে চুমু দেই। সারাটা বিকেল এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা না বলে পুরনো সৌধগুলো শুধু ঘুরে ঘুরে দেখি। ফেরার পথে তিনি আমাকে আইএনএ মার্কেটে নিয়ে যেতে বলেন, যেখানে কিছু ফল ও অন্যান্য খাবার জিনিস কিনবেন। আমাকে নির্দেশ দেন, 'আপনি গাড়ীতেই বসুন। আমি খুব বেশী সময় নেব না।'

আমি জানি তিনি মার্কেটে আমার সাথে কারো দৃষ্টিতে পড়তে চান না। এখানে সরকারী কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসাররা অহরহ আগমণ করে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ফিরে আসেন। পিছনে একজন কুলি বাস্কেটে বয়ে এনেছে আপেল, বিভিন্ন প্যাকেট খাবার, বিস্কুট এবং পনির। পিছনের সিটে বাস্কেট রাখেন। এবার তিনি মেসের উদ্দেশে গাড়ী চালাতে বলেন। 'আমি এতসব জিনিস একা বয়ে নিতে পারবো না।' তিনি ব্যাখ্যা করেন। 'খুব তাড়াতাড়ি আমার সাথে একটু মদ পান করতে পারবেন।'

আমি বাস্কেট নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তাকে অনুসরণ করে একটি বারান্দার নীচে দাঁড়াই। শেষ প্রান্তে তার কক্ষ। দরজার তালা খুলে সুইচ টিপে বাতি জ্বালান। 'আমি পড়শীদের সাথে মিশি না। তাদের নাক অনেক লম্বা।'

আমি তার কিচেনে বাস্কেট রাখি। তিনি তার কেনা খাদ্যদ্রব্যের কিছু ছোট ফ্রিজে তুলে রাখেন, অন্যগুলো শেলফে। 'আমি আপনাকে আর্মির সরবরাহ করা রাম ছাড়া আর কোন পানীয় দিতে পারবো না বলে বিব্রত বোধ করছি। আর কিছু করার সামর্থও নেই। সোডা না পানি মিশিয়ে দেব।'

'আমি কখনো রাম পান করিনি। এমনিই দিন।'

সুসজ্জিত কক্ষ। তিনি তার শয্যায় বসেন, আমি সোফায়। আমি মিষ্টি স্বাদবিশিষ্ট গন্ধযুক্ত রাম পান করি। মদটা হাতে চোলাই মদের মত। খুব কড়া, ঝাঁঝালো। ভাবতে পারছি না, তাকে কি বলবো! প্রথমে মনে যা এলো তাই বলে নীরবতা ভঙ্গ করলাম। 'সেদিন আপনি আওরঙ্গজেবের অন্য ধর্ম সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার কথা বলছিলেন। কিন্তু মুসলিম ইতিহাসবিদরা তাকে সেভাবে দেখেন না। এমনকি এখনকার সাধারণ মুসলমানরাও মনে করে যে, তার মূল্যায়ণে অবিচার করা হয়েছে।'

তিনি হেসে উঠেন,'এক মৃত সম্রাটকে নিয়ে একজন মহিলার সঙ্গে আলোচনার চাইতে চমকপ্রদ কিছু কি আপনি ভাবতে পারেন না?'

'একজন আকর্ষণীয়া মহিলার সঙ্গ লাভ করাটা কতটা ভাগ্যের ব্যাপার, আমি তা বলতে পারি। কিন্তু তাতে আমি কি লাভ করবো?

'আপনি আমার সম্পর্কে খুব কম জেনেছেন। এমনকি আমি কতটা আকর্ষণীয় হতে পারি তাও জানেন না। তা জানার কোন চেষ্টাও আপনি করেননি' তিনি বলেন। তিনি তার শাড়ীর প্যাঁচগুলো খুলে ফেলেন। ব্লাউজের হুক খুলে ফেলায় তার স্তন আমার চোখের সামনে। 'আপনি এ রকমটা আগে কখনো দেখেছেন? এবং বিশেষ করে তেমন কোন মহিলাকে, যে তিনটি বাচ্চাকে স্তন চুষতে দিয়েছে?'

নিশ্চয়ই আমি দেখিনি। মেহগিনির মতো কালো। আকৃতিতে নিখুঁত এবং ষোড়শী কুমারীর মত দৃঢ় স্তন। স্তনের ঘোর কালো বোটা সরাসরি আমার দিকে তাক করা। তাকে বলি, আপনার স্তন সবচেয়ে নিখুঁত আকৃতির, এমনকি নগ্ন চিত্রের নারীদেরও এমন স্তন দেখিনি।' আমার প্রচন্ড ইচ্ছা হচ্ছিল সোফা থেকে উঠে গিয়ে তার পাশে বসার। তিনি আমার দ্বিধা লক্ষ্য করলেন, 'এগুলো অনুভব করুন। আমাকে নিয়ে সংকোচ করার কিছু নেই।'

আমি উঠে তার পাশে বসি। আমার হাতের তালু তার স্তনের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনি। সত্যিই তার স্তন সুদৃঢ়। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এমন স্তনের মোকাবিলার ঘটনা নেই। আমি তার মাথা বালিশে স্থাপন করে স্তনের বোটায় জিহ্বা চালনা করি। আমার মাথা থেকে পাগড়ী অপসারণ করে তিনি বলেন, 'এটি আপনার পথেই আসছে।' আমার দীর্ঘ চুল তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে। চুল ধরে মাথাটা তার বুকের উপর এনে চেপে ধরেন। দম নেয়ার জন্য আমি একটু থামি এবং তার মুখের দিকে তাকাই। তিনি চোখ বন্ধ করেছেন। ভারী নিঃশ্বাস বইছে। আমি তার ঠোঁটে ঠোঁট স্থাপন করা মাত্রই তিনি মুখ খুলে তার জিহ্বা আমার মুখে দিয়ে দেন। আমার হাত তার নিতম্বের নীচে চলে যায় এবং তার দুই উরুর মাঝে আসে। তিনি বিড়বিড় করেন, 'আমার ভিতরে প্রবেশ করে আপনার প্রতিশ্রুত বাচ্চা আমাকে দিন।'

আমি তার ইচ্ছা পূরণ করি। তিনি দ্রুত পরিতৃপ্ত। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার উত্তেজনা প্রশমিত। আমি আবার রাম পান করতে শুরু করি। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠেন। বিছানার পাশের টেবিল থেকে সিগারেট নিয়ে ধরান। এবং বলেন, 'এখন আমরা মন থেকে এসব ঝেড়ে ফেলেছি। আপনি আমাকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কে বলতে পারেন।

১০

হিন্দুস্থানের মহান সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর

পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল মহান আল্লাহতায়ালা এবং তার পয়গম্বর বিশ্বের আশ্রয় মহানবী (সঃ)-এর নামে আমি আবুল মোজাফফার মহীউদ্দিন মোহাম্মদ, যার উপর হিন্দুস্থানের সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত; আমার নব্বই বছরের জীবন ও আটচল্লিশ বছর শাসনকালের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করছি। আমার এই উদ্যোগ নেয়ার কারণ, যারা আমার বিরুদ্ধে লিখতে গিয়ে সত্যকে বিকৃত করেছে ন্যায়ের মালিক আল্লাহ তাদের শাস্তিবিধান করবেন। আমাকে নিজের কথায় ইতিহাসে অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে উপস্থাপন করার জন্য আল্লাহ নিশ্চয়ই তার দাসানুদাসকে ক্ষমা করবেন।

অপরাধে পরিপূর্ণ এই পাপীর জন্ম গুজরাটের ছোট্ট শহর দোহাদে। একজন কবি আমার জন্য 'আফতাবে আলমতাব' শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। এর অর্থ ছিল সূর্যালোক, যার আলো বিশ্বকে আলিঙ্গন করবে। আরেকজন রচনা করেছিলেন 'গওহার-ই-তাজ মুলক-আওরঙ্গজেব' অর্থাৎ 'আওরঙ্গজেব-সম্রাটের মুকুটের মণি।' আমার জন্ম ১০২৭ হিজরী অর্থাৎ ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন জিলকদ মাসের ১৫ তারিখ এবং নবেম্বরের তিন। আমি যুগপুৎ তুলা ও বৃশ্চিক রাশির জাতক। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, আমার চরিত্রে দুই রাশির বৈশিষ্ট্যই থাকবেঃ তুলা দন্ডের ন্যায়বিচার ও ক্ষমা এবং বৃশ্চিকের, যার বিষ থাকে লেজে; তার উদ্দেশ্য সাধনে আসক্তি এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা। বিশেষতঃ যারা অধিকার পদদলিত করার স্পর্ধা দেখায়।

আমার জন্মের সময় আমার পিতা শাহজাদা খুররম নামে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তার পিতা জাহাঙ্গীর ছিলেন হিন্দুস্থানের সম্রাট।আমার মাতা হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী যিনি আগ্রায় শ্বেতপাথরের সমাধিতে শান্তিতে শায়িতা, তার সুখী দাম্পত্য জীবনের চৌদ্দ বছরে চৌদ্দটি সন্তানের জন্ম দেন। তার নামানুসারেই আগ্রার সমাধির নাম দেয়া হয়েছে 'তাজমহল।' চৌদ্দ সন্তানের মধ্যে আল্লাহ সাতজনকে জান্নাতে তলব করে নিয়েছেন। অবশিষ্ট সাত সন্তান যাদেরকে সাময়িকভাবে এ পৃথিবীতে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা হচ্ছেন জাহানারা। এরপর দারা শিকোহ, সুজা ও রওশন আরা বেগম। ধূলিবালি হতে সৃষ্ট এই অধমের স্থান পঞ্চম এবং পিতামাতার পুত্রদের মধ্যে তৃতীয়। আমার পর মুরাদ। গওহর আরা এই পৃথিবীতে যেদিন প্রবেশ করে সেদিনই আমাদের শ্রদ্ধেয়া মাতৃজননী ধরাধাম ত্যাগ করেন। সেদিনটি ছিল ১৬৩১ সালের ৭ই জুন।

যেহেতু পার্থিব বিষয়ের স্মৃতি ছয় থেকে সাত বছর বয়সে পুঞ্জীভূত হতে থাকে সে কারণে শৈশব সম্পর্কে আমি খুব কমই স্মরণ করতে পারি। পরে আমি জানতে পেরেছি যে, আমার পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীর কিছু কারণে আমার পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমার বড় ভাই ও আমাকে অনেকটা পণবন্দী হিসেবে লাহোর নিয়ে গিয়েছিলেন তার সাথে বাস করার জন্য। তখন আমার বয়স আট বছর।

সম্রাট জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে আমাদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। মীর মোহাম্মদ হাশিত জিলানী এবং আইতমাদ খান আমাদেরকে আল্লাহর বাণী ও নবী করিম (সঃ)-এর

হাদিস শিক্ষা দেন। আমাদেরকে ফারসী, তুর্কী ও হিন্দু ভাষা ও লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়। সে শিক্ষাকেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হতো তা আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু মহান আল্লাহর বাণী ও তার প্রিয় পয়গম্বরদের অনুসৃত পথের বাইরে আর কোন্ শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে? যা হোক, দারা শিকোহ বিধর্মীদের গ্রন্থাদি পাঠ করাকেই প্রাধান্য দিলো এবং খোদাদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলো। সে নামায পড়া বন্ধ করলো এবং রমজান মাসে রোজাও রাখতো না। তার হাতের আঙ্গুলে একটি আংটি পরতো, যাতে দেবনাগরী অক্ষরে লিখা ছিলো 'প্রভু'। যারা কাগজ ও প্রস্তরে জীবন্ত বস্তুর প্রতিকৃতি অংকন ও খোদাই করতো, যারা সঙ্গীত সাধনা করতো, বাঁশী বাজাতো, নাচতো বা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত ছিল দারা শিকোহ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতো। আল্লাহ তাকে যে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছিলেন সে তাকে নিজস্ব কিছুতে পরিণত করেছিল। তার ব্যবহার হয়ে উঠেছিল উদ্ধত। তার কথাবার্তা ছিল আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ অমাত্যদের সাথে। সে কারণে তার সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে, 'মানুষের ভাগ্যের কম্বল যদি কালো পশমে বোনা হয়, তাহলে জমজম বা কাওসারের পানি তাকে ধুয়ে সাদা করতে পারে না।"

পরিবারে সচরাচর যা ঘটে থাকে, কিছু কিছু সদস্য পরস্পর অন্যদের চাইতে অধিক ঘনিষ্ঠ থাকে। আমার পিতার প্রিয় সন্তান তার বড় দু'জন—জাহানারা বেগম ও দারা শিকোহ। তারা দু'জন অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল এবং অন্য কোন ভাইবোনদের সাথে তাদের তেমন ঘনিষ্টতা ছিল না। আমি যদিও আমার সকল আত্মীয় পরিজনের সাথে সমান ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখতাম, তবুও রওশন আরা অন্যান্য ভাইদের চেয়ে আমার সঙ্গ অধিক কামনা করতো। ঠিক তেমনি কনিষ্ঠা গওহর আরা মুরাদকে ভালোবাসতো।

১৬২৭ সালের অক্টোবরে আমার পিতা শাহজাহান হিন্দুস্থানের বাদশাহ হওয়ার পর তার চার পুত্রকে একদিন বললেন, "দারা শিকোহ নিজেকে ভালো মানুষের শত্রুতে পরিণত করেছে। মুরাদ আকণ্ঠ মদ্য পানে নিমগ্ন। সুজার মধ্যে ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ ছাড়া আর কিছু নেই। আওরঙ্গজেবের বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরতা প্রমাণ করে যে, সে একাই হিন্দুস্থান শাসনের বোঝা বহন করতে পারে। কিন্তু দৈহিকভাবে সে অত্যন্ত দুর্বল।"

আমার জীবনের পনেরটি গ্রীষ্ম অতিক্রান্ত হতে আমি প্রমাণ করতে সক্ষম হলাম যে, আমার হৃদয়ে সংকল্পের ঘাটতি নেই এবং আমার বাহু শক্তিহীন নয়। একদিন সকালে যখন সূর্য্য কেবলমাত্র উদিত হয়ে শাহী মসজিদের মিনারগুলোর কাছে তার উপস্থিতি জ্ঞাপন করেছে তখন যমুনা নদীর বালুকাময় তীরে জনতা সমবেত হয়েছে দুটি হাতীর মধ্যে লড়াই দেখার জন্য। এর একটির নাম সুধাকর। অন্যটি সুরাট সুন্দর। সুধাকরের দাঁত বর্শার মত সুতীক্ষ্ণ। সুরাট সুন্দরের দাঁতগুলো তুলে ফেলা হলেও এটি প্রতিপক্ষের মত বিশালদেহী। দু'টি হাতীকেই গঞ্জিকা সেবন করানো হয়েছিল। কিছুক্ষণ দু'টি হাতী পরস্পর লড়াই এ লিপ্ত থাকার পর মাহুতের খোঁচা খেয়ে এবং দর্শকদের চীৎকারে সুধাকর ক্ষিপ্ত হয়ে লড়াই থেকে নিজেকে মুক্ত করে জনতার দিকে ধাবিত হলো এবং বহু লোক হাতীর পায়ের নীচে পিষ্ট হলো। আমি ছাড়া সকলে ভয়ে ও আতংকে পলায়ন করলো। আমাকে একাকী দেখে সুধাকর আমার উপর হামলা করতে এগিয়ে এলো। আমি আমার বর্শা দিয়ে জোরে হাতীর কপালে আঘাত করলাম যে হাতী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অবশ্য হাতীর শুড়ের এক ঝাপটায় আমার ঘোড়া ভূপাতিত হলে আমি ঘোড়ার নীচে পড়ে গেলাম। এ অবস্থা থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে তরবারি বের করে আমি হাতীর শুড়ে আঘাত করলাম। ইতিমধ্যে সুজা ও রাজা জয়সিংহসহ অন্যান্যরা ঘোড়ায় চড়ে এসে হাতীটিকে আক্রমণ করলো। অন্য হাতী সুরাট সুন্দর ততক্ষণে ফিরে এসে আহত সুধাকরকে ময়দানের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। মহামহিম বাদশাহ আমার বেপরোয়া কাজের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। উত্তরে আমি বললাম, "মৃত্যু বাদশাহর উপরেও পর্দা টেনে দেয়। মৃত্যু কোন অসম্মান নয়। আমার ভাইদের ভূমিকা বরং লজ্জাজনক।" যদিও সুজা তার সাধ্যানুযায়ী কাজ করেছে, তবু আমার কথা সকলের কাছে স্পষ্ট ছিল যে, দারা শিকোহকে তার কাপুরুষোচিত আচরণের জন্যই কথাগুলো বলেছি। বাদশাহ ভান করলেন যে, তিনি আমার কথা শোনেননি। তিনি আমাকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওজন করে মুদ্রাগুলো আমাকে দান করলেন এবং আমাকে 'বাহাদুর'

খেতাবে ভূষিত করলেন। কয়েক মাস পর তিনি আমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। দারা শিকোহ'র হৃদয় হিংসায় ভারী হয়ে গেল।

সতের বছর বয়সে শাহ নওয়াজ সাফাবীর কন্যা দিলরাস বানুর সাথে আমার বিয়ে হলো। পরের বছর সুজা মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে দিলরাস বানুর ছোট বোনকে বিয়ে করলো এবং আমার ভাই হওয়া সত্ত্বেও ভায়রা ভাই এ পরিণত হলো। আমাদের তখন ভরা যৌবন এবং যৌবনের অনেক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বাসর শয্যায় নষ্ট করার মত সময় আমাদের ছিল না। হারেমের নারীদের সাথে রঙ্গরস করা অপেক্ষা সেনা শিবিরে সশস্ত্র সৈনিকদের মধ্যে বসবাস করা আমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমার শিক্ষক গিলানী সাহেবের বাণী আমার মধ্যে খুব প্রভাব ফেলেছিল যে, একজন শাসকের জন্য গতিশীলতাই আসল কথা। এক স্থানে বসে থাকায় আলস্য আসে এবং আলস্যের হাজারো মন্দ পরিণতি আছে। এরকম বসে থাকা এক স্থানে আবদ্ধ পানির মতই মন্দ। আবদ্ধ পানি দূষিত হয়ে যায় এবং আবদ্ধ বা স্থবির বাদশাহর ক্ষমতা তার হাত থেকে চলে যায়। হিন্দুস্থানের তখনকার অন্যান্য সম্রাট ও আমীর-ওমরাহদের মত না হলেও কমপক্ষে পাঁচটি নারী আমার ঘনিষ্ট সাহচর্য উপভোগ করেছে। আমার ঔরসে তাদের গর্ভে দশটি সন্তানের জন্ম হয়। এই নারীদের মধ্যে একজনকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতাম। কিন্তু তার সাথে সঙ্গ ছিল সংক্ষিপ্ত এবং তার গর্ভে কোনো সন্তানও আসেনি।

আমার বয়স এখন পয়ত্রিশ বছর। গ্রীষ্মের খর উত্তাপের শেষে ঋতু পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট। আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা। সেই সাথে শীতল বায়ু ও বর্ষণ। বুরহানপুরে আমার খালার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে আমি তাপ্তি নদীর তীরে তার মৃগ কাননে গড়াগড়ি দিতাম। একটি দোলনায় উচ্ছল তরুণীদের হাসাহাসি করতে দেখে তাদের বিব্রত না করে থেমে গিয়েছিলাম। তরুণীরা সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীত গাইছিল। সঙ্গীতের কিছু কিছু শব্দ আমার কানে আসছিল, যা একজন বরের জন্য কনের আহ্বান সম্বলিত। রাগ মেঘ মালহার গাইছিল তারা, যা ঋতু ও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। তাদের একজনের কণ্ঠ আরেকজনের কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠছিল। সবুজ পরিবেশে সকালের সূর্যালোকে পাতার উপর শিশির কণা যেমন চিকচিক করে, সঙ্গীতের মূর্ছনায় আমার তেমনই মনে হচ্ছিল। আমি পায়ে পায়ে সুরের সেই উৎসের দিকে এগিয়ে গেলাম। তরুণীরা আমার উপস্থিতিতে দৌড়ে পালালেও তাদের সুর রয়েই গেল। তখন পর্যন্ত আমার কানে সঙ্গীতের সুরের গুঞ্জরন চলছিল। কিন্তু যা দেখলাম আমার চোখও আপ্লুত হয়ে গেল। একজন তরুণীর পরণে ছিল শ্বেতশুভ্র বসন। তার ঘন কালো চুল কোমর পর্যন্ত এলায়িত ছিল। সম্মুখভাগে তার কামিজ স্ফীত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। সে এখনো গাইছে এবং তার হরিণ চোখে আমাকে দেখছিল। এই অতুলনীয় সুন্দরীর চোখে চোখ পড়তে তার থেকে কয়েক পা দূরে আমার পা যেন মাটিতে গেঁথে গেছে। সে আমের শাখা হতে একটি আম ছিঁড়ে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলো। এটি আমার হৃদয়ে আঘাত করলো। আমি অনুভব করলাম আমার দেহ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে। তরুণী দৌড়ে প্রাসাদে প্রবেশ করলো। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "সকল প্রশংসা আল্লাহর। সে কি মানবী, না বেহেশতের হুরী!" আমার এক অনুচর উত্তরে বললো, "হুজুর, আমার ভুল হলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন, সে আপনার খালার দাসী হীরা বাঈ ছাড়া কেউ নয়। সে নারী শ্রেষ্ঠা এবং দাক্ষিণাত্যের সেরা সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে সুরের পাখী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। আমার স্থির হতে কিছু সময় লাগলো। খালা সালিহা বানুর সাথে যখন সাক্ষাত করতে গেলাম তাকে ভুল সম্বোধনে ডাকায় তিনি আমার দুর্ভাগ্যের কথা উপলব্ধি করলেন। আমার হৃদয়ের আকাংখাকে আমার হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমি তার সহায়তা কামনা করলাম। তাকে বললাম, "আমার হারেমের সকল নারীকে নিয়ে তার বদলে হীরা বাঈকে দিন।" সালিহা বানু বললেন, যে তিনি আমার জন্যে তার জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারেন। কিন্তু তার স্বামী বুরহানপুরের সুবেদার সাইফ খানের কারণে তিনি ভীত। আমার বন্ধু ও সহচর মুর্শিদকুলী খান সাইফ খানকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করলো। কিন্তু তাকে শরীয়ত বিরোধী কাজ করা থেকে বিরত রাখলাম। তার পরিবর্তে মুর্শিদ কুলী খান সাইফ খানের কাছে গিয়ে খোলাখুলি আমার প্রস্তাব পেশ করলো। সাঈফ খান বিষয়টি ভেবে দেখলেন এবং আমার খালাকে জানালেন যে,

আমার একজন দাসী চাত্তার বাঈ-এর সাথে হীরা বাঈকে বিনিময় করতে পারেন।

হীরা বাঈকে একটি পালকীতে করে আমার হারেমে আনা হলো। এরপর অনেক ক'টা মাস তাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি এবং তার সঙ্গ ছাড়া আর কারো সঙ্গ কামনা করিনি। আমার কাছে মদ হারাম ও বমনোদ্রেকারী হলেও হীরা বাঈ-এর হাত থেকে এক গ্লাস মদ নিয়েছিলাম এবং বিষাক্ত হলেও আনন্দচিত্তে পান করেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে মদ পান করতে নিষেধ করলো। আমার মোহাচ্ছন্ন অবস্থার কাহিনী গুজব রটনাকারীদের মাধ্যমে দারা শিকোহর কানে পৌছলো। কাহিনীকে আরো বিষাক্ত করে সে আমার বিরুদ্ধে পিতার কান ভারী করলো। সে বাদশাহর কাছে বলেছিল, "আব্বাজান আপনি এই ভন্ডের কান্ডকারবার দেখুন। খালার অধীনস্থ একটি বেশ্যার জন্য সে কুকুরের স্তরে নেমে গেছে।"

সীমাহীন জ্ঞানের আধার মহান আল্লাহ যখন দেখলেন যে, আমি আমার কর্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি তখন তিনি আমার নিকট থেকে হীরা বাঈকে নিয়ে গেলেন। অশ্রুভরা চোখে আমি তাকে আওরঙ্গাবাদে এক পুকুরের পারে কবর দিলাম।

আমার পিতা গুজবে কান দিয়েছিলেন এবং গণকদের কথা দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আমাকে বলা হলো, একদিন এক ভন্ড জনৈক দরবেশের নিকট হতে দু'টি আপেল এনে বাদশাহ'র হাতে দিয়ে বলেছিল, যতদিন এই ফলের ঘ্রাণ তার হাতে থাকবে ততদিন তিনি নিরোগ থাকবেন এবং রোগের পরিণতি কখনো ভয়াবহ হবে না। তিনি যখন সেই ভন্ডকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার কোন্ পুত্র সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনবে সে উত্তরে বলেছিল, 'আওরঙ্গজেব'। আমি তো বহুবার পিতার হস্ত চুম্বন করেছিলাম, কিন্তু কখনো তাতে আপেলের ঘ্রাণ পাইনি এবং সাম্রাজ্যের সীমান্ত এতোদূর বিস্তৃত করেছিলাম যে, আমার পূর্বপুরুষদের কেউ তা ধারণাও করতে পারেনি। তবুও আমার বিরুদ্ধে পিতার মন বিষিয়ে আছে। আমি আরো জানতে পারলাম যে, আমার ফর্সা রং এবং আমার নিষ্কলুষ চরিত্রের কারণে তিনি আমাকে "শ্বেতকায় সর্প" বলে বর্ণনা করেছেন।

এরই মধ্যে একটি ঘটনা আমার সন্দেহকে যথার্থ বলে প্রমাণ করলো। এক সন্ধ্যায় জাহানারা বেগম একটি মোমবাতি হাতে তার শয়ন কক্ষে যাওয়ার সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন এবং মোমবাতির শিখায় তার মসলিনে আগুন ধরে গেল। এতে তার শরীর গুরুতর রূপে দগ্ধ হয়। যে দু'জন দাসী আগুন নিভাতে জাহানারা বেগমকে জড়িয়ে ধরেছিল তারা দু'জনই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। এ খবর আমার কাছে পাঠাতে দারা শিকোহ যথেষ্ট বিলম্ব করে। এর ফলে ঘটনার এক মাস পর আমার পক্ষে আগ্রায় পৌছা সম্ভব হয়। বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে আমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ থেকে অব্যাহতি দেন। আমার সকল বক্তব্য অগ্রাহ্য করা হলো। শেষ পর্যন্ত আমি ক্ষোভের সাথে তাকে লিখলাম, "মহান বাদশাহ যদি মনে করেন যে, তার সকল ভৃত্যের মধ্যে একমাত্র আমি অসম্মানজনক জীবন কাটাবো এবং অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে নিঃশেষিত হবো, তাহলেও আমাকে তা মেনে নিতে হবে....। দশ বছর পূর্বেই আমি এটা উপলব্ধি করেছিলাম। আমি জানতাম আমার জীবনের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।"

পরে একই বছর দারা শিকোহ তার যমুনা তীরের প্রাসাদে আমাকে আমন্ত্রণ জানালো। বহুবার তার কাছে অপমানিত হওয়ার কারণে আমি তার থেকে খানিকটা দূরে প্রবেশ পথের কাছে অবস্থান করাকেই উত্তম বিবেচনা করলাম। আমার পদমর্যাদা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে ব্যাপারে সে বাদশাহকে প্ররোচিত করলো আমাকে গঞ্জনা করতে। যা হোক দীর্ঘ সাতটি মাস দরবারে আমার উপস্থিতি নিষিদ্ধ করা হলো।

এটি ছিল বহু ঘটনার মধ্যে একটি। বাদশাহ আমাকে এতোটা দূরে রাখলেন বা এমন আরচণ শুরু করলেন যেন আমি তার ঔরসজাত নই। আমার ভাই ও তাদের সন্তানদের জন্মদিনে বাদশাহ সুবর্ণ মুদ্রা ও অলংকারাদি প্রেরণ করতেন। কিন্তু কখনো আমার বা আমার সন্তানদের জন্য নয়। আমি যেসব রাজ কর্মচারীর পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করতাম সেগুলো অগ্রাহ্য করা হতো। গোলকুন্ডার যে সম্পদ আমার হাতে পড়েছিল তার অপব্যবহার, এমনকি দাক্ষিণাত্যের যে আম বাদশাহ'র খাবার টেবিলে পরিবেশন করার কথা, তার সবই ভক্ষণ করে ফেলেছি বলে অভিযোগ করা হলো। আমি জানতে পারলাম যে, বাদশাহ একবার দিল্লী সফরের সময় দারা শিকোহকে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ বাদশাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাদশাহ'র দেয়া একটি রাজকীয় পোশাক

পরিধান করে সে দরবারে আসতো এবং ময়ূর সিংহাসনের পাশেই এক সুবর্ণ আসনে উপবেশন করতো। দারা শিকোহ'র কথা যদি সত্য হয়ে থাকে, অবশ্য সে সাধারণতঃ সত্য বলে না। বাদশাহ নাকি তাকে বলেছেন যে, 'বৎস্য, আমি তোমার অজ্ঞাতে অথবা তোমার সাথে পরামর্শ না করে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য মনস্থির করেছি। তোমার মত পুত্র দান করার জন্য আল্লাহর কাছে আমার শোকরিয়ার সীমা-পরিসীমা নেই।'

আমি আগেও বলেছি এবং আরো শতবার বলবো যে, ক্ষমতা বা বাদশাহীর প্রতি আমার কোন লোভ নেই। কিন্তু আমার উস্তাদ আমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহতায়ালা সজ্ঞানে আমাকে রাজবংশে জন্ম দিয়েছেন। আমার পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে মানবতার সেবা করা এবং মানুষের মাঝে ইসলামের বিস্তার ঘটানো। গিলানী সাহেব বলতেন, হিন্দুস্থান হচ্ছে এক টুকরা রুটির মত, যা আমার পূর্বপুরুষ তৈমুর, বাবর, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের উপর পরম দাতার দান হিসেবে অর্পিত হয়েছে। তিনি আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন যে, যদিও আল্লাহ দানশীল, কিন্তু যারা তার দান লাভে ধন্য হয়েছে তাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের বিস্তার ঘটানো। তিনি বলতেন, "জীবনের সর্বোত্তম কাজ করো। স্মরণ রেখো, জীবন হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। শুধুমাত্র আল্লাহ অমর।"

"তুমি যখন উদ্যানে তখন
প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করো
বসন্ত শেষে আসে গ্রীষ্ম এবং
গ্রীষ্মের অবসানে হয় শরতের আগমণ
আর মেহদীর ফুল
হয়ে যায় বিশুষ্ক, প্রাণহীন।"

দারা শিকোহ যখন দিল্লী ও আগ্রায় পিতার কাপড়ের প্রান্ত ধরে ঝুলে থাকতো, আমি তখন দাক্ষিণাত্যের শাসক। সেখান থেকে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছি বলখ, বাদাখশান, কান্দাহার ও মুলতানে। বিপথগামী ইরানীদের বিরুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করেছি। অব্যাহতভাবে এক রণক্ষেত্র থেকে আরেক রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। জীবনের একটি মাত্র অংশ- যেখানে কোন পরিবর্তন আসেনি তা হচ্ছে আমার ইবাদত বন্দেগীতে। এ ক্ষেত্রে আমি কোথায় অবস্থান করছি কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, কোন কিছুই বাধার কারণ হয়নি। যখনই নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে আমার অস্ত্রশস্ত্র একপাশে ফেলে রেখে কেবলামুখী হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছি।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বাদশাহ শাহজাহানের জীবদ্দশায় হিন্দুস্থানের সার্বভৌম ক্ষমতায় যেভাবে আমি আসীন হয়েছি সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত ইতিহাসবিদরা অনেক মিথ্যা কাহিনী লিখেছে। তারা আমার নামে মিথ্যা কলংক আরোপ করেছে যে, আমি একজন স্বার্থ শিকারী এবং ষড়যন্ত্রকারী। তারা ভুলে গেছে যে, পবিত্র কোরআন বলেছে, "আল্লাহ সকল পরিকল্পনাকারীর মধ্যে সর্বোত্তম"। আমরা তার পরিকল্পনার চাবিকাঠি ছাড়া কিছুই নই।

আমার রাশি এবং দরবেশরা যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সবকিছু সেভাবে ঘটে যেতে লাগলো। পিতার দরবারে আমার নিয়োজিত গুপ্তচর আমাকে জানালো যে, একদিন বাদশাহ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলতে পারে এমন একজন দরবেশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, তার চার পুত্রের মধ্যে কে ময়ূর সিংহাসনে আরোহন করবে। দরবেশ তার পুত্রদের নাম উচ্চারণ করতে বলেন।

বাদশাহ উত্তর দেন, "দারা শিকোহ হচ্ছে বয়োজ্যেষ্ঠ।"

"ভাগ্য তার নামের মতই হবে, ঠিক যেভাবে আলেকজান্ডারের কাছে দারিউস পরাভূত হয়েছিল।"

"সুজা আমার দ্বিতীয় পুত্র।"

"যদিও তার নামের অর্থ 'নির্ভীক', কিন্তু সে ভয়ভীতির উর্ধে থাকতে পারে না।"

"মুরাদ সর্ব কণিষ্ঠ" (বাদশাহ তার অভ্যাসবশতঃ আমার অস্তিত্বকে এড়িয়ে গেলেন।)

তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য লাল কেল্লায় আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আমার ধার্মিকতার প্রশংসা করে আমাকে 'পবিত্র মানুষ' হিসেবে উল্লেখ করলেন। আমার গুপ্তচরেরা আমাকে সতর্ক করলো যে, আমি প্রাসাদে প্রবেশ করা মাত্র হারেমের মহিলাদের দিয়ে আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। আমার জন্যে পেতে রাখা ফাঁদে পা দিতে আমি অস্বীকার করলাম এবং নদী থেকে কেল্লায় পানি প্রবাহিত করার খালটি বন্ধ করে দিলাম। পরবর্তী পত্রে বাদশাহ আমার সমবেদনা চাইলেনঃ "ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের জন্য আমি কেন অভিযোগ করবো? বিশেষ করে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত যেখানে বৃক্ষের একটি পাতাও ঝরে না? গতকাল আমি ছিলাম নয় লক্ষ সৈনিকের প্রভু, আজ আমাকে এক কলসী পানির প্রয়োজনের কথা বলতে হয়। আমি হিন্দুদের প্রশংসা করি, তারা তাদের মৃতদের পানি দেয়, অথচ আমার নিষ্ঠাবান মুসলমানপুত্র জীবিতদের পানি দিতে অস্বীকৃতি জানায়।"

আমি বাদশাহ'র কাছে পানি সরবরাহের নির্দেশ দিলাম। কিন্তু আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত তার সাথে সাক্ষাতের সম্ভবনা নাকচ করে দিলাম। ১৬৫৮ সালের ৮ই জুন আমার জন্যে লাল কেল্লার ফটক খুলে দেয়া হলো। বাদশাহ ও জাহানারা বেগমের কাতর মিনতিতে আমি তাদের অনুচরবৃন্দসহ প্রাসাদে অবস্থানের অনুমতি দিলাম এবং আমার বিশ্বস্ত খোজা এতাবর খানকে নির্দেশ দিলাম যাতে কেউ আমার প্রিয় ভগিনী রওশন আরাকে তার অবাধ যাতায়াতে বাধা প্রদান না করে।

এরপর আমি দারা শিকোহর দিকে মনোযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সে পালিয়ে দিল্লী পৌছেছে। কিন্তু প্রথমে আমাকে মুরাদের সাথে বুঝাপড়া করতে হবে। আল্লাহ আমাকে বিজয় দান করায় মুরাদ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তার মনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তার শিবিরে সঙ্গীত, নৃত্য, মদ্যপান, ভোজনোৎসব ছাড়া কিছু নেই। এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মুরাদের হাতে যদি সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় তাহলে সাম্রাজ্যের রথ শীঘ্রই খান খান হয়ে যাবে। আমি মুরাদকে এমন এক স্থানে অবসর যাপনে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলাম যেখানে সে মোগল সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধন না করেই মদ্যপান ও তার হৃদয়ের অন্যান্য বাসনা চরিতার্থ করতে পারবে।

আমার কানে এলো যে, মুরাদ মদ্যপানরত অবস্থায় আমার বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেও তার পানসঙ্গীদের সাথে গোপনে বলেছে যে, দারা ও সুজাকে নির্মূল করার পর সে আমার দিকে মনোযোগ দেবে। আমি এ ধরনের নোংরা চিন্তার প্রশ্রয় দিতে পারি না, যা আমার অন্তরকে বিষাক্ত করার জন্য আমার কানকে বিষাক্ত করবে। অতএব আমি মুরাদের ভালোবাসার অভিনয়ে বিভ্রান্ত না হয়ে তার কার্যকলাপের উপর নজর রাখার নির্দেশ দিলাম।

হিন্দুদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত নগরী মথুরায় আমি মুরাদের জন্য অপেক্ষা করলাম। সে যখন পৌছলো, আমি তাকে আমার তাঁবুতে আমন্ত্রণ জানালাম এবং সে এলে নিজ হাতে এক পাত্র মদ তার দিকে এগিয়ে দিলাম। অথচ একজন ধার্মিক মুসলমান হিসেবে মদ্যপান আমি ঘৃণা করি। মুরাদ অনেক মদ পান করলো। আমার নিয়োজিত দাসীরা তার অঙ্গাদি মর্দন করে তাকে আবিষ্ট করে এক একে তার সকল অস্ত্র নিয়ে নিলো। এরপর আমার ইশারা পাওয়া মাত্র দাসীরা তার হাত ও পায়ে সোনার হাতকড়া ও বেড়ি পরিয়ে দিলো। যতদিন সে জীবিত থাকে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আফিম ও মদ সরবরাহের নির্দেশ দিলাম। আমার অভিযান অব্যাহত থাকলো। দিল্লীতে পৌছে আমি নগরীর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করলাম।

আমার বিজয়ী বাহিনীর সঙ্গে টিকতে না পেরে দারা পলায়ন করলো। সমগ্র দেশ আমার করতলগত হলো। সাম্রাজ্যের শাসন কাজের বোঝা বহনের জন্য আমার পিতার বার্ধক্যজনিত ও স্বাস্থ্যগত অক্ষমতা এবং আমার ভাইদের অযোগ্যতার কারণে ইবাদতের জন্য খানকায় আশ্রয় নেয়ার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি কন্টকের মুকুট পরতে বাধ্য হলাম, যা রাজাধিরাজ বা শাহানশাহের মস্তকে শোভা পাবার কথা। জ্যোতিষীদের সাথে পরামর্শক্রমে ১৬৫৮ সালের ২১শে জুলাই আমি সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম। ইরান, বোখারা, মক্কা ও ইথিওপিয়ার শাসকরা আমাকে অভিনন্দন জানালো।

আমার পক্ষ হতে দারা শিকোহর কন্টক উৎপাটন করতে আরো এক বছর সময় লাগলো।

আমার সৈন্য বাহিনী তাকে পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের মধ্য দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেল এবং সেওরাই এর কাছে এক সংঘর্ষে তার সৈন্য সামন্তরা শরৎকালে ঝরে পড়া পাতার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। আফগানিস্তানে পলায়নরত দারা শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো। হিন্দুস্থানের বাদশাহ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের কয়েক সপ্তাহ পর আমার বিশ্বস্ত অনুচর মালিক জিওয়ান দারা শিকোহ, তার পুত্র ও সহচরদের শৃংখলিত করে দিল্লীতে আনলো।

আমি উলেমাদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা এক বাক্যে বললো, শরীয়তের আইনে খোদাদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আমার প্রিয় বোন রওশন আরা আমার সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও একইভাবে দারা শিকোহর সাথেও ঘনিষ্ঠ ছিল। সেও ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করলো। দারা শিকোহ আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলো।

এক পত্রে সে আমাকে লিখলো, "আমার ভ্রাতা ও বাদশাহ, আমার মৃত্যুদন্ড তোমার মহিমান্বিত হৃদয়ে এক অপ্রয়োজনীয় কাজ। আমাকে বসবাস করার জন্য একটি বাড়ী দাও এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সাবেক রক্ষিতাদের মধ্য থেকে একটি নারী মঞ্জুর করো। তাহলে আমার অবশিষ্ট জীবন তোমার মঙ্গল কামনায় নিবেদন করতে পারবো।"

দারা শিকোহর সাথে কোনরূপ আলোচনায় প্রবেশ করার ইচ্ছা আমার হয়নি। তার ক্ষমা ভিক্ষার দরখাস্তের নীচে আমি আরবীতে একটি লাইন লিখে দিলাম, "তুমি বলপূর্বক কর্তৃত্ব দখলকারী এবং বিদ্রোহী।"

দারা শিকোহ'র পরিণতি দিল্লীর বিভ্রান্ত নাগরিকদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। তার প্রতি সহানুভূতিশীলরা অশ্রু বিসর্জন এবং ন্যায়বিচারের জন্য দারাকে দিল্লীতে আনয়ণকারী মালিক জিওয়ানের প্রতি মলমূত্রপূর্ণ পাত্র ও প্রস্তর নিক্ষেপ করলো। যদিও আমার হৃদয় ব্যথা ভারাক্রান্ত ছিল আমি আবার স্মরণ করলাম যে, বাদশাহী কোন আত্মীয়ের খোঁজ জানে না। দারার মৃত্যু পরওয়ানায় আমি দস্তখত করলাম। ১৬৫৯ সালের ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যায় দারা শিকোহকে তার পুত্র শিফির শিকোহ থেকে পৃথক করে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হলো। তার ছিন্ন মস্তক লাল কেল্লায় আমার কাছে আনা হলো। পরদিন সকালে তার মুন্ডহীন দেহ দিল্লীর রাস্তায় প্রদক্ষিণ করানো হলো। অবশেষে তাকে আমার মহান প্রপিতামহ বাদশাহ হুমায়ুনের সমাধি সৌধের এক স্থানে দাফন করা হলো।

দারার পুত্র সোলায়মান শিকোহ পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল তাকেও শৃংখলিত করে দিল্লীতে আনা হলো। ১৬৬১ সালের ৫ই জানুয়ারী সকালে তাকে দিওয়ানে খাসে আমার সামনে হাজির করা হলো। দীর্ঘদিন তাকে আমি দেখিনি। তার সুদর্শন ও পুরুষোচিত চেহারা আমাকে বিমুগ্ধ করলো। আমাকে স্মরণ করতে হলো যে, 'যদিও সাপের চামড়া অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু এর মাঝেই তো রয়েছে মারাত্মক বিষ।' আমি তাকে তার পিতার ও তার অপরাধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তাকে গোয়ালিয়র দুর্গের কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দিলাম, যেখানে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

এখনো ভন্ড সন্নাসী সারমাদের সঙ্গে আমার বুঝাপড়ার বাকী। সে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, দারা শিকোহ রাজমুকুট ধারণ করবে। নারী ও পুরুষের সামনে দিগম্বর হয়ে থাকা ছাড়াও একটি হিন্দু বালকের সঙ্গে তার নারীসুলভ ঘনিষ্ঠতা কেলেংকারীর রূপ পরিগ্রহ করে। যদিও সে প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলে, কিন্তু সে মহানবী (সঃ)-এর মর্যাদাহানিকর উক্তি করে বলেও আমার গোচরে এলো। আমি তাকে আমার সামনে হাজির করার নির্দেশ দিলাম এবং সে এলে তার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে উত্তরে একথা বলার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো যে, "আল্লাহ দারা শিকোহকে স্বর্গীয় সার্বভৌমত্ব দান করেছেন।" আমি তাকে এ কথাও জিজ্ঞাসা করলাম যে, এ কথা কি সত্য যে সে পবিত্র কলেমার মাত্র অর্ধেকটা উচ্চারণ করে- 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই' কিন্তু অবশিষ্ট 'এবং মোহাম্মদ (সঃ) তার রসূল' এই অংশ বাদ দিয়ে। ভন্ড সারমাদ জবাব দিলো, "মোল্লারা বলে, মোহাম্মদ (সঃ)কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু আমি বলি "আল্লাহ তার কাছে এসেছিলেন'। বাদ বাকী সব মিথ্যা।"

সারমাদ আরো বললো, আমি 'না' এর মধ্যে বিলুপ্ত হয়েছি এবং এখন পর্যন্ত 'হা'তে পৌছিনি। প্রশ্ন করলাম তার দিগম্বর থাকা সম্পর্কে। উত্তরে সে বললো, নবী ঈসাও দিগম্বর

হয়েছিলেন। আমি তাকে শাহী মসজিদের ফটকের সামনে হত্যা করার নির্দেশ দিলাম, যাতে জনগণ দন্ডাদেশ কার্যকর করার দৃশ্য অবলোকন করতে পারে। পরে আমাকে জানানো হয়েছিল যে, মস্তক বিচ্ছিন্ন হবার পর সে পুরো কলেমা পাঠ করে সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে।

আমার পিতার জীবদ্দশায় আমি আগ্রা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। দিওয়ানে খাসের পাশে আমি একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করালাম এবং এর অভ্যন্তরে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হলো যাতে আমার দ্বারা অন্যান্যের ইবাদতে কোন বিঘ্ন না ঘটে। এর নির্মাণ কাজে পাঁচ বছর লেগেছিল। মসজিদের নামকরণ করলাম মোতি মসজিদ। মসজিদে ইবাদত করতে এবং তসবীর উপর আঙ্গুল চালাতে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম।

পিতার সঙ্গে সাক্ষাত আমার ললাটের লিখন ছিল না। দীর্ঘ কয়েক মাস তিনি আমাকে লিখা চিঠিতে অপুত্রজনোচিত আচরণ ও ভাইদের প্রতি আমার ব্যবহারের জন্য অভিযুক্ত করলেন। আমার মনে হলো, তিক্ত সত্য প্রকাশ করার এখনই উপযুক্ত সময়। আমার পিতা তার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা এবং দাড়ির শুভ্রতা সত্ত্বেও আকন্ঠ মদ্যপান ও হৈ হুল্লোড়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন বলে আমার কানে এলো। আমি লিখলাম, "বাদশাহীর অর্থ সাম্রাজ্য রক্ষা ও জনগনের অভিভাবকত্ব করা। দৈহিক ভোগবিলাস ও নারীর প্রতি কামনা নয়।' আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, তিনি যেভাবে তার জ্ঞাতি ভাইদের নির্মূল করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তা মনে রাখলে আমার প্রতি অভিযোগের অঙ্গুলি নির্দেশ অথবা আল্লাহর ক্রোধের ভয় দেখানো মোটেই সমীচিন নয়। এই লক্ষ্যহীন সংলাপের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য আমি লিখলাম, "আল্লাহ যদি আমার কাজে সন্তুষ্টই না হবেন তাহলে কি করে আমার পক্ষে বিজয় অর্জন সম্ভব হলো, যা একমাত্র আল্লাহর দান।"

১৬৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমার পিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার ইচ্ছানুসারে তার শয্যা অষ্টকোণাকৃতি জেসমিন টাওয়ারে স্থাপন করা হলো, যেখানে থেকে তিনি তাজমহল দেখতে পাবেন। ১৬৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারী মুখে আল্লাহর নাম নিয়ে তিনি পৃথিবী ছেড়ে জান্নাতবাসী হলেন।

অতি জরুরী রাষ্ট্রীয় কাজে আমাকে দুই সপ্তাহ দিল্লীতে থাকতে হলো। ঝামেলা চুকে যাওয়া মাত্র আমি আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। আমার চোখের পানিতে পিতার কবরের মাটি সিক্ত হলো। পিতার জান্নাতবাসী হবার দুই বছর অতিক্রান্ত হবার পর আমি ময়ূর সিংহাসনে বসলাম। এরপর উপলব্ধি করলাম, আল্লাহ যে দায়িত্ব দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা প্রতিপালন করা প্রয়োজন। আমার সেনাপতি মীর জুমলা, শায়েস্তা খান এবং অন্যান্যদের নির্দেশ দিলাম ইসলামের ভূখন্ড হিন্দুস্থানের দূরতম অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্য। আমার বিজয়ী সৈন্যবাহিনী পূর্বে চাটগাঁ, উত্তরে পর্বত অতিক্রম করে তিব্বত পর্যন্ত, পশ্চিমে কাবুল ও দক্ষিণে কর্নাটক পর্যন্ত অভিযান চালালো। এসব অভিযানে আমার বাহিনী জাঠ, রাজপুত, দুরাচার শতনামী সম্প্রদায় ও নানক প্রস্থদের ধ্বংস করলো। এরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলেছিল। কূটচালে পটু মারাঠাদের ভূখন্ড আমি তছনছ করে তাদের নেতা শিবাজীকে আমার সাথে সাক্ষাতে বাধ্য করলাম। আমি বহু মসজিদ নির্মাণ করলাম। অবিশ্বাসী বিধর্মীদের উপর জিজিয়া কর আরোপ করা হলো, যাতে তারা সত্য পথে বিচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। আমার সকল কর্মের অনুপ্রেরণা ছিল শরীয়তের পবিত্র আইন। মদ তৈরীর উপর আমি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলাম এবং যারা মদ্যপায়ী বলে সন্দেহ হলো তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করা হলো। এটা সাধারণ কথায় পরিণত হয়েছিল যে, আমি যখন সিংহাসনে আরোহণ করি তখন তামাম হিন্দুস্থানে মাত্র দু'জন পুরুষ মানুষ ছিল যারা মদ্যপান করতো না। একজন স্বয়ং আমি এবং অন্যজন প্রধান কাজী। কয়েক বছরের মধ্যে মদ্যপান বিরল ঘটনায় পরিণত হলো। মদ্যপানের উপসর্গ হিসেবে যেহেতু নৃত্য গীতের আয়োজন হতো, আমি সেসব আমোদ ও ফূর্তিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম। আমি বেশ্যা ও নর্তকীদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে অথবা আমার সাম্রাজ্য ত্যাগে বাধ্য করলাম। একদিন বাদক ও সঙ্গীত শিল্পীরা বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্যের সরঞ্জাম শবাধারে তুলে আমার কাছে এলো। আমি তখন জু'মার জামাতে যাচ্ছিলাম। তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, "এসব সরঞ্জাম মাটির এতো গভীরে প্রোথিত করা হোক যাতে আর কোনদিন মাটি ভেদ করে আসতে না পারে। মুসলিম প্রজারা আমার আদেশে

অত্যন্ত আনন্দিত হলো এবং আমাকে 'জিন্দা পীর' উপাধিতে ভূষিত করলো।

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ ছিল নিরন্তর। বিধর্মীরা যেখানেই সাপের মতো ফনা উঁচাতো সেখানেই আমি তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করতাম। আমার পরবর্তী বছরগুলোর অধিকাংশই আমাকে কাটাতে হয়েছে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর সৃষ্ট পার্বত্য ইঁদুরের সাথে লড়াই করে। আমার হাতে শিবাজীর পুত্র সাম্বা ধরা পড়ে এবং তাকে নরকে প্রেরণ করা হয়। অবশ্য আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে, আমার জীবদ্দশায় এই দেশ থেকে মূর্তিপূজা দূর করা সম্ভব হবে না এবং আমার পুত্রদেরকে এই জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে।

অন্যান্য বাদশাহরা রাজকোষকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচনা করে জাঁকজমক, নারী, মদ, মণিমুক্তার পিছনে এবং সৌধ নির্মাণে ব্যয় করতেন। আল্লাহ আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের কল্যাণে রাজকোষের অর্থ ব্যয় করতে। নিজের জন্য আমি যা ব্যয় করতাম তা আমার প্রজাদের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্রের ব্যয় অপেক্ষা অধিক নয়। আমি নিজে টুপি সেলাই ও পবিত্র কোরআন হাতে লিখে তা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থে আমার খাবার ও ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করতাম। আমার মত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা সত্ত্বেও আমি যেমন দরবেশের জীবন কাটিয়েছি এমন ক'জন বাদশাহ খুঁজে পাওয়া যাবে?

আমার বোন ছিল তিনজন। তাদের মধ্যে রওশন আরা ছিল আমার ঘনিষ্টতম। শেষ দিকে সে আমার ইচ্ছার প্রতি তার ঔদাসীন্য প্রকাশ এবং অসৌজন্যমূলক আচরণ শুরু করে। তার আচরণের বিরুদ্ধে পুরোপুরি প্রতিবাদ করার পূর্বেই মহান আল্লাহ তাকে নিজের দরবারে ডেকে নিলেন। জীবদ্দশাতেই তিনি তার শেষ বিশ্রামস্থলের পরিকল্পনা করেছিলেন। বহু সন্ধ্যা তিনি সেই উদ্যানে কাটিয়েছেন। সেখানে ছিল বহু ধরনের মনোহর, সুগন্ধ ছড়ানো গাছ পালা, যা পানিভর্তি নালা ও পুকুরের পাড়ে রোপণ করা হয়েছিল। তার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিল যে, তার সমাধির উপরিভাগ থাকবে উন্মুক্ত, যাতে আল্লাহর প্রেরিত বৃষ্টি ও কুয়াশা তার দেহাবশেষকে ধুঁয়ে দিতে পারে। তার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করা হয়।

আমি জাহানারা বেগমের দিকে ফিরলাম। তাকে বললাম, যারা আমাদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা আর নেই। অতএব তার উচিত আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা, যা একজন বড় বোনের থেকে ছোট ভাই-এর প্রাপ্য। আমার অভিষেক বার্ষিকীতে তার নিকট এক লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা উপঢৌকন প্রেরণ করলাম। সতের লক্ষ টাকার অবসর ভাতা নির্ধারণ এবং 'পাদশাহ' বেগম খেতাবে ভূষিত করলাম। তিনি আমার নিসঙ্গতার সঙ্গী হতে এবং আমাকে পরামর্শ দিতে সহায়তা করতে সম্মত হলেন। আল্লাহ যখন তাকে তলব করলেন তখন আমি সকল ঐতিহাসিক দলিলপত্রে তাকে 'শাহিবাত-উজ-জামানী' হিসেবে উল্লেখ করার নির্দেশ দিলাম। বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন যুগ নারী। তার আকাংখা অনুসারেই তাকে হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের পাশে কবরস্থ করা হয়। তার কবরের গায়ে তার রচিত একটি ফারসী কবিতা উৎকীর্ণ করে দিলাম,

"সবুজ ঘাসের আচ্ছাদনে আমার
কবর হারিয়ে যাক,
নিরীহ কারো কবরে ঘাসের
গালিচাই সর্বোত্তম আচ্ছাদন।"

১৭০৬ সালের বসন্তকালে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা গওহর আরা বেগমকে আল্লাহতায়ালা তলব করলেন। আমি উপলব্ধি করলাম, এখন আমার ইবাদতের মাদুর গুটানোর সময় এসেছে। আহমদনগরে থাকাকালেই আমার স্বাস্থ্যহানি শুরু হলো। আমি আরো উপলব্ধি করলাম যে, আহমদনগরেই আমার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আমার প্রিয় কন্যা জীনাত-উন-নিসা ও প্রবীণা স্ত্রী উদয়পুরী বেগম আমার শুশ্রূষার জন্য পাশে ছিলো। শ'খানেক হেকিম প্রতিদিন আমার নাড়ী পরীক্ষা করতো। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্তের কাছে জাগতিক বিষয় ও চিকিৎসার কি মূল্য আছে? দীর্ঘ নব্বই বছর ইহজগতে অবস্থানকালে আমার কার্য এবং পরলোকে শেষ বিচারের দিনে আমার জন্য কি পুরস্কার বা শাস্তি অপেক্ষা করছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম।

যে বিষয়টি আমার কাছে সবচেয়ে দুঃখজনক বলে মনে হয়, তা হচ্ছে আমার নিকটজনদের ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা। আমার পুত্র মোহাম্মদ সুলতান আমার বিরুদ্ধে তার চাচা সুজার সাথে যোগ দিয়ে ইতিপূর্বেই তার মুখকে কালিমালিপ্ত করেছে। এখন আরেক পুত্র আকবর বিধর্মীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে। আযমের সাথে দারা শিকোহ'র কন্যার বিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সে একটি নিষ্কর্মা। মদ্যপান থেকে বিরত করা এবং নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাকে এক বছরের কারাদন্ডও দিয়েছি। আমার সর্বকণিষ্ঠ পুত্র কাম বখশের কোন উচ্চাকাংখা বা যোগ্যতা কিছুই নেই। সকল পুত্র আমার প্রতি খড়গহস্ত। কিন্তু আমার কন্যা জেবুন্নিসার ব্যবহার আমাকে সবচেয়ে বেশী আহত করেছে। জেবুন্নিসা 'মখফী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতো। সে তার ভাই আকবরকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে প্ররোচিত করে। ফলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জেবুন্নিসাকে সেলিমগড় দুর্গে বন্দী করার নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সে আমার প্রতি তার সর্বশেষ কন্টকাকীর্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে,

'হিন্দুস্থানে এতো নির্মমতা ও রুক্ষতার
সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে
আমি ভিন্ন কোন দেশে গিয়ে
আমার বসত গড়বো।'

এরপর সে মৃতদের দেশে চলে গেছে। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজ্জেমের উপর যথেষ্ট আস্থা রেখেছিলাম। বিজাপুর এবং গোলকুন্ডা অভিযানের সময় সে দুশমনের সাথে ষড়যন্ত্র করে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করা সত্ত্বেও আমার আস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু ন্যায়বিচারের কাছে আমার ভালোবাসা ছিল মূল্যহীন। ফলে তাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তার চুল ও নখ কাটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পানি ছাড়া আর কিছু পানও করতে দেয়া হয়নি। দীর্ঘ সাতটি বছর তাকে নির্জন কারাগারে রাখা হয়।

১৭০৫ সালের গ্রীষ্মকালে আমি কৃষ্ণা নদীর তীরে দেবপুর গ্রামে শিবির সংস্থাপন করলাম। সেখানে গুরুতর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রলাপের মত শেখ গাঞ্জার একটি চর্তুপদী আবৃত্তি করেছিলাম,

"যখন তুমি আশি বছর বা তারও অধিক গনণা করো
সময় এবং ভাগ্য দুটোই দরজায় ঘা দেয়
কিন্তু যদি একশ' বছর বেঁচে থাকো
তাহলে জীবিত থাকার মুহূর্তও মৃত্যুর মত হবে।"

আমার রোগশয্যার পাশে অবস্থানরত একজন ওমরাহ এর সাথে যোগ করলো ঃ

"এ অবস্থায় আপনার হৃদয়কে জাগিয়ে তুলুন
ঈশ্বরের চিন্তা মৃত্যুর আঁধারকে আলোকিত করবে।"

পৃথিবীতে আরো দীর্ঘদিন অবস্থানের কোনো বাসনা আমার মধ্যে ছিল না। বার বার জ্বরে আক্রান্ত দেহ ভেঙ্গে পড়ায় আমি নিশ্চিত হলাম যে, বহু পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা আমাকে তলব করেছেন। জ্বরের ঘোরে আমি আবৃত্তি করলাম,

"এক মুহূর্ত, কিছুক্ষণ, একটি নিশ্বাসও বদলে যায়
এবং পৃথিবী নতুন আকৃতি ধারণ করে।"

বিক্ষুব্ধ পুত্রদের কিছু পরামর্শ দেয়ার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে আমি বিবেচনা করলাম। আযমকে লিখলাম, "আমি একাই এসেছিলাম এবং বিদায় নেব এক অপরিচিত লোক হিসেবে।

আমি জানি না, আমি কে অথবা আমি কি করছি। ক্ষমতার মধ্যে যে তাৎক্ষণিকতা ছিল তা পিছনে রেখে গেছে শুধু বিষাদ ও দুঃখ। আমি সাম্রাজ্যের অভিভাবক বা রক্ষাকারী ছিলাম না। জীবন এতো মূল্যবান। কিন্তু তা অতীত হলো ব্যর্থতায়। আল্লাহর অবস্থান আমার হৃদয়ে। কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাইনা। জীবন ক্ষণস্থায়ী, এখন সবকিছু অতীত এবং ভবিষ্যতের জন্যেও কোন আশা নেই। আমি আমার মুক্তির জন্য ভীত, আমি আমার শাস্তির জন্য ভীত। আমি আল্লাহর দান ও ক্ষমায় বিশ্বাসী। কিন্তু আমার কৃতকর্মের জন্য আমি আতংকিত...."

কাম বখশকে লিখলাম, "আমার আত্মার আত্মা....আমি একাই যাচ্ছি। তোমার অসহায়ত্ব আমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু দুঃখ করেই বা কি করবো? আমি যত পীড়ন সহ্য করেছি, যত পাপ করেছি, যতটা ভুল করেছি, তার ফলাফল বা পরিণতি সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তবু আমার অবাক লাগে যে, এ পৃথিবীতে আমি এসেছিলাম শূন্য হাতে। এখন আমি যাচ্ছি পাপের প্রকান্ড এক বোঝা নিয়ে। আমি যে দিকেই তাকাই, শুধু আল্লাহকে দেখি। আমি ভয়ানক পাপ করেছি। জানি না এসব পাপের জন্য কি শাস্তি অপেক্ষা করছে।"

এই কথাগুলো মৃত্যুভয়ে ভীত একজন বৃদ্ধের নয়, বিশেষতঃ যখন তিনি জানতে পারছেন যে, মৃত্যু খুব নিকটে। বরং পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পূর্বেই বিদায় নেয়ার ভয়ে। আমি দেখতে পাচ্ছি, বিধর্মী মারাঠা, রাজপুত, জাঠ ও শিখরা হিন্দুস্থানের সর্বত্র অস্ত্র তুলে ধরেছে। আমি এটাও দেখে যাচ্ছি, আমার যে উত্তরাধিকারী রয়েছে তারা কত দুর্বল। আমি বুঝতে পারছি, আমি চলে যাওয়ার পর বাবরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য খন্ডবিখন্ড হতে শুরু করবে এবং শুধু উত্তেজনা, বিশৃংখলা বিরাজ করবে ঃ আজমা হামা, ফাসাদ বাকী।'

আমি ইতিমধ্যে আমার অন্তিম বিশ্রামের স্থান পছন্দ করেছি দৌলতাবাদ দুর্গের পাদদেশে দরবেশ শেখ জইনুদ্দিনের মাযারের চত্বরে অতি সাধারণ একটি কবর।

আমি জানতাম, আমার শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। আমার সহচররাও বুঝতে পেরেছিল, বিদায়ের আর বেশী সময় বাকী নেই। তারা আমার হাতী ও হীরকখন্ডগুলো দান করে দেয়ার অনুমতি চাইলো। আমার বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় আমি এক টুকরা কাগজে লিখে দিলাম যে, এ ধরনের রীতি মুসলমানদের অনুসরণ করা উচিত নয়। "তোমরা যদি ভালো মনে করো তাহলে, রাজকোষের সকল সম্পদ দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দাও। কিন্তু আমার কবরের উপর কোন সৌধ নির্মাণ করো না। ধূলির এই সৃষ্টিকে যথাশীঘ্র কবরের কাছে নিয়ে যাবে এবং কোন কফিন ব্যবহার না করেই মাটির মধ্যে স্থাপন করবে।"

১১

ভাগমতী

আমার সারাটা জীবন আমি ভূতের পীড়নের মধ্যে কাটিয়েছি। যেহেতু দিল্লীতে ভূতের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে কোন শহরের চাইতে অধিক, দিল্লীতে জীবন কাটানোর অর্থ দীর্ঘ দুঃসময়ের মধ্যে থাকা। আমি কখনো ভূত দেখিনি অথবা বিশ্বাসও করি না যে ভূতের অস্তিত্ব আছে। তথাপি আমার জন্য ভূত বাস্তব ভীতি। আমি ভূতভীতি কাটিয়ে উঠার জন্য মরণাপন্ন ও মৃত লোকদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করি। শ্মশান এবং কবরস্থানে নিয়মিত যাই। এতে খুব একটা কাজ হয় না। আমি শান্তির একটি অনুভূতি নিয়ে ফিরে আসি এবং কল্পনা করি যে আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু দিবসের মৃত্যু ঘটার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে মৃতের চেতনা জীবন্ত হয়ে উঠে। দরজা আপনা আপনি খুলে যায়। কোন বাতাস ছাড়াই পর্দাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠে এবং আমার চারপাশে মৃত ব্যক্তিদের অদৃশ্য উপস্থিতি দেখতে পাই। শুধুমাত্র যার কাছে আমি এই ভীতির কথা স্বীকার করি, সে ভাগমতী। কারণ সে ভূতে বিশ্বাস করে। সে আমার ভীতিগ্রস্ত হওয়ায় সমবেদনা জানায় না। সে হাসে এবং আমাকে বলে'বাচ্চা'। সে আরো বলে, 'আমি মরে গেলে আপনার সাথে শুতে আসবো। তখন আপনার শিশু সুলভ ভয় দূর হবে। কিন্তু অন্য কারো সাথে শয়নরত অবস্থায় দেখলে, আপনাকে এক রাতের জন্যও ঘুমুতে দেব না।' (এখনো সে আমাকে ব্রিগেডিয়ারের স্ত্রী কমলাকে সঙ্গম করার কারণে ক্ষমা করতে পারেনি। কমলা এখন স্বামীর সাথে ফ্যামিলি পোস্টিং এ রয়েছে বলে ভাগমতী আমার প্রতি ক্ষুব্ধ নয়।)

ভূতের সাথে অনেকবার আমাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু একটি ঘটনা আমি ভুলতে পারি না। কয়েক বছর আগের ঘটনা। একটি ফোন এলো এবং বললো যে, আমার চাচা গুরুতর অসুস্থ এবং মৃত্যুর পূর্বে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ করা উচিত। আমার এই চাচা দীর্ঘদিন ধরেই মরছেন। হাঁপানি তাকে কংকালবৎ করে ফেলেছে। চোখ অগ্নিকুন্ডের মত জ্বল জ্বল করছে। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি যেন একটি জীবন্ত ভূত এবং কিছু একটা আমাকে বলে দিয়েছে যে, তার মৃত্যুশয্যা থেকে আমার দূরে থাকা উচিত। মৃত্যুর সাথে এক ধরনের বিষাদময় আগ্রহ এবং মৃতের জন্য বিলাপ আমার স্বতঃস্ফূর্ততাকে অবজ্ঞা করতে শিখিয়েছে। অতএব আমি নিজেকে দেখতে পেলাম সমবেদনা ও শোকগ্রস্ততায় কাতর আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে অসুস্থ ব্যক্তির শয্যার চারপাশ ঘিরে। কেউ প্রার্থনা করছে। অন্যেরা ফিস ফিস করে কথা বলছে। তিনি একটি বালিশে ঠেশ দিয়ে আছেন এবং মাথাটা দুই হাঁটুর মাঝখানে। তার স্ত্রী কফে পূর্ণ একটি পিকদানি হাতে তার পাশে বসা। তিনি কাশতে শুরু করেন, দীর্ঘসময় ধরে কাশি- অতঃপর মাথাটা কিঞ্চিৎ তোলেন। তার স্ত্রী পিকদানি তুলে ধরেন তার থুতনির নীচে। পুঁজের মত কফ তার কালো দাড়ি বেয়ে পিকদানিতে গড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী তোয়ালে দিয়ে দাড়ি মুছে দেন এবং তাকে বলেন যে, আমি এসেছি। তিনি যদিও বড় বড় চোখ তুলে আমার দিকে তাকান, কিন্তু মনে হলো না যে তিনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। এরপর তিনি মাথাটা হাঁটুর মাঝখানে রাখেন। মিনিট খানেক পরই তিনি পাশে পড়ে যান এবং চোখ ও মুখ খোলা থাকে। তিনি মারা গেছেন।

আমার চাচী দুই হাত দিয়ে কপাল চাপড়ান এবং বিলাপ শুরু করেন, 'হায় হায়! আমি মরে গেছি! আমি বিধবা হয়ে গেলাম!' খাটের পায়ার সাথে আঘাত করে তিনি হাতের চুড়ি ভেঙ্গে ফেলেন। অন্যেরা এগিয়ে আসে তাকে সান্ত্বনা দিতে। একজন মৃত ব্যক্তির চোখ ও মুখ বন্ধ

করে থুতনি পেঁচিয়ে একটি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয় এবং নাকের ছিদ্রে তুলা গুঁজে দেয়। কিছু সময়ের জন্য বিলাপ চলে। এরপর উচ্চস্বরে প্রার্থনা শুরু হয়, 'ঈশ্বর এক। তিনিই চূড়ান্ত ও পরম সত্য।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখন বর্ষাকাল এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু আমার অ্যাপার্টমেন্টে একাকী ঘুমুতে সাহস হলো না আমার। ভাগমতীকে আমার সাথে রাত্রিযাপনের জন্য খুঁজে বের করার কোন উপায় নেই। আমি বুধ সিংকে বললাম, আমার অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের লনে বিছানা পেতে দিতে, কারণ হিসেবে এয়ারকন্ডিশনার নষ্ট হয়ে গেছে, বললাম। লন থেকে অন্যান্য অ্যাপার্টমেন্ট দেখা যায়। মানুষের কথাবার্তার শব্দ এবং সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের আলো আমাকে অনেক স্বাচ্ছন্দ দেবে। আমি একটি মশারি খাটিয়ে নিরাপদে শুয়ে পড়লাম।

এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও আমার চোখ বন্ধ করতে পারলাম না। যেভাবেই চোখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করি না কেন, আমার মৃত চাচার চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে এমন দেখছি। বাতিগুলো এক এক করে নিভে গেল। মানুষের কণ্ঠ নীরবতার মধ্যে হারিয়ে গেল। চাঁদের ধূসর আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। মালবেরী গাছে পেঁচা ডাকছে। আমি একটি বাঁদুড় উড়ে যেতে দেখলাম, সেটি রাস্তার দিকে ঝুঁকে নামলো এবং একটি ইঁদুর ধরে নিয়ে আবার উড়াল দিল। আমার চোখ অভ্যাসবশতঃই বন্ধ হলো এবং সকালের মৃত্যু দৃশ্য পুনর্জীবিত হয়ে ভেসে উঠলো। মৃত মানুষটি জীবন্ত হয়ে এলো। মাপা পা ফেলে তিনি লন অতিক্রম করে আমার দিকে এলেন, মশারির এক পাশ তুলে তার মুখটা আমার মুখের কাছে আনলেন। ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আমার কণ্ঠ হারিয়ে গেছে। এরপর আমার হেঁচকি উঠলো এবং গোঙানির মত তার প্রকাশ ঘটলো। মৃত ব্যক্তি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "বাহ্ গুরু, বাহ। এটা আমি; বুধ সিং। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আপনার বিছানা ভিতরে নিয়ে যাই।"

শীতল ঘামে আমি ভিজে গেছি। আশে পাশের অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে আলো জ্বলে উঠতে দেখলাম। একটি কণ্ঠ জানতে চাইলো, 'ব্যাপার কি?' বুধ সিং আমার পক্ষ থেকে উত্তর দিল; কিছু না! উনি একটি খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন।'

আমি অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করে সব ক'টি রুমের আলো জ্বালিয়ে দেই এবং বুধ সিংকে যেতে বলি। আর্মচেয়ারে বসে নিজের সাথেই নীরব তর্কবিতর্ক শুরু করি। নিজেকে খুব আহম্মক মনে হতে থাকে। নিজের কাছেই গাধা বনে গেছি। এখন বুধ সিং সকলকে বলে বেড়াবে যে, তার ষাট বছর বয়স্ক মনিব আতংকগ্রস্ত শিশুর মত আচরণ করেছেন। এই বুদ্ধু যাতে এমন বলতে না পারে সেজন্য অযৌক্তিক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তখন রাত সাড়ে তিনটা। প্যান্ট পরে মৃদু বর্ষণের মধ্যেই রাস্তায় হাঁটার সিদ্ধান্ত নিলাম। জনহীন রাস্তা ধরে লোধী পার্কের উদ্দেশ্যে চললাম। লোধী পার্কে অনেক সমাধি স্তম্ভ। আমি সেগুলোর উপর বসবো এবং স্তম্ভের নীচে যারা কবরস্থ তাদেরকে 'হ্যালো' বলবো।

প্রথমে আমি মোহাম্মদ শাহের সমাধিতে গেলাম। সাইয়িদ বংশের তৃতীয় শাসক ছিলেন তিনি। মারা গেছেন ১৪৪৪ সালে। একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর অষ্টাকোনাকৃতির গম্বুজে ঢাকা তার সমাধি। তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম যে, এখানে তার কোন কাজ নেই। কারণ এ পার্কটি লোধীদের। তিনি কিছু না বললেও গম্বুজে বসবাসরত বাঁদুড়গুলো বললো, 'তিনিই এখানে প্রথমে এসেছেন, লোধীরা পরে এসেছে। এবং সিকান্দার লোধীরও এখানে অবস্থানের অধিকার কমই আছে। কারণ দিল্লীর চাইতে বরং আগ্রাতেই তিনি বেশী সময় কাটিয়েছেন।"

সেখান থেকে বের হয়ে আমি সিকান্দার লোধী নির্মিত বড় গম্বুজ মসজিদের দিকে রওয়ানা দিলাম। চমৎকার গম্বুজ। নারিকেলের দেশ দক্ষিণের মহিলা কমলার স্তনের মত, দৃঢ় গোলাকৃতির এবং এর তীক্ষ্ণ বোটা আকাশ বিদীর্ণ করতে সক্ষম। মসজিদের চারপাশটা প্রদক্ষিণ করে একটি ধ্বংসপ্রায় কবরের উপর বসলাম এবং কয়েক মিটার দূরের শীশ গম্বুজ পরীক্ষা করলাম। এই গম্বুজ তেমন আকর্ষণীয় নয়। রঙ্গিন টাইলসের নকশাগুলোকে দিবাভাগে মনে হয় লেসের ব্রেসিয়ারের মত, কিন্তু রাতে দৃশ্যমান নয়। মসজিদ থেকে আবার যাই সিকান্দার লোধীর সমাধিতে। আমার নার্ভ আর কাজ করছে না। সিকান্দার লোধী উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বর্গাকৃতির এক উদ্যানে সমাহিত। এই বেষ্টনীর ভিতরে রাতের বেলায় নিজেকে দেখে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কোন ভূত যদি আমার

বহির্গমণের পথ রুদ্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে?

আমি সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠি আবার অবতরণ করি। আমি দু'বার চেষ্টা করি, কিন্তু দু'বারই প্রবেশ পথের বেশী যেতে ব্যর্থ হই। নিজেকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করি, 'ধরে নাও, জায়গাটা পরিদর্শন করেছো।' যে কারণেই হোক না কেন, সিকান্দার লোধী দিল্লীকে পছন্দ করেননি এবং আমারও তাকে তোয়াক্কা করার মত কিছু নেই। এছাড়া তার পুত্র ইব্রাহিম লোধী নিজেকে পানিপথে মোগল বাবরের দ্বারা পরাভূত হতে দিয়েছিলেন। অতএব লোধীদের জন্য আর কোন সম্মান প্রাপ্য নেই।

ইতিমধ্যে পূর্ব দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং ফিঙ্গে পাখী ভোর হওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে। প্রাতঃভ্রমণকারীরা আথপুলা ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছে। বড় গম্বুজের উল্টো দিকে ঘাসের উপর বসেছে খোলা মাঠের যোগ ব্যায়ামের ক্লাশ। জীবন্ত পৃথিবী জেগে উঠেছে। মৃতের পৃথিবী দিবাভাগে অবসর নিয়েছে।

১২

নাদির শাহের দিল্লী অভিযান

বহু বছর পূর্বে আমি যখন পিতার বকরীর পাল চরাতাম, দীনহীন অবস্থায় রুটি দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতাম এবং ধূলিশয্যায় নিদ্রা যেতাম, তখন আমার একটি স্বপ্ন ছিল। আমি স্বপ্ন দেখতাম, বকরী চরানো বালক থেকে আমি জেলেতে পরিণত হয়েছি এবং আমার জালে চারটি শিংধারী মাছ ধরা পড়েছে। আমি জানতাম, মাছ রাজ প্রতীক। আমি এটাও জানতাম যে, শূন্য উদরের প্রকৃতিই হচ্ছে জাঁকালো কল্পনার সৃষ্টি। এ কল্পনার ধরণ হচ্ছে, একজন সারাদিন ক্রীতদাসের খাটুনি খাটবে এবং রাতে কাটাবে হুরী পরিপূর্ণ প্রাসাদে। অন্যদিকে একজন রাজা দিনের বেলায় শাসন কার্য পরিচালনা করে রাত কাটাবেন বিদ্রোহ ও হত্যার দুঃস্বপ্নের মধ্যে। এভাবেই মহান আল্লাহ ন্যায় বিচার নিশ্চিত করেন। 'একজনকে তিনি দিনের বেলায় সুখ শান্তি দেন এবং রাতে দুর্দশা। অন্যজনকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে রেখে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বর্গীয় আনন্দের মধ্যে রাখেন।'

এই স্বপ্ন আমার স্মৃতিতে অম্লান ছিল। আমি যখন ইস্পাহানের শাসনকর্তা হলাম, তখন একজন বিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করলাম, যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে পটু ছিলেন। তিনি আমাকে নিশ্চিত করলেন, মৎস্য নিঃসন্দেহে রাজ প্রতীক এবং এর চারটি শিং চারটি রাজ্যের ইঙ্গিতবাহী। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ আমার ভাগ্যে রেখেছিলেন চারটি ভূখন্ড শাসনের দায়িত্ব। আমি ইস্পাহানের শাসনকর্তা ছিলাম, এবার ইরানের 'পাদশাহ' (সম্রাট) হলাম। শীঘ্রই আফগানিস্তান আমার ভূখন্ডের সাথে সংযুক্ত হলো। হিন্দুস্থানকে আমার চতুর্থ রাজ্যে পরিণত করা থেকে কে রক্ষা করবে? কান্দাহার নগরী দখল করার সময় আমি দ্বিতীয় স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নটা হলো, হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) আমার কাছে এসে নিজ হাতে তার সর্বজয়ী তরবারি 'জুলফিকার' আমার কোমরে বেঁধে দিচ্ছেন। স্বপ্নটির কথা মনে মনে ভাবতাম। আমার স্মরণ হলো, যখন একজন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পূর্ব থেকে পশ্চিম কত দূর?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাত্র একদিনের সফর।'

নিজেকে বললাম, 'তাহমাস কুলী খান, দিল্লীর পথ তোমাকে ডাকছে।' এভাবেই দিন কাটছিল। কয়েকদিন পর দিল্লী হতে আমি আমন্ত্রণ পেলাম। এই আমন্ত্রণ মোগল সিংহাসনে আসীন নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের নিকট হতে নয়। মোগল দরবারের দু'জন ওমরাহ- দাক্ষিণাত্যের গভর্ণর আসফ শাহ নিজাম উল মুলক এবং দিল্লী থেকে পূর্বদিকে অযোধ্যার গভর্ণর সাদাত খান এই আমন্ত্রণ জানালেন। আমন্ত্রণ অতি গোপনীয় এবং যেভাবে আমাকে বলা হলো তাতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমন্ত্রণকারীদের বক্তব্য একাধিক অর্থে পূর্ণ। নিজেকে আবার বললাম, 'নাদির শাহ, দীর্ঘদিন ধরে মানুষের উপর শাসন চালিয়ে তুমি নিজের শত্রুর হাতে সর্পের মস্তিষ্ক গুড়িয়ে দেয়ার কৌশল ভালোভাবেই জানো।'

আমি 'শত্রু' শব্দটি ব্যবহার করলাম মোগলদের ক্ষেত্রে, কারণ মোগল সম্রাট আমার প্রতি চরম অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন। তিনি হিন্দুস্থান ও আমার দেশের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক

রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমার চিঠির উত্তর দেননি। এমনকি, আমার দূতকে দিল্লীতে আটক করে রেখেছেন। নিজাম উল মুলক ও সাদাত খানের মত লোক যারা তাদের প্রভুর নিমক খেয়ে প্রভুর পতনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে দুষ্ট সর্প বলা অপেক্ষা আর কত ভালোভাবে বর্ণনা করা সম্ভব? এরা মাটির উপর গড়িয়ে চলে কিন্তু গায়ে কারো পা পড়লেই দংশন করে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমার বিচার বিবেচনাকে অযোগ্য লোকদের পরামর্শ দ্বারা গুলিয়ে ফেলাকে আমি বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করতাম না। আমার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আমি কূটনীতির কলমকে গভীরভাবে কালিতে ডুবিয়ে কৌশলের কাগজে উত্তর লিখলাম। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান কোনটাই করলাম না। আমি শুধুমাত্র দিল্লীর পথে যাত্রার অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার কথা বর্ণনা করলাম। সুলাইমান ও হিন্দুকুশ পর্বতের গভীর গিরিখাত- যে পথ ধরে আমাদের এগুতে হবে, যুদ্ধবাজ পাঠান ও আফগান উপজাতির লোকজন- যাদের সাথে আমাদের লড়তে হবে, কাবুল ও লাহোরের সুবেদারদের বদমতলব, সবই আমার বিরুদ্ধে। আমার চিঠি শেষ করলাম মোগল সম্রাটের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর উল্লেখ করে। আমার চিঠির উত্তরই আমাকে বলে দেবে যে, আমাকে যারা আমন্ত্রণ করেছে তারা আমাকে তাদের হাতের তরবারিতে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করছে কিনা অথবা তাদের সার্বভৌম সম্রাটের দুর্ব্যবহারের কারণে তাদের আনুগত্যের ঝরণা বিষাক্ত হয়ে আমার ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রে পরিণত হবে কিনা?

তাদের উত্তর পেতে আমাকে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতে হলো না। তারা আমাকে শুধুমাত্র সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বরং অন্যান্য ওমরাহদের কাছে লিখা পত্রের অনুলিপিও পাঠিয়েছে। সেইসব চিঠিতে আমাকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে উল্লেখ করেছে। তারা আমাকে জানিয়েছে যে, তাদের সম্রাট, 'মহামহিম নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ শুধুমাত্র মদ ও নারী নিয়েই তার সময় অতিবাহিত করেন। মোগলদের মহান ঐতিহ্য এখন বিলুপ্তির পথে এবং শিগগিরই বিধর্মী মারাঠাদের করতলগত হবে মোগল সাম্রাজ্য।'

মোহাম্মদ শাহের লাম্পট্যের কথাবার্তা বিভিন্ন দিক থেকেই আমার কানে এসেছিল। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, এক হাতে নারী, আর এক হাতে সুরা পাত্র ছাড়া তাকে দেখাই যেতো না। তাকে বলা হতো 'রঙ্গীলা সম্রাট।' যদিও তিনি ফারসী ভাষায় দক্ষ ছিলেন বলে বলা হতো, কিন্তু তিনি শেখ সা'দীর ভর্ৎসনামূলক কাব্য সম্পর্কে মনোযোগী ছিলেন না। শেখ সাদী বলেছেন, 'আবেগ হচ্ছে দুশমনের মতো'।

"তুমি যার ইচ্ছা পূরণ করো
সে তোমার আদেশ পালন করবে,
কিন্তু আবেগের কাছে পরাভূত হলে
আবেগই তোমাকে চালনা করবে।"

আমি একে একে কান্দাহার, গজনী ও কাবুল নগরী অধিকার করলাম। সমগ্র আফগানিস্তান যা মোগল সাম্রাজ্যের অধীন ছিল তা আমার পদানত হলো। আমি মোহাম্মদ শাহকে এ কথাগুলো লিখা সর্বোত্তম বিবেচনা করলাম, 'মহান সম্রাটের অতি উজ্জ্বল মনে এটা স্পষ্ট থাকা উচিত যে, কাবুলে আমার আগমন ও দখলের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ইসলামের খাতিরে এবং আপনার বন্ধুত্বের স্বার্থে। আমি কখনো ভাবতে পারি না যে, দাক্ষিণাত্যের বিধর্মী মারাঠারা মুসলমান সম্রাটের সাম্রাজ্যে কর আরোপ করবে। আটক অঞ্চলের এ পাশে আমার অবস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন এই বিধর্মীরা দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তখন আমাদের বিজয়ী সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করে তাদেরকে নরকের অতল গহ্বরে প্রেরণ করবো। মহান সম্রাটের পূর্বপুরুষ এবং ইরানের বাদশাহদের মধ্যে বন্ধুত্বের ইতিহাস অতি পুরাতন। হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ)-এর নামে শপথ করছি যে, বন্ধুত্ব এবং ধর্মীয় তাগিদ ছাড়া আমার অন্য কোন স্বার্থ কখনো ছিল না, এখনো নেই। আপনি এর বিপরীত কিছু সন্দেহ করলেও করতে পারেন। আমি সব সময় আপনার বন্ধু।'

মোহাম্মদ শাহ আমার চিঠির কোন উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনেই বললাম, 'আমিন।' কিন্তু আমি একটি ইসলামী সাম্রাজ্যকে বিধর্মীদের দ্বারা পর্যুদস্ত হতে দিতে পারি না। সাম্রাজ্যের

একটি মাত্র দুর্ভাগ্য, এটি এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা শাসিত যিনি মনে করেন, স্বর্গ একটি উদ্যান, যেখানে আঙ্গুরের রসের প্রস্রবন প্রবাহিত হচ্ছে এবং সাধারণ বেশ্যারাও হুরীর মত সম্মোহন সৃষ্টি করছে।

মোহাম্মদ শাহের কাছে আর একটি চিঠি লিখলাম। এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমার শর্তসমূহ উল্লেখ করলাম, যাতে তার মগজে প্রবেশ করে। তাকে জানালাম যে, আমরা শিগগির দিল্লীর পথ ধরবো। আমার উদ্দেশ্য মোগল সাম্রাজ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা এবং হিন্দুস্থানে ইসলামের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। আমার এই কাজ সমাধা করার বিনিময়ে চার কোটি রৌপ্য মুদ্রা এবং মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরাঞ্চলীয় চারটি প্রদেশকে ইরানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। মোহাম্মদ শাহের পূর্ববর্তী আচরণের কারণে পত্রে একটি হুশিয়ারী উচ্চারণ করতে বাধ্য হলাম, 'চল্লিশ দিনের মধ্যে পত্রের উত্তর আশা করি।'

চল্লিশ দিবস গত হলো। এরপর আরো একটি বছর কাটলো। আমি শুধু যে আমার পত্রের উত্তর পেলাম না তা নয়, আমার দূতকে দিল্লী ত্যাগের অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হলো না।

আমি সৈন্যদের সমাবেশ ডেকে একটি অজেয় বাহিনীর জন্য সৈন্য বাছাই করলাম। পতঙ্গ যেমন আলোর শিখার প্রতি ধাবিত হয়ে স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন দেয়, তেমনি জীবন দিতে প্রস্তুত সব সৈনিকের দ্বারা বাহিনী তৈরী হলো। এই বাহিনীতে ছিল কিজিলবাসী, তুর্কী, জর্জীয়, উজবেক, আফগান, পাঠান ও বেলুচী সৈন্য। ইংলিস্তান, ফ্রান্স ও ইটালী থেকে আনা প্রকৌশলী ও গোলন্দাজদেরও তালিকাভুক্ত করলাম। আমার বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত হলো।

১৭৩৮ সালের ৬ই নবেম্বর দামামা বাজানো হলো। আমরা দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। ইতিমধ্যে ঠান্ডা পড়ে গিয়েছিল। যে উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করতাম রাতের বেলায় বরফে জমে যাওয়ার অবস্থা হতো। কাবুল এবং পাঞ্জাবের সমভূমির মধ্যবর্তী এই এলাকায় যেসব উপজাতির লোকদের বসবাস, তারা প্রকৃতিতে দস্যু। প্রায়ই আমাদের রসদ লুটপাট করতো। তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের বিষয়াবলী আমাদের পদক্ষেপ দ্রুততর করলো।

আমরা খাইবার পাসের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হলাম। আমাকে বলা হলো, খাইবার পাস একটি ফাঁদের মতো। আমাদের উপর সুযোগ বুঝে আঘাত হানার জন্য বড় বড় দস্যু বাহিনী পর্বত শীর্ষে সমবেত হয়েছে। আমরা সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি করলাম এবং মাগরিবের নামায আদায় করলাম। নামায শেষে আমরা আবার যাত্রা করলাম। দস্যুরা যখন কম্বলের উষ্ণতায় নিদ্রা মগ্ন সেই সুযোগে আমরা বিশ্বাসঘাতক উপত্যকা দিয়ে পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করলাম। স্বচ্ছ ও শীতল আকাশের তারকা ছাড়া পথ দেখার জন্য আমরা আলোও জ্বালাতে পারিনি। উদীয়মান সূর্যের পানে তাকিয়ে দস্যুরা যখন চোখ কচলাচ্ছিল, আমরা তখন পেশোয়ারের উপকণ্ঠে উপনীত হয়েছি। কোন বিঘ্ন ছাড়াই আমরা পেশোয়ার দখল করলাম।

আমাদের অভিযাত্রা অব্যাহত রইলো। সুপ্রশস্ত সিন্ধু নদী অতিক্রম করলাম। নদীর নামেই এই দেশটির নামকরণ হয়েছে। এরপর এলাম পাঞ্জাবের বিস্তীর্ণ সমভূমিতে। পাঁচ নদীর নামে এই ভূখন্ডের নাম হয়েছে পাঞ্জাব। ইতিপূর্বে আমরা যেসব ভূখন্ড অতিক্রম করে এসেছি কোনটাই পাঞ্জাবের মতো নয়। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের অভিযানে আমরা দেখেছি বরফের টুপি পরা পর্বত শীর্ষ। দূর থেকে এই দৃশ্য কতই না মনোহর।

উপরে ঘন নীল আকাশ। সূর্যের তাপ নীলকান্ত মনির মতই উষ্ণ। সমতল ভূমিতে গম, সরিষা ও ইক্ষুর মরুদ্যান। শিকারের জন্য প্রচুর সংখ্যক তিতির, ময়ূর ও হরিণ। অনেক রকমের হাঁস পুকুর ও নদীতে সাঁতার কাটছে। আমাকে বলা হয়েছিল, বাঘ, প্যান্থার ও চিতাও দেখা যায় প্রচুর। সমৃদ্ধির এই দ্বীপে গ্রামগুলো দুর্গের মতো সুরক্ষিত। এসব এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান। তারা জানতো যে, আমরা বিধর্মী মারাঠাদের হাত থেকে থেকে তাদের দেশকে রক্ষা করতে এসেছি। সে জন্য তারা আমাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেছে। আমরা তাদের নিকট থেকে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে বিনিময়ে রজত ও সুবর্ণ মুদ্রা দিয়েছি। আমাদের কাউকে যখন কারো কাছ থেকে বলপূর্বক কিছু ছিনিয়ে নিতে দেখা গেছে আমরা তাদের শিরোচ্ছেদ করেছি।

কাউকে হিন্দুস্থানী নারীর উপর বলাৎকার করতে দেখা গেছে তাহলে আমরা তার এক মাসের বেতন এবং অভকোষ কেটে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের কাছে প্রদান করেছি।

লাহোরের গভর্ণর জাকারিয়া খান প্রথমে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল। পরে অধীনতা স্বীকার করে। আমার হিন্দুস্থান অভিযান সম্পর্কে তার ধারণা বিভ্রান্তিকর ছিল বলে অজুহাত দেখায়। লোকটি যে মিথ্যা বলছে, তা আমি বুঝেছিলাম। আমি হযরত আলী (রাঃ)-এর বাণী স্মরণ করলাম, "যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার যুক্তি গ্রহণ করো" এবং তাকে আমার পদচুম্বনের অনুমতি দিলাম। আমার সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তাকে বিশ লাখ রুপি প্রদানের নির্দেশ দিলাম।

নগরীর কয়েক মাইল দক্ষিণে শালিমার উদ্যানের অপূর্ব মনোরম পরিবেশে ষোল দিন কাটালাম। দিন দীর্ঘতর হচ্ছিল এবং সূর্যের প্রখরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শালিমার উদ্যানে রেশমী তন্তুর গাছগুলোতে লাল ফুলের বিপুল সমারোহ। উদ্যানের মালীরা বললো যে, শিমুল ফুলের রং দেখেই লোকজন বলতে পারে যে, গ্রীষ্মের উত্তাপ কতটা হবে। ফুলের রং যত উজ্জ্বল হবে, সূর্যের প্রখরতাও তত বাড়বে।

দিল্লীতে নিয়োজিত আমার গুপ্তচরেরা খবর দিলো যে, আমাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মোহাম্মদ শাহ বিশাল বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছে। আমার বাহিনীকে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিলাম কারণ বসন্তের অধিকাংশ সময় লাহোরে কাটিয়ে দিলে গ্রীষ্ম এসে পড়বে এবং আমার সৈনিকদের জন্য গরম সহ্য করা করা কষ্টকর দাঁড়াবে।

আমরা অগ্রসর হয়ে তিরাউড়ি গ্রামে শিবির সংস্থাপন করলাম। বন্দুকের গুলী ছোড়ার দূরত্বে মোগল বাহিনী কর্ণাল শহর ও ওয়ালী মর্দান খানের নামে দেয়া খালের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান নিয়েছে। পরদিন সকালে অশ্বে আরোহণ করে শত্রু বাহিনীর অবস্থান দেখতে বের হলাম। তারা সত্যিই বিপুল শক্তি নিয়ে এসেছে। বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষের উপর হবে। কিন্তু এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, যুদ্ধকলায় মোগল বাহিনী এখনো শিশু। সৈন্য সংখ্যা আমাদের দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও এবং তাদের বাহিনীতে দুই সহস্রাধিক হাতী, হাজার হাজার উট, বহু সংখ্যক কামান এবং অসংখ্য অশ্বের সমারোহ থাকলেও বাহিনী সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণার কারণে আমাদের উপর হামলার সুযোগ থেকে মোহাম্মদ শাহ নিজেকে বঞ্চিত রাখেন। আল্লাহতায়ালা তাকে নিজের বোধশক্তি সম্পর্কেও অজ্ঞ রেখে তাকে আমার হাতে অর্পণ করেন।

আমি আমাদের ঝটিকা বাহিনীকে নির্দেশ দিলাম মোগল বাহিনীর রসদ সরবরাহের পথ রুদ্ধ করে দিতে। মহাজ্ঞানী শেখ সাদী যথার্থই বলেছেন, 'যখন কোন যোদ্ধার উদর পূর্ণ থাকে সে যুদ্ধে সাহসী থাকে। কিন্তু উদর শূন্য থাকলে সে পলায়নেই সাহসী হয়।' কয়েক দিনের জন্য আমার দুশমনদের ক্ষুধার্ত রাখবো। যখন তাদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলবে আমরা তাদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবো এবং এতে তাদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। তারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কামানের গোলা ছুড়বে এবং তা অনিবার্যভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে।

১৭৩৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ক্ষুধাপীড়িত বিপুল মোগল বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য শিবির থেকে বের হলো। প্রথমেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হলো একটি হস্তী প্রাচীর। আমরা তাদের মোকাবিলায় উটের পিঠে জলন্ত নেপথা বেঁধে সামনে পাঠালাম। হাতী আগুন দেখে আতংকিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো এবং তাদের প্রভুদেরকেই পদদলিত করলো। মোগল বাহিনী শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পূর্বেই আমাদের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাদের সিংহ শিকারী যোদ্ধারা শত্রু বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেললো। দুই ঘন্টা তুমুল যুদ্ধের পর ২০ সহস্র শত্রু সৈন্য নিহত হলো এবং বহু সংখ্যক সৈন্যকে বন্দী করা হলো। নিহতদের মধ্যে একজন ছিল শামসামুদ্দৌলা, যাকে মোগল দরবারের একটি স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কবিদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে আমি সত্যি সত্যি দুঃখ পেলাম।

মোহাম্মদ শাহ আমাকে স্বাগত জানানোর ব্যাপারে সম্মত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পরাজয়ের ধূলি তার মুখের উপর স্থায়ীভাবে বসার সুযোগ দিলাম। মোহাম্মদ শাহ আমার সাথে যাকে আলাপ করার জন্য প্রেরণ করলেন, তিনি আসফ জাহ নিজাম-উল-মুলক, যিনি আমাকে হিন্দুস্থানে আমন্ত্রণ করেছিলেন। এই ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে নিমকহারামী করেছে এবং আমার পরিকল্পনার কলকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। আমি তাকে সম্মানে ভূষিত করলাম এবং মোহাম্মদ শাহকে আমার

পদতলে তার তরবারি সমর্পণ করার অনুমতি দিতে সম্মত হলাম।

পরের দিন হিন্দুস্থানের মহান সম্রাট নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ আমার সম্মুখে হাজির হলেন। তার হয়তো ভয় হয়ে থাকবে যে, আমি তার জীবন নিতে পারি। প্রথমে তিনি আমার তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে একজন খোজার হাতে পবিত্র কুরআন পাঠিয়ে আমার নিকট ক্ষমার প্রতিশ্রুতি চাইলেন। আমি পবিত্র গ্রন্থ চুম্বন করে আমার পুত্র শাহজাদা নাসরুল্লাহ খানকে নির্দেশ দিলাম মোগল সম্রাটকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে আসতে। মোহাম্মদ শাহ ভিতরে প্রবেশ করে আমাকে কুর্ণিশ করলেন এবং তার তরবারি আমার পদতলে স্থাপন করলেন। আমি আসন থেকে দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলাম। তার মন থেকে ভয় মুছে ফেলতে বললাম, "শত্রুর প্রতি আমার নীতি হচ্ছে, প্রকাশ্য যুদ্ধ, চক্রান্তমূলক হত্যাকান্ড নয়।"

মোহাম্মদ শাহ আমাকে বিশ্বাস করলেন না। তার সামনে যখন খাবার রাখা হলো তখন দেখলাম সন্দেহ তার মুখের উপর ভীতির রেখাপাত করেছে। আমি তার পাত্র নিয়ে আমারটা তার সামনে স্থাপন করলাম। আমার সুরা পাত্র তাকে দিলাম। তাকে আরো আশ্বস্ত করার জন্য নিজ হাতে একটি পাত্রে তাকে 'কাওয়া' ঢেলে দিলাম। অনুগ্রহ যেহেতু তার বুকে বন্ধুত্বের শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারলো না, তখন মনে করলাম তাকে সহজ ভাষায় উপদেশ দেয়াই উত্তম।

তাকে বললাম, 'আমি অবাক হচ্ছি যে, নিজস্ব বিষয়গুলো সম্পর্কেও আপনি এতোটা অসচেতন। আমি যে আপনাকে বেশ ক'টি চিঠি লিখেছি, আমার বন্ধুত্ব যাচাই করার জন্য আপনার কাছে একজন দূত প্রেরণ করেছি। তারপরও, আপনি আমাকে একটি সন্তোষজনক উত্তর প্রেরণকেও সঠিক বিবেচনা করেননি।' আমি তার উত্তর আশা করেছিলাম। কিন্তু মোহাম্মদ শাহ বোবার মত নিরব। আমি আরো বললাম, 'আপনার নিজের সম্পর্কেও মনোযোগ নেই। আমরা আপনার ভূখন্ডে প্রবেশ করার পর আমরা কে, আমাদের উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য একজন দূত প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাটুকু আপনি উপলব্ধি করেননি। আপনার পক্ষ থেকে কোন একজন লোক একটি বার্তা বা কুর্ণিশ নিয়ে এলো না। এমনকি আমার সালামের জবাব পর্যন্ত নিয়ে এলো না।'

মোহাম্মদ শাহের যুদ্ধ পরিকল্পনার ভুলগুলোও দেখিয়ে দিলাম, 'পানি এবং খাদ্য ছাড়া আপনি যে বেষ্টনীর মধ্যে টিকে থাকতে পারবেন না, তা বিবেচনা না করে আহম্মকের মতো শিবিরের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন। এর পরিণতি কি হয়েছে তা আপনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।'

মোগল সম্রাটের মাথা লজ্জায় অবনত। হিন্দুস্থানে আমার অভিযান সম্পর্কে তার মনে যাতে কোন বিভ্রান্তি না থাকে, সে জন্য বললাম, 'আপনার নিস্পৃহতা এবং অহংকার আমাকে বাধ্য করেছে দিল্লী অভিযান পরিচালনা করতে। আপনার নিকট হতে সাম্রাজ্য কেড়ে নিতে আমি আসিনি। কিন্তু এই অভিযানে আমাদের বিপুল ব্যয় হয়েছে। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের শ্রান্তিতে আমার সৈন্যরা অবসাদগ্রস্ত এবং আমাদের রসদ ঘাটতি পড়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই দিল্লী অভিমুখে যেতে হবে এবং সৈন্যরা সুস্থ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কিছুদিন সেখানে কাটাতে হবে। তাছাড়া আসফ জাহ নিজাম-উল-মুলক যে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছেন, তা দিতে হবে। এরপর আমি আপনার নিজস্ব বিষয়গুলো দেখার জন্য আপনাকে ছেড়ে যাবো।'

আমার পায়ের উপর থেকে দৃষ্টি না তুলে মোহাম্মদ শাহ কথাগুলো শ্রবণ করলেন। তাকে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। তাকে বলা হলো সম্রাজ্ঞী মালিকা-উল-জামানী ও তার পুত্র সুলতান আহমদকে পণবন্দী হিসেবে আমার শিবিরে পাঠিয়ে দিতে।

মোগল সম্রাটের সাথে আমরা দিল্লীর পথে অগ্রসর হলাম। মোগল রাজধানীর বাইরে উপনীত হয়ে আমাদের কাজিলবাস অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দলকে মোগল সম্রাটকে তার প্রাসাদে পৌছে দেয়া এবং আমাদেরকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পাঠানো হলো।

শহরতলীর শালিমার নামক স্থানে আমরা শিবির সংস্থাপন করলাম। সেখানে মোগল ওমরাহদের প্রমোদ ভবনগুলো বিশাল বটবৃক্ষের সবুজ ছায়ায় আচ্ছাদিত। গাছের কান্ড থেকে ঝুড়ি এসে ভূমি স্পর্শ করেছে। সেখানে ফলের বাগান, যার নাম হচ্ছে আম। এ দেশে আম নাকি খুব প্রিয়- তখন আমের মুকুল পল্লবিত হয়েছে। ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে মাছি, মৌমাছি ও মাকড়শা। আম গাছ এক ধরনের কালো পাখির বিচরণের জন্য খুব প্রিয়। কাকের মত আকৃতির এই পাখির নাম কোকিল। নিরলস ও অবিরাম দিনভর ডাকে এই পাখি। আম ছাড়াও ফলের

বাগানে আছে পেয়ারা গাছ। মওসুমের এই সময়ে পেয়ারাও থাকে না। খোরাসান ও মাশাদে আমাদের উদ্যানে বসন্ত কত ভিন্নতর। সেখানে দ্রাক্ষা উদ্যানের ধূসরতার মাঝে যখন সবুজ পত্র পল্লবিত হয়, তখন দিন রাত নাইটিঙ্গেল পাখির সুরেলা সঙ্গীতে পরিবেশ মেতে উঠে। নিজেকে বললাম, 'হে মহান আল্লাহ, ইরানে একদিনের অবস্থান হিন্দুস্থানে একশ' দিন অবস্থানের সমান।'

পরদিন উত্তর দিকের লাহোরী গেট দিয়ে মোগলদের নগরীতে প্রবেশ করলাম। নগর প্রাচীরের বাইরে আমাদের বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যকে রেখে গেলাম, যাতে আমাদের সৈনিক ও নগরবাসীর মধ্যে অবাঞ্ছিত কোন ঘটনা না ঘটে এবং আমাদের উদ্দেশ্য পন্ড না হয়। আমরা পুষ্প নির্মিত অনেকগুলো ফটক অতিক্রম করলাম। ফটক শীর্ষে ফারসী ভাষায় আমাদের স্বাগত জানানো হয়েছে, 'খোশ আমদেদ'। পথিপার্শ্বের অট্টালিকাগুলোর বারান্দা থেকে আমাদের উপর গোলাপ পাঁপড়ি ছিটাচ্ছিল নেকাবে মুখ ঢাকা রমণীরা। হিন্দুস্থানীরা সন্দেহাতীতভাবে চাটুকারিতার কৌশলে পটু। ফুলের সুগন্ধির মাঝে মশল্লা ও রসুনের কড়া গন্ধ নাকে এলো লাহোরী বাজারে। একটি বিশাল মসজিদ অতিক্রম করলাম। আমাকে বলা হলো, সম্রাট শাহজাহানের একজন বেগম এই মসজিদের নির্মাতা এবং তার নামেই মসজিদের নামকরণ হয়েছে 'ফতেপুরী মসজিদ।'

এবার পড়লাম চাঁদনী চক নামে এক প্রশস্ত রাস্তায়। রাস্তার মাঝ বরাবর পানিপূর্ণ একটি সরু খাল এবং দু'পাশে গাছের সারি। জওহরী বাজারে অলংকারের দোকানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাকে পাত্র ভর্তি মূল্যবান পাথর উপহার দেয়া হলো। এরপর সামনে পড়লো নবনির্মিত একটি মসজিদ। নবাব রওশন-উদ-দৌলা মসজিদটি নির্মাণ করেছেন। এই লোকটিই মোহাম্মদ শাহের রাজকোষ সামলান। মসজিদটি ছোট হলেও এতে শ্বেত পাথর এবং সুবর্ণ দন্ডের ব্যবহার রাজকোষ রক্ষাকর্তার বিপুল বৈভবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পরে জানতে পেরেছি যে রওশন-উদ-দৌলা একজন কুখ্যাত ঘুষখোর। ইরানের মত হিন্দুস্থানেও যারা অর্থবিত্তের মালিক তারাই মসজিদ নির্মাতা।

মসজিদের ঠিক পরেই কোতোয়ালী। কোতোয়ালীতে কারাগার ও বধ্যভূমি দুইই আছে। কোতোয়ালীর পর ফুল বিক্রেতাদের বাজার 'ফুল কি মন্ডি'। সেখানে বহু ধরনের ফুলের সাজসজ্জা। বাজারের উল্টো দিকের বারান্দা ফুলের মালা দিয়ে যুক্ত। এর ফলে গোটা বাজারকে মনে হচ্ছিল ফুলের সুড়ঙ্গ। পরবর্তী বাজারের প্রবেশ পথ দারিবায় রৌপ্যকররা আমাকে মূল্যবান পাথর খচিত রিকাব উপহার দিলো। তাদের কেউ কেউ রিকাবে ঢেলে দিলো মুদ্রা যা আমার নামে ভিক্ষুকদের দেয়া হবে। নগরীতে অসংখ্য ভিক্ষুক। কিল্লার প্রবেশ পথের কাছেই উর্দু বাজার, সৈন্য শিবির। আমাদের কাজিলবাস দেহরক্ষীদের স্থান করে দেয়ার জন্য মোগল সৈন্যরা তাদের শিবির পরিত্যাগ করেছিল। আমরা কিল্লায় প্রবেশ করা মাত্র আমার সম্মানে মোগলরা তোপধ্বনি করলো। তাদের দেয়া সম্বর্ধনায় আমি প্রীত। দামামা বাজিয়ে আমরা ঘোষণা করলাম যে, দিল্লী এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং নাগরিকরা যতক্ষণ সদাচরণ করবে তারা নির্ভয়ে তাদের কাজ.কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে। আমি দিল্লীর গভর্ণর লুৎফুল্লাহ খান, নগর কোতোয়াল হাজী ফাউলাদ খানকে সম্মানে ভূষিত করলাম। আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাদের আয়োজনের কারণে প্রশংসা করলাম।

দিওয়ান-ই-খাসের আশে পাশের কয়েকটি স্থান আমাদের থাকার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে আমি মোগল যুবরাজদের স্বাগত জানালাম এবং তাদের সালাম গ্রহণ করে তাদেরকে সম্মানসূচক পোশাক দান করলাম।

সন্ধ্যায় যমুনা তীরে আতশবাজি দেখলাম। এরপরের অনুষ্ঠান নৃত্য গীত। যদিও আমাদেরই বিজয় উদযাপন করা উচিত, কিন্তু আমরা বিদেশীদের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলাকে বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করলাম না। অবশ্য আমার মেজবান নাসির উদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি তার হাত থেকে সুরা পাত্র এবং একটি বালিকাকে গ্রহণ করলাম। আমাকে জানানো হলো, সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এই বালিকা কামকলায়ও সুনিপুণা। তার দিকে খুব বেশী না তাকিয়েই আমাকে আনন্দদানের জন্য তাকে আমার স্বপ্ন শয্যায় অপেক্ষা করতে বললাম।

মোহাম্মদ শাহ এতো অধিক সুরা পান করেছিলেন যে, তিনি নিজেকে এবং যে মেহমানকে তুষ্ট করছেন তার অস্তিত্বও বিস্মৃত হয়েছিলেন। তিনি পায়ের গোড়ালিতে ঘুঙ্গুর বেঁধে বাঈজীদের

সাথে যোগ দিলেন। বাঈজীদের মতই তিনি নাচতে পারেন- একই রকম চোখের ইশারা, নারীতুল্য অঙ্গভঙ্গিমা এবং অবিকল মেয়েদের পদবিক্ষেপ। একজন ওমরাহ যখন প্রশংসায় সোচ্চার হলো যে, সম্রাটের নৃত্য হিন্দুস্থানের যে কোন নর্তকীর নৃত্যের চাইতেও তার কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে, তখন তিনি বানরের মত ভেংচি কেটে সহসা গোপন স্থানের বস্ত্রের ভাঁজ উন্মোচন করে তার বিশেষ অঙ্গটা বের করলেন। নাচতে নাচতেই বললেন, 'কোন নর্তকীর এটা নেই। এর চেয়ে বৃহৎ অঙ্গ কেউ যদি দেখাতে পারে তাহলে তাকে একশ' সুবর্ণ মুদ্রা দেব।' এই আহম্মকী প্রদর্শনীতে আমার হাসি পেল। আমার হাসিতে তার উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পেল এবং তার ঘোষণাকে দ্বিগুণ করলো, 'কারো এমন আকৃতির জন্য দু'শ সুবর্ণ মুদ্রা-তুর্কী, ইরানী-যার দ্বারা এর উত্তম ব্যবহার সম্ভব।' উপস্থিত কেউই তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণে সহসী হলো না। কিন্তু এই আহম্মক লোকটি আমার প্রতি সরাসরি তীর নিক্ষেপের চেষ্টা করলো। শেখ সা'দীর কবিতা আউড়ালো মোহাম্মদ শাহ,

'পুরানো দিনের ছোট মা
তুমি চতুরতার সাথে চুলে রং
লাগালেও বাঁকা পিঠ আর
কখনো সোজা হবে না।'

চাটুকারদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মোগল সম্রাট। তোষামোদকারীরা প্রশংসায় সোচ্চার হলো, 'ওয়াহ, ওয়াহ!' আমি জানতাম, কথাটি পরোক্ষভাবে আমাকেই বলা হয়েছে। কারণ আমার দাড়িতে খেজাব লাগানোর সময় পাইনি এবং দাড়ির গোড়া মাথার চুলের মতই সাদা দেখা যাচ্ছে। দু'মুখো সাদাত খান, যে কয়েক ঘন্টা পূর্বে আমার পায়ের সামনে মাটিতে চুম্বন করছিল সে আরেকটি কবিতা আউড়ালোঃ

'আজকাল শোনা যায়, জরাজীর্ণ বুড়ো
এক লোক সুন্দরী বঁধুর আশায়
শ্বেত শুভ্র চুলকে কুচকুচে কালো করলো
'মুক্তা' নামে সেই সুন্দরী তরুণীকে
অন্য লোকদের নিকট থেকে যখন সে
গোপনে নিয়ে বিয়ের পর নিয়ম মাফিক
কাজ শুরু করলো- তখন প্রথম
প্রচেষ্টাতেই বুড়োর বিশেষ অঙ্গ নেতিয়ে পড়লো।
ধনুকের ছিলায় শক্ত টান দিয়ে তীর ছুড়লেও
তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।'

আমার ইচ্ছে হলো সাদাত খানকে কষে চড় লাগাই। কিন্তু অন্য দিনের জন্য তার শাস্তি জমা রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম। লোকটি যাতে পালাতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখলাম। অবশ্য আমার ভাবটা এমন ছিল যে, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তাদের হাসি থামলে আমি উত্তর দিলামঃ

'একটি সুন্দর মুখ, সোনার কারুকাজ করা জামা
গোলাপের কুঁড়ি, ঘৃতকুমারী, রং এবং সুগন্ধি
এসবই নারীর সৌন্দর্যকে বর্ধন করে
কিন্তু পুরুষের অন্তকোষই তার আসল অলংকার।'

আমার আবৃতি শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা সুউচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা ধ্বনি তুললো, 'মারহাবা,

সোবহান আল্লাহ!'

আমি মাহফিল ভেঙ্গে দিলাম এবং আমার জন্য প্রস্তুত শয্যার দিকে গেলাম। পালঙ্কে হেলান দেয়া মাত্র ক্রীতদাসী বালিকা এসে কুর্ণিশ করলো। পা থেকে পাদুকা খুলে নিয়ে আমার পা মর্দন করতে শুরু করলো। দীর্ঘদিনের বিরামহীন সফরের ক্লান্তির পর কোমল হাতের স্পর্শের অনুভূতি ছিল সত্যিই আরামদায়ক। আমার পদযুগল তার কোলে স্থাপন করলাম যাতে সে ভালোভাবে পা টিপতে পারে। লক্ষ্য করলাম, তার বয়স কম এবং পরমা সুন্দরী। প্রশ্ন করলাম, 'বালিকা, কি নাম তোমার?'

'আপনার এই ক্রীতদাসী নূর বাঈ নামে পরিচিতা। ক্রীতদাসী কি মহান বাদশাহকে এক পাত্র সুরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে?' সে আমার পানে তাকালো। আল্লাহ তাকে কি সুন্দর চোখ দিয়েছেন! আয়ত কালো এবং ইরানী হরিণীর চাইতে টানা সে চোখ এবং চোখ দিয়েই সে যেন কথা বলছে। একটি রৌপ্য নির্মিত সুরা পাত্র হতে সে সোনার পানপাত্রে সুরা ঢেলে দুই হাত দিয়ে আমার সামনে এনে ধরলো। আমি পাত্রটি নিলাম। আমাদের প্রথা অনুযায়ী তা একটি টেবিলের উপর রাখলাম। অচেনা কারো দেয়া খাবার, পানি অথবা সুরা আমি গ্রহণ করি না। সুরা পান করার জন্য নূর বাঈ আমাকে পীড়াপীড়ি করলো না। সে মাথাটা ইষৎ তুলে তর্জনী গালে ঠেকিয়ে জানতে চাইলো, 'আমি কি মহামহিমকে সন্তুষ্ট করার মত?'

আমি উত্তর দিলাম, 'তোমার অনিন্দ্য সুন্দর মুখ আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। অন্য সব সম্পর্কে আমার এখনো কোন ধারণা হয়নি।'

আমি কি বুঝাতে চেয়েছি সে তা অনুমান করতে পেরেছে। আমার পা দু'খানি একটি টুলের উপর রেখে সে উঠে দাঁড়ালো। পাজামার ফিতা খুলে ফেলায় পাজামা পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো। এরপর শেমিজ খুলে সেটিকে গালিচার উপর নিক্ষেপ করলো। লজ্জার আতিশয্যে দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। এর ফলে তার পুরো দেহ আমার দৃষ্টির সামনে। এর আগে আমি তার মত মেয়ে আর দেখিনি। তার পায়ের রং দারুচিনির মত। তার স্তন দু'টি ঔদ্ধত্যে বিস্ফোরণোন্মুখ। ক'টিদেশ এতো সরু যে, আমি হাত দিয়ে তা ধরতে পারি। সে ছোটখাট হলেও তার নিতম্ব হিরাতের তরমুজের মত সুবিশাল।

তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমার বয়স কত নূর বাঈ? এর আগে কি কোন পুরুষ মানুষের সাথে মিলিত হয়েছ?'

সে আহত হয়েছে এমন ভান করলো, 'অন্যের দ্বারা কলঙ্কিত কাউকে মহান বাদশাহর কাছে অর্পণ করার ধৃষ্টতা কে দেখাতে পারে? আপনাকে তৃপ্তি দেয়ার জন্যই আমাকে গড়ে তোলা হয়েছে। কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং মহান বাদশাহ'র দ্বারা সম্মানিতা হবার পরও আমার দেহ কেউ স্পর্শ করবে না।'

হয়তো কয়েক বছর আগে সে ছিল ক্ষুদ্র বালিকা। কিন্তু তাকে শিখানো হয়েছে মানুষকে অবসাদগ্রস্ত করার মত বাকচারিতায়। আমি তাকে কাছে ডাকলাম। আমার হাত দিয়ে তার মুখ এবং শরীরের অন্যান্য স্থান স্পর্শ করলাম। তার শরীর মসৃন ও সুদৃঢ়। যেন ঘষে ঘষে মসৃন করা আখরোট কাঠ। তার কোন অঙ্গে, বগল কিংবা গোপন স্থানে লোমের লেশমাত্র নেই। সে দেহে সুগন্ধি তেল মেখেছে। আমার নাকে জেসমিনের গন্ধ আসছে। আমার শয়ন কক্ষে এমন উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণীকে পাঠানোর পিছনে মোগল সম্রাটের কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে আমার সন্দেহ হলো।

পঞ্চাশটি গ্রীষ্ম কঠোর পরিশ্রম ও টানাপোড়েনে কাটালে নারীর জন্য পুরুষের ক্ষুধা কমে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি মোগলদের কাছে এটা প্রমাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ইরানীরা যেমন শক্তিশালী, হারেমেও তারা ততটা বীর্যবান ও পারঙ্গম। পালঙ্কের উপর বিছানো ছিল তুষার ধবল একটি চাদর। আমাকে পুরোপুরি উত্তেজিত করে তোলার কামকলা প্রয়োগ করার জন্য নূর বাঈকে নির্দেশ দিলাম। সে যথার্থই পরিপুষ্ট।

তার সেবার জন্য যা উপস্থাপন করা হলো তা দেখে নূর বাঈ-এর শিশু সুলভ ঔৎসুক্যের দৃষ্টি আতংকে পর্যবসিত হলো। আমি তার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলাম। বেদনায় সে কাঁদলো এবং বিছানার চাদরে তার কুমারীত্ব ও আমার পৌরুষের পর্যাপ্ত আলামত রয়ে গেল।

আমি পরিতৃপ্তি লাভের পর নূর বাঈ-এর নগ্ন দেহকে মূল্যবান পাথর খচিত সোনার অলংকার দ্বারা মুড়ে দিলাম। তাকে বললাম, আমার শয্যায় নেয়া নারীর মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী। চোখের পানি মুছে সে হাসলো। কিন্তু যখন তাকে আমার হারেমে নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম, সে আবার কাঁদতে আরম্ভ করলো, 'হে মহান বাদশাহ, আপনি যদি দিল্লীতে থাকেন তাহলে এই ক্রীতদাসী শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপনার সেবায় নিবেদিত থাকবে। কিন্তু মহারাজ যদি আমাকে দিল্লী থেকে নিয়ে যেতে চান তাহলে আমি বিষপানে আত্মহত্যা করবো।'

আমি শুনেছিলাম দিল্লীবাসীরা তাদের শহরকে খুব ভালোবাসে, ঠিক মৌমাছি যেমন ফুল ভালোবাসে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, এক রাজ নর্তকীর কন্যা ইরানে আমার রাজ প্রাসাদে বাস করার চাইতে দিল্লীর বেশ্যালয়ে থাকাই পছন্দ করবে।

যাহোক, এ ব্যাপারে নূর বাঈ-এর সাথে আর আলোচনা করাটা পছন্দ করলাম না, তাকে অসুখীও করলাম না। বরং তার প্রিয় নগরীতে অবস্থানকালে আমার কাছে থাকার জন্য তাকে বললাম। এতে সম্ভবত তার মনের গতির পরিবর্তন হবে অথবা আমার।

পরদিন ছিল শুক্রবার। আমি নগরীর সকল মসজিদে আমার নামে খুতবা পাঠ করার নির্দেশ দিলাম। এতে একটি বিষয় সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হবে যে, আমার দিল্লী আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একটি ইসলামী ভূখন্ডে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা।

বিকেলে সাদাত খানকে তলব করলাম। সে তার পুত্র এবং তার অনুচরদের সহ অশ্বারোহী শোভাযাত্রা নিয়ে এলো। কারণ সে আসফ জাহ নিজাম-উল-মুলকের সাথে আমাকে হিন্দুস্থানে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং লাল কিল্লার তোষাখানায় বিপুল সম্পদের কথা বলেছিল। আমার সাথে অধিকতর পরিচয়ের একটা ভাব তার মধ্যে এবং নিজের গুরুত্ব দিয়ে তা তার সঙ্গীদের বুঝাতে চাইছিল। আমার মনে হলো, তার এই ভ্রান্তি দূর করে দেয়া উচিত। ঠিক আগের রাতে তার আচরণ সম্পর্কে তাকে কিছুই বললাম না। কিন্তু তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আমি দিল্লীতে এসেছি শুধু একটি আশ্বাসে যে, আমরা যদি বিধর্মী মারাঠাদের হাত থেকে মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারি তাহলে মোগলরা আমাদের অভিযানের ব্যয় নির্বাহ করবে। তাকে বললাম যে, আমাদের দিল্লী পৌছার পর তার আচরণ আমাকে এই ধারণাই দিয়েছে যে, সে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতে জানে না।

হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) যথার্থই বলেছেন, "অনেক সময় একটি শব্দ তরবারির মতই বিদ্ধ হয় এবং জিহ্বার ধার বর্শার চাইতেও তীক্ষ্ণ হয়।" অতএব আমি ক্রোধের জিহ্বায় তাকে ভৎর্সনা করলাম। কঠোর ভাষায় বললাম, 'সাদাত খান, ইসলামের রক্ষাকারী বাহিনী যে ত্যাগ করেছে সেই ক্ষতিপূরণ এখনো দেয়া হয়নি। প্রতিশ্রুত চার কোটি রুপী তো দূরের কথা, একটি কানাকড়ি পর্যন্ত না। এই অংকের একটি বড় অংশ যদি কাল সূর্যাস্তের পূর্বে পরিশোধ না করা হয়, তাহলে আমার অসন্তোষ সকলে জানতে পারবে।"

আমার এই প্রতিবাদ সাদাত খানের মস্তিষ্কের আবরণ ভেদ করতে ব্যর্থ হলো। সে বললো, 'বিশ্ব বিজয়ীর কাছে অর্থের কি মূল্য!' অনুমোদনের আশায় সঙ্গীদের পানে ফিরলো, 'অর্থে কি আসে যায়। নাদির শাহের জন্য আমাদের জীবন বিলিয়ে দেব।'

তার সঙ্গীরা এই ধৃষ্টতার প্রশংসায় গুঞ্জন শুরু করলো। আমার ক্রোধ জাগ্রত হলো। নির্দেশ দিলাম, 'সাদাত খান, এখানে এসো।' তার মুখমন্ডল থেকে হাস্য কৌতুকের আভা দূর হয়ে গেছে। আমার নিকটবর্তী হতে তার হাঁটু কাঁপছে। আমার উদ্দেশ্যে কুর্ণিশ করতেই আমি তার বাম কান আঁকড়ে ধরলাম এবং টেনে তুলে তাকে সোজা করলাম, 'আমি এ ধরনের চালাকি পছন্দ করি না। যারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তেমন লোকদের পছন্দ করি না।'

সাদাত খানের মুখ প্রথমে লাল, পরে হলুদ বর্ণ ধারণ করলো। সে তোতলাতে শুরু করেছে। তার কানের উপর মুষ্টাঘাত ও মুখে চপেটাঘাত করলাম। একটু পিছে সরে যেতে তার পেটে কষে লাথি লাগালাম। গর্জে উঠে বললাম, 'আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও। আমার বাহিনীর যা প্রাপ্য তা আগামীকালের মধ্যে বুঝে না পেলে চাঁদনী চকে কোতোয়ালীর সামনে চাবকে তোমার ছাল তুলে ফেলবো।'

সাদাত খানকে টেনে আমার সম্মুখ থেকে অপসারণ করা হলো। তার জন্যে শাস্তিটা অধিক

হয়েছিল বলে প্রমাণিত হলো। সেই রাতেই সাদাত খান নিজের বুকে ছুরি বিদ্ধ করে তার করুণ অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটালো।

দিল্লীর অধিবাসীরা অকৃতজ্ঞ এবং ভীরু। আমরা যে পর্বতমালা, নদী, মরুভূমির মধ্য দিয়ে শত শত মাইল অতিক্রম করে তাদেরকে বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এসেছি, আমাদের এই কষ্টের জন্য ধন্যবাদ দেয়ার পরিবর্তে তারা বরং এ রকম কটাক্ষ করার ধৃষ্টতা দেখালো যে, ইসলামের জন্য ভালোবাসার কারণে নয় সোনার লোভ আমাদেরকে তাদের দেশে এনেছে।

আমি জানতে পারলাম যে, শাহী মসজিদের ইমাম যখন আমার নামে খুতবা পাঠ করছিল তখন দেশীয়রা গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। সেনাপতিরা জানালো যে, কাজিলবাস দেহরক্ষীদের উপর রাস্তায় থুথু ছিটানো হয়েছে। বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলারা তাদের মাথায় আবর্জনা নিক্ষেপ করেছে। ইরানী সৈনিকদের নিকট হতে দোকানীরা জিনিসপত্রের বেশী দাম হাঁকছে। আমরা যে দিল্লীবাসীদের নিরাপত্তার জন্যেই আমাদের অধিকাংশ সৈন্য শহরের বাইরে রেখে এসেছি, তারা তার প্রশংসা করলো না। তারা দেখেছিল, মাত্র কয়েকশ' ইরানী প্রাচীর বেষ্টিত শাহজাহানাবাদে রয়েছে, ফলে তারা তাদের ভীরুতা মাখা চোখ তুলে তাকাতে দ্বিধা করেনি। এভাবেই তারা তাদের নগরীতে মৃত্যু দূত আজরাইলকে আমন্ত্রণ করেছিল।

১৭৩৯ সালের ১০ই মার্চ শনিবার সূর্য উদিত হলো। এটি ছিল পবিত্র ঈদুল আজহার দিন। যে পবিত্র দিনে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ)কে আল্লাহর কাছে কোরবাণী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার দেহরক্ষীরা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কয়েকটি ষাড় ও বকনা গাই ধরে এনে কোরবানী দিলো। হিন্দুরা গরুকে পবিত্র বিবেচনা করে। আমাদের গরু কোরবাণীকে কেন্দ্র করে তারা ক্রুদ্ধ হলো। আমার লোকদের কাছে তারা চাল বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানালো। আমি তাদেরকে চালের বদলে মুসলিম দোকানীদের নিকট হতে আটা ক্রয়ের নির্দেশ দিলাম। এ সময়ই দিল্লীর মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমার গোচরে আনা হলো। তারা গমের আটার দাম তিন গুণ বাড়িয়ে দিল। আমি আর একবার আমার ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করলাম। হযরত আলী মোর্তজা (রাঃ) কি বলেননি যে, 'ক্রোধ হচ্ছে উন্মত্ততার প্রজাতি।' আমি দশ সের গমের মূল্য এক রজত মুদ্রা নির্ধারণ করে শস্যের গোলা খুলে দেয়ার নির্দেশ দিলাম।

বিকেলে খবর পেলাম আমাদের কিছু সৈনিক পাহাড়গঞ্জ নামক স্থানে এক শস্য বাজারে গিয়েছিল কেনাকাটা করতে, আজমিরী গেটের পশ্চিমে তাদের উপর বন্দুকের গুলী ছোড়া হয়েছে এবং তারা নিহত। গুজবে কান দেয়া আমার অভ্যাস নয়। ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি দেহরক্ষীদের সাতজনকে প্রেরণ করলাম। সাতজনের মধ্যে মাত্র তিনজন ফিরে আসতে সক্ষম হলো। এই তিনজনই ঘটনার জীবন্ত সাক্ষী। তারা বললো, উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টির নেতা হচ্ছে দুই পাঠান- নিয়াজ খান ও শেহ সওয়ার খান।

উচ্ছৃংখল জনতা আমাদের বন্দুকধারীদের ঘেরাও করে তাদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আমাকে জানানো হলো যে, আমাদের একটি বড় সৈন্যদলকে হত্যা করা হয়েছে এবং নিয়াজ খানের নেতৃত্বে সশস্ত্র জনতা লাল কিল্লার দিকে ধেয়ে আসছে তাদের অপবিত্র হাত আমার উপর তোলার জন্য। আমরা লাহোরী গেট পর্যন্ত আমাদের অবস্থানকে এগিয়ে নিলাম। সেখান থেকে উর্দু বাজার ও চাঁদনী চক স্পষ্ট দেখা যায়। আমার কানে বন্দুকের গুলীর শব্দ ভেসে এলো। তাকিয়ে দেখলাম সামনে বর্শা, তরবারি ও মশালের সমুদ্র জুমা মসজিদ থেকে লাল কিল্লার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং জনতার বন্যায় ইতিমধ্যে চাঁদনী চক ও উর্দু বাজার প্লাবিত।

উর্দু বাজারে প্রহরায় মোতায়েন আমার দেহরক্ষীরা বীরত্বের সাথে এই উন্মত্ততাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য লড়ছিল। আমি তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালাম, যেন তারা উর্দু বাজার ছেড়ে পশ্চাদপসারণ করে লাল কিল্লার পূর্ব প্রাচীর এবং নদীর মধ্যবর্তী বালুচরে ফিরে আসে। লাহোরী ও দিল্লী গেটের উপর আমাদের কামান বসানো ছিল, যার মুখ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে। আমি উচ্ছৃংখল জনতার উপর গোলাবর্ষণের নির্দেশ দিলাম। শালিমারে অবস্থানরত বাহিনীর সেনাপতিদের কাছে জরুরী বার্তা পাঠালাম অবিলম্বে সৈন্য পাঠিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধির জন্য, যাতে তারা কাল সকালের মধ্যে নগরীতে উপনীত হয়।

উন্মত্ত জনতার চীৎকার ও কামানের গর্জনে রাতটা হয়ে উঠেছিল ভয়ংকর। আমার মনের

শান্তি বিঘ্নিত হলো; বিশেষ করে এ কারণে যে, মোহাম্মদ শাহ তার প্রজাদের এহেন আচরণের কারণে ক্ষমা প্রার্থনার কোন উদ্যোগ পর্যন্ত নিলেন না। একটি খবর পেলাম, বাজারে খোলামেলা বলাবলি হচ্ছে যে, নূর বাঈ আমাকে বিষ প্রয়োগ করেছে এবং আমি এখন মৃত্যু শয্যায়। যখন মোগল সম্রাট আমার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন, আমি তার মুখ দেখেই বুঝে নিলাম যে, তিনি স্বয়ং দেখতে এসেছেন, আমার মৃত্যু ঘটেছে কিনা। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমার হৃদয়ে এখন তিক্ততার যে বন্যা, তা সুমিষ্ট করার জন্যে আগের সন্ধ্যার স্মৃতিগুলো মনের মধ্যে প্রবেশ করতে দিলাম না। আমি দ্রুত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে নূর বাঈকে আদেশ করলাম আমার কাছে পাঠানো সুরাপাত্রটি আনতে।

ঠিক পূর্ব রাতের মতোই নূর বাঈ নিতম্ব দুলিয়ে এবং মুচকি হেসে কাছে এলো। তার চোখ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কিন্তু আমার চোখ মুখে ক্রোধের নিশানা দেখে সে ভীত হলো। আমার পা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার ক্রীতদাসী কি কোন অন্যায় কাজের জন্য অপরাধী?'

সে যদি মিথ্যুক হতো তাহলে ষোল বছরের নীচে পৃথিবীর সেরা মিথ্যাবাদী হতে পারতো। প্রশ্ন করলাম, 'এই সুরা পাত্র কে তোমাকে দিয়েছে?' তাকে নিরপরাধ ও হতবুদ্ধি মনে হলো। 'আমাকে কেউ দেয়নি মহামহিম। এটা এখানেই ছিল। আমি ভেবেছিলাম, এটা শিরাজ থেকে আনা মহারাজের প্রিয় সুরা। এই সুরা কি আপনার কোন অসুবিধা করেছে?' আমি সুরা পাত্র তুলে একটি পানপাত্র পূর্ণ করে নূর বাঈ-এর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। 'পান কর'! তাকে আদেশ দিলাম। তার দৃষ্টিতে আতংক নেমে এসেছে। আমার হাত থেকে সে পান পাত্রটি নিলো, 'আমার ঠোঁট কখনো সুরা স্পর্শ করেনি।'

'পান কর। তা না হলে এই সুরা গিলতে তোমাকে বাধ্য করবো।' নূর বাঈ পানপাত্রে একটি আঙ্গুল ডুবিয়ে আঙ্গুলটি জিহ্বায় স্পর্শ করলো। বিস্বাদে সে মুখ বিকৃত করলো। এরপর সে এক হাতের আঙ্গুল দিয়ে নাক বন্ধ করে আরেক হাতে পানপাত্র মুখের কাছে আনলো এবং খানিকটা মুখে ঢালতেই প্রবলভাবে কাশতে শুরু করলো। তার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করলো। সে দুই হাতে গলা চেপে ধরলো যেন তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। অশ্রু উদগত কণ্ঠে জানতে চাইলো, 'মহামহিম, আপনি কি আনন্দের জন্য বিষ পান করেন?'

আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, পূর্ব রাত্রে আমার শয়নকক্ষে যে সুরা রেখে যাওয়া হয়েছিল, এটাও সে রকম কিনা। কিন্তু আমি বা নূর বাঈ এই সুরা পান করার পর যেহেতু খুব খারাপ প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হইনি, ফলে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, এতে বিষ প্রয়োগ করা হয়নি। আমি নূর বাঈকে আরো কাছে আসতে বললাম। আমার হাত দিয়ে তার চোখের পানি মুছে তার অশ্রু সজল চোখের দিকে তাকালাম। 'নূর বাঈ, কেউ যদি আমার সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলে বা আমাকে কিছু করতে বলে, তাহলে তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার উপর এবং তোমার ওজনের সমপরিমাণ সোনা দিয়ে তোমাকে আমি মুড়ে দেব। সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে আমার পদচুম্বন করলো। তার গলায় রুবির একটি কণ্ঠহার পরিয়ে তাকে বিদায় দিলাম। কিছুদিনের জন্য তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একজন গুপ্তচর নিয়োগ করলাম। রোববার ভোরে ঘুম ভাঙ্গলো অন্যান্য দিনের চাইতে আগে। আওরঙ্গজেবের মোতি মসজিদে গিয়ে ফজর নামাজ আদায় করলাম এবং হালকা নাশতা খেলাম। আমার বাহিনীর সেনাপতিরা নগরীতে এসে পৌঁছেছে এবং আমার নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে। আমি তাদেরকে লাহোরী গেটের সামনে অবস্থান নিতে বললাম।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে উচ্ছৃংখল জনতা আগের দিনের মতোই রাস্তায় জড়ো হলো। আমি লক্ষ্য করলাম জনতার উপর দিয়ে প্রবাহিত মৃদু বাতাস ঝড়ো হাওয়ার রূপ নিয়ে সমুদ্রকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। ভেবেছিলাম আমার উপস্থিতি তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনবে।

সূর্য যখন লাল কিল্লার প্রাচীরের উপর উঠলো আমি দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চাঁদনী চকে গেলাম। সেখানে যা দেখলাম তাতে আমার চোখে পানি এলো। আমার অনেক বিশ্বস্ত সহকর্মী মৃত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে আছে। তাদের দেহের উপর চলেছে বিভৎস অত্যাচার। দু'মুখো জঘন্য লোকগুলো, যারা দু'দিন আগে ফুল ছিটিয়ে এবং মূল্যবান ধাতু ও পাথর দিয়ে আমাদের

অভ্যর্থনা জানিয়েছে, এখন তারাই আমাদের গালি দিচ্ছে। ফুল কি মন্ডির ফুল বিক্রেতারা আমাদের উপর ছিটিয়েছিল গোলাপের পাপড়ি, এখন তারা আমাদের উপর ইট পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছে। রৌশন-উদ-দৌলাহ'র মসজিদে গিয়ে আমি ঘোড়ার পিঠ হতে অবতরণ করে বারান্দায় আসন গ্রহণ করলাম।

আশেপাশের বাড়ীর বারান্দা থেকে আমার উপর ময়লা আবর্জনা ও পাথর নিক্ষেপ শুরু হলো। কে একজন বন্দুকের গুলীও ছুড়লো। গুলী আমার পাশ ঘেঁষে আমার ছত্রধরকে আঘাত করলো। হতভাগ্য লোকটি আমার উপর পতিত হলো। তার রক্তে আমার অন্তর্বাস পর্যন্ত ভিজে গেল। আমার হাতের উপরই তার মৃত্যু হলো। যন্ত্রণায় সে কেঁদেছিল, 'ইয়া আল্লাহ'।

আমার বিশ্বস্ত ভৃত্যকে মেঝের উপর শুইয়ে দিলাম। আমার সহনশীলতা ও ধৈর্যের পাত্র কানায় কানায় উপচে উঠেছে। আমি খাপ থেকে তরবারি বের করে চীৎকার করলাম, 'এই তরবারি যতক্ষণ খাপের বাইরে থাকবে এই বিশ্বাসঘাতক নগরীর প্রতিটি বাসিন্দাকে জীবন দিতে হবে খেসারত হিসেবে।' নির্দেশ দিলাম 'কাউকে ছাড়বে না।'

আমি হিন্দুস্থানের লোদের চরিত্রের আরো একটি দিক লক্ষ্য করলাম। তারা আমাদেরকে তাদের সাহায্যের জন্য আসতে আমন্ত্রণ জানানোর ব্যাপারে ধূর্ত ছিল। তাদের সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রতিবাদ জানানোর ক্ষেত্রে তারা দু'মুখো এবং আমাদের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিল যে, কে বিজয় লাভ করতে যাচ্ছে। আমি দেখেছি যুদ্ধক্ষেত্রে তারা কত শান্ত এবং পরাজয়ের মুহূর্তে কেমন দুর্দশাগ্রস্তের ভান করে। তোষামোদির সুমিষ্ট প্রলেপের আড়ালে তারা তাদের কটাক্ষকে গোপন করেছিল। অলংকারপূর্ণ ভাষণে আমি বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। আরো দেখলাম, তারা সংখ্যায় বিপুল হলে কতটা উন্মত্ত হতে পারে। আর এখনতো তাদের উপর মৃত্যুদূত ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন তারা ভেড়ার পাল। আমার সৈন্যরা ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের উপর হত্যালীলা চালালো।

লাল কিল্লায় ফিরে যাবার উদ্দেশ্যে রওশন-উদ-দৌলাহ মসজিদ ত্যাগ করলাম। যখন দারিবা দরওয়াজা অতিক্রম করছিলাম তখন রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিধর্মীদের দ্বারা অধ্যুষিত প্রতিটি বাড়ী মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে নির্দেশ দিলাম। আমার সৈনিকেরা দারিবার প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুকে হত্যা করলো। বাজারে আগুন লাগিয়ে দিল। জু'মা মসজিদ ও দিল্লী গেটের চারপাশের বাজার শুধু রক্ষা পেলো। কারণ নবাব সরবুলন্দ খান আমার সমীপে এসে আর্জি পেশ করেছিলেন যে, এসব এলাকার কোন লোক উচ্ছৃংখলতায় যোগ দিতে যায়নি।

বিকেলে মোহাম্মদ শাহ আমার সাক্ষাত লাভের জন্য সনির্বন্ধ অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আমার ক্রোধের আগুন ইতিমধ্যে রক্তের নদীতে সিক্ত হয়েছে। আমি তাকে আমার পদচুম্বন করার অনুমতি দিলাম। সম্রাট কথার মালা গাঁথার কৌশল ভালোই জানে।

নাকি সুরে বললো, "আপনার প্রতিশোধের তরবারি থেকে একটি প্রাণও রেহাই পায়নি। মহান বাদশাহ কি এই ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। মৃতদের মাঝে জীবন সঞ্চার করে কি আবার হত্যা করবেন?'

আমার ধারণা নেই, কত লোককে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই ছয়টি ঘন্টায় আমার অমিতবিক্রম সৈনিকেরা হত্যা ছাড়া আর কিছুই করেনি। আমি তাদের তরবারি খাপে ভরতে নির্দেশ দেয়ায় তারা তরবারি নামিয়েছিল। তখন তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম দামামা বাজিয়ে আমার সন্তুষ্টির কথা বিজ্ঞাপিত করতে।

ধ্বংসযজ্ঞের ফলাফল দেখার জন্য আমি চোখ খুলতেও রাজি নই। রাস্তা হতে মৃতদেহ ও রক্ত অপসারিত করার নির্দেশ দিলাম। এক অদ্ভুত যোগসূত্র যে, দিনটি ছিল বিধর্মীদের হোলি উৎসব উদযাপনের। বসন্তের আগমনে তারা রক্তের রং ছিটিয়ে ফূর্তি করে। বিধর্মীরা তাদের মৃতদেহ ভস্মীভূত করে নরকে পাঠিয়ে দিল। মুসলমানরা তাদের লাশ নদী তীরে কবরস্থ করলো। যে সব মৃতদেহ দাহ বা কবরস্থ করার মত কেউ ছিল না তারা কাক, কুকুর, শৃগালের আহার্যে পরিণত হলো। এসব প্রাণী নগরীতে প্রচুর।

যদিও আমি অভিশপ্ত এই নগরীর উপর ক্ষমাশীলতার মধুর বাতাস প্রবাহের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু নগরবাসীকে এটা বিশ্বাস করতে দিতে চাইনি যে তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত

হয়ে গেছে। আমার লোকদেরকে ওমরাহ ও ধনী ব্যবসায়ীদের বাড়ীতে প্রবেশ করে যা কিছু চোখে পড়ে সব লুটে নেয়ার জন্য প্রেরণ করলাম।

যারা প্রতিবাদ করেছে তাদেরকে আমার সামনে আনা হলো। নিকটজনের সামনে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হলো। তাদের ঘরের মেঝে খনন এবং নারীদের উলঙ্গ করা হলো। তাদের অনেকে সতীত্ব বিনাশের প্রাবল্য সহ্য করতে না পেরে নিজ হাতে করুণ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো। নদীর পানি যেমন সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনি সোনা, রূপা ও মূল্যবান পাথর আমার কোষাগারে জড়ো হতে লাগলো। এই শুভ সংবাদ ইরানে প্রেরণের সাথে একটি ঘোষণাও পাঠালাম যে, আগামী তিন বছর ইরানের কোন প্রজাকে কোন প্রকার কর দিতে হবে না। হযরত আলী মোর্তজা (রা) যথার্থই বলেছেন, "উদারতার উত্তম অংশ হচ্ছে দ্রুত দান করা।" কিন্তু এতো সব প্রাপ্তির ফলে আমার আবেগ লুকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। আমি একাকী থাকতে চাই বলে দেহরক্ষীকে বিদায় করে দিলাম। দীর্ঘ সময় ধরে নিজের সাথেই পরামর্শ করলাম। আমার স্বপ্নের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমি চারটি রাজ্য জয় করেছি। ইসলামের বর্শা দিয়ে বিধর্মীদের ভূখন্ডের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত এবং হাজার হাজার মূর্তি পূজারীকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছি। এভাবেই আমি মহান আল্লাহতায়ালা ও তার রসূল (সঃ)-এর সেবা করেছি।

আমরা প্রভূত সম্পদ সংগ্রহ এবং লক্ষ লক্ষ ইরানী বাসগৃহে সমৃদ্ধির প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছি। আমাদের তরবারি যে ফসল ঘরে তুলেছে তা আমাদের পুত্র এবং তাদের পুত্রেরা সাত পুরুষ ধরে খেলেও শেষ করতে পারবে না। আমাদের নামে এশিয়ার লোকেরা সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়াবে। আমাদের নিশান যেখানে নিয়ে যেতে চাই সকল মানুষ তা অনুসরণ করবে আগ্রহ ভরে। আমাদের হারেমে সুন্দরী সব নারী-ককেশীয়, তুর্কী, ইরানী, আরব, আফগান ও হিন্দুস্থানী। আমাদের ঔরস জন্ম দেবে শক্তিমান পুত্র এবং সুন্দরী কন্যার। একজন পুরুষের যা থাকা প্রয়োজন আমাদের তা আছে। তবুও একটি অদ্ভুত বিষন্নতা আমার চিত্ত জুড়ে আছে।

নূর বাঈ আমার মন থেকে অপসৃত হয়নি। আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে, সে আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিংবা নিজেকে কারো হীন ষড়যন্ত্রের ক্রীড়ণক হিসেবে ব্যবহৃত হতে দিয়েছে। এমনকি আমি এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে পারিনি যে, নূর বাঈ-এর নাম জড়িত করে বিষাক্ত গুজবে আমার কান পরিপূর্ণ। হাততালি দিয়ে দেহরক্ষী ডেকে নূর বাঈকে আমার সামনে হাজির করার আদেশ দিলাম।

নূর বাঈ তার চোখের পানিতে আমার পা ধুয়ে দিল। গালিচার উপর শুয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বহুবার প্রশ্ন করলো, কেন তাকে সন্দেহ করেছিলাম। তা বলতে আমার কোন কারণ ছিল না, অতএব আমি উত্তর দিলাম না। আমি শুধু তার শায়িত দেহ ভঙ্গিমা দেখছিলাম- কোমরটা বাঁকানো তীরের মত হয়ে আছে, নিতম্ব কাংখিত মানুষকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে যেন উন্মুখ। তার সম্পর্কে আমার আত্ম প্রশংসায় আমার যৌনাকাংখা জাগ্রত হলো না। তাছাড়া ইতিমধ্যে আমি জেনে গেছি যে, যদিও তার দেহ আমার নিয়ন্ত্রণে, আমি তার হৃদয়ের অধীশ্বর হতে পারিনি।

তাকে যে সন্দেহ করেছিলাম, তার প্রতিবিধান করার জন্য তার কোমরের উপর সোনার দু'টি বালা রেখে তাকে নিষ্ক্রান্ত হতে বললাম। কিন্তু সে যেতে অস্বীকার করলো। আমার হাঁটুর মাঝে মাথা রেখে সে বসলো। আমার মুখ পানে তাকিয়ে বললো, 'মহান বাদশাহ কি এই পৃথিবীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছেন।' আমার মনের অবস্থা সে যথার্থই উপলব্ধি করেছে। 'এতোগুলো মানুষকে হত্যা করার কারণেই এমন হয়েছে। হত্যাকান্ড কোনো ভালো কাজ নয়।'

তার সাহস আমাকে হতবাক করলো। আমি তার মাথায় হাত রাখলাম এবং সহসা নিজের বিরুদ্ধেই মনটা পরিবর্তিত হলো। দুই হাতে আমার মুখ ঢাকলাম, উদগত অশ্রু গোপন করার জন্য। কিন্তু বুক থেকে বেরিয়ে আসা কান্নাকে ধরে রাখতে পারলাম না। নূর বাঈ আরো সাহসী হয়ে উঠলো এবং আমার অনুমতির অপেক্ষা না করে ভালোভাবে আমার কোলের উপর বসলো। অপুরুষাচিত আবেগের দুর্বলতা কেটে গেলো। নূর বাঈকে ভদ্রতার সাথে আমার মধ্যস্থান থেকে সরিয়ে আমাকে একাকী ছেড়ে যাওয়ার জন্য বললাম। যাওয়ার পূর্বে সে আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলো যে, আমি যেন চিকিৎসার জন্য বাল্লীমরণের হাকীম আলভী খানকে তলব করি। 'তিনি দেহে জোঁক লাগিয়ে আপনার ক্রুদ্ধ রক্ত অপসারণ করবেন।'

পরদিন হাকীম আলভী খানকে ডেকে পাঠালাম। যীশু খৃষ্টের নিরাময় যোগ্যতা তার মধ্যে রয়েছে বলে আমাকে বলা হয়েছিল। বয়সের ভারে তিনি ন্যুব্জ। মুখে দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি। লাঠির সাহায্যে তিনি হাঁটেন। বৃদ্ধ লোকেরা যখন জানতে পারে যে, তারা আর বেশীদিন বাঁচবে না, তখন এই বৃদ্ধের মতই ধৃষ্ট হয়ে উঠে। তিনি আমাকে তিরস্কার করতে শুরু করলেন, "আপনি যদি মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে না শিখেন তাহলে আপনার মেজাজই আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।"

আমি স্বীকার করলাম যে, আমি দ্রুত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। হাকীম বললেন, 'শুধু যে দ্রুত মেজাজ খারাপ হয় তাই নয়, বিপদজনকভাবেই খারাপ হয়। ক্রোধ হচ্ছে উন্মত্ততার প্রজাতি। ক্রোধ যদি দমন করা না যায়, তাহলে এটা নিরাময়ের অযোগ্য হয়ে পড়ে।' তার কথাগুলো তার ঔষধের চাইতেও বেশী তিক্ত। কিন্তু তোষামোদকারী ও চাটুকারদের কথার পর এই লোকটির স্পষ্ট ভাষণ বীণার বাজনার মতই সুরেলা মনে হলো। তার কণ্ঠেই নগরীতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা শুনতে পেলাম। তার কাছে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম যে, দিল্লীর লোকরাই প্রথমে আমার সৈন্যদের উপর হাত তুলেছিল এবং আমি সৈন্যদেরকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্বাধীনতা দিয়েছিলাম মাত্র।

হাকীম আলভী খান বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা...নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ! নিরীহ মানুষ হত্যা! আপনার মুলুকে কি এমন ধারার ন্যায়বিচারই বিরাজ করছে?'

আমি তার অপরাধ বিবেচনা না করে বলতে দিলাম। এরপর হাকীম আলভী খানের কাছে আরো শোনার জন্য তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। শুধু চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র নিতে নয়, অন্য প্রসঙ্গে শোনার জন্য। তিনি আমার দুর্বলতাগুলোকে নির্দেশ করার সাথে সাথে মুক্তাভস্ম ও ইয়েমেনের মধু মিশ্রিত কামোদ্দীপক ঔষধ সেবন করতে দিলেন। যদিও আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, তবুও ভাবলাম আমার হারেমের তেত্রিশ জন নারী এবং বর্তমানে উদ্ভিন্না যৌবনা তরুণী নূর বাঈ আমার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

আমি বুঝতে পারি না, যে হাকীম আলভী খানের উপদেশ অথবা নূর বাঈ-এর সঙ্গ আমার মনকে পরিবর্তিত করলো। পনের দিন ধরে আমি কোন মৃত্যুদন্ডাদেশ দিলাম না। আমার সহযোগীদের সাথে হাসি ঠাট্টা ও কৌতুক করে কাটাতে লাগলাম। মোগল কোষাগারের অধ্যক্ষ কাজমারুদ্দিন খানকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা সত্য কি না যে, তার হারেমে ৮৫০ জন নারী রয়েছে। সে যখন স্বীকার করলো, আমি মন্তব্য করলাম, 'তোমার উচিত আরো ১৫০ জনকে জড়ো করা, তাহলে তুমি 'মিম বাশী' অর্থাৎ এক হাজারী সেনাপতি হতে পারো। উপস্থিত লোকদের চোখে পানি না আসা পর্যন্ত তারা হাসলো। চাটুকাররা বহুবার এই কথাটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললো।

আমি মোগল সম্রাটকে তার পারিষদবর্গের সাথে পরামর্শ করার জন্য বললাম এই আশায় যে, তার নিজের সাথে সমঝোতা করার মতো বোধোদয় হবে। কিন্তু মোহাম্মদ শাহের মাথার খুলি সাধারণ বুদ্ধির পরিবর্তে ধূর্ততায় ঠাসা। আমার ধৈর্যের সাথে প্রতারণার চেষ্টা করলো মোগল সম্রাট। আমার কাছে প্রস্তাব পেশ করলো, বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের দুই পরিবারকে যুক্ত করার জন্য। আমি এই বিশ্বাসে তাকে সম্মতি দিলাম যে, তিনি যৌতুকের আকারে তার দেনা পরিশোধ করার সুযোগ খুঁজছেন। ফলে আমার প্রিয় পুত্র শাহজাদা নসরুল্লা মির্জা সম্রাট আরওঙ্গজেবের পুত্র কাম বখশের পুত্র ইয়াজদান বখশের কন্যাকে বিয়ে করলো।

এ ধরনের অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থানের লোকদের মধ্যে নিয়ম হলো ঠাট্টা মস্করায় লিপ্ত হওয়া। মোগল হারেমের মেয়েরা, যারা তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অহংকারী, তারা আমার পুত্রকে তার পূর্ববর্তী সাত পুরুষ পর্যন্ত নাম বলতে বললো। শাহজাদা নসরুল্লা খান বাকহীন ও বিব্রত হয়ে পড়লো। সে জানতো, এই সেদিন আমাদের পার্থিব সম্পদ বলতে ছিল একটি উট এবং কিছু ভেড়া। দাঁতের পাটির মাঝে তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে রইলো। তার পক্ষে আমি বললাম, 'পুত্র, ওদেরকে বলো যে, তরবারির নাতি, তরবারির পুত্র নাদির শাহের পুত্র তুমি এবং এভাবে সাত পূর্বপুরুষে পরিবর্তে সত্তর পূর্বপুরুষ পর্যন্ত বলে দাও।' মহিলারা সাড়া দিলো, 'আশ, আশ, মারহাবা।'

এই ঘটনা দিল্লীবাসীর উপর ভয়ঙ্কর শাস্তিবিধানের পনের দিন পরের। মনে হলো তারা তা বিস্মৃত হয়ে বিয়ের উৎসবে যোগ দিতে আগ্রহী। লাল কিল্লার প্রাচীর তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে

সাজানো হলো। জাকজমকপূর্ণ আতশবাজির প্রদর্শনী হলো। সুরাপান ও বাঈজির নাচে দিল্লী মেতে উঠলো। ১৭৩৯ সালের ২৬শে মার্চ বিবাহ অনুষ্ঠানের পর আয়োজিত হলো দাওয়াতে ওয়ালিমা। মোগলরা আমাকে এবং আমার সেনাপতিদেরকে উপঢৌকন দিল। সম্রাট হয়তো ভেবেছিলেন যে তার বংশের এক কন্যাকে আমার পুত্রকে উপহার দিয়ে তার হিসাব চুকিয়ে ফেলবেন। আমি তাকে এমন শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ইরানীরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে যেমন পরাস্ত করেছে ছলচাতুরীতেও খুব সহজে পরাস্ত করতে পারবে।

আমি জানতে পারলাম যে, মোগল রাজপরিবারের কাছে দু'টি মূল্যবান বস্তু আছে। একটি হচ্ছে বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন 'তখত-ই-তাউস' যা সোনার তৈরী এবং তাতে বসানো আছে হীরকখন্ড, রুবি ও এমারেল্ড। এই সিংহাসনের মূল্য নয় কোটি রুপি। অন্যটি হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত হীরক 'কোহিনূর' বা আলোকমালার পর্বত। হীরক খন্ডটি নাকি কবুতরের ডিমের চেয়ে আকৃতিতে বড় এবং গোটা পৃথিবীর সাত দিনের আয়ের সমতুল্য এর দাম। প্রাসাদের গোপন স্থানে তল্লাশী চালানোর নির্দেশ দিলাম। কিন্তু সিংহাসন বা হীরক কোনটাই পাওয়া গেল না।

মোহাম্মদ শাহকে জেরা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, উনিশ বছর আগে সিংহাসনটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং তিনি কখনো কোহিনূর দেখেননি। সাদাত খান আমাকে বলেছিল যে, কোহিনূর মোহাম্মদ শাহের কাছেই আছে। তার পূর্বপুরুষদের মতো কোহিনূরকে হাতে ধারণ করার পর তিনি এটা লুকিয়ে রাখেন পাগড়ীর ভাঁজে। কোহিনূর লাভের আকাংখার সাথে প্রতারণা না করেই সেটি লাভ করার কৌশল আঁটলাম।

আমি একটি দরবার আহ্বান করলাম যেখানে সকল হিন্দুস্থানী ওমরাহ ও আমার সেনাপতিরা উপস্থিত হলো। প্রথমেই আমি মোহাম্মদ শাহের কাছে একজন বাদশাহ'র কর্তব্য ব্যাখ্যা করলাম। এরপর তাকে তার পূর্বপুরুষদের মর্মর আসনে বসার জন্য এগিয়ে নিয়ে গেলাম। এরপর এই অনুষ্ঠানের জন্য তৈরী একটি মুকুট আমার দেহরক্ষী নিয়ে এলো। আমি মোহাম্মদ শাহের মাথা হতে পাগড়ীটি উঠিয়ে তাতে মুকুট পরিয়ে দিলাম।

তাকে বললাম, 'আল্লাহ আপনাকে সমৃদ্ধি ও দীর্ঘজীবন দান করুন।' সভাসদরা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লো। আমি লক্ষ্য করলাম মোহাম্মদ শাহের দৃষ্টি পাগড়ীর উপর ঘুরাফেরা করছে। আমার ভাষণের উত্তরে মোহাম্মদ শাহ যে ভাষণ দিলেন তাতে মনে হলো আমার চাইতে তার পাগড়ীর উদ্দেশ্যেই এ ভাষণ। তিনি বললেন, আমাকে তিনি বড় ভাই বিবেচনা করেন। এর ফলে আমার কার্যসিদ্ধি আরো সহজ হলো। তিনি আসন গ্রহণ করলে আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং বললাম, আমি এখানে আসার পর জানতে পেরেছি যে, হিন্দুস্থানে পুরুষদের মধ্যে প্রথা হিসেবে প্রচলিত আছে যে, তারা একে অন্যের প্রতি বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করলে পাগড়ী বিনিময় করে। আমি তার মাথা থেকে মুকুটটি উঠিয়ে আমার পাগড়ী তার মাথায় পরিয়ে দিলাম। মাথা নীচু করে তার পাগড়ী আমার মাথায় পরিয়ে দেবার সুযোগ দিলাম। তার কথা মতোই কাজ হলো। নিজ হাতে সে আমাকে কোহিনূর প্রদান করলো। আমি তাকে আলিঙ্গন করে দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।

সত্যি সত্যিই পাগড়ীর ভাঁজে হীরকখন্ডটি ছিল। এর আকৃতি চিলের ডিমের মত এবং এতো উজ্জ্বল যেন হীরকটি বুকে ধারণ করে আছে সূর্যের হৃদয়। কোহিনূর যে আমার দখলে এসেছে তা গোপন না করে আমার ডান হাতে ধারণ করলাম।

এপ্রিলের শেষদিকে সূর্যের রশ্মি এতো প্রখর হলো যেন, জাহান্নামের অগ্নিশিখা। আমার শরীর ঘামাচিতে ভরে গেল। হাকীম আলভী খানের শরবত পান করা সত্ত্বেও খাদ্য ও নারীর জন্যে আমার ক্ষুধা প্রায় বিলুপ্ত হলো। বৃদ্ধ হাকীম বললেন, 'দিল্লী আপনার উপযুক্ত স্থান নয়।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমীন! ইস্ফাহানে একদিন আপনার দেশে সারাজীবন অবস্থানের মতো।'

দিল্লীর প্রশংসা এতো শোনা সত্ত্বেও দিল্লী আমাকে খুব কম তৃপ্ত করতে পেরেছে। সে জন্যে আমার যথার্থ অনুভূতিই প্রকাশ করলাম। এখানকার লোকজন বা তাদের আচরণ আমি পছন্দ করতে পারিনি। তাদের খাবার বা সুরাও আমার পছন্দ হয়নি। এখানকার তরমুজ স্বাদহীন এবং উদরে বায়ু সৃষ্টি করে। যে আমের উচ্চ প্রশংসা শুনেছিলাম, সেই আমও আমার কাংখিত স্বাদের চাইতে অধিক মিষ্টি। তাছাড়া আমের রসে হাত ও দাড়ি ময়লাযুক্ত হয়। দিল্লীর আবহাওয়া আলস্য, ঘামাচি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

নগরী থেকে যা কিছু সংগৃহীত হয়েছে তা হাতী, উট ও গর্দভের পিঠে বোঝাই করার এবং ইরান প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলাম। দেশটি পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাদিও সম্পন্ন করলাম। সিন্ধু নদী পর্যন্ত চারটি প্রদেশ আমার সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করে মোগল সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট এলাকার শাসনভার মোহাম্মদ শাহ ও নিজাম-উল-মূলকের উপর ন্যস্ত করলাম। বাদশাহ সরল ও প্রমোদ প্রিয়, মন্ত্রী ধূর্ত ও উচ্চাভিলাষী। এই ব্যবস্থাপনা যদি অকার্যকর প্রমাণিত হয় তাহলে হিন্দুস্থানকে আমার সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করার অধিকার থাকবে। ১৭৩৯ সালের ৫ই মে আমরা মোগলদের রাজধানী নগরী পরিত্যাগ করলাম। শুধুমাত্র দু'জনের কাছে আমার হৃদয়ের কিছু অংশ রেখে যেতে হলো। একজন স্পষ্টভাষী হাকীম আলভী খান এবং অন্যজন দুর্বিণীতা নূর বাঈ। একজন সৎ লোক ও একটি নারীর হৃদয় ছাড়া একজন সম্রাট তার সাম্রাজ্যের সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করতে পারে। দু'জনকেই আমার সাথে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলাম। যদিও জানতাম বৃদ্ধ হাকীম এই কষ্টকর সফর করতে পারবেন না। নূর বাঈ আমার প্রস্তাবে সারাক্ষণ কাঁদলো। আমি উপলব্ধি করলাম, আমার সাথে তার দেহকে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেও তার হৃদয় পড়ে থাকবে দিল্লীতে। একজন নারীর দেহে যদি হৃদয়ই না থাকে তাহলে সে দেহের মূল্য কি। আমি হাকীমকে প্রচুর উপঢৌকন দিলাম এবং নূর বাঈকে তার ওজনের সমপরিমাণ সোনা দিয়ে তাদেরকে এবং দিল্লী নগরীকে বিদায় জানালাম।

১৩

ভাগমতী

ভাগমতী সবে বিদায় নিয়েছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, গত রাতের কামলীলায় সে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। কিন্তু আমি কি করতে পারি। এখন আমি বৃদ্ধ। আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ফোন বাজছে। তুঘলক পুলিশ স্টেশন থেকে ফোন এসেছে, 'আমি কি বুধ সিং-এর মনিব?'

'হ্যাঁ, বলা যেতে পারে। সে পুরো এলাকার চৌকিদার। আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে নজর রাখার জন্য আমি তাকে অতিরিক্ত কিছু অর্থ দিয়ে থাকি। কিন্তু ব্যাপার কি? তার উপর দিয়ে কি গাড়ী চলে গেছে? কোন দুর্ঘটনা....?' 'না, সে রকম কিছু নয়। সে মেয়েদের উপর পীড়ন করেছে।' আমি বুধ সিং-এর ব্যাপারে সবকিছু বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু নারী পীড়ন! নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে। সে যদি আমাকে তার মনিব হিসেবে বলে থাকে, তাহলে তার ব্যাপারে অবশ্যই আমার দায়িত্ব অস্বীকার করা উচিত নয়। আমি পুলিশ স্টেশনের উদ্দেশ্যে গাড়ী চালাই। বারান্দার উপর শিকল বাঁধা অবস্থায় বসে আছে বুধ সিং। সেই শিকল ধরে চেয়ারে বসে আছে একজন পুলিশ। পান চিবুচ্ছে। তাদের কেউই আমার উপস্থিতি টের পেল না। আমি ঝুঁকে বুধ সিংকে বলি, যা ঘটেছিল আমাকে বলতে। সে কোন কিছু না বলে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আমি তাকে বারবার বলি ঘটনা আমাকে বলতে, যাতে আমি জামিনের ব্যবস্থা করতে পারি। পুলিশ মেঝের উপর পানের পিক ফেলে বলে, 'লোকটি পাগল।' বুধ সিং ধীরে তার মাথা ঘুরিয়ে পুলিশের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠে, 'তুই পাগল, তোর মা পাগল; তোর বোন পাগল! তুই আমাকে পাগল বলার কে? শালা বানচোৎ!'

পুলিশ কন্সটেবল পান চিবুতে চিবুতে শান্তভাবে বলে, 'আমি আপনাকে বলেছি, এ আস্ত পাগল। ওর সাথে কথা বলে লাভ নেই। ভিতরে যান, ইন্সপেক্টর সাহেবের সাথে কথা বলুন।' আমি ভিতরে প্রবেশ করি। রিপোর্টিং রুমে গিয়ে তাদের বলি, কেন আমি এসেছি। সাব-ইন্সপেক্টর আমাকে বসতে দিয়ে বলেন যে, কেন বুধ সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 'মেয়েদের উত্যক্ত করা।' আমি প্রতিবাদ করি। তাকে বলি, বুধ সিং অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় লোক। মেয়েদের প্রতি কোনকালে সে আগ্রহ দেখায়নি- ইত্যাদি। কিন্তু কখনো কখনো তার মধ্যে কিছু একটা ঘটে যায়। আমি মাথার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করি।

সাব-ইন্সপেক্টর মাথা নেড়ে আমাকে বুধ সিং-এর মেয়েদের উত্যক্ত করা সম্পর্কে বলেন। সে কনট সার্কাসের বারান্দা দিয়ে হাঁটছিল এবং বিড়বিড় করে কি বলছিল (আমি মাঝখানে বলি, 'প্রার্থনা, সে সব সময় প্রার্থনা করে।) হঠাৎ সে এক তরুণীর স্তন আঁকড়ে ধরে তাতে চাপ দেয় এবং মুখে উচ্চারণ করে 'ভেঁপু, 'ভেঁপু।' এই আচমকা ঘটনা মেয়েটি সামলে উঠার পূর্বেই বুধ সিং আরেক স্তন আঁকড়ে ধরে এবং একইভাবে চাপ দিয়ে মুখে 'ভেঁপু 'ভেঁপু' উচ্চারণ করে।'

'ওহ, এই ব্যাপার! কেমন হতচ্ছাড়া! জানেন, লোকটি এক সময় আর্মির ট্রাক ড্রাইভার ছিল। সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, এগুলো বাল্ব হর্ন', আমি ব্যাখ্যা করি। সাব-ইন্সপেক্টর কনট সার্কাসের মেয়েটির চাইতে ব্যাপারটা সহজে বোঝে। দৃশ্যতঃ বুধ সিং আরো অনেক মহিলার বাল্ব হর্ন টিপেছে। ফলে ঘটনাস্থলে হুলুস্থুল পড়ে গেছে এবং কিছু ছাত্র তাকে ধরে পিটিয়েছে। এতেই শেষ হয়নি। বারান্দায় ঝুড়ি ভর্তি কলা নিয়ে বসেছিল এক মহিলা কলা বিক্রেতা। বুধ সিং কলা

বাছাই করে দাম জিজ্ঞাসা করে। মহিলা যে দাম হাঁকে, তা বুধ সিং-এর কাছে অতিরিক্ত মনে হয় এবং অনেক সস্তা মূল্যে নিজেরটা বিক্রয়ের প্রস্তাব দেয়। সে মহিলাকে তার কলা বের করে দেখায়। বুধ সিং-এর এই আচরণ মহিলার পছন্দ হয়নি, সে তাকে বলে, তার মাকে কলাটি প্রদান করতে। বুধ সিং আর কি করবে? সে কলা বিক্রেতা মহিলার দুই স্তন আঁকড়ে ধরে উচ্চারণ করে 'ভেঁপু 'ভেঁপু'। এরপর পুলিশ তাকে পাকড়াও করে।

আমি আবার ব্যাখ্যা করি, 'সে নিশ্চয়ই তার ট্রাক চালানোর দিনগুলোর কথা স্মরণ করছিল। ব্যাপারটা হঠাৎ তার উপর আছর করে বসে।' সাব-ইন্সপেক্টর অত্যন্ত দয়ালু ব্যক্তি। লোকগুলো বুধ সিংকে ধোলাই দিয়েছে। সাব-ইন্সপেক্টর বললেন, 'চারটি স্তন টেপা এবং তার লিঙ্গ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট শাস্তি হয়ে গেছে। সে তো কারো মাকে সঙ্গম করেনি; করেছে কি? কিন্তু সে যাতে ভবিষ্যতে এমন না করে।'

১৪

কবি মীর তকী মীর

আমি জানিনা, আমার মধ্যে কোন গুণটি অধিক- একজন প্রেমিকের, না একজন কবির। আমার মধ্যে প্রেম ও কবিত্ব দু'টোই আছে। হৃদয়ঘটিত একটি ব্যাপার আমার বদনামের কারণ হয়েছে। কবিতা গোটা হিন্দুস্থানে আমার সুনাম ছড়িয়েছে। প্রেম আমাকে দিয়েছে মানসিক যন্ত্রণা, আর কবিতা আমার মধ্যে উত্তেজনার সুড়সুড়ি দিয়েছে। প্রেম বা কাব্যচর্চা হতে যে বস্তুটি আমি পাইনি, সেটা হচ্ছে অর্থ। যা কিছু আমি আয় করেছি তা আমার কথামালার সূত্র ধরে। আমি উপলব্ধি করেছি, সুন্দরভাবে কাটা হীরকখন্ড এবং কাঁচের টুকরার মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে না এমন লোকের সমাজে বাস করে আমাকে কি ভোজন করতে হবে তা স্থির করার কৌশল সুচারুভাবে রপ্ত করার চাইতেও আমার পৃষ্ঠপোষকের মর্জিই অধিক কার্যকর। আমার দরবেশতুল্য আব্বা মীর মোহাম্মদ আলী একদিন আমাকে বলেছিলেন, "বেটা, আমি তোমার ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তোমার হৃদয়ে একটা আগুন জ্বলছে। আমার ভয় হচ্ছে, এই আগুন তোমাকে কি করে ফেলে।" আমার বয়স তখন মাত্র নয় বছর। তার কথা শুনে আমি হেসে ফেলেছিলাম। তার মধ্যে বয়সের প্রজ্ঞা ছিল। তিনি কেঁদেছিলেন, কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, আমার মধ্যে প্রেমের যে আগুন জ্বলছে তা আমাকে প্রতিষ্ঠিত এবং ধ্বংস করবে।

একদিন আসর নামাজ শেষে সন্ধ্যার দিকে আব্বা বললেন, "বেটা, পৃথিবীটা দ্রুত বদলায় এবং এর সাথে পাল্লা দেয়ার সময় খুব কম। তাছাড়া জিন্দেগীর রাস্তাটা বড়ই বন্ধুর। তোমাকে প্রতিটি কদম ফেলতে হবে হিসেব করে। যে সময়টুকু আছে তা নিজেকে জানতে কাজে লাগাও।" তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। যা খুশী করার মত প্রচুর অবসর ছিল। নিজের কোন ব্যাপারে আমি অজ্ঞ, কোনদিনই আমার এমন মনে হয়নি। আমার পিতা নিজের ভিতরের সত্যটাকে অনুসন্ধান করতে গোটা জীবন অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তার অনুসন্ধান শিগগিরই শেষ হবে।

আমরা আকবরাবাদের (আগ্রা) উপকণ্ঠে এক খানকায় বাস করতাম। আব্বার দুই বিবির সন্তানরা ছাড়াও আমাদের সাথে থাকতেন চাচা আমানুল্লাহ, তিনি আব্বার মতোই অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগী ও ধর্মীয় আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন। তারা যখন ইবাদত করতেন না তখন প্রেম বিষয়ে যুক্তিতর্ক করতেন। আব্বা বলতেন, তুমি যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আল্লাহর সৃষ্টি সবকিছুকেই ভালোবাসো। চাচা কথাটা বলতেন এভাবে ঘুরিয়ে ঃ তুমি যদি আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসো, তার অর্থ আল্লাহকে ভালোবাসা। আমি বুঝতে পারতাম না যে, কি করে দু'জন বৃদ্ধ মানুষ একই বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন আলোচনা করতে পারে। চাচা আমানুল্লাহর মনে যে প্রেম ছিল তা আমি পরবর্তী সময়ে উপলব্ধি করেছি। আমি কখনো কখনো বিস্মিত হতাম যে, চাচা আমানুল্লাহ, যিনি আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা এতো আলোচনা করতেন, তিনি কোন নারীর উপস্থিতিতে মাটি থেকে তার দৃষ্টি উপরে তুলতেন না। এরপর এক সন্ধ্যায় তিনি আগ্রার বাজারে ঘুরে বেড়ানোর সময় এক সুদর্শন বালকের সাথে তার দৃষ্টি বিনিময় হলো এবং পাগলের মতো তার ভালোবাসায় পড়লেন। এই ঘটনার পর খাদ্যের জন্য তার ক্ষুধা এবং মনের শান্তিও হারিয়ে গেল। কয়েকদিন পরই সেই বালকের প্রেমে দিশেহারা চাচার মৃত্যু ঘটলো।

আমার আব্বার কাছে প্রেমের অর্থ কিছুটা ভিন্ন ছিল। একদিন তিনি আমাকে বললেন,

'তোমার একমাত্র সঙ্গীর সাথেই প্রেম করবে। প্রেমই বিশ্বকে টিকিয়ে রাখে। পৃথিবীতে তুমি যা কিছু দেখছো, সবই প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। আগুন হচ্ছে প্রেমের উত্তাপ, মাটি হচ্ছে এর ভিত্তি, বায়ু হচ্ছে বিরামহীনতা, রাত স্বপ্নের রাজ্য এবং দিবস হচ্ছে জাগ্রত অবস্থা।' তখন আমার কাছে তার কথার কোন মর্ম ছিল না। যা হোক, নিজের অজান্তেই আমার শৈশব হতেই প্রেমের একটি অনুসন্ধিৎসা আমার সাথে জড়িত হয়ে গিয়েছিল এবং সেটাই হয়েছিল আমার জীবনের ধ্রুব তারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার চাচা আমানুল্লাহ যে প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন বা আব্বা যে প্রেমের আলোচনা করতেন সে প্রেম আমার জীবনে আসেনি। বরং আমার মধ্যে সেই প্রেম এসেছিল যা একজন নারীর কাছে একজন পুরুষের মাথা ও হৃদয়কে আবৃত করার মতো।

আব্বা দু'বার বিয়ে করেছিলেন। তার প্রথম বিবি ছিলেন দিল্লীর খ্যাতিমান কবি আরজুর বোন। তার এক পুত্র ছিল হাফিজ মোহাম্মদ। আমার মা ছিলেন তার দ্বিতীয় বিবি। মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে আমিই বড়। আমার বৈমাত্রেয় ভাই হাফিজ মোহাম্মদের তার পিতা, সৎ মা অথবা তার সন্তানদের প্রতি কোন ভালোবাসাই ছিল না। তদুপরি সে আমাকে ঘৃণা করতো। আব্বা ব্যাপারটি ভালোভাবে জানতেন। সে জন্যে তিনি জীবদ্দশাতেই তার যা কিছুই ছিল তা ভাগ করে দেয়ার কথা ভাবলেন। গ্রীষ্মের এক বিকেলে সূর্যতাপ যখন অতি প্রচন্ড এবং উত্তপ্ত বাতাস বইছিল, তখন তিনি তার কিছু অসুস্থ মুরীদকে দেখতে আগ্রা গমন করলেন।

ফিরে এসেই তিনি গরমজনিত রোগে শয্যাশায়ী হলেন। তার নাসিকায় বেহেশতের মৃদুমন্দ বাতাসের সুগন্ধ। হাফিজ মোহাম্মদ এবং আমাকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, 'বেটা, আমি একজন ফকির। আমার কোন অর্থ, জমি বা অন্য সম্পত্তি নেই। থাকার মধ্যে আছে শ'তিনেক কেতাব। তাছাড়া মহাজনদের কাছে তিনশ টাকার দেনাও আমার আছে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে আমি আমার কেতাব ও দেনা সমানভাবে তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে চাই।' আমার সৎ ভাই সাথে সাথে বললো, 'আব্বাজান আপনি ভালোভাবেই জানেন যে, পরিবারের মধ্যে আমিই একমাত্র শিক্ষিত এবং কেতাবগুলো পড়ে যদি কেউ লাভবান হয়, সেটা আমিই। কেতাবের পাতা ছিঁড়ে ঘুড়ি তৈরী করে উড়ানো ছাড়া তকী সেগুলো দিয়ে আর কি করবে?' তার কথায় আব্বা বিরক্ত হলেন। কিন্তু মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে তিনি তাকে মৃদু তিরস্কার করা ছাড়া আর কি করতে পারেন। তিনি বললেন, 'হাফিজ মোহাম্মদ, মন দিয়ে আমার কথাগুলো শোন। শিক্ষার আলো কোনদিনই তোমার ঘর আলোকিত করবে না, কিন্তু তকীর ঘরকে উজ্জ্বল করবে।' আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'বেটা, মহাজনদের দেনা পরিশোধ করার পূর্বে আমার লাশ দাফন করো না। ঘাবড়িও না, তোমার কাছে টাকা আসবে।'

আল্লাহর নাম জপতে জপতেই আব্বা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন। তার ইন্তেকালের খবর আগ্রায় পৌঁছলে লোকজন দলে দলে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আমাদের খানকায় আসছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু হিন্দু দোকানদার আমাকে টাকা দিতে চাইলো। আমি তাদের থেকে অর্থ নিতে অস্বীকার করার পর যখন আব্বার মুসলিম মুরীদরা পাঁচশ টাকার একটা থলে আমার কোলে রাখলো, তখন আমি হিন্দুদের টাকাটাও গ্রহণ করি। মহাজনদের কাছে আব্বার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে চাচা আমানুল্লাহর কবরের পাশেই তার লাশ দাফন করলাম। এগার বছর বয়সেই বিধবা আম্মা, ছোটভাই ও বোনের দেখাশুনার দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। দাফনের খরচ মিটানোর পরও আমার কাছে একশ' টাকা ছিল। এছাড়া ছিল আমার জন্যে পিতার রেখে যাওয়া অভিজ্ঞান।

চাচা আমানুল্লাহ আমাকে উর্দু, ফার্সিতে তালিম দেয়া ছাড়াও কবিতা লেখার কায়দা শিখিয়েছিলেন। আমি এই ক্ষুদ্র জ্ঞান ধনী পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যবহার করতাম। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় আমি মুশায়রায় হাজির হয়ে আগ্রা ও দিল্লীর বিখ্যাত কবিদের কবিতা শুনতাম। তাদের কবিতা আবৃত্তিও করতাম। খেয়াল করলাম, তাদের অধিকাংশ কবিতাই নতুন কোন ভাব আনতে পারছে না। ছন্দের ক্ষেত্রেও এক স্থানে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাসুদ নামে একজন গায়ক, মুশায়রাতেও যিনি সবার প্রিয়, তিনি আমাকে কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত করলেন। মাসুদ দেখতে সুদর্শন। চেহারায় দুষ্ট প্রকৃতির ছাপ। তিনি তার বিশ্রী কবিতাগুলো সুমধুর কণ্ঠে গাইতেন। মুশায়রা শুরু হওয়া মাত্র শ্রোতারা 'পরওয়ানার' (পতঙ্গ) জন্যে চীৎকার

করতো। 'পরওয়ানা' ছিল তার ছদ্মনাম। (অবশ্য আমি সব সময় তাকে পতঙ্গ বলতাম) রমণীরা তাকে খুব পছন্দ করতো। প্রত্যেকটি সমাবেশেই লক্ষ্য করেছি, তার রচিত গান গাওয়ার অনুরোধ সম্বলিত চিরকুট দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে মহিলারা তাদের দাসীদের পাঠাতো। সবাই কামনা করতো 'পরওয়ানার' প্রেমের শিখাটা, যে শিখায় সে নিজেই জ্বলে পুড়ে গেছে। পরওয়ানার একটি ব্যাপার আমাকে বিরক্ত করতো, তাহলে খেলো ভাবের উদয় হলেও কবিতায় সে নতুন কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নেই, অপদার্থ হলেও 'পরওয়ানার' পক্ষে হিংসা করারই ব্যাপার যে, সেই আমার মধ্যে কবিতার দীপ জ্বালিয়েছিল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি একটা তেলের বাতির সামনে বসে কবিতা লিখতাম। তাসনীম ঝর্ণার পানির মতো আমার ভিতর থেকে কবিতা বেরুতো। লোকজনের সামনে কবিতা আবৃত্তি করতে আমার ভীষণ লজ্জা লাগতো। অবশ্য কবিতাগুলো সেইসব কবিদের দেখাতাম, যাদের কবিতা আমার কাছে একেবারে তুচ্ছ মনে হতো না। তারা বিস্মিত হতো যে, একজন ছোট্ট বালকের শব্দমালায় এতো অন্তরঙ্গতা আছে। কেউ কেউ সন্দেহ করতো যে, আমি কারো লেখা চুরি করছি। অনেকে মন্তব্য করলো, "এই কবিতা সত্যিই যদি তোমার হয়, তাহলে 'পরওয়ানার' দিন শিগগিরই ফুরিয়ে যাবে। একটি শিখার মধ্যেই তাকে লাফালাফি করতে হবে।" আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, "আপনারা কি বলতে চান, 'পতঙ্গ' একজন কবি? সে পুরুষ বেশী খোজার কণ্ঠধারী সামান্য একজন 'তুকবাজ' ছাড়া কিছু নয়।" গল্পটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, মুশায়রা সম্রাটের প্রতি অপমানসূচক শব্দ ব্যবহার করার মতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে বারো বছর বয়সী এক ছোকরা। আমি কি বলেছি, 'পরওয়ানা' তা যথাসময়ে শুনতে পেলো। সে গর্জে উঠলো, "কে এই ছোকরা, মীর তকী? আমি তাকে এমনই শিক্ষা দেব যে, জীবনে ভুলবে না।" তার পরিচিত আগ্রার কয়েকটা পরিবারে আমি গৃহশিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে সে সবার সামনে আমাকে অপমান করার সিদ্ধান্ত নিলো।

আগ্রার শ্রেষ্ঠ ধনী নওয়াব রঈস মিয়ার বেগম 'পরওয়ানার' প্রেমে পাগল বলে বলা হতো। তারই হাভেলীতে আয়োজিত এক মুশায়রায় কে যেন তার কানে কানে বললো যে, আমিও সমাবেশে হাজির। দেখলাম, তার চোখ শ্রোতাদের মধ্যে আমাকে খুঁজে ফিরছে। তার তথ্য সরবরাহকারী ইশারায় আমার দিকে দেখাচ্ছিল। এক সময় সে মাথা নাড়লো এবং জোরে শোরেই সবাইকে শুনিয়ে বললো, 'দাঁড়াও তামাশা দেখাচ্ছি।' একজন কবির আবৃত্তি শেষ হবার পরই তার ভক্তরা চীৎকার শুরু করলো, 'পরওয়ানা'। সে তার দুই হাত উপরে তুলে লোকদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বললো, 'আমার মেধার প্রশংসা করার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনাদের হুকুম অনুযায়ী কাজ করার জন্যেই আমি নিবেদিত। অবশ্য আজকের শুভ সন্ধ্যায় আপনাদের এই অনুগত দাসের মুখ খোলার আগে আমি হিন্দুস্থানের উদীয়মান তারকার জন্যে আপনাদের শান্ত থাকার অনুরোধ করছি। 'পরওয়ানা' তার কাছে সামান্য এক 'পতঙ্গ'। আপনারা যে এখনো তার নাম জানেন না, সে জন্যে আপনাদের কোন দোষ দেয়া যায় না। কারণ দুনিয়া এখনো তার কালাম শোনেনি। নাক টিপলে এখনো তার দুধ বেরোয়। কিন্তু সে নিজেকে উস্তাদের উস্তাদ মনে করে।' তার কণ্ঠে ব্যঙ্গ। তার ভক্তরা আনন্দে চীৎকার করে উঠছিল। শ্রোতাদের একজনের দিকে ফিরে উচ্চ কণ্ঠে সে বললো, 'তুমি কি বলতে পারো, সেই লুন্ডার (ফচকে ছোকরা) নাম কি? হ্যাঁ মনে পড়েছে- মীর। পুরো নাম মীর তকী মীর। আজকের এই মহান সমাবেশে তার সামনে মোমবাতি রাখা হোক।

আমি ঘাবড়ে গেলাম। কখনো কোনো মুশায়রায় মুখ খুলিনি। আমার কোনো কবিতাও সঙ্গে নেই। এরই মধ্যে আমার সামনে বাতি এনে রাখা হলো। কয়েকশত চোখ আমার উপর নিবদ্ধ। কপালে দরদর করে ঘাম ঝরছে। চোখ বন্ধ করে আমি আব্বার কথা চিন্তা করলাম। প্রার্থনা করলাম, 'ইয়া আল্লাহ তুমিই আমার সাহায্য ও আশ্রয়দাতা।' কোন চিন্তা মাথায় ঢুকছিল না। 'শামা-পরওয়ানা' সম্পর্কে যে কবিতাটা লিখেছিলাম, সেটির কয়েক ছত্র ছাড়া আর কি আবৃত্তি করতে পারি। এটা লিখতে হয়েছিল আমাকে অপমান করার জবাব দেয়ার জন্যে। আমি আমার সকল বিনয় জড়ো করে বললাম, 'পরওয়ানা সাহেব, কবিতা পেশের আগে আমি আপনাকে একটা ক্ষুদ্র উপহার দেয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করছি। দয়া করে আপনি গ্রহণ করুন।

এরপর আমি স্পষ্টভাবে আবৃতি করলাম-

"আগুনের শিখাটা চেয়ে আছে
কিন্তু এরপর বাঁকা রেখার
পাশে আর কিছুই থাকে না
আগুনের জিহ্বার লাফানোর মধ্যেই
পতঙ্গ আগুনে পতিত হয়।"

শ্রোতারা এরমধ্যে প্রেমের স্বাদ পেলো না। কিন্তু অর্থ উপলব্ধি করার পর হর্ষধ্বনি করে উঠলো। 'মারহাবা! সোবহান আল্লাহ! কেমন চমৎকার ছন্দ!' প্রশংসায় সাহস সঞ্চয় করে আমি প্রেমের একটা কবিতা আবৃতির অনুমতি চাইলাম যেটি মাত্র পূর্ব রাত্রে রচনা করেছি এবং এখনো আমার মনে আছে।

"যেভাবেই দেখো, এ হচ্ছে প্রেম
শুধুই প্রেম
প্রেম সংগৃহীত হয়েছে মাটি থেকে
উপরে আকাশ।
প্রেম তো প্রেমের জন্যে
প্রেমিকের জন্যেও
সংক্ষেপে, প্রেম নিজেই প্রেমের সঙ্গে
প্রেমে নিমগ্ন।
প্রেম ভিন্ন কেউ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না
প্রেম আকাংখা, প্রেমই আকাংখার শেষ লক্ষ্য।
প্রেম দুঃসহ যাতনা, প্রেমের ব্যথায়
প্রেমই নিবারক
জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ, তোমরা কি জানো
প্রেম কি?
প্রেম ছাড়া বিশ্বের নিয়মরীতি ভেঙ্গে পড়বে
কবিরা যথার্থই বলে গেছেন
প্রেম হচ্ছে আল্লাহ।"

আমার আবৃতিতে শ্রোতৃমন্ডলী অভিভূত। প্রতিটি লাইনের পর তারা প্রশংসা করছিল, 'বাহ্, বাহ্, মোকাররার।' তাদের উৎসাহে লাইনগুলো আমাকে বার বার আবৃতি করতে হলো। অনেকেই কাছে এসে আমার সামনে রৌপ্যমুদ্রা ছুঁড়ে দিচ্ছিল। একজন দাসী সোনার আশরফীর সাথে একটি কাগজের টুকরো আমার হাতে গুজে দিল। তাতে আমাকে নিজ হাতে কবিতার একটি অনুলিপি লিখে পরদিন সকালে ব্যক্তিগতভাবে হাভেলীতে পৌঁছে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। অনুরোধটা এসেছিল হাভেলীর বেগমের নিকট হতে। এভাবেই কবি ও প্রেমিক হিসেবে আমার জীবনের সূচনা হলো।

সে রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি। প্রশংসাগুলো আমার কানে বাজছিল। মিথ্যা ভানকারী 'পরওয়ানাকে' আমি অপমান করতে পেরেছি। এরপর আমি যেখানে থাকবো, সেই মুশায়রায় সে আর মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু কে এই নারী যিনি আমার কবিতা চেয়ে পাঠিয়েছেন। মাথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সারারাত বিনিদ্র কাটানো সত্ত্বেও সকালে বেশ সতেজ ও বিজয়ী বলে অনুভব করলাম। রাতে যা-যা ঘটেছিল তার সবই মাকে বললাম। সোনার আশরফী ও রৌপ্য মুদ্রাগুলো তার হাতে দিলাম। তিনি বললেন, "সব কিছু হয়েছে তোমার মরহুম আব্বার জন্যে। তোমাকে

তিনি দেখছেন। একদিন তিনি দেখবেন যে, তুমি হিন্দুস্থানের সেরা কবি হবে।"

আমি আমার কবিতার একটি অনুলিপি তৈরী করলাম। নওয়াব রঈস মিয়ার হাভেলীতে হাজির হয়ে ভিতরে পয়গাম পাঠালাম। নওয়াব সাহেব ঘোড়াকে ব্যায়াম করাতে বাইরে গেছেন। খানিক পরেই একজন দাসী এসে আমাকে হেরেমে নিয়ে চললো। সে ধৃষ্টতার সাথে বললো, 'তুমি এখনো ছোট্ট বালক। তোমার ঠোঁটের উপরে এখনো লোম গজায়নি। জেনানার মধ্যে তোমার উপস্থিতিতে কেউ আপত্তি করবে না।' আমি এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম জাঁকজমকপূর্ণ অন্ধকার এক কক্ষে। সে কক্ষে পারস্যের গালিচার উপরে দেয়ালের সাথে ঠেস দেয়া কয়েকটি তাকিয়া। কয়েক মুহূর্ত পর বেগম সাহেবা কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি মাথা নত করে তাকে কুর্ণিশ করলাম এবং দুই হাত সামনে বাড়িয়ে আমার লেখা কবিতাটা পেশ করলাম। 'আমার সামান্য মেধা সম্পর্কে আপনার প্রশংসা আমাকে সম্মানিত করেছে।' তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'তোমার উপস্থিতিতে বরং আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি। তুমি যখন হিন্দুস্থানের সবচাইতে বড় কবি হবে তখন তুমি স্মরণ করতে পারবে যে, আমার মত ক্ষুদ্র সৃষ্টি তোমার শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম মূল্য দিয়েছে।'

তার কণ্ঠ আমার কানে স্বর্গীয় সুরের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছিল। তাকে এক নজর দেখার জন্যে আমি সাহস করে চোখ তুললাম। তিনি গালিচায় বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়েছিলেন। তার চোখ দুটি আমার উপর স্থির-নিবদ্ধ। তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকাতে পারলাম না। তিনি খাটো মোটা আকৃতির প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী রমণী। দেখতে সুশ্রী, গোলগাল মুখ, দীর্ঘ কুচকুচে কালো তার চুল। অন্য যে জিনিসটি লক্ষ্য করলাম, তা হচ্ছে তার সুপুষ্ট স্তন এবং বিশাল সুগোল নিতম্ব, যা আঁটসাট পায়জামায় প্রায় ফেটে বেরুচ্ছিল। তার স্থির দৃষ্টিতে আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, তিনি আমাকে দু'চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি আমাকে বসতে বললেন এবং দাসীকে নির্দেশ দিলেন নাশতা আনতে। আমার সামনে রক্ষিত খাবারের স্তূপ থেকে আমি যখন গলধঃকরণ করছিলাম, তখনো অনুভব করলাম যে, তার চোখ আমার উপর ঘোরাফেরা করছে। তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রের 'বিসমিল্লাহ' অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত করলেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন তার লেখা কিছু কবিতা দেখে সেগুলো কিভাবে আরো উন্নত করা যায় সে বিষয়ে উপদেশ দেই। তার সন্তানদের গৃহশিক্ষকের পদে আমাকে বহাল করতে চাইলেন। হঠাৎ আমার মনে হলো, একটি পাখীর উপর রেশমী ফাঁদ পড়তে যাচ্ছে। আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুটা উদ্বিগ্নও হয়েছিলাম। আমার দৈন্যের দিনগুলোর অবসান ঘটলো, কিন্তু সেই সাথে ফুরিয়ে এসেছিল আমার স্বাধীনতার দিন।

আম্মার কাছে যখন এই সাক্ষাতের কথা বললাম তিনি আমার আনন্দ ও উদ্বেগে শরীক হলেন। তিনি বললেন, "এই বেগম সাহেবা সম্পর্কে অনেক কিছু কানে এসেছে। এক দরিদ্র পরিবার থেকে উনি এসেছেন। যখন তার বয়স বড় জোর ষোল, তখন তাকে তুলে দেয়া হয় নওয়াব রঈসের কাছে। এখন নওয়াবের বয়স পঞ্চাশের উর্ধে। তার প্রথম বেগমের অনেকগুলো সন্তান তার স্বামীর নয়, কবি পরওয়ানার। এই কবিকে কিছুদিনের জন্যে উস্তাদ হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। নওয়াব রঈস বৃদ্ধ ও কমজোর হয়ে গেছেন। তাছাড়া প্রায়ই তিনি দিল্লী চলে যান।" একটু থেমে তিনি বললেন, 'বেটা, তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। তোমার জন্যে সুন্দরী একটা মেয়ে খুজবো।' যদিও আমার বয়স মাত্র পনের, আমি বুঝতে পারলাম, তার মনের মধ্যে কি উদ্বেগ কাজ করছে। তিনি ভাবলেন যে, বেগম সাহেবার সাথে সাক্ষাত করে তাকে ধন্যবাদ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্যে উপযুক্ত পাত্রীর ব্যাপারে পরামর্শ নেয়া খুব ভালো হবে।

বেগম সাহেবা আম্মার সাথে ভালো ব্যবহার করলেন। তিনি তাকে রেশমী পোশাক উপহার দিলেন এবং তার কাছে আমার প্রশংসা করলেন যে, তার পুত্র খুব শিগগির কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। আম্মা যখন তার কাছে আমার জন্যে পাত্রী অনুসন্ধানের বিষয় উত্থাপন করলেন। বেগম সাহেবা সাথে সাথে উত্তর দিলেন যে, 'ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। আমার কাছেই তার উপযুক্ত মেয়ে রয়েছে। আপনি কি ওকে দেখতে আগ্রহী?' আম্মা বাধা দিলেন, 'বেগম সাহেবা, আপনার যদি পছন্দ হয়, তাহলে আমাদের দেখার বা বলার কি থাকতে

পারে। আপনার পছন্দ কল্যাণকর হোক।'

পরদিন বেগম সাহেবা আমাকে খোঁচা দিয়ে বললেন যে, তিনি আমার জন্যে একটা মেয়ে দেখেছেন। সে কোন হুরী নয়, নিতান্তই সাধারণ মেয়ে। শ্বেতপাথরের মতো শুভ্র তার চরিত্র। তার মতো স্ত্রী হলে বদনাম কোনদিনই তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করবে না। তার পিতা কোন ধনী ব্যক্তি নয়। কিন্তু আমরাই বিয়ের খরচ এবং উপযুক্ত যৌতুক দেবো। আমার পছন্দে তুমি নিশ্চয়ই নারাজ হবে না।'

সেই মেয়ের নাম সালিমা। ওকে বিয়ে করার পর আমার কাছে বেগম সাহেবার উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমার বিবি বাস্তবিক পক্ষে কোন হুরী ছিল না। বাঁশের মতো শুকনো সে। হাতের আঙ্গুল দিয়ে ওর কোমর আঁকড়ে ধরতে পারতাম। ওর স্তনের অস্তিত্ব বুঝাই যেতো না; মুখ বন্ধ করে থাকলেও ওর সামনের দাঁতগুলো বেরিয়ে থাকতো। কথা বলার সময় সহজেই ওর মাড়ি দৃষ্টিগোচর হতো। শ্বেতপাথরের মতো চরিত্রের শুভ্রতা বজায় রাখা ছাড়া ওর আর কোন পছন্দ ছিল না। ওর নিস্পৃহভাব আমাকে অসৎ পথ অবলম্বনের জন্যে প্রলোভিত করতো। আমার বিবির পিতা বেগম সাহেবার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তাকে নওয়াব সাহেবের এক বাগানে তত্ত্বাবধায়কের কাজ দেয়া হয়েছিল।

বেগম সাহেবা একজন চক্রান্তকারী এবং কর্তৃত্বশীল নারী, যিনি তার ইচ্ছামত সবকিছু পাওয়ার পথ করে নিতেন। বৃদ্ধ হলেও নওয়াব রঈস তার স্বামী ছিলেন। খণ্ডকালীন এক প্রেমিককে কামনা করে সে বাসনা পূরণ করেছেন। একজন কবি সুনাম অর্জন করলে তার উপর নির্ভর করে বেগমের কাব্যপ্রীতি। কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে নয়। মীর তকীর নক্ষত্র যখন উদিত হচ্ছিল, তখন তিনি তার পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবিকা হতে স্থির করলেন। তিনি তকীর জন্যে এমন একজন স্ত্রী সংগ্রহ করেছিলেন, যাকে তিনি অনায়াসে অবজ্ঞাও করতে পারেন।

আমি এখানে বেগম সাহেবার নাম প্রকাশ করতে চাই না। ধর্ম শাস্ত্রে যতগুলো অপরাধ তালিকাবদ্ধ আছে, তার মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে, যে রমণী স্বেচ্ছায় নিজেকে কারো কাছে নিবেদন করেছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা। তার সুন্দর ও গোলগাল মুখের জন্যে যে নামটি দিয়েছিলাম, সে নামটিই আমি প্রকাশ করতে চাই- 'কামরুন্নিসা', পূর্ণ চাঁদের মতো। এই তুলনায় তিনি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছিলেন। তার মাঝে হাজার বছরের রমণীয়তা। তিনি জানতেন, কেমন করে পুরুষকে বিপথগামী করতে হয়। নিজের পছন্দের মায়াজালে পরপুরুষকে প্রলোভিত করতে হয়। তিনি স্বেচ্ছায় হৃদয় সমর্পণের সাথে প্রেমিকের কাছে দেহও সমর্পণ করেছেন। যখন থেকে তিনি আমার কর্ত্রী, তখন থেকে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, তিনি আমাকেই তার ঈশ্বর হিসেবে জানেন এবং আমার কবিতার প্রতিটি বাক্য তার কাছে পবিত্র কোরআনের সুরার মতো। তিনি এক সাথে আমার মা, কর্ত্রী, সেবিকা ও সঙ্গিনীতে পরিণত হলেন। আমার সাথে মুহূর্তের বিচ্ছেদও তিনি সইতে পারতেন না। আমার আরো বন্ধু-বান্ধব থাকুক তা সহ্য করতে না পেরে তিনি মাত্র কয়েকজনকে অনুমোদন করেছিলেন। তিনি আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যত জীবনকে নাস্তিক্যে পর্যবসিত করেছিলেন। আমি নিজেকে হাতবাঁধা এবং তার দ্বারা শৃংখলিত মনে করতাম। শৃংখল একটু শিথিল হোক তাও চাইতাম। একই সময়ে এটাও অনুভব করতাম যে, দীর্ঘ রেশমী বেণী দিয়ে তিনি যে আমাকে বেঁধেছেন, তা প্রেমিকের জন্যে মানুষের শ্বাশত অনুসন্ধানের মতোই আল্লাহ প্রদত্ত। তিনি আমাকে যখন তার ছেঁড়া চঞ্চলের মতো পরিত্যাগ করলেন এবং আরেক ছন্দস্রষ্টার প্রতি তার দৃষ্টি ফেরালেন, যার যোগ্যতা শুধু এতটুকু যে, আমি দিল্লীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলে তিনি আগ্রার মুশায়রায় প্রিয় প্রজাপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। এই নারী আমাকে সৃষ্টিও করেছে, ধ্বংসও করে দিয়েছে। সংক্ষেপে এই হলো, কবি ও প্রেমিক মীর তকী মীরের জীবনের ইতিহাস।

আমি এরই মধ্যে বলে ফেলেছি যে, কিভাবে নওয়াব রঈসের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত এবং তার পুত্রদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হই। বেগম সাহেবা পড়ানোর সময় সর্বদা হাজির থাকতেন। আমি বাচ্চাদের যখন পড়াতাম, তার চোখ নিবদ্ধ আমার ওপর। পড়ানো শেষ হলে আগের রাতে কি লিখেছি, তা আবৃতি করার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। আবৃতির সময় প্রতিটি লাইন

শুনে 'সোবাহানআল্লাহ' বলে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। যে কাগজে লিখেছি আমার হাত থেকে সে কাগজটি নিয়ে তার বুকে চেপে ধরতেন। মাঝে মাঝে তার নিজের রচনা আমাকে দেখতে দিতেন। সেগুলোর ছন্দ খুব দুর্বল, কিন্তু স্পষ্টতঃই আমাকে লক্ষ্য করে লেখা। আমি তার কবিতার প্রশংসা করতাম। কিভাবে ছন্দ ও বাক্যের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতাম। কখনো কখনো তার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে কপালে স্থাপন করতাম। তিনি আমাকে দুপুরে খেতে দিতেন। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে দেখতাম, তিনি সবার জন্যে বিরিয়ানী এবং অন্যান্য উপাদেয় খাবার পাঠিয়েছেন। এভাবে তিনি আমাকে বুঝিয়েছেন, মোগল সাম্রাজ্যে আমিই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। রাতে আমার হাড্ডি চর্মসার স্ত্রীর সাথে বিছানায় শুয়ে বেগম সাহেবার বিশাল নিতম্বের প্রসঙ্গ তুলে মস্করা করতাম, যা আমাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

একদিন বেগম সাহেবা কোন কিছুর চাহিদায় ষড়যন্ত্রের জাল বুনলেন, যা সংশ্লিষ্ট সকলে উপলব্ধি করলো। তিনি প্রধান পুতুল নাচিয়ে, যার আঙ্গুলে সবকটা সুতার মাথা। তার ষড়যন্ত্রের অসহায় শিকারদের পুতুলের মত তার হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় ছিল না। কাব্য বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, আমি ছিলাম তার স্বেচ্ছা শিকার। তিনি তার ছলচাতুরী প্রয়োগ করলেন স্বামীর উপর। নওয়াব সাহেবকে তিনি বুঝালেন যে, তার নিজের ভবিষ্যতের জন্যই দিল্লী যাওয়া জরুরী। কারণ পারস্যের নাদির কুলী খান হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে আসছে এই গুজবের সত্যতা কতটুকু তা দেখা উচিত। সেই সাথে তিনি নওয়াব সাহেবকে বললেন, শাহী খাজাঞ্চী দিল্লীর সব চাইতে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নওয়াব শামসামুদ্দৌলার কাছে আমার ব্যাপারে তদবীর করতে, যাতে তিনি আমাকে সম্রাটের কাছে পেশ করতে পারেন। এর ফলে নওয়াব রঈসের মনে এমন সন্দেহও হতে পারে যে, বেগম আমাকে আগ্রা থেকে বিদায় করতে চাচ্ছেন। তার স্বামী যে শুধু উভয় প্রস্তাবে সম্মত হলেন তাই নয়, তার অনুপস্থিতির সময় আমাকে হাভেলীতে থাকার জন্য চাপ দিলেন। তাহলে তিনি অন্ততঃ স্বস্তিবোধ করবেন যে তার বাড়ীতে একজন বিশ্বস্ত লোক দেখাশুনা করছে, আর পুত্রদের পড়াশুনাও ব্যাহত হচ্ছে না।

নওয়াব রঈস তার অশ্বারোহী অনুচরবৃন্দসহ দিল্লী রওয়ানা হলেন। হাভেলীতে নতুন করে থাকার ব্যবস্থা গুছানো হলো। পুত্রদেরকে তাদের পিতার শয়নকক্ষে স্থানান্তরিত করা হলো যাতে পুত্রদের কক্ষটা আমাকে দেয়া যায়। এই দুই কক্ষের মাঝেরটাই বেগম সাহেবার শয়নকক্ষ। তিনি মূল্যবান সময় অহেতুক নষ্ট করায় বিশ্বাসী ছিলেন না।

বেগম সাহেবার প্রতারণা তার ধৃষ্টতার মতোই ভীতিজনক ছিল। সকালে তিনি বৃদ্ধ স্বামীকে অশ্রুসজল চোখে বিদায় দিয়েছিলেন। বিকেলে তিনি তার পদযুগল, বগল ও গোপনস্থানের কেশ বিনাশ এবং সুগন্ধী তেল দ্বারা শরীর মর্দন করানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। নৈশ ভোজনের ঘন্টা খানেক পর পুত্র কন্যারা নিদ্রামগ্ন হলো। ভৃত্যরাও কাজ সেরে তাদের কক্ষে প্রস্থান করলো, তখন আমার কাছে সকল রহস্য উদঘাটিত হলো। তিনি আমার কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যেন শয্যায় প্রতীক্ষারত স্বামীর কাছে আসছেন। দীর্ঘদিনের বিবাহিত লোকদের মতো আমরাও প্রেমের বাক বিনিময়ে অহেতুক কালক্ষেপণ করলাম না। প্রেমের পূর্বে প্রেমিক-প্রেমিকারা যেসব বাক্যালাপ করে আমরা উভয়ে কবিতার মাধ্যমেই তা শেষ করেছিলাম। আমাদের চোখ প্রথম সাক্ষাতের দিন থেকেই কথা বলে আসছে।

বাতি নিভানোর ব্যাপারটাকে তোয়াক্কা না করেই তিনি একে একে তার সকল বসন পরিত্যাগ করলেন। আমারগুলোও খুলে দুই হাত দিয়ে আমাকে নিষ্পেষণ শুরু করলেন। যতক্ষণ সাধ্যে কুলোয়, আমরা একে অন্যের মুখে মধু পান করলাম। তিনি আলতোভাবে আমাকে বিছানায় ফেলে আমার উপর তার দেহ ছড়িয়ে দিলেন। গ্রীষ্মের ভোরে গোলাপ পাপড়ির ওপর শিশির বিন্দুর মতো তার দুই উরু সিক্ত। আমার দন্তে ব্যথা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি আমার মুখে মুখ চেপে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি উত্তেজনায় গোঙাতে শুরু করলেন। সারা শরীরে তার অদ্ভুত কম্পন অনুভব করলাম। দেহ ঘামে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। এ ধরনের উত্তেজনা সম্পর্কে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই এবং ভাষায়ও এর প্রকাশ সম্ভব নয়।

তিনি উঠতে চেষ্টা করলেন। আমি তাকে আঁকড়ে রেখেছিলাম। ফলে তিনি নড়তে পারলেন না। এ খেলায় তিনি পাকা খেলোয়াড়। তার অভিজ্ঞতাও অনেক। বয়সে আমি তরুণ, কামনাও

অধিক। বেগম সাহেবা আমাকে অনুমোদনের হাসি উপহার দিয়ে অধীনতা স্বীকারের দৈহিক ভাব প্রকাশ করলেন এবং এবার চিৎ হয়ে আমাকে পুরো ভূমিকা পালনের সুযোগ দিলেন। আমি তার মুখমন্ডল, গলা, স্তনে কামড় বসালাম এবং জিভ দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিলাম। এবার আমি নিঃশেষিত হবার আগে তিনি বহুবার চরমে উঠে গেলেন। অর্ধ ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে আবার প্রেমের খেলা শুরু করলাম। এভাবে সারারাত চললো। আমার মনে নেই, কখন এর সমাপ্তি ঘটলো অথবা তিনি কখন আমার কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তার কক্ষে বিশ্রাম নিতে গেলেন। যখন জাগ্রত হলাম, মনে হচ্ছিল চোখের পাতা আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। কিন্তু ক্লান্তির বদলে নিজেকে অনেক ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। তার স্বামীর বিশ্বাসের প্রতি প্রতারণা এবং আমার স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হওয়ার জন্যে অপরাধবোধের বদলে আমার মনে হলো, অন্তর্যামী আমাদের হৃদয় ও দেহের এই মিলনে তুষ্ট হয়েছেন এতে পাপ নেই, বরং এ হচ্ছে স্বর্গীয় প্রেম।

আমি হাভেলীর আঙ্গিনায় নেমে গেলাম। দেখলাম, বেগম সাহেবা একটা মোড়ায় বসে আছেন। দু'জন দাসী তার পা মর্দন করছে। আঙ্গিনায় তার স্বামীর পেখম ছড়ানো পায়রাগুলো আশেপাশে ঘুরে ঘুরে ডাকছে। আমি তাকে কুর্ণিশ করলে তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের কবি বন্ধুর সুন্দর রাত কেটেছে।' তিনি দাসীকে নাশতা পরিবেশনের নির্দেশ দিলেন। স্বামীর প্রেরিত চিঠিটা পাঠ করলেন। সেকেন্দ্রায় রাত্রি যাপনের জন্যে যাত্রা বিরতির সময় তিনি চিঠিটি লিখেছেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার স্ত্রীর জন্যে একঝুড়ি শুকনো ফল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বেগম সাহেবা তার মর্জি মাফিক আমাদের জীবনের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তার পুত্রদের পড়ানোর জন্যে যে টাকা আমাকে দিতেন তা আমার বিবি ও আম্মা আগে যা দেখে এসেছেন, তার চাইতে অনেক বেশী। আমার বিবিকে তিনি বলতেন, 'আমার পুত্ররা কি তোমার পুত্র নয়? তোমার স্বামীকে তাদের পড়ানোর সুযোগ দিয়ে তুমি আমাকে চিরকৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করছো। এর পরিবর্তে আমি যা দিচ্ছি তা পান চর্বণের মতোই যৎসামান্য। উপহার দিয়ে তিনি আমার বিবিকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন। তিনি তার স্বামীকে লিখলেন, শুধু তার সন্তানদের পড়ানোর কাজে লাগানো ছাড়া অন্য কোন কাজে নিয়োজিত না হতে দিয়ে আমার উপর কতটা কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন।

আমার সাথে বেগম সাহেবার আচরণ অতি বিশ্বস্ত। দুনিয়ার আর সবার সাথে মিথ্যা বললেও আমার সাথে কখনো মিথ্যা বলতেন না। রঈস মিয়ার সাথে তার শাদীর কথা বললেন যে, প্রথম বিবির ঘরে নওয়াবের সন্তান ছিল। তাকে এবং তার কাজগুলো দেখাশুনা করার জন্যে তিনি কাউকে প্রয়োজন ভেবেছিলেন। বেগম সাহেবা এসে সন্তান ও সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব নিলেন। ঘোড়াকে ব্যায়াম করানো এবং পায়রাকে প্রশিক্ষণ দেবার পর নওয়াব সাহেবের যথেষ্ট সময় পড়ে থাকতো। কয়েক মাস অন্তর হঠাৎ একদিন মদ্যপান করে উত্তেজিত হয়ে উঠলে বেগম সাহেবার সাথে তার দৈহিক মিলন ঘটতো। তার আত্মচেতনা জাগ্রত করার জন্যে প্রেমের তীব্রতা প্রদর্শন করার পর এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, বেগম সাহেবা এমন ভানও করতেন। তিনি 'পতঙ্গের' সাথে তার সম্পর্ক এবং তার দ্বারা যে গর্ভ সঞ্চারিত হয়েছিল সেই ভ্রূণকে নষ্ট করে দেয়ার বিপদের কথাও স্বীকার করলেন। আমাদের মধ্যে না বলা আর কিছুই ছিল না। তিনি আমার এতো ঘনিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে, নিজের বিবির কাছে গেলে অপরাধী মনে হতো। বেগম সাহেবা আমাকে এমনও প্ররোচিত করতেন যে, আমাদের সম্পর্কের জন্যে তার স্বামীর সাথে ভালোবাসার ছলনা করা জরুরী হলেও আমার স্ত্রীর সাথে বসবাসের কোন প্রয়োজন নেই। ব্যাপার খুব স্পষ্ট যে, আমাকে তার যথেষ্ট প্রয়োজন। এর মাঝেও তিনি আমাকে একটি সন্তান জন্ম দেয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তার বিশ্বাস যে, আমার সকল শক্তি কবিতা লিখা ও বাচ্চাদের তামিল দিতে নিঃশেষ হচ্ছে।

বেগম সাহেবার সান্নিধ্যে আমি পরম সুখের দিনগুলো কাটিয়েছি। তার আঁটসাট পোশাক, সুকোমল দেহবল্লরীর মাঝে আমি জীবনের সত্যিকার অর্থ খুঁজে পেয়েছি। আমাদের হৃদয় ও দেহের কামনা পূরণের জন্যে দীর্ঘ প্রহর আমরা এই আশায় অতিবাহিত করেছি যে, আমাদের পরস্পরের ক্ষুধার চির পরিতৃপ্তি ঘটবে। কিন্তু হায়, প্রতিবার বিচ্ছিন্ন হবার পর যখন আবার

মিলিত হতাম, মনে হতো, এই বুঝি প্রথম। আমরা সারারাত একে অন্যের বাহুতে মাথা রেখে শয়ন করতাম। ভোর হওয়ার সাথে সাথে নববধূর মতো লাজনম্র ভঙ্গিতে তিনি মুখমন্ডল আবৃত করতেন। তার পর্দার রহস্য উন্মোচন করার একটা বাসনা আমার মধ্যে জাগ্রত হতো। আমি যতো তাকে দেখেছি, তার দেহের জন্যে আমার আকাংখা ততো তীব্র হয়েছে। তার সৌন্দর্য স্বচ্ছ পানিতে মুক্তার মতো। যখন তার চাঁদমুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, তখন আসল চাঁদকে মাকড়সার জালের মতোই বিবর্ণ মনে হয়।

"জলন্ত আগুন আমাদের হৃদয়কেও জ্বালিয়ে গেছে
আমরা ডুবে গেছি, আর আমার হৃদয় যন্ত্রণায় বিদগ্ধ
ভোরের সাথে বাতির সলতের শেষ বিন্দু তেল
নিঃশেষিত হয় এবং নিভে যায়।"

আমি দুনিয়াদারী; আমার আম্মা, বিবি ও বাচ্চার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়লাম। আত্মীয়-স্বজনরা আমার প্রতি বিমুখ হলেন। প্রেমের জন্যে যন্ত্রণা পাওয়ার চাইতে সুখ আর কি আছে? চোখ বন্ধ করে মরে যাওয়ার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। আমার সুখ ও দুঃখগুলো আমাকে একাই ভোগ করতে হতো। কারণ এমন কেউ ছিল না, যাকে বিশ্বাস করতে পারি।

একমাস পর নওয়াব রঈস দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ততোদিনে আমার ধারণা হয়েছে যে, বেগম সম্পর্কে তিনি কোন সন্দেহই পোষণ করবেন না এবং বেগম সাহেবা তাকে পুনরায় অন্য কাজে পাঠাতে সক্ষম হবেন। কিভাবে নওয়াবকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হবে, তা দেখাতে আমাকে নেয়া হলো এবং তার সাক্ষাতে আমাকে কি সম্বোধন করা হবে তা আগেই জানানো হলো। উত্তম বস্ত্রে তিনি নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন। কাজল দিয়ে চোখকে কালো এবং মিশি দিয়ে ঠোঁট রঞ্জিত করে তাকে একাকী ফেলে যাওয়ার কারণে তার মধ্যে যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়েছে নওয়াবের সামনে তিনি যথার্থই তা ব্যক্ত করলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় তিনি ঘোষণা করলেন যে, দীর্ঘ পথ শ্রমের পর নওয়াব সাহেবের বিশ্রাম প্রয়োজন। তিনি তার বৃদ্ধ স্বামীর অনুগমন করে তাদের একান্ত কামরায় প্রবেশ করলেন। কলম হাতে আমি একাকী রয়ে গেলাম।

আমি মন থেকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমাদের সম্পর্ক যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, এরপর কারো পক্ষেই অন্য কারো সংস্পর্শ সহ্য করা সম্ভব নয় বলেই মনে হতো। তার স্বামীর সাথে যে নির্লজ্জ ছল-চাতুরীর মহড়া তিনি দেখালেন, তার মর্ম আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না। পড়ন্ত বিকেলে যখন কক্ষের বাইরে এলেন, তার চেহারা দেখে আমি আরো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। তার কেশ আলুলায়িত, চোখের কাজল গালে মাখামাখি হয়ে আছে। আমাকে গোমড়া মুখে দেখে তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে আমার সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিলেন। তার স্বামীর সামনে আমাকে বলেছিলেন যে, আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজে আগ্রায় থাকতে হবে বলে তিনি আমার বিবির কাছে খবর পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, "আমার স্বামী তোমাকে বলবেন যে, নওয়াব শামসামুদ্দৌলা ও তার মধ্যে কি আলাপ হয়েছে।" নওয়াব রঈস যোগ করলেন, "হ্যাঁ, আমাকে যথাশীঘ্র দিল্লী ফিরে যেতে হবে। কারণ পারস্য বাহিনীর ভারত অভিযানের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। গুজব যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের কোমরে আবার তলোয়ার ঝুলাতে হবে। আর যদি সত্য না হয়, তাহলে আমি মাস খানেকের মধ্যেই ফিরে আসবো। এ সময়টায় তুমি এখানেই থাকবে এবং জেনানাদের দেখাশুনা করবে।" তার বেগম ওকালতি করলেন, "তোমার অনুগ্রহ, আমি তোমার মাথার চুল স্পর্শ করে ওয়াদা করছি, আমাদের সানুনয় নিবেদনে সম্মত না হলে আমরা তোমার সাথে আর কখনো কথা বলবো না।"

যদিও আমি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তবু আমার নিজের পছন্দ অপছন্দের বালাই ছিল না। অতএব আমি তাদের কথায় রাজী হলাম। সেই সন্ধ্যায় আগ্রার বহু সম্ভ্রান্ত নাগরিক নওয়াব রঈসের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো এবং তার কুশলাদি ও দিল্লীর খবর জিজ্ঞাসা করলো। উত্তর দিতে তিনি খুব সতর্কতা অবলম্বন করলেন এবং দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললেন। "দিল্লীর লোকজন

কি বললো সে বিষয় নিয়ে অহেতুক উদ্বিগ্ন হবেন না। আজ শুকনো রুটি ও ডালের দাওয়াত গ্রহণ করুন, আর তকী সাহেবের কবিতা শুনে যান। তকী মীরের 'কালাম' যদি না শুনে থাকেন, তাহলে আপনারা কিছুই শোনেননি।"

প্রচুর খানাপিনার পর শুরু হলো মুশায়রা। কোন মন্তব্য না করে দীর্ঘক্ষণ অত্যন্ত নিম্নমানের কবিতা শুনলাম। একজন ভৃত্য আমার হাতে এক টুকরা কাগজ এনে দিলো। বুঝতে পারলাম বেগম সাহেবার লেখা, "তোমার কালাম যেন বাজে না হয়।" আমার সামনে মোমবাতি স্থাপন করা হলো। মনে হলো পর্দার পেছন থেকে তার দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ হয়ে আছে। আমার কালাম শুনতে তিনি কান খাড়া করে আছেন ঃ

"রাতের আঁধারে মীর তকী
বিধ্বস্ত হৃদয় এক মানব
তার মুখে যা উচ্চারিত হয়
তা যেন আর্তনাদ
কিন্তু যখন সে প্রেমের পথে
যাত্রা শুরু করেছিল
তখন সে ছিল
আগুনের মতো জীবন্ত
এখন সবকিছু নিঃশেষিত এবং
মীর চিতার তল দেশের
ভস্মের মতো।"

আমার কালামের জন্যে পুনঃ পুনঃ অনুরোধের দরুন শেষ রাত পর্যন্ত মুশায়রা চললো। যতক্ষণ মুশায়রা চলছিল, ততক্ষণ ধরে আমার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল প্রশংসার মদিরা। এরপর সবাই চলে গেলে আমি ছাদে একটা খাটিয়ার উপর একাকী শুয়ে পড়েছিলাম। অসংখ্য তারকা আমার দুঃখকে অবলোকন করছিল। আমার ভিতরে ক্রোধের বাষ্প জমে আছে। যে ছাদে শুয়েছিলাম, তার নীচেই সেই রমণী তার দুই উরুর মাঝে অন্য এক পুরুষকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সে তো আমাকেও তার শয্যাসঙ্গী করেছিল। স্বামীর সাথে তার সম্পর্কের কোনরূপ পরিবর্তন না করলেও সে আমাকে বিবির কাছে আগন্তুকে পরিণত করেছে। আমার নিজেকে পরিত্যক্ত ও প্রতারিত মনে হলো। নিজের সাথেই আমার আচরণ যথার্থ মনে হচ্ছিল না এবং বহুদিন পর্যন্ত বেগম সাহেবা আমাকে ডেকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেও অন্যদিকে চেয়ে উত্তর দিতাম।

নওয়াব রঈস রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, আমি তার সঙ্গে দিল্লী দরওয়াজা পর্যন্ত গেলাম। তাকে বিদায় দিয়ে হাভেলীতে ফেরার পরিবর্তে আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে চললাম।

অপরাহ্নে আমি বিবিকে শয্যায় টেনে নিয়ে বর্বরের মতো তাকে উপভোগ করলাম। প্রথমবারের পর এভাবে আমি আর কখনো ওর উপর উপগত হইনি। নিরীহ রমণী কৃতজ্ঞচিত্তে আমার দলনকে সহ্য করলো। কারণ আমি প্রমাণ করতে পেরেছি যে, তাকে আমি ভালবাসি। (সেই বিকেলেই সে আমার দ্বিতীয় সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে) সন্ধ্যায় বেগম সাহেবার দাসী খাদ্য ও ফলমূল ভর্তি ঝুড়ি নিয়ে হাজির হলো। নাসিমা নামের দাসীটি বেগম সাহেবার প্রেরিত পত্র আমার হাতে দিলো। আমার কবিতা দিয়েই চিঠির শুরু- 'দীর্ঘদিন ধরে কোন চিঠি বা বার্তা পাঠানো হয়নি; বিশ্বস্ততার রীতি শেষ হয়ে গেছে।' চিঠিতে বলা হয়েছে, আমাকে ছাড়া তার বিশ্ব নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। আমি যদি সকালের মধ্যে ফিরে না যাই, তাহলে তিনি বিষপান করবেন এবং তার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী হবো। আমার ক্রোধ সহসাই নির্বাপিত হলো। মনস্তাপে হৃদয় পরিপূর্ণ হলো। দাসীকে বলে পাঠালাম যে, আমি সকালেই তার খেদমতে হাজির হবো।

ক্ষমা প্রার্থনার আপীল করতে আদালতে হাজিরা দেয়ার অপরাধীর মতো আমি হ্যাভেলীতে

গেলাম। আমার দিকে দৃষ্টি না দিয়েই বেগম সাহেবা নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'মীর সাহেব আমাদের সাথে ভিক্ষুকের মতো ব্যবহার করেন। যখন তিনি খুশী থাকেন, তখন আমাদের ভিক্ষাপাত্রে তার অনুগ্রহের কিছুটা ছুড়ে দেন।" আমি নিরুত্তর ছিলাম। তার পুত্রদের পড়াতে আমি কয়েক ঘন্টা কাটিয়ে দিলাম। তিনি কোন বাক্য ব্যয় না করে দুঃখ ভারাক্রান্ত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে ছিলেন। বিকেলে নাশতা সেরে আমি আমার কক্ষে চলে গেলাম। বালিশের উপর রক্ষিত এক টুকরা কাগজ চোখে পড়লো। তাতেও বেগম সাহেবার কাছে আবৃত্তি করা আমার কবিতার ক'টি লাইন-

"জীবন হচ্ছে রেখা টানার মতো
অবয়ব এক ধরনের বিশ্বাস
কালের অনুগ্রহকে আমরা বলি বয়স
এ হচ্ছে প্রতীক্ষার আরেক রূপ।"

সারাটা বিকেল আমি তার প্রতীক্ষা করলাম। বেগম সাহেবা এলেন না। সন্ধ্যায় আঙ্গিনায় তাকে একা পেয়ে শুকনো কণ্ঠে জানতে চাইলাম যে, আমার বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার এজাজত আছে কিনা? তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার জানাযায় আসতে দ্বিধা করো না।' কথাটা বলেই দোপাট্টা দিয়ে মুখ ঢেকে তিনি দৌড়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

কোন উত্তেজনাপূর্ণ নাটকে আমি প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইনি। আমার ইচ্ছা ছিল, নওয়াব রঈস আমাকে তার সাথে দিল্লী নিয়ে যাবেন এবং আমি এই নারীর ছোবলমুক্ত হতে পারবো। কারণ তিনি আমাকে এমন করে তুলেছেন, যেন আমি মধুর হাড়ির চারদিকে ঘুর ঘুর করা মাছি। অন্য মাছিরা এখনো আসেনি। রাতের খাবার শেষে ভৃত্যরা ধোয়ামোছার কাজ করছিল, তখনই বেগম সাহেবা আমার কক্ষে প্রবেশ করলেন। ভিতর থেকে দরজার খিল লাগিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি তাকে বাধা দেবার আগেই তিনি আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। আগ্রার শ্রেষ্ঠ ধনী নওয়াবের বেগম একজন দরিদ্র শিক্ষক ও কবির পায়ে পড়ে কাঁদছিলেন!

চোখে তার অশ্রুর বন্যা। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'তুমি আমার উপর রাগ করেছ, যেভাবে খুশী আমাকে শাস্তি দাও। আমাকে আঘাতে জর্জরিত করো, যা খুশী করো, কিন্তু আমার উপর রাগ করো না।' আমি জোর করে তাকে খাটিয়ার উপর তুলে এনে হাত দিয়ে অশ্রু মোচন করলাম। তিনি আমার মাথাটা তার বুকের উপর চেপে ধরলেন। তার চোখ ও ঠোঁটে চুমু দিলাম। তিনি অনুনয়ের সুরে বললেন, 'চলো এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে আমরা বিয়ে করি। আমি আমার স্বামীকে ঘৃণা করি। আমি চাই না যে, সে আর আমাকে স্পর্শ করুক।' আমি বললাম, 'আপনার সন্তানদের কি হবে? আর বদনাম?' গভীর দৃষ্টিতে তিনি আমার চোখে চোখ রাখলেন, 'তোমার সাথে থাকতে এবং তোমার খেদমত করতে আমি সবাইকে, সবকিছুকে পরিত্যাগ করবো। আমার সাথে শুধু ওয়াদা করো যে, আমাকে বিয়ে করবে। আমি ওয়াদা করলাম। আমি তখন চরমে, প্রত্যাহার করতে সচেষ্ট, তার দুই পায়ের বাঁধনে বেগম সাহেবা আমাকে আঁকড়ে ধরে ফ্যাস ফ্যাসে গলায় চীৎকার করে বললেন, 'যা খুশী ঘটুক, আজ রাতে আমি তোমার।'

প্রথম দফা শেষ হলে আমি শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলাম যে, তিনি কি তার স্বামীর প্রতি অনুরক্ত। রাগত সুরে তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কি ধরনের রমণী হিসেবে গ্রহণ করেছো। আমি যখন তোমার সাথে ভালবাসায় লিপ্ত, তখন আর কি করে আমার দেহ অন্যকে দিতে পারি? জানি, এমন হলে আমাকে দেখে তোমার খারাপ লাগবে। অনেক সময় পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয়, তাই নয় কি? আমার ব্যাপারে তুমি কি তোমার বিবির কাছে অবিশ্বাসী?' প্রশ্নটা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিলাম, 'আপনার কি মনে হয়, তা সম্ভব?'

আমরা আবার প্রেমের খেলায় ফিরে গেলাম। কামশাস্ত্রে এ যাবত যা লিখা হয়েছে এবং যেসব প্রক্রিয়া কোথাও লিখা নেই, সবই আমরা একে অপরের উপর প্রয়োগ করতাম।

আমাদের নিজস্ব কিছু পরিভাষা ছিল। তিনি ছিলেন আমার কাছে 'কামার' বা চাঁদ, আমি তার

'জান' অর্থাৎ জীবন। এমনকি আমরা আমাদের যৌন অঙ্গের নিজস্ব নামকরণ করেছিলাম। আমারটা 'রাজা বাবু', তারটা 'বহুরাণী'। মাসের অপরিচ্ছন্ন অবস্থাকে তিনি বলতেন 'আলাপচারিতা ও পরিদর্শনের সময়'। বার্ধক্য তিনি পছন্দ করতেন না। আমরা একটা ব্যাপারে স্থির করেছিলাম যে, প্রতিটা সংযোগ পরিপূর্ণভাবে সফল হতে হবে। আমি যদি বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ি, তাহলে তিনি ধৈর্যের সাথে আমার কামনা পূরণ করতেন। তার স্বাভাবিক পথটা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বেগম সাহেবা আমার উপভোগের জন্যে উদারভাবে অন্যান্য উপায়ের সন্ধান দিতেন। কিন্তু এরপরও কি কোন পুরুষ কোন নারীকে ভালো করে জানতে পেরেছে? অথবা কোন নারী পুরুষকে? আমি কয়েকটা লাইন লিখে ফেললাম-

"আবেগ আমাদেরকে নশ্বর করেছে
মানুষ যদি আবেগের দাস না হতো
তাহলে তো ঈশ্বরই হতো।"

এভাবেই দিন ও রাতগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল। যখন আমরা একত্রিত হতাম, পরস্পর অতীতের কথা বলে কাটাতাম। নিজের সম্পর্কে বলার মতো আমার তেমন কিছুই ছিল না। বেগম সাহেবা আমার কাছে বলার কিছুই বাকী রাখেননি। অপদার্থ 'পতঙ্গের' সঙ্গে তিনি জড়িত হয়েছিলেন। সে গান গেয়েছিল শুধু একথা প্রমাণ করতে যে, সে একজন প্রেমিক। বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়ে বেগম সাহেবার সাথে প্রতারণা করেছিল। আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন কিছু ছিল না, যা আমরা জানি না। নারীর সাথে সম্পর্কের পর একজন পুরুষের পক্ষে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু নারীর জীবন এলোমেলো হয়ে গেলে সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। বেগম সাহেবার মতো নারী নিজেকে আমার কাছে পেশ করে এ কথা প্রমাণ করতে সচেষ্ট যে, তার জীবনে আমিই একমাত্র পুরুষ। আমি নারীর কতটুকু জানতে পেরেছি?

লোকজন যে কানাঘুষা শুরু করেছে তা খুব বেশীদিন হয়নি। স্বামীর কানে তার বদনাম করা হচ্ছে কিনা, এই বিষয়টি ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে বেগম সাহেবার কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হলো না। তার ভৃত্যরা জানতো যে, বেগম সম্পর্কে কথার সামান্য এদিক সেদিক হলে তা তাদের পরিবারের ধ্বংস ডেকে আনবে। নওয়াব রঈসকে বলার জন্যে তারা একটা কথাই স্থির করে রেখেছিল যে, তার বিদায়ের পর বেগম সাহেবা খাওয়া দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন এবং তার ঘরে ফিরে আসার জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে প্রার্থনা করতেন। বৃদ্ধ স্বামী অত্যন্ত উৎকণ্ঠা অনুভব করতেন। এমনই হচ্ছে মানুষের অসারতা। যা হোক, হাভেলী আর আগ্রা শহর এক নয়।

যখন আমি বাজারে যেতাম, যারা আমাকে চিনতো, তারা দুইভাবে আমাকে গ্রহণ করতো। "মীর ভাই, আপনার কলমের কি ক্ষমতা। এ কলম হৃদয়কে ছিন্ন করে, পাজামাকেও বটে।" অথবা পিঠে চাপড় দিয়ে বলতো, 'মীর তকী, ভাগ্য তোমার উপর কতো প্রসন্ন।' একদিন সন্ধ্যায় আমি পরিবারবর্গের কাছে গিয়েছি। আম্মা একপাশে নিয়ে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'বেটা তকী, নানা মুখে তোমার সম্পর্কে বহু গল্প ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের মুখে কেউ তালা লাগাতে পারে না। আগ্রার সবাই বেগম সাহেবা ও তোমার সম্পর্কে বলে বেড়াচ্ছে। আমি এর একটাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু এই কথাগুলো যদি তার স্বামীর কানে যায়, অনুমান করতে পারো, সে তোমাকে কি করতে পারে? তার রাগ ভয়ানক। আমাদের সবাইকে হত্যা করতে সে মোটেও দ্বিধা করবে না। হাভেলীতে যাওয়া বন্ধ করার জন্যে আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। কিছু একটা অজুহাত দেখাও। বলে দাও, তোমার মা মরণাপন্ন। যা খুশী একটা কিছু বলে দাও।'

আম্মা আমাকে যা বলেছিলেন, আমি বেগম সাহেবাকে বললাম। তিনি আবার চিন্তিত হয়ে পড়লেন, 'মানুষের মন এতো নোংরা!' এরপর তার আবেগে তেমন উচ্ছ্বাস দেখা গেলো না। তিনি বলতে লাগলেন, মোগল দরবারের আমার স্বীকৃতি লাভ কতো গুরুত্বপূর্ণ। একমাস পর তিনি তার স্বামীর একটা চিঠি পড়ে শুনালেন। তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি আমাকে রাজ দরবারে প্রেরণের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছেন এবং সেই পদ গ্রহণের জন্যে আমার দিল্লী যাওয়া প্রয়োজন। বেগম সাহেবা বললেন, 'আমার জীবন নিঃসঙ্গতায় ভরে যাবে। কিন্তু যখন আমি দেখবো যে, সারা

হিন্দুস্থানে তোমার তারকা উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে, তখন বলতে পারবো, এই লোকটি আমার প্রেমিক ছিল, আমি তার প্রেমিকা।'

আমার বিদায়ের দিনে তিনি সবুজ রেশমী রুমালে জড়ানো কিছু সোনার আশরফী এনে আমার কানের কাছে ঠোঁট রেখে বললেন, 'ফালাহু খাইরুন হাফিজা ওয়াহুয়া আরহামুর রাহিমিন।' আল্লাহ সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা, তিনি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।' আমার হাত জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'যেখানেই যাও, আল্লাহ তোমার সঙ্গে আছেন। কোনো ক্ষতি থেকে তিনি তোমাকে রক্ষা করুন।' অবশ্য 'আল্লাহ তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনুক'- তার দোয়ায় এ কথাটি ছিল না।

বিদায় নেবার আগে আমি কয়েকটা লাইন রচনা করে আমার স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে তার কাছে দিয়ে গেলাম-

"তুমি এসেছিলে আপন অস্তিত্ব নিয়ে
যা তোমার মধ্যেই হারিয়ে গেছে
জানি না তুমি কি এবং কাকে
সন্ধান করছো?
আমি যদি কাউকে চাই, সে তুমি
কাউকে যদি দেখতে চাই, সে তুমি
তুমি আমার হৃদয়ের আকাংখা
আর দৃষ্টির প্রার্থনা।"

আমার আগ্রা পরিত্যাগে বেগম সাহেবা দুঃখ অনুভব করবেন, না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এমন কি তার ব্যাপারে আমার নিজস্ব অনুভূতিও ভোতা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমতঃ আমার মনে হলো, আমি পিঞ্জরমুক্ত এক বিহঙ্গ। মুক্তির আনন্দে আমি গান গাইতে চাচ্ছিলাম। এক সময় সোনার পিঞ্জরটা হারানোর অনুতাপও হলো। দু'বছরের অধিক সময় ধরে বেগম সাহেবা এই পিঞ্জরে আমাকে আটকে রেখে শুনিয়েছেন প্রেম সঙ্গীত। মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন এবং আমার পরিচর্যা করেছেন। জানি না, আমি তার প্রেমে পড়েছি কি না। হয়তো তার প্রেমই আমাকে আমার মূল্য সম্পর্কে সচেতন করেছে, আর আমি নিজেই আমার প্রেমে পড়েছি। মথুরায় আমাদের তৃতীয় যাত্রা বিরতির সময় আমার বৃদ্ধা মা, ছোট ভাই, যার উপর আমার স্ত্রী ও দুই বছর বয়স্ক পুত্র কাল্লুর দায়িত্ব অর্পণ করেছি, তাদের সবার চাইতে আমার কামরুন্নিসার কথাই বারবার উদিত হচ্ছিল মনে।

সময়টা গোলযোগপূর্ণ। জাঠ, গুজ্জার, মারাঠা এবং রোহিলারা দলবদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র অসহায় যাত্রীদের উপর চড়াও হয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন করছিল। এমনকি আগ্রা হতে দিল্লী পর্যন্ত দীর্ঘ রাজপথও হামলার আশংকামুক্ত ছিল না। নিজেই প্রশ্ন করলাম, "ওহে মীর, যাত্রালগ্নেই কন্টকের অভিযোগ কেন, দিল্লী এখনো বহুদূর।" আমি সশস্ত্র অশ্বারোহী ও পদাতিক বেষ্টিত শকটের আরোহী। সামনে পিছনে প্রহরা। আমাদের ভ্রমণ শুধু দিবাভাগে। রাতে সুরক্ষিত সরাইখানায় বিশ্রাম। গিয়াসপুরে পৌছে আমি সহযাত্রীদের ছেড়ে হযরত নিজামুদ্দিন আওলিয়া এবং যার কবিতা আমার অনুপ্রেরণার উৎস, সেই খাজা আমীর খসরুর মাযারে গেলাম আমার ভক্তি নিবেদন করতে। সম্রাট হুমায়ুনের স্মৃতিসৌধের কাছে আরব সরাই- এ দু'দিন দু'রাত অতিবাহিত করলাম। শ্বেত পাথরের স্তম্ভ থেকে আমি মহান মোগলদের পত্তন করা নগরীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। অনাগত দিনগুলোতে আমাকে এই নগরীতেই কাটাতে হবে।

নগরীতে প্রবেশ করলাম দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে। আমাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য নওয়াব রঈস প্রহরারত হাবিলদারকে পূর্বাহ্নেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। নওয়াব রঈস যে প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন, সেখানে পৌছে দেয়ার জন্য হাবিলদার আমার সাথে একজন প্রহরী দিলো। নওয়াব আমার ব্যাপারে অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু আমি তার নিমক খেয়ে তার বেগমের প্রেমিক হয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছি। তার অনুপস্থিতিতে বেগম সাহেবা ও সাহেবজাদারা কেমন পীড়া অনুভব করেন, তা তাকে বলেছি বেশ গুছিয়ে।

নওয়াব রঈসের আনুকূল্যে ফতেপুরী মসজিদের কাছে এক বাজারে দুটি কক্ষ ভাড়া করতে সক্ষম হলাম। জায়গাটি নোংরা এবং সুবিধাজনক নয়। আমার কাছে যে অর্থ আছে সে তুলনায় এটাই আমার জন্য উত্তম। আমি বলতাম, 'অহংকারীদের কবর।' দিনপঞ্জীতে একটা বর্ণনাও লিখে ফেললাম। 'গৃহের প্রাচীর ছিদ্র ও ফাটলে পরিপূর্ণ। ধুলো ঝরছে সব জায়গা থেকে। এক কোণায় ছুঁচো। আরেক গর্ত হতে বের হচ্ছে ইঁদুর। চামচিকে আমার নিত্যসঙ্গী। মশকের গুণগুণ শব্দ সারাক্ষণ। মাকড়সার জাল ঝুলছে দেয়ালে। রাতে বিচিত্র সব আওয়াজ। ঘরের প্রান্তদেশ কাঁত হয়ে আছে। দরজা জানালা যেন খুলে খুলে যাচ্ছে। দেয়ালের প্রস্তরখন্ড বেরিয়ে পড়েছে। ছাদের কড়ি-বরগা মরচে ধরে জীর্ণ হয়ে গেছে। এই হলো মীর তকীর নিকুঞ্জ। এখানে সে কাটিয়েছে প্রহরের পর প্রহর।'

কয়েক দিবস পর নওয়াব রঈস আমাকে নওয়াব শামসামুদ্দৌলার ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ ওয়াসিতের কাছে নিয়ে গেলেন। মোগল সিংহাসনের পশ্চাতে তার অপরিসীম ক্ষমতা। মুশায়রায় আমার কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারলে তিনি আমাকে সহযোগিতা করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই মুশায়রায় তার পিতৃব্য সম্মানিত অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। ফৈয়াজ বাজার, যাকে দরিয়াগঞ্জও বলা হয়, সেখানে এক বিশাল প্রাসাদের ছাদে মুশায়রা আয়োজিত হলো। পূর্ণিমা রাত। মনে বারবার উদয় হচ্ছিল আমার কামরুন্নিসার কথা। গোলাপ ও জেসমিন পত্র খচিত তুষারশুভ্র চাদরে গালিচা আচ্ছাদিত। প্রান্তের দিকে রাখা হয়েছে তাকিয়া। সারি বাধা শরবতের সোরাহী। যমুনার দিক হতে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহমান। তাতে গোলাপ ও জেসমিনের খুশবু। আমন্ত্রিত হয়েছেন শুধু নগরীর ওমরাহরা। এক ডজনের অধিক বিশিষ্ট কবি উপস্থিত। তাদের মধ্যে আমার বিমাতার ভ্রাতা খ্যাতনামা কবি সিরাজুদ্দিন আলী খান আরজুও উপবিষ্ট। শ্রোতৃমন্ডলীর অধিকাংশই আমার নাম শ্রবণ করেছেন। কিন্তু আমাকে দর্শন করেননি এবং কবিতাও শোনেননি। আমি খুব অসহায় বোধ করছিলাম এবং তালু শুষ্ক রাখার জন্য বারবার জামায় হাত ঘষছিলাম। এ ধরনের সমাবেশে কোন্ কবিতাটি আবৃতি করবো ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

দরবারের নওয়াবদের আগমণ শুরু হলো। তাদের প্রত্যেকের নাম ঘোষণার সাথে আমরা দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করছিলাম। সবশেষে এলেন নওয়াব শামসামুদ্দৌলা। সকলে শির অবনত করে তাকে কুর্নিশ করলো। তিনি সবার অভিবাদন গ্রহণ করে সবাইকে আসন গ্রহণ করতে ইশারা করলেন। একটু পর গৃহকর্তা ঘোষণা করলেন যে, মুশায়রা শুরু হবার আগে কবি ও মেহমানরা গোঁফ ভিজিয়ে নিলে নওয়াব শামসামুদ্দৌলা কৃতার্থ হবেন। এ ঘোষণায় সবাই প্রীত হলেন। জীবনে এই প্রথম কোন মুশায়রায় আমাকে শরবত ছাড়াও শরাব পরিবেশন করা হলো। হাতে হাতে ঘুরছিল পান পাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে সবার মওজ এসে গেল। এর আগেও আমি শরাব পান করেছি। কিন্তু এতো চমৎকার নয়। এ শরাব কান্ধার আঙ্গুরের তৈরী। আমার উদর শরাবের উপযুক্ত নয়। উপলব্ধি করলাম, দিল্লীতে আমার প্রথম মুশায়রায় আমি আহম্মক প্রতিপন্ন হবো। নগরীতেও সবার হাসির পাত্রে পরিণত হবো। অতএব কবিতা শেষে আমার পানপাত্র পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দিল্লীর কবিদের আবৃতি মধ্য দিয়ে মুশায়রা শুরু হলো। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু পতঙ্গ, আগুনের শিখা, বুলবুল, গোলাপ, লায়লা ও মজনু। নতুন কোন ভাব বা ছন্দ নেই। তবু উচ্চকণ্ঠে তাদের প্রশংসা উচ্চারিত হলো। দীর্ঘ মুশায়রার শেষভাগে আমার সামনে বাতি স্থাপন করা হলো। গৃহকর্তা আমার নাম ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, বয়সে আমি নবীন হলেও আগ্রার ঘরে ঘরে আমার নাম এবং এই প্রথম দিল্লীর মুশায়রার হাজির হয়েছি। তার সৌজন্যের কারণে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললাম যে, আমি যে কবিতা আবৃতি করতে চাই তা প্রেমের পুরনো একটি কবিতা এবং আগ্রায় এটি উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। মুশায়রার অবস্থা লক্ষ্য করে আমি সেটি আবৃতির অনুমতি প্রার্থনা করলাম। শরাবের ছড়াছড়ি দেখেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। (সত্যি বলতে কি, একরাতে বেগম সাহেবা যখন আমার উপর শুয়ে তার মুখের শরাব আমার মুখে ঢেলে দিচ্ছিলেন, তখন কবিতাটা রচনা করেছিলাম।) আওয়াজ উঠলো 'ইরশাদ! ইরশাদ!' শরাব পানের আচ্ছন্নতার উপর রচিত কবিতা আবৃতি শুরু করলাম-

"বন্ধুরা, ক্ষমা করো। তোমরা তো দেখেছো!
আমি মাতাল হয়ে গেছি
তোমাদের পাত্র যদি শূন্য থাকে
তাহলে তা পূর্ণ করে দাও
কারণ আমি মাতাল।

পাত্র যখন হাতে হাতে, আমাকে
শুধু একটা চুমুক দিতে দাও
আমাকে পূর্ণ করতে নয় শুধু
আমার ঠোঁট ভেজাতে
কারণ আমি মাতাল।

যদি বাজে কিছু বলে ফেলি, তা শুধু
পান করার কারণে
আমাকে যদি নাম ধরেও ডাকো, আর
আমার সম্পর্কে যাই ভাবো
তা আমার মাতাল হবার কারণেই
হয় আমাকে ধরে রাখো, যেমন করে
তুমি পান পাত্র ধরো
কিংবা আমার কাছে একটু এসে
আমাকে তোমার সঙ্গ দাও
কারণ আমি মাতাল।

আমার কিইবা করার আছে
যদি হাঁটতে চেষ্টা করি
তাহলে হোঁচট খাই
আমার সাথে তর্ক করো না, দয়া করো
অসন্তুষ্ট হয়ো না
কারণ আমি মাতাল।

শুক্রবারের জুম'য়ার নামায কখনো
দৌড়ে পালাবে না
তুমি যদি একটু থাকো
আমি তোমার সাথে আসবো
কারণ আমি মাতাল।

মীর তকীর মর্জি হলে সে নরকের মতো
স্পর্শকাতর হতে পারে
সেতো ভঙ্গুর কাঁচের মতো
তার সাথে স্বাধীনতা খুঁজো না
কারণ সে মাতাল।"

মুশায়রা অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ওমরাহদের প্রত্যেকে আমাকে আলিঙ্গন করছিল। হাতে গুঁজে দিচ্ছিল মুদ্রা। আমাকে নওয়াব শামসামুদ্দৌলার কাছে নেয়া হলো। তিনি আমাকে তার হস্ত

চুম্বন করতে দিয়ে উদারভাবে আমার সাথে কথা বললেন। 'বেটা, আমি তোমার আব্বার মুরিদদের একজন। তোমাকে দিল্লীতে দেখে অনুমান করেছি, তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমি তার কাছে অনেক ঋণী। তোমার কাছেই সে ঋণ পরিশোধ করতে চাই। সকালে আমার বাসভবনে এসো। আমরা দেখবো, তোমার জন্য কি করতে পারি।'

আমি পুনরায় তার হস্তচুম্বন করে উপবেশন করলাম। পানপাত্র বারবার পূর্ণ করে আমি পানির মত শরাব পান করলাম। আমার মাথায় নানা প্রশ্ন। অন্য কবিরা কি বলেছিল, আমি তা শুনিনি। রাতের খাবার পরিবেশনের পূর্বেই আমি মুশায়রা থেকে বেরিয়ে এলাম। দুনিয়া মাতালকে মার্জনা করে দেয়। আলোকোজ্জ্বল নগরীতে আমি হাঁটছি। কান্ধারী শরাবের প্রভাবে সবকিছুই সুন্দর লাগছিল। রাজপথ আচ্ছাদিত। গভীর নীলাকাশে তারার ঝিকিমিকি। আমার পদদ্বয় একটু টললেও ফৈয়াজ বাজার হতে জামে মসজিদ, গণিকালয়ের রাস্তা, চৌরী বাজার হয়ে হিজড়া পল্লী হুয়াজ কাজী পর্যন্ত পৌঁছতে কোন বিঘ্ন ঘটলো না। আমি ভাবছিলাম, আমার সাথে যদি শুধু কামরুন্নিসা থাকতো তাহলে দু'জন কতটা সুখী হতাম এবং অন্য কবিদের উপর আমার বিষয়কে কিভাবে উপভোগ করতাম। একটি পান দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। পান ক্রেতাদের ভিড় ঠেলে আদেশ দিলাম, তোমার সেরা পান আমাকে দাও। পানওয়ালা আমাকে এক নজর দেখে বললো, 'মীর সাহেব, আপনাকে এমন পান দেব, যা আগে কখনো খাননি। তাহলে হয়তো, আপনি আমার পানের উপর কাসিদা লিখে তাতে আমার নামটাও জুড়ে দেবেন।' সে আমাকে চিনতে পেরেছে দেখে প্রীত হলাম। প্রশ্ন করলাম, 'তুমি আমাকে চিনলে কি করে?' সে হেসে বললো , দিল্লীতে এমন কে আছে যে মীরের কালাম শুনেনি। সবার মুখে মুখে আপনার নাম।'

পানওয়ালা তার তাম্রপাত্র হতে এক গুচ্ছ পানপাতা বের করে সুন্দর পানটা বাছাই-এর পর তাতে চুন ও খয়ের মাখালো। এরপর সুগন্ধি সুপারি ও জর্দা রাখলো। অতঃপর মুক্তাভস্ম, সুবর্ণভস্ম ছড়িয়ে দিলো পানের ওপর। পানটা নিপুণতার সাথে ভাঁজ করলো। সবশেষে সোনালী তবকে পানটা মুড়িয়ে আমার হাতে দিলো- 'দিল্লীতে আমরা এ পানকে বলি 'পালং তোর,' শয্যাবিলাসী। আপনি খেয়ে পরীক্ষা করুন। আমার কথা যদি সত্য না হয়, তাহলে আমার নাম শাহজাহানাবাদের বিখ্যাত পানওয়ালা হরিরাম চৌবাসিয়া নয়।'

অন্য লোকদের উপস্থিতিতে আমার সাথে এ ধরনের বাক্য বিনিময় প্রীতিকর মনে হচ্ছিল না। তাকে একটা রজত মুদ্রা দিয়ে লাল কুয়ানের দিকে অগ্রসর হলাম। পানটা মুখে পুড়েছি। পানের মধ্যে কড়া সব উপাদান। আমার সারাদেহে ঘাম ছুটলো। হঠাৎ নজরে পড়লো পান দোকানে দেখা এক ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করছে। ঘুরে প্রশ্ন করলাম, 'আমার সাথে আপনার প্রয়োজন আছে?'

অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করে লোকটি বললো, 'মীর সাহেব এমন সুন্দর রজনী তো প্রেমের জন্যে। জনশূন্য রাজপথে পদচারণা করার জন্যে নয়। আমি দিল্লীর সেরা সুন্দরীর কাছে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি। রাজরক্তের অধিকারী রাজকুমারীর চাইতে কোন অংশেই কম নয় সে। আর ওর বয়স বড়জোর ষোল বছর। সে যদি আপনার জীবনের কিমত না দিতে পারে তো আমার নাম চঞ্চল মিয়া নয়।'

জানিনি, না শরাব, পান অথবা আমার চন্দ্রমুখী কামরুন্নিসা, কোনটির প্রভাব আমাকে সকল সতর্কতা সত্ত্বেও সেই গণিকার দালালের পিছু পিছু লাল কুয়ানের অন্ধকার সংকীর্ণ গলিপথে নিয়ে গেল। আলো আঁধারির মধ্যে সে এক দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিল। কর্কশ নারীকণ্ঠে ভিতর থেকে জানতে চাইল, 'এতো রাতে দরজায় কে?' চঞ্চল জানালো, 'দরোজা খোল, সঙ্গে খদ্দের আছে।'

এক বৃদ্ধা দরজা উন্মুক্ত করে আমাদেরকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিল। বৃদ্ধা আমাকে সালাম জানিয়ে বললো, 'বড় বিলম্বে এসেছেন। একটু অপেক্ষা করুন। আমার কন্যাকে জাগ্রত করে আপনাকে স্বাগত জানাতে পাঠাচ্ছি। হুজুর কি পান কিনে আনার জন্যে কিছু দিতে পারেন?' সান্ধ্য মুশায়রায় আমাকে যে সুবর্ণ আশরফী দেয়া হয়েছিল তা থেকে একটা বৃদ্ধার হাতে তুলে দিলাম সে আমার উদারতায় অবাক হয়ে থাকবে। কিন্তু অভিজ্ঞ রমণী আঙ্গুলের ফাঁকে মুদ্রাটি আমার দিকে বাড়িয়ে বললো, 'আপনার মতো শরীফ লোকের কাছে আমার আরো বড় আশা ছিল।' আমি তাকে আরেকটি আশরফী দিলাম। সে দালালকে বিদায় করে আমাকে অন্দরে নিয়ে গেল।

আলো জ্বললো। বৃদ্ধা শুকনো ফলপূর্ণ একটি ঝুড়ি আমার সামনে আনলে আমি হাতের

ইশারায় তাকে নিবৃত্ত করলাম। কয়েক মুহূর্ত পর তার কন্যা চোখ কচলাতে কচলাতে কক্ষে প্রবেশ করলো। তার বয়স কম এবং সুন্দরী। আমার কামরুন্নিসাও এই বয়সে সম্ভবত দেখতে এমনই ছিল। সুদর্শনা, গোলগাল মুখ। কিন্তু একটু লাজুক। 'একটু রয়ে সয়ে তার সাথে আচরণ করো, এখনো সে বালিকা-' বলেই বৃদ্ধা রমণী কক্ষ ত্যাগ করলো।

আমি বালিকাকে একটি সুবর্ণ আশরফী দিয়ে বললাম, এটি তোমার। তোমার মা বা দালালকে বলো না। সে মুদ্রাটি গ্রহণ করে ও মাথা আমার কোলে রেখে কাঁদতে আরম্ভ করলো। আমি প্রথম ওর চুলে, এরপর পিঠে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। আমার তার ঘাগড়ার ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে তার সুগোল পুষ্ট নিতম্বে চাপ দিলাম। আমার উত্তেজনা জাগছে। সে আমার পাজামার গিট খুললো। তাকে বিছানায় ফেলে তার ভিতরে প্রবিষ্ট হলাম। আমি কি কামরুন্নিসার কাছে বিশ্বাসভঙ্গ করলাম? না, মোটেই না। এই ছোট্ট বালিকার মধ্যে আমি তো তাকেই উপভোগ করছি। আমরা উভয়ে দীর্ঘক্ষণ শায়িত ছিলাম। শরাব এবং পানের উপাদান আমাকে সুদীর্ঘ সময় উত্তেজিত রাখার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

সে বার বার চরমে উঠলো এবং যখন তার দেহের মধ্যে আমার উত্তাপ ঢেলে দিলাম তখন সে ঘেমে সম্পূর্ণ ভিজে গেছে। সে উঠে নিজেকে ধৌত করলো এবং একটা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে আমার মধ্যাঙ্গ মুছে দিলো। আমার পাশে বসে সে বললো, 'চঞ্চল বলেছে, আপনি এক মশহুর কবি। এই দাসীকে উপহার হিসেবে কয়েক ছত্র লিখে দিন।' কবিতা রচনার মত মানসিক অবস্থা না থাকলেও বালিকার অনুভূতিতে আঘাত দিতে ইচ্ছে হলো না, 'আমাকে এক টুকরো কাগজ, কলম আর কালি এনে দাও। তোমার জন্যে কিছু একটা লিখে দেব।' নোট বই থেকে সে এক টুকরা কাগজ ছিড়ে আনলো। নলের একটা কলম দিলো এবং মাটির দোয়াত এনে হাতে ধরে রইলো। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে লিখলাম ঃ

'বর্ষার মৌসুমে সোরাহীর মদও
মেঘের মতো
গোলাপ উদ্যানে গোলাপগুলো
দেখতে তোমারই মতো।'

ফতেপুরীর সে বাড়ীতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় ভোর। প্রচন্ড ব্যথায় মাথা টিবটিব করছে। মুখ ঝলসে গেছে। কাপড় খোলার সময় খেয়াল করলাম তোহফা হিসেবে যে সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা লাভ করেছিলাম তার একটাও নেই। মোগল রাজকুমারী হতে আগ্রহী ষোল বছরের বালিকা ছাড়া আর কে এই কাজটা করতে পারে। সন্ধ্যায় যখন ঘর ছেড়েছি, তখন আমার পকেট শূন্য ছিল। রাতে তা ছিল সুবর্ণ ও রজত মুদ্রায় পূর্ণ। পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই পকেট আবার পূর্ববৎ হয়ে গেছে। এই হচ্ছে কবির জীবন। 'মীর তকী, তার চেয়ে ভালো, নিজ উপত্যকায় ফিরে যাও। এটা যেমন তেমন জনপদ নয়। এ হচ্ছে দিল্লী।'

নওয়াব শামসামুদ্দৌলার সামনে যখন হাজির হলাম, তখন আমার দীনহীন অবস্থা। নওয়াব অবস্থা উপলব্ধি করলেন। তার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার জন্য একটা ভাতা মঞ্জুর করার সুপারিশ করলেন। নওয়াব রক্তবর্ণ চোখ মেলে আমার পানে তাকালেন, 'হ্যাঁ, গতরাতে ওর কালাম শুনেছি। তার বিষয়টা বিবেচনা যোগ্য। তাছাড়া ওর মরহুম আব্বার কাছে আমি ঋণী। ওকে দৈনিক এক রুপেয়া করে দেয়া হোক। এরপরের বিষয় কি?'

পরবর্তী কর্মসূচীতে যাওয়ার পূর্বে আমি তার সামনে একটা কাগজ তুলে ধরে আরজ করলাম, 'আদেশটা লিখিত দিলেই বোধহয় নওয়াব সাহেব বেশী সন্তুষ্ট হবেন। বয়সে নবীন হলেও আমি বেসামরিক আমলাদের কাজের তরিকা জানতাম। তারা লিখিত দলিল ছাড়া কিছুই করেন না।

আমার ক্ষুদ্র নিবেদনে নওয়াব সাহেবের আত্মমোহিতের ভাবটা দূরীভূত হলো। তিনি ফার্সিতে বললেন, 'ওয়াক্ত-ই কলম দান নেস্ত'- এখন তো দলিল লেখকদের সময় নয়।' আমি দাঁড়িয়ে আরজ করলাম, 'আমি বুঝতে অক্ষম যে, আপনি কিভাবে আপনার বাক্য গঠন করেন। আপনি যদি এ কথা বলেন যে, এখন দস্তখতের সময় নয়, কিংবা দলিল লেখকের এখন দায়িত্ব নেই

তাহলে কথাটা বুঝতে পারবো। কিন্তু 'দলিল লেখকের সময় নেই' কথাটা ভালো শোনায় না। এটা সজীব কোন বস্তু নয়। ফলে এর যথার্থ সময়ের প্রশ্ন আসে না। আপনার হুকুমেই তাকে এখানে আনা যায়।'

নওয়াবের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, 'মীর তকী, তুমি ধৃষ্ট বালক। আমি আনন্দের সঙ্গে আমার প্রতিশ্রুতি লিখতে প্রস্তুত। তিনি স্বহস্তে আমার ভাতার কথা লিখলেন এবং তার স্বাক্ষরযুক্ত অঙ্গুরীয় দিয়ে তাতে মোহর লাগালেন, 'যাও, সুনাম অর্জন করো। তোমার কালাম তোমার আব্বার নাম উজ্জ্বল করুক। সেই সঙ্গে তোমারও খ্যাতি বয়ে আনুক।'

দিল্লীতে তখনকার জীবন কতো চমৎকার ছিল। লোকেরা তাদের কবিতা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে আমার ঘরে হানা দিতো। যেখানেই গমন করতাম, নগরবাসী আমাকে চিনে ফেলতো এবং প্রশংসা করতো। যেখানেই মুশায়রা আয়োজিত হতো, সেখানেই আমি হাজির থাকতাম উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে। শুক্রবার জুমার নামায আদায় করতে হাজির হতাম মসজিদে। যদিও আমি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করি না এবং বিশ্বাসী ও পৌত্তলিকের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে বড় কোন তফাৎ পরিলক্ষিত হয়নি। তবুও নামায শেষে সমবেত মুসল্লীদের নিকট হতে তোষামোদ পাওয়ার ব্যাপারটিকে জুমার জামাতে হাজিরা দেয়ার কারণ হিসেবে স্থির করে নিয়েছিলাম। দিল্লীর বাসিন্দারা আমাকে ভালোবেসেছিলো, আমিও তাদেরকে এবং দিল্লী নগরীকে ভালোবেসেছিলাম।

কিন্তু হায়! আমার সুখের দিনগুলো চিরস্থায়ী হলো না। শোনা গেলো পারস্যবাসী নাদির কুলী খান আফগানিস্তান কব্জা করে সিন্ধু নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছে। হামলাকারীকে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেলো। ভীতি ছড়িয়ে পড়লো দিল্লীতে। ধনী ব্যবসায়ীরা নগর ত্যাগ করতে লাগলো। আমার বিবি তার পত্রে আমাকে আগ্রা প্রত্যাবর্তন করতে অনুনয় করছিল। বেগম সাহেবা যে তাদেরকে খাদ্য ও উপঢৌকন পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন, সে কথাও সে লিখেছে। তার পুত্রের জন্য নতুন ওস্তাদ নিয়োগ করা হয়েছে। আগ্রা থেকে আগত লোকজন আমাকে বলেছে যে, যার কাছে আমার হৃদয় বিক্রি করেছি, সেই বেগম সাহেবা নতুন ওস্তাদের প্রেমে মাতোয়ারা। তার প্রেমের উপর এখন উপঢৌকনের বৃষ্টি ঝরছে। গল্পগুলো আমার বিশ্বাস হলো না। সংক্ষিপ্ত সফরে দিল্লীতে অবস্থানরত নওয়াব রইসের দিল্লী ত্যাগের পূর্বেই তার সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তিনি পারস্য বাহিনীর হামলা মোকাবেলায় তার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির তদবির করতে এসেছিলেন। আমার স্থলাভিষিক্ত ওস্তাদের উচ্ছসিত প্রশংসা করে তিনি বললেন, 'লোকটি কবি নয়, কিন্তু ওস্তাদ হিসেবে উত্তম।' তার পুত্ররাও তার খুব ভক্ত। সে মহলের একজন সদস্যই বনে গেছে এবং আগ্রা থেকে নওয়াবের অনুপস্থিতির সময় হাভেলীতেই কাটায়।

আগ্রার ঘটনা প্রবাহে মনটা আরো বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো। যতক্ষণ দিল্লী নিরাপদ, আমি দিল্লীতেই কাটালাম। দিল্লী আমাকে প্রতিপালন করছিল। নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, কোনো নারী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে তাকে মৃত বিবেচনা করাই উত্তম। তার চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাবার পরিবর্তে তাকে বিস্মৃত হওয়াই ভালো। কিন্তু তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে যত চেষ্টা করেছি, সে ততো ফিরে এসে ব্যথা দিয়েছে। আগুনে দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াতে প্রয়োজন অশ্রুর ঝর্ণাধারা। দু'এক ফোঁটা অশ্রু আগুনকে আরো ভয়াবহ করবে। তাকে আমার ছন্দে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছি যে, অন্যের চোখে তাকে দেবীতে পরিণত করেছি। আমার শব্দমালা যাকে স্বর্গীয় জ্যোতিতে দীপ্যমান করেছে, সেই নারী আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সাথে আমি দেহ বিনিময় করেছি এবং তার কারণেই আমার বিবেক আমাকে মানবতার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছে। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম।

১৭৩৮ সালের শরৎকালে নাদির কুলী খান পাঞ্জাবের সমভূমি পর্যন্ত অগ্রসর হলো। তাদের বাধা দিতে মোগল বাহিনী দিল্লী থেকে ধাবিত হলো। সেনাপতিদের মধ্যে নওয়াব শামসামুদ্দৌলাও ছিলেন। আমি মোগলদের বিজয় এবং নিরাপদে আমার পৃষ্ঠপোষকের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রার্থনা করলাম। ১৭৩৯ সালের বসন্তকালে দুই বাহিনী কর্নালে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। আল্লাহ পারসিকদের বিজয়ী করলেন। মোগল বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। হাজার হাজার মৃতের স্তূপে মীর তকী মীরের

পৃষ্ঠপোষক, শাহী খাজাঞ্চী নওয়াব শামসামুদ্দৌলাও ছিলেন। তার মহত্ব ও উদারতার মূল্যায়নসূচক কোন স্তুতি আমি রচনা করিনি। ঔদার্যের মেঘমালার মত আমার মাথার উপর তিনি ছায়া বিস্তার করেছিলেন। আল্লাহ তার রূহকে শান্তি দিন। ঈর্ষাপরায়ণ কলমবাজদের নোংরামি থেকে আমাকে রক্ষা করার মত কেউ আর অবশিষ্ট রইলো না। অথবা এমন কেউও নেই, যার কাছে আমার দৈন্য তুলে ধরতে পারি। আমি দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লাম।

কর্নালের বিপর্যয়ের খবর শোনার পর কালবিলম্ব না করে একটা ঘোড়া ভাড়া নিয়ে আমি আগ্রার পথ ধরলাম। কোন কাফেলার সাথে যোগ দেয়ার প্রয়োজন পড়েনি। কারণ গোটা পথই দিল্লী থেকে পার্শ্ববর্তী শহর ও গ্রামের দিকে পলায়নপর জনতার দীর্ঘ কাফেলায় পরিণত হয়েছিল। পারস্যবাসী হামলাকারীদের চাইতে তারা স্বদেশবাসী মারাঠা, জাঠ, গুজ্জার লুটেরাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। তারা লুণ্ঠন, হত্যা এবং তাদের কবলে পতিত নারীদের ধর্ষণ করতো। আগ্রা পৌঁছতে পাঁচদিন লাগলো। নাদির কুলী খানের বাহিনী তখন দিল্লী লুণ্ঠনে ব্যস্ত। নিজেকে বললাম, 'একটা নগরীর পুনঃনির্মাণ সম্ভব, পুনঃবসতি স্থাপনও হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর কোন শক্তিই ভেঙ্গে যাওয়া হৃদয়কে জোড়া লাগাতে পারে না।'

আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে দেয়া শহরের নাম আগ্রা। নিজ চোখে ধ্বংসস্তূপ দেখার জন্য আমি আগ্রায় ফিরে এসেছিলাম। বন্ধুরা, কান্না আমার সহজাত হয়ে গেছে। আর কতোদিন তোমরা আমার চোখ থেকে অশ্রু মোচন করবে?

আমি আমাদের যোগসূত্র এবং প্রেমের গভীরতার কথা স্মরণ করলাম যে, কিভাবে খরস্রোতা ঝর্ণায় কাগজের নৌকার মত আমরা ভেসে চলেছিলাম। প্রেম এমন এক যন্ত্রণা, যা কাউকে ক্ষমা করে না। হোক সে বৃদ্ধ বা তরুণ, বিবাহিত কিংবা কুমার। আমি মোহগ্রস্তের মত তার পায়ে পুষ্প ছড়িয়ে দিয়েছি। প্রথম দর্শনে যে নারীকে তেমন সুন্দরী বলে বিবেচনা করিনি, আমার প্রেমিকা হওয়ার পর সে কেমন করে আমার চোখে বিশ্বের সেরা সুন্দরীতে পরিণত হলো। সুন্দরীদের কোন সমাবেশে সে তারকারাজির মাঝে পূর্ণিমার চাঁদের মতো। তার হাসি প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো। তার কেশগুচ্ছ ভোরের নির্মল বায়ুতে সুগন্ধি ছড়াতো। সে আমার এতো প্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। কারণ সে ছিল আমার বাসনা। এই নারী কি করে আমার কাছে মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে? এমনকি আমার অগোচরে নতুন প্রেমিকও নির্বাচন করতে পারে?

কিন্তু এখনো তাকে কামনা করি এবং সে জন্যই আমি আগ্রায় ফিরে এসেছি। আমার মধ্যে আবেগের আগুন জ্বলছে। ভেবেছিলাম আগুন নিভে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু নিভু নিভু আগুনটা আবার জ্বলন্ত শিখায় পরিণত হলো।

শূন্য হাতে বাড়ী ফিরেছি। তবুও আমার পরিবার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে স্বাগত জানালো। এই প্রথম আমার দ্বিতীয় সন্তানের মুখ দর্শন করলাম। শুনে ক্ষুব্ধ হলাম যে, আমার আগ্রা ত্যাগের মাস খানেক পর থেকেই বেগম সাহেবা আমার পরিবারের প্রতি উদাসীন। তারা যখন শেষবার হাভেলীতে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল, তখন তিনি অসুস্থতার ভান করে সাক্ষাৎ দেননি। আমার বৈমাত্রেয় ভাই, যিনি আমাকে খুঁচিয়ে আনন্দ পান, শ্লেষ মিশিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, নতুন ওস্তাদের সাথে বেগম সাহেবের সম্পর্ক কি? সন্তানদের জন্যে তাকে নিয়োজিত করা হলেও ওস্তাদের সাথে তার ঢলাঢলি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। তার কথা তীরের মতো বিদ্ধ হয়েছে আমার হৃদয়ে।

পরদিন সকালে আমি নওয়াব রঈসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গেলাম। পারস্যের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য বৃদ্ধির পরিবর্তে নাদির কুলী খানের সঙ্গে সন্ধিতে উপনীত হওয়ার জন্য তিনি মোগলদের সমালোচনা করলেন। তার বিশ্বাস জন্মেছে যে, নাদির কুলী খান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি এবং খাঁটি মুসলমান। তার দ্বারাই হিন্দুস্থান থেকে মূর্তিপূজার অবসান সম্ভব। তিনি আমাকে জেনানা মহলে নিয়ে গেলেন। মহল যেমন দেখে গিয়েছিলাম, সবই তেমন আছে। শুধু আমার পরিবর্তে নতুন ওস্তাদ বাচ্চাদের তালিম দিচ্ছে। বেগম সাহেবা মোড়ায় বসে তাদের অবলোকন করছেন। বাচ্চারা আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল। ওস্তাদও স্বাগত জানাল। তার কুৎসিৎ চেহারায় আমি বিজয়ীর ভাব লক্ষ্য করলাম।

বেগম সাহেবার ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাকে দর্শনমাত্র তার চোখের দীপ্তি নিভে গেল।

আমার প্রতি তার দৃষ্টি এমন নির্লিপ্তের যেন তিনি কোন অচেনা লোকের সামনে উপনীত। নির্বাপিত প্রদীপের মতো স্থির তার হৃদয়। তিনি বললেন, 'আমরা শুনেছি দিল্লীতে আপনার নাম প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এটাতো আগ্রাবাসীদের জন্য গৌরবের বিষয়, অবাক হলাম যে, উপস্থিত তিনজন লোকেরই শয্যাসঙ্গী এই মহিলা নিজেকে কতটা শান্ত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আমার চোখমুখে ক্রোধ ও অভিযোগের ছায়া। ইচ্ছে হলো, এখান থেকে ছুটে গিয়ে চীৎকার করে আগ্রাবাসীর কাছে প্রকাশ করি যে, এই নারী শুধু তার স্বামীর কাছেই বিশ্বাসহন্তা নয়, প্রেমিকের কাছেও। তাহলে নগরবাসী তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, এক বার নয়, তিন তিনবার। কিন্তু আমি মুখ খুলতে পারিনি। একটা অজুহাত দেখিয়ে হাভেলী ত্যাগ করলাম। আমার জন্য গৌরববোধ করা তো দূরের কথা, আগ্রাবাসী আমার বিরুদ্ধে যেন রুখে দাঁড়াল। যারা আমার দরবেশতুল্য আব্বাজানের পদধূলিকে সুরমার মত পবিত্র গণ্য করতো, তারা পাশ দিয়ে গেলেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতো। ঘন্টার প্রতিধ্বনির মতো আমার কণ্ঠস্বর অজ্ঞাত গন্তব্যে হারিয়ে যাচ্ছিল। ছয়মাস ধরে অব্যাহত নিপীড়নের পর আমি আগ্রা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম।

১৭৩৯ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আমি আবার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমি হতবাক হয়ে গেছি, যে নারী গত দিনগুলোতে আমার জীবনসঙ্গিনী হিসেবে থাকার ওয়াদা করেছিল, এখন সে আমার সঙ্গে প্রতিশোধমূলক আচরণের চিন্তা করছে। তার বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ততার কারণে আগ্রা ত্যাগ করলেও তাকে মন থেকে নির্বাসিত করতে পারলাম না। দিল্লীর ধ্বংসস্তূপের সর্বত্র আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। তার কৃপালাভের আশায় ঘুরে ফিরেছি ভিক্ষাপাত্র হাতে। প্রতিটি দিবসের সূচনায় ভোরের বাতাসের মতো সব রাজপথের গৃহদ্বারে ধাক্কা দিয়ে ফিরেছি। ভোরের বাতাসের ঝাপটায় আমি কম্পমান মোমবাতির শিখা হয়ে গেছি। ভিতরে ভিতরে জ্বলে গলে নিঃশেষিত এবং মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। অদ্ভুত এক উন্মাদনা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। অনেকে বললো, আমার পাগলামি বংশগতভাবে প্রাপ্ত। এটা আমার রক্তে ছড়িয়ে পড়েছে। রক্ত বের করে ফেলাই নিরাময়ের একমাত্র উপায়। তারা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা আমাকে দগ্ধ করলো। আমার দেহের নানাস্থানে জোঁক লাগিয়ে দিলো। পাগলা গারদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে রাখলো। চিকিৎসক আমার অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে বললো, 'প্রেমের যন্ত্রণায় দগ্ধ এই লোকের জন্য আমি কি ব্যবস্থাপত্র দিতে পারি?' যে ব্যক্তিটি আমার প্রতি সামান্য সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন, তিনি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, বৃদ্ধা রমনী। তিনি আমার কাপড় বদলে দিতেন, খাবার তুলে দিতেন এবং সান্ত্বনার বাণী শুনাতেন। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন।

হতাশাগ্রস্ত হয়ে আপন মনেই বলছিলাম, কামনা ও প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার চাইতে অন্ধকার কারাকক্ষে শৃংখলিত বা আটকে থাকা বরং শ্রেয়। নিজের হতাশার উপর একটা কবিতা রচনা করলাম-

'আমার হৃদয়ের অভিযোগ,
চোখই আমাকে ধ্বংস করেছে
চোখ বললো,
হৃদয় আমাকে সর্বস্বান্ত করেছে।
জানি না, কার কথা সত্য
আর কারটা মিথ্যা
মীর তকী দুটোর মাঝেই আছে
যার মৃত্যু হয়েছে।'

আমি নিজেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই আমার অন্তিম ইচ্ছাগুলো লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। 'বন্ধু মীর, তোমার হৃদয় যা চায়, সবই করো। কিন্তু হৃদয়কে প্রেমে পড়তে দিও না। প্রেম প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা কাউকে ছাড়ে না।'

অবশেষে আমাকে তারা কারা প্রকোষ্ঠ থেকে ছেড়ে দিলো। অনেকগুলো সপ্তাহ ধরে অলি-গলিতে ঘুরাঘুরি করে বহু সময় অতিবাহিত করলাম। যেদিকেই দৃষ্টি ফিরিয়েছি, নাদিরের পারস্য

বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ধ্বংসের নজীর দেখেছি। একটি বাড়ীও বাদ পড়েনি। মৌলা কিল্লার প্রাচীর হতে মূল্যবান প্রস্তর ও সাজসজ্জা খুলে নেয়া হয়েছে। রাজপুত্রদের ভিখারী পর্যায়ে আনা হয়েছে। তাদের অনেককে অভুক্ত থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। আমি এ ব্যাপারে অভিযোগ করার কে? সেই যে এক রজনীতে জীর্ণ এক কুটিরে বালিকার কাছে গিয়েছিলাম, তার বাহুলগ্না হতে গেলাম। গলির একটি ঘরও আস্ত নেই। বৃদ্ধা ও বালিকার ভাগ্যে কি ঘটেছে কেউ আমাকে বলতে পারলো না। সম্ভবতঃ বৃদ্ধা নিহত এবং পারসিক সৈন্যরা বালিকাকে ধরে নিয়ে গেছে ক্রীতদাসী হিসেবে।

কি দুর্ভাগ্য আমার প্রিয় নগরীর। শিখ, মারাঠা, চোর, পকেটমার, ব্যবসায়ী শাসক সকলের অসহায় শিকার আমরা। যার সহায়-সম্পদের কোন বালাই নেই, সেই সুখী। সম্পদই একমাত্র দারিদ্র। সবকিছুর বিচারে আমি ধনী শ্রেষ্ঠদের চাইতেও ধনী। একই সাথে দরিদ্রতমের চাইতেও দরিদ্র।

একদিন নগর মাঝে ঘুরতে ঘুরতে সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবন সারির কাছে এলাম। এলাকাটি আমার পরিচিত। কিন্তু ঘরগুলো সনাক্ত করতে পারছিলাম না। কারণ খুব কম ঘরই খাড়া ছিল। এলাকাবাসী সম্পর্কেও জানতে পারিনি। যখন কারো নাম ধরে প্রশ্ন করেছি, তারা উত্তর দিয়েছে, সে আর এখানে থাকে না। তারা কোথায় গেছে জানতে চাইলে উত্তর পেয়েছি 'তারা কোথায় গেছে' এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।' সারি সারি ঘরবাড়ী মাটিতে মিশে গেছে। প্রাচীরগুলো আর খাড়া নেই। আশ্রম সন্যাসী শূন্য, শরাবখানা মাতালশূন্য। যদ্দুর চোখ যায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তর। বাজারের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন। অবাধে চড়ে বেড়াচ্ছে শুকর। সৌন্দর্য অবলোকন করতে এখন আমি কোনদিকে চোখ ফেরাব। আমার গতকালের প্রেমের সঙ্গী, সকল সুখ শান্তি কোথায় পালিয়ে গেল? উচ্ছল তরুণ, জ্ঞানী বয়োজ্যেষ্ঠ সবাই নিশ্চিহ্ন। একটি কবিতা মনে পড়েছে, জানিনা কার-

'একদিন এই বিধ্বস্ত নগরীর মাঝ দিয়ে
আমি অতিক্রম করেছি।
গাছের ডালে নিঃসঙ্গ এক পাখীকে
দেখে প্রশ্ন করলাম,
এই নিরানন্দ জীবনের হেতু কি?
সে বললো, দুটো শব্দে
আমি মনের কথা ব্যক্ত করতে পারি
"হায়! হায়!"

নাদির কুলী খানের হামলায় দিল্লী মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার পরও অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আমি দিল্লীতে ছিলাম। আমি আমার বৈমাত্রেয় ভাই-এর মামা সিরাজুদ্দিন আলী আরজুর সাহচর্য কামনা করলাম। আমার দিল্লী আগমনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মশহুর কবি ছিলেন। প্রথমদিকে আমার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ আগ্রহী এবং আমার জন্যে পৃষ্ঠপোষকও অনুসন্ধান করেছেন। তার পরামর্শেই আমি ফার্সিতে লেখা ত্যাগ করলাম এবং সাধারণ মানুষের ভাষায় কবিতা রচনার পরিবর্তে জামে মসজিদের সিঁড়িতে ভিড় করা লোকদের জন্যে লিখতে শুরু করলাম। এর ফলে আমার জনপ্রিয়তা এতো বৃদ্ধি পেলো, যা শুধুমাত্র শিক্ষিত আমীর-ওমরাহদের প্রাপ্য বিবেচিত হতো। আশ্চর্যজনক যে, আরজু আমার বিরোধিতা শুরু করলো। ভাবলাম, আমার বৈমাত্রেয় ভাই আমার পৃষ্ঠপোষকের বিবির সাথে আমার প্রেম সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছে। অথবা তিনি ভাবছেন, যেহেতু আমার মা শিয়া, অতএব, আমার সঙ্গেও শিয়া মতবাদের সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে আরজু সুন্নী মতাবলম্বী।

আমি আমার বিশ্বাস সম্পর্কে সত্য কথাটাই বলছি-

'আমি মন্দির এবং মসজিদের
অনেক উর্ধে
আমার হৃদয়কে পরিণত করেছি

এক অভয়াশ্রমে
এই কন্টকাকীর্ণ পথ ধরেই
আমার সকল ভ্রমণ ও অভিযাত্রা।'

মীর তকীর বর্ণ বা ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করার মতো কিছু আছে কি? সে শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়। মুসলিম বা হিন্দু নয়। মুসলমানদের মতো মীর তকী প্রতি শুক্রবার মসজিদে যায়। হিন্দুদের মতো কপালে চিহ্ন আঁকে এবং বহু বর্ষ পূর্বে ইসলাম ধর্মে পরিত্যক্ত মূর্তিপূজা করে মন্দিরে গিয়ে। আমার উপর আরজুর ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ ছিল আমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা। সে দেখতে পাচ্ছিলো যে, 'সুলতান-উল-শোয়ারা' কবিদের রাজমুকুট তার মাথা থেকে খসে আমার মাথায় বসছে। হিংসা-বিদ্বেষ বন্ধুত্বকে তরবারির আঘাতের চেয়েও দ্রুত বলি দেয়।' আরজুর শত্রুতা আমার পৃষ্ঠপোষককে বিরূপ করলো এবং আমার জীবনকে দুঃসহ করে তুললো। আমার নিয়মিত আয়ের কোন উৎস ছিল না। ফলে আমি মহাজন, সব্জী বিক্রেতা, দুধওয়ালাদের কাছে কর্জ নেয়া শুরু করলাম।

উঁচু লালকিল্লার প্রাসাদ থেকে শুরু করে পাহাড়গঞ্জের জীর্ণ বস্তি পর্যন্ত বিস্তৃত নগরীর সর্বত্র যখন বিলাপের শব্দ, তখন মীর তকী, নিজের দুর্ভাগ্যের এতো হাহুতাশ করছে কেন? অভিশপ্ত নাদির শাহ ১৭৩৯ সালের ১৬ই মে দিল্লী পরিত্যাগ করলো। পশ্চাতে ফেলে গেলো হাজার হাজার বিধবা, যারা মৃত স্বামীর পাশে বুক চাপড়াচ্ছিল এবং হাজার হাজার এতিমকে ভিক্ষা করতে রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছিল। সরকার সম্পর্কে কম বলাই শ্রেয়। মোহাম্মদ শাহ আমাদের সম্রাট। এ ছাড়াও তিনজন শাসক প্রধান উজির নওয়াব সফদার জং, খাজাঞ্চী নওয়াব ইমাদুল মুলক এবং নওয়াব ইনতিজামুদ্দৌলা। সম্রাটের আইন তার হেরেমেও অচল। তার হিন্দু বিবি-যিনি সাবেক নর্তকী ও তার উপদেষ্টা ছিলেন, তিনিই সর্বেসর্বা। হেরেমের তত্ত্বাবধায়ক জাভেদ খান একজন খোজা, নপুংসক। তার অযোগ্যতার কারণে হিন্দু সম্রাজ্ঞীই ক্ষমতা প্রদর্শন করতেন। অতএব মীর তকীর অভিযোগ করার কি থাকতে পারে? জাভেদ পুরুষত্বহীন হতে পারে। কিন্তু সে আমার সকল নিন্দা ও বদনাম উপেক্ষা করে আমার উপর দান-শীতলতার ছায়া বিস্তার করে তার পুরুষত্ব প্রমাণ করেছে। আমাকে দিনে এক বেলা আহার্য এবং যে কাপড়টি পরিধানে আছে তা ছিড়ে গেলে সেটি বদলে দেয়ার আশ্বাসও আমাকে দেয়া হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য নওয়াব সফদর জং-এর ভাগ্য প্রসন্ন হলো। ১৭৪৩ সালের ১৫ই এপ্রিল মোহাম্মদ শাহের ইন্তেকালের পর সম্রাটের একুশ বছর বয়সের পুত্র আহমদ শাহ মোগল সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। আহমদ শাহ রাজকার্য অপেক্ষা সুন্দরী নারীসঙ্গ এবং পানপাত্রের প্রতি বেশী আসক্ত ছিলেন। রাজকার্যের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তার মা ও মায়ের বিশ্বস্ত অনুচর নওয়াব জাভেদ খানের উপর।

নওয়াব জাভেদ খান সফদর জংকে পছন্দ করতেন না এবং তিনি ইমাদুল মুলক ও নওয়াব ইনতিজামুদ্দৌলার সাথে যোগ দিলেন। কয়েক মাস পর সফদর জং প্রধান উজির পদে উন্নীত হলে তার জীবনের উপর হামলা এলো (নভেম্বর ১৭৪৮)। নিগমবোধ ঘাটের কাছে তার প্রাসাদের সামনে তাকে লক্ষ্য করে বন্দুকের গুলী ছোঁড়া হলো। সফদর জং ঘোড়া থেকে মাটিতে পতিত হয়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও তার বেশ কয়েকজন অনুচর নিহত হলো। তিনি নিকটস্থ সকল বাড়ী উচ্ছেদ করে ও জ্বালিয়ে দিয়ে তার ক্রোধ প্রশমিত করলেন এবং যমুনার অপর তীরে একটি সেনা ছাউনি ফেললেন। তার সন্দেহ হলো যে, এই ষড়যন্ত্রের পশ্চাতে জাভেদ খানের হাত আছে। জাভেদ খানের সঙ্গে মিত্রতার ভান করে তিনি একদিন অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য ভরতপুরের রাজা সুরাজ মল জাঠের সঙ্গে প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানালেন। আহার পর্ব সমাধার পর তিনি জাভেদ খানকে এক কোণায় ডেকে নিয়ে গেলে তার একজন অনুচর তার পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করলো। তার মাথা দেহ হতে ছিন্ন করে যমুনা তীরের বালুকায় নিক্ষেপ করা হলো। সম্রাজ্ঞীর শোক বিলাপ শুরু হলো। আমি আর একজন পৃষ্ঠপোষক হারালাম।

এ ঘটনার পর নওয়াব সফদর জং-এর অনুসারী বাহিনী এবং সম্রাজ্ঞীর বাহিনীর মধ্যে নিয়মিত খন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। প্রতিদিন তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। বন্দুকের গুলী চলতো, তরবারী ঝলসে

উঠতো, রাজপথে প্রবাহিত হতো রক্তের স্রোত। তারা রোহিলা, জাঠ, মারাঠা ও শিখদেরকে তাদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ভাড়া করলো। ভাড়াটে সৈন্যরা দিবাভাগে তাদের মনিবদের জন্যে লড়তো, আর রাতের অন্ধকারে ভাগ্য বিড়ম্বিত দিল্লীবাসীর উপর চড়াও হয়ে লুণ্ঠন করতো। গৃহাভ্যন্তরেও লোকেরা নিরাপদ বোধ করতো না। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তারা সম্রাজ্ঞীর কাছে আবেদন করলো। হাজার হাজার পরিবার চাঁদনী চকের পাশে সাঈদাবাদ উদ্যানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে জড়ো হলো। সৌভাগ্যবশত আবহাওয়া অনুকূল ছিল। এভাবে কাটানোর ফলে বেশী লোক মারা পড়েনি। বৃষ্টিতে ভিজে মরা, তরবারির আঘাতে নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম বিবেচিত হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত নওয়াব সফদর জং টিকতে পারলেন না। তিনি নিজে শিয়া মতাবলম্বী। কিন্তু তার বাহিনীতে অধিক সংখ্যক শিয়া ছিল না। জাঠ ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের চেষ্টা করে তিনি নিরাশ হয়ে গেলেন। সে সময়টুকু তিনি রায়সিনা ও কুতুব-এর সংযোগ সড়কের পাশে অন্তিম আবাস নির্মাণের জন্য ব্যয় করলেন। এ সময় তিনি অযোধ্যায় তার জায়গীরও দেখাশুনা করতেন।

আহমদ শাহের শাসনের অবসান ঘটেছিল তার মাধ্যমেই। তখনো তারা দুর্গের প্রাসাদেই বাস করতেন। হোলকারের নেতৃত্বে মারাঠাদের দিল্লীর শহরতলী লুটতরাজের পর নয়া সরকার হিসেবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৌহিত্র মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিনকে স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে সম্মত হলো। তিনি সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন জুন, ১৭৫৪ সালে। এই বিশ্ব বিজেতা সুরম্য দুর্গের লাল প্রস্তরের প্রাচীরের বেষ্টনী অপেক্ষা বৃহত্তর কোন স্থানে শাসন করেননি। অতএব সম্রাটের দুঃখজনক পরিণতির কাহিনী বয়ানের পরিশ্রম নিরর্থক।

পারস্যের হামলাকারীদের হাতে দিল্লীর প্রাণ সংহারের পর নগরী আর পূর্বের মত ছিল না। রাজন্যবর্গ, ওমরাহ এবং তাদের ভাড়াটেরা নগরীর লাশের উপর শকুনির ঝাঁকের মত চড়াও হতো। আমি দিল্লীতেই ছিলাম। কারণ দিল্লীর বাইরে আগ্রা ছাড়া আমার যাওয়ার আর কোন জায়গা ছিল না। কিন্তু একজন রমণীর বিশ্বাসঘাতকতা আমাকে সেই নগরী থেকেও চিরতরে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল। দিল্লীতে ভয়াবহ হত্যাকান্ড ও ধ্বংস সত্ত্বেও আমার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে চেয়ে সে একটা চিঠি পাঠাবার কথাও ভাবেনি। এ ধরণের লোকের কথা বিস্মৃত হওয়াই উত্তম। আমার বিবি ও সন্তানরা (ইতিমধ্যে আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে) দিল্লীতে আমার কাছে হাজির হয়েছে। আমরা চরম দারিদ্রের মধ্যে বাস করছি। আমার নাম ও খ্যাতির বিনিময়ে আয় হতো স্বল্প। সন্তানদের নিজেই তালিম দিতাম। লক্ষ্য করলাম, অর্থাগম হতে পারে এমন কোন কাজ করার চাইতে ওরা তিনজনই কবিতা লেখার প্রতি বেশী আগ্রহী।

১৭৫৮ সালের শরৎ কালে নাদির শাহের উত্তরাধিকারী একজন আফগান আহমদ শাহ আবদালী মোগল সাম্রাজ্যের উপর তার অধিকার দাবী করে বসলেন। আফগানরা পাঞ্জাব হয়ে অগ্রসর হলো এবং বিনা প্রতিরোধে দিল্লী দখল করলো। আবদালী দিল্লীবাসীদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু নৃশংসতা ছাড়া রজনী অতিবাহিত হয়েছে, এমন নজীর বিরল। শহরে অগ্নিসংযোগ শুরু হলো। ঘরবাড়ী লুণ্ঠন ও জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দরজা ভেঙ্গে লুটেরার দল ঘরে প্রবেশ করতো। লোকদের বেঁধে ফেলতো। জীবন্ত পুড়িয়ে মারতো অথবা মস্তক ছিন্ন করতো। সর্বত্র চলছিল রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা। কারো পরনে একটা কাপড়, একবেলা খাবারও ছিল না। মজলুমের কান্না আরশ পর্যন্ত পৌছে যেতো। আবদালী নিজেকে মনে করতো 'দুর ই দওরান' 'মুক্তার মধ্যে মুক্তা' এবং বিশ্বাসের স্তম্ভ। আসলে আবদালী ক্ষুধার্ত সিংহের মতো সর্বগ্রাসী। বিপুল সংখ্যক লোক দিল্লী পরিত্যাগ করলো এবং অনেকে গ্রামের দিকে পালিয়ে গিয়ে পথে মারা পড়লো। আমি দারিদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম। আমার দৈন্যতা আরো বৃদ্ধি পেলো। প্রধান সড়কের পাশে আমার বাড়ীটি মাটির সঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া হলো। হে খোদা, তুমি কোথায় মুখ লুকাবে? তোমাকে অন্বেষণ করার পথ যে আমি হারিয়ে ফেলেছি।

এ পৃথিবী আমার বেঁচে থাকার সকল প্রয়াসকে চিরতরে বিঘ্নসংকুল করে দিয়েছে। মুসলিম নওয়াবদের দরবার হতে বিমুখ হয়ে ফেরার পর আমি হিন্দু রাজন্যবর্গের মধ্যে আমার পৃষ্ঠপোষক

পেলাম। রাজা যুগল কিশোর ও রাজা নাগর মল কাব্য রসিক ছিলেন। উভয়েই আমার কাছে তাদের কবিতা পাঠালেন সংশোধনের জন্য। যাদের কৃপার উপর নির্ভর করতো আমার আহার্যের সংস্থান, সে সব ধনবান বিলাসী ছন্দকারের কবিতা সংশোধনের কাজ তো আমার নয়। যাদের অনুগ্রহ ভিক্ষায় আমি হস্ত প্রসারিত করতাম তাদের অনুপস্থিতিতে আমার হাততো অবশ হয়ে আছে।

দিল্লী এখন অভিশপ্ত নগরী। ১৭৫৯ সালের শীতকালে নওয়াব ইমাদুল মুলক দ্বিতীয় আলমগীরকে হত্যা করে পুনরায় রাজরক্তে তার নোংরা হাত রঞ্জিত করলেন। নিহত সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা আবদুল্লাহ আলী গওহর অযোধ্যায় পালিয়ে নিজেকে দ্বিতীয় শাহ আলম হিসেবে ঘোষণা করলেন (সম্রাট বাবরের সপ্তদশ উত্তরাধিকারী)। হে, বিশ্ব সম্রাট, কোথায় তোমার সাম্রাজ্য।

চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিল্লীতে আমার দিনগুলো কাটছিল। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে স্থির করলাম যে, দিল্লীতে বাস করার চাইতে গ্রামের দিকে হিন্দু জাঠদের মধ্যে বাস করা নিরাপদ। প্রতি ছয় মাসে ছন্নছাড়ার মত স্থান পরিবর্তনের চেয়ে এটা উত্তম।

সুরাজ মল জাঠের শাসনাধীন ভরতপুরে গেলাম। মারাঠা বাহিনী আহমদ শাহ আবদালীর অভিযান প্রতিহত করার জন্য দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে রওয়ানা হবার পূর্ব পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। ১৭৬১ সালের ১৭ই জানুয়ারী খবর পেলাম যে, মাত্র দু'দিন পূর্বে পানিপথে আফগানরা মারাঠাদের পরাজিত করে তাদের নির্বিচার হত্যা করেছে। যুদ্ধক্ষেত্র পালিয়ে আসা মারাঠারা গুজ্জার ও জাঠদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিহত ও লুণ্ঠিত হলো। আফগানদের দিল্লী ত্যাগ এবং দিল্লীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভরতপুরেই অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলাম। ছয় মাস পর আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলাম।

১৭৬১ সালের গ্রীষ্মকালের ঘটনা আমি দিনপঞ্জীতে এভাবে বর্ণনা করেছি, "আমি আমার প্রিয় নগরীতে ফিরে এলাম। সর্বত্র ধ্বংসলীলার দৃশ্যে আমার চোখ অশ্রুসজল হলো। প্রতিটি পদক্ষেপে আমার শোক ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কোন গৃহ সনাক্ত করার উপযোগী কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অথচ এসব তো আমার পরিচিত স্থান। সাবেক বাসিন্দাদের কোন খোঁজ নেই। ঘরবাড়ী ধ্বংসস্তূপ। প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। মন্দির ও পানশালা পরিত্যক্ত। চারদিকে ভয়াবহ শূন্যতা। এক সময় নিজেকে সেই ভিটার উপর আবিষ্কার করলাম, যেখানে কিছুদিন আগেও বাস করেছি। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা স্মরণ করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে সান্ধ্য সমাবেশ, কবিতা আবৃত্তি, প্রেমিকের ভূমিকা পালন, সুন্দরী রমণীর প্রেমে কাতর হয়ে ক্রন্দন, তাদের উদ্দেশ্যে কবিতা রচনা এবং যাদের দীর্ঘ বেণী আমাকে বন্দী করে রেখেছিল তাদের সাহচর্যের কথা মনে উঁকি দিলো। তখন সত্যিই আমি জীবন কাটিয়েছি, প্রেম করেছি। সেখানে আর কি অবশেষ আছে? এমন কোন হৃদয় নেই, যার সাথে বাক্য বিনিময়ে আনন্দঘন কয়েকটা মুহূর্ত অতিবাহিত করি। গলি হতে বের হয়ে আমি জনহীন রাস্তায় দাঁড়ালাম। ধ্বংসের দৃশ্য আমাকে নিথর করে দিয়েছে। প্রতিজ্ঞা করলাম, যতদিন বেঁচে থাকবো, এখানে আর ফিরে আসবো না। নগরীর পরিত্যক্ত গলিতে ধূলির পুরু স্তর পড়েছে। অথচ এমনও দিন গেছে, যখন নগরবাসী পথে সোনা কুড়াতো। রাজা নাগর মল আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রত্যাহার করলেন। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তাদের সংশোধনের অযোগ্য কবিতাগুলো আমাকে আর সংশোধনের বৃথা চেষ্টা করতে হবে না। আমার কোন সহায় সম্পদ নেই। আমি রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতাম। অভিজাতদের গৃহদ্বারে করাঘাত করতাম। কবি হিসেবে আমার খ্যাতিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রার্থনা করলাম, দিল্লী নগরীকে আর যেন অভিশপ্ত আফগানদের দেখতে না হয়। আবদালীর সৈন্যরা আটক করা উট ও হাতির বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশী লুট করেছিল। তাদের রাজাকে তারা বলেছিল যে, তিনি যদি একান্তই হিন্দুস্থানে থাকতে চান তাহলে তাকে স্বীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় থাকতে হবে। আবদালী বুদ্ধিমানের মতোই কেটে পড়লেন। তার আগে বিধ্বস্ত ভূখন্ডের শাসন পরিচালনার একটা ব্যবস্থাও করলেন।

হামলাকারী আফগানরা এতো উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে পড়েছিলো যে, আল্লাহ তাদেরকে

সমাজের নিম্নশ্রেণীর জনগোষ্ঠী শিখদের হাতে লাঞ্ছনার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছিলেন।

চল্লিশ হতে পঞ্চাশ হাজার শিখের এক বিশাল বাহিনী আফগানদের পশ্চাদপসারণের রাস্তা বন্ধ করে দিল। যুদ্ধে তারা এমন সাহসিকতা প্রদর্শন করলো, যার নজীর খুবই কম আছে। গুরুতর আহত শিখও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেনি। দলবদ্ধ শিখরা ক্ষিপ্রগতিতে কাজ সম্পন্ন করেছিল। বিক্ষিপ্ত আফগান সৈন্যদের ঘেরাও করে শিখরা তাদের উপর তরবারি চালাতো। সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তো আফগানদের উপর আর ভোরের আলো ফোটার সাথে অদৃশ্য হয়ে যেতো। আফগানদের জীবনকে তারা নরকতুল্য করে তুলেছিল। পালিয়ে জীবনরক্ষা করাটাও অসম্ভব ব্যাপার। শিখদের কেশ ও শশ্রু দীর্ঘ। ফলে দেখতেও তারা অস্বাভাবিক। কখনো কখনো তারা এলোচুলে আফগানদের সামনে হাজির হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো। রাতভর অদ্ভুত কান্নায় আচ্ছন্ন করে রাখতো। শিখ পদাতিক লড়ছে আফগান অশ্বারোহীর সংগে। আফগান অশ্বের জিন দ্বিখন্ডিত হচ্ছে শিখের তরবারির আঘাতে— এই ছিল সাধারণ দৃশ্য। সংক্ষেপে বলা যায়, আফগানরা শিখদের হাতে এমনভাবে পর্যুদস্ত হলো, যা ইতিপূর্বে কখনো শ্রুত হয়নি বা দেখাও যায়নি। শেষ পর্যন্ত আফগানদের যুদ্ধ সাধ পূরণ হলো। তাদের জন্য সর্বোত্তম পথ উন্মুক্ত ছিল জীবন নিয়ে পলায়ন এবং হিন্দুদের হাতে রাজ্যের শাসনভার অর্পণ।

শিখ সৈন্যরা তাদের মর্জি মোতাবেক রাজমুকুট ও সিংহাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আফগানদের উপর চড়াও হয়ে তাদেরকে আটক নদী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অতঃপর তারা পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করে আবদালীর নিয়োজিত পাঞ্জাবের হিন্দু শাসককে হত্যা ও নিজেদের হাতে শাসনভার গ্রহণ করলো। এরপর দিল্লীর দিকেও তারা রক্ত চক্ষু ফেরালো। ভাগ্য বিড়ম্বিত সুন্দর নগরীর উপর বারবার বর্বরতার আগমণের চাইতে দুর্ভাগ্যজনক আর কি হতে পারে।

ভারী মেঘের মতো আমি ভেসে বেড়াচ্ছিলাম বছরের পর বছর ধরে। দিল্লীতে একসময় আমার আবাস ছিল। কিন্তু আমার ও পরিবারের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আহার্য দিল্লী আমাকে দিতে পারলো না। আমি ভরতপুরে দ্বিতীয়বার আশ্রয় নিলাম। আমাকে একনজর দেখার আশায় দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম থেকে লোকজনের আগমণ হচ্ছিল। আমার কবিতা শুধু উত্তরের সমতলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দাক্ষিণাত্যেও সজীব হয়ে বিকশিত হয়েছিল। লোকেরা আমার কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো।

কিন্তু শুধু প্রশংসা বাক্য দিয়ে ক্ষুধা নিবারিত হয় না। আমি জানতাম, বেঁচে থাকার জীবন আমার মাত্র একটি। কিন্তু আমার আকাংখা ও বাসনা শত সহস্র। কি করে আমি সে সব পূরণ করবো? আমি অনুভব করছি, আমার বয়সের বোঝা বাড়ছে এবং প্রবল বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা মোমবাতির শিখার প্রতিও আমার আগ্রহ বেড়েই চলছে।

পারস্যবাসী, আফগান ও মারাঠাদের হামলার পর এবার জাঠদের পালা। আমার ভরতপুর অবস্থানকালেই রাজা সুরাজ মল তার বর্বর অনুচর বাহিনী নিয়ে আগ্রা ও দিল্লী লুণ্ঠন করলো। দিল্লীতে লুণ্ঠন করার মতো কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। বন্ধুদের চিঠিতে জানতে পেলাম, জাঠ বর্বরতা পারস্যবাসী নাদির শাহের বর্বরতাকে হার মানিয়েছিল। দিল্লীর একমাত্র ভরসা নওয়াব নজীবুদ্দৌলা। তিনিই শিখ ও জাঠদের কোণঠাসা করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

১৭৭০ সালে নজীবুদ্দৌলার ইন্তেকালের পর দিল্লীরও আর কোন আশা রইলো না। মাত্র চার বছর পূর্বে আবদালীর হাতে পানিপথে চরমভাবে নিগৃহীত মারাঠারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। জাতি হিসেবে মারাঠা ও শিখরা অভিশপ্ত হলেও দৃশ্যতঃ মনে হচ্ছিল তারাই দিল্লীর শাসক হবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই এ ধরনের বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। দীর্ঘ দশটি বছর ধরে গৃহহীন যাযাবরের মতো আমি এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরছিলাম। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম যখন দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি প্রধান উজীর মির্জা নজফ খানের কাছে আমার বাসনার কথা নিবেদন করলাম। তিনি পারস্যবাসী শিয়া মুসলমান। মায়ের শিয়া মতবাদের প্রতি আস্থার কারণে আমিও নিজেকে তার সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবলাম। মির্জা একজন খ্যাতনামা 'জুলফিকারুদ্দৌলা'-তরবারির যাদুকর। তিনি আগ্রাকে জাঠমুক্ত করলেন। শিখ ও রোহিলাদেরকে বাধ্য করলেন পিছু হটতে। মারাঠারা তার সাথে তরবারির মোকাবিলা করতে সাহসী হচ্ছিল না।

আল্লাহ তার তরবারিকে চিরবিজয়ী রাখুন। কিন্তু আল্লাহর তেমন ইচ্ছা ছিল না। ১৭৮২ সালের গ্রীষ্মে মির্জা নজফ খান ইন্তেকাল করলেন। তাকে নওয়াব সফদর জং-এর স্মৃতিসৌধের সামনাসামনি এক উদ্যানে দাফন করা হলো। ধ্বংসের রক্তমাখা ছুরিকা আরেকবার খাপমুক্ত হলো। মির্জা নজফ খানের পালিত পুত্র মির্জা আফরাসিয়াব এর নিকট হতে ক্ষমতা কেড়ে নিলেন। নজফ খানের ভ্রাতুষ্পুত্র মির্জা শফি আফসারিয়াবের ভাড়াটে ঘাতকের হাতে নিহত হলো। এরপর শুরু হলো হত্যা লীলা। খুন খারাবি ছাড়া একটা দিনও যেতো না। কয়েক মাস পর মির্জা শফির ভাই এর হাতে নিহত হলো আফসারিয়াব। কারো নিরাপত্তা ছিল না।

দিল্লী আমাকে খ্যাতি দিলেও ভাগ্য খুলে দেয়নি। ক্ষুধা, নিরাপত্তাহীনতা আমাকে প্রিয় নগরী দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌতে যেতে বাধ্য করলো। নওয়াব আসাফুদ্দৌলা অনুগ্রহ দেখিয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। তিনি আমার পরিবারের জন্য কিছু ভাতাও মঞ্জুর করলেন। নিজেদের শিষ্টাচার ও মার্জিত ভাষণের জন্যে গর্বিত লক্ষ্ণৌবাসীর প্রথম মাহফিলে আমার পানে ফিরেও তাকালো না। তারা আমার বিরাট পাগড়ী ও শিথিল বেশবাসের প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছিল এবং জানতে চাইছিল, কোত্থেকে এ ভুবনে আমার উদয় হলো। আমার সামনে যখন মোমবাতি বাতি রাখা হলো, আমি তাদের উপযুক্ত জবাব দিলাম-

"তোমরা, এই পূর্বাঞ্চলের লোকগুলো
আমাকে ভিখারীর দশায় দেখে
বিদ্রূপ করছো-এবং জানতে চাইছো
পৃথিবীর কোথা হতে তুমি এলে?
কোত্থেকে————
আমাকে বলতে দাও
এক সময় সেখানে সুন্দর এক নগরী ছিলো
বিশ্বের সকল সেরা নগরীর মধ্যে
এর খ্যাতি ছিল সর্বোচ্চ
সে নগরী এখন ধ্বংস এবং নিঃসঙ্গ
আমি যে নগরীর অধিবাসী
তার নাম দিল্লী।"

লক্ষ্ণৌবাসীরা আমাকে বুঝতে পারলো না। আমিও তাদের বুঝলাম না। কিভাবে আমি এই অদ্ভুত ভূখন্ডে আমার কাহিনী বয়ান করবো? যে ভাষায় আমি কথা বলি, তারা তার মর্ম বুঝতে পারে না। তারা জানে না যে, মীর তকীর প্রতিটি শব্দের অর্থ ছাড়াও ভিন্ন একটি অর্থ আছে। দিল্লীর সাধারণ মানুষ আমার ভাষা সহজে বুঝতো। ও মীর, এই মৃতের সমাবেশে কথা বলতে দ্বিধা কেন? আমার ক্রন্দসী চোখ হতে নদীর ধারার মতো অশ্রু ঝরছিল। আমার হৃদয়ও দিল্লীর মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। গোলাপ ফুল নতুন করে প্রস্ফুটিত হলেও আমাকে কোন আনন্দই দিতে পারবে না। গোলাপ কন্টকও পারে না আমাকে ব্যথা দিতে। মন বলছিল, আমাকে দিল্লী ফিরতে হবে, যেখানে আমি প্রেমে নেশাগ্রস্তের মতো কাটিয়েছি এবং হৃদয় শোনিতের গোলাপ-লাল শরাব পান করেছি। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আমার রচিত কবিতা স্মরণ করলাম-

'তোমার ফোস্কা পড়া পা নিয়ে
বিলাপ করছো-
আমার প্রিয় বন্ধু
দিল্লী এখনো বহু দূরে।"

দিল্লীর যে কোন খবর সবার চোখে পানি আনার জন্যে যথেষ্ট। নাদির শাহ বা আবদালী নয়,

মারাঠা, জাঠ কিংবা শিখরাও নয়। নাজিবুদ্দৌলার দৌহিত্র অত্যাচারী গোলাম কাদির এবং তার রোহিলা বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। এই যুদ্ধলিপ্সু দ্বিতীয় শাহ আলমকে অপমান ও সিংহাসনচ্যুত করে তার চক্ষু উৎপাটন করলো। আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুনে ভস্মীভূত করুক। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই বলতে পারেন আর কতদিন দিল্লীতে হত্যা ও লুটতরাজ চলবে। এভাবে চলতে থাকলে তো হত্যা করার জন্য নিহতদের পুনরুজ্জীবিত করতে হবে এবং পুনরায় লুটপাট করার জন্যে লুটের মাল ফিরিয়ে আনতে হবে। দিল্লী যেন জীবন্ত এক কংকালে পরিণত হয়েছিল।

'ভস্মে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত
প্রতিটি ভবন অগ্নিশিখায় জ্বলছিল
কতো সুন্দর একটি নগরীর
হৃদয়ের প্রেমে আগুন লেগেছিল।'

মারাঠাদের হাতে রোহিলারা চরমভাবে পরাজয় বরণ করলো। গোলাম কাদির জীবিত ধরা পড়লো। নিপীড়নের পর তার শিরোচ্ছেদ করা হলো। তার জন্য কেউ এক ফোঁটা অশ্রুও বিসর্জন করলো না। দীর্ঘদিন পর আমার প্রতিপক্ষের জীবনাবসানে আমি শান্তি লাভ করলাম। এই ব্যক্তিটি আমার প্রিয় নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। সে কি তার সাজা পেয়েছে? দিল্লী কি আবার তার ঐশ্বর্যমন্ডিত দিনে ফিরে আসবে? একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন।

এই শোকার্ত বেদনার্ত পৃথিবীতে আমি ৮৮টি গ্রীষ্ম ও শীত প্রত্যক্ষ করেছি। আমার চোখের জ্যোতি ঘোলাটে হয়ে এসেছে। তিন বছরে আমি আমার পরিবারের তিনজন সদস্যকে হারিয়েছি। আমার পুত্র, কন্যা ও বিবি। এখন আমি লিখতে ও পড়তে অক্ষম। আমার এমন কেউ নেই, যার জন্যে আমার জীবিত থাকা প্রয়োজন। দিল্লী নগরীর ধূলিকণার সঙ্গে আমি আমার দেহের ধূলিও মিশিয়ে দিতে চাই। আমার সেই অন্তিম বাসনাও অস্বীকৃত হয়েছে। ভাগ্য আমাকে লক্ষ্ণৌর মাহফিলে নিয়ে এলো। সেখানে সাকী শরাব পরিবেশন করছিল। কিন্তু আমার পাত্রে বিষ ঢেলে দেয়া হলো। মীর তকী এখানে অবসর নেয়ার সুযোগ পেল না। তাকে পৃথিবীর উদ্যানগুলোর মধ্য দিয়ে প্রবাহমান পানির মতোই চলতে হবে।

মৃত্যুর পথে যাত্রা সম্পর্কে মানুষ ভীতি সঞ্চারক কাহিনী কেন বলে, যখন এ পথে অনেকেই সঙ্গ দিতে চলেছে। মরণে আমার ভয়। আমার জীবনে দু'টি প্রেম এসেছিল- কামরুন্নিসা বেগম আর দিল্লী নগরীর সাথে। এক প্রেম আমাকে ধ্বংস করেছে। আরেকটি আমার জন্যে ধ্বংস হয়েছে। কোন কিছুর জন্যেই আমার আর জীবিত থাকার প্রয়োজন নেই। আমার দ্বৈত প্রেমের উদ্দেশ্যে ক'টি ছত্র রচনা করেছি-

"জীবনাবসানে আমি যখন
চোখ খুলবো,
আমার একমাত্র বাসনা হবে
তোমার মুখটা আরেকবার দেখার
আমার হৃদয়ের অলিন্দে
তোমার আবাস।
আমি লুণ্ঠিত স্থানের কোথায়
চোখ মেলবো।"

[মীর তকী মীর ১৮১০ সালে লক্ষ্ণৌতে ইন্তেকাল করেন। যেখানে তাকে দাফন করা হয়েছিল, এখন আর তার অস্তিত্ব নেই।]

১৫

ভাগমতী

সন্ধ্যায় ভাগমতীর আমার সাথে কাটানোর কথা। সে আশা করবে, আমি যাতে তাকে গ্রহণ করি। আমি যদি আগ্রহ না দেখাই তাহলে সে বলবে যে, আমি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছি, অথবা আরো খারাপ- 'ধ্বজভঙ্গ হয়েছে আমার'। আমার বিরত থাকার উপযুক্ত কারণ আছেঃ প্রচন্ড জ্বর। হাত ভেঙ্গেছে অথবা লিঙ্গ ফেটে গেছে। কিন্তু আমার আসলে যা ঘটেছে- পেটে বায়ু জমেছে। যারই পেটে বায়ু জমা হওয়ার ঘটনা ঘটে, কেবল তিনিই জানেন যে, বায়ু নির্গত না হওয়া পর্যন্ত কামনার বাতিকে শিখা ছড়াতে দেবে না।

অনেক দিন আগে প্রথম যখন এই সমস্যার সূচনা হয় তখন আমি বায়ু উৎপাদনকারী খাদ্য দ্রব্যগুলোর একটি তালিকা তৈরী করেছিলাম। আমার অনেক প্রিয় খাদ্য এই তালিকাভুক্ত হয়ে পড়েছিলঃ কাঁচা পিঁয়াজ, আম, আইসক্রিম, কেক...। আমার যৌন কর্মসূচীতে কিছুটা পরিবর্তন এনে সমস্যা অতিক্রম করছিলাম। লোভনীয় খাদ্যগুলো গ্রহণ করতাম যৌনকর্মের পর; পূর্বে নয়। সময়ের ব্যবধানের সাথে সাথে আমার 'পরে, পূর্বে নয়' তালিকায় অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও অন্তর্ভুক্ত করেছিলামঃ ভাত, ডাল, আলু, ভাজা খাবার। ভোজ্য প্রায় সবকিছু তালিকাভুক্ত না করা পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য বেড়েই চললো। তথাপি সন্ধ্যার মধ্যে আমার পেট বায়ুতে পূর্ণ হয়ে যায়। আমি দুপুরে খাদ্য গ্রহণ বাদ দিলাম এবং যৌনকর্মের সময়সূচী সন্ধ্যার পরিবর্তে বিকেলে নির্ধারণ করলাম। কিছুদিন বেশ ভালোই চললো। কিন্তু মিলনের জন্য দু'জনের সমন্বয় প্রয়োজন এবং ভাগমতী কখনো দুপুরে আসে না। অতএব যখনই আমি নিশ্চিত হতাম যে, ভাগমতী আসবে, সেদিন সকালের নাশতার বদলে শুধু দুধ ছাড়া কফি পান করতাম এবং ভিটামিন-বি ট্যাবলেট সেবন করতাম- কামোদ্দীপক হিসেবে। এই ট্যাবলেট চমৎকার। আজ সকাল থেকে মাত্র দু'কাপ দুধ ছাড়া কালো কফি পান করেছি এবং একটি ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স ক্যাপসুল। তবু আমার উদরে বেলুন পূর্ণ বায়ু জমে আছে এবং আমার মাজায় যৌন কামনা পূরণের মত তেজ নেই। যৌনকর্মের কোন আগ্রহই নেই। বরং আমি আরামদায়ক প্রলম্বিত বায়ুত্যাগের জন্য প্রার্থনা করছি। এক পায়ে কক্ষের মধ্যে লাফিয়ে চেষ্টা করেছি। পেটের মধ্যে হাঁটু ঠেকিয়ে শুয়ে থেকেছি। পেট মর্দন করেছি। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। শেখ সা'দী যথার্থই বলেছেন;

"হে পরম জ্ঞানী! পেট হচ্ছে বায়ুর কারাগৃহ।
জ্ঞানী ব্যক্তিরা এই বায়ুকে বন্দী করেন না,
বায়ু যদি তোমার উদরে মোচড় দেয়
মুক্ত করে দাও, বায়ু ত্যাগ করো;
কারণ উদরে বায়ু জমলে তা
হৃদপিন্ডের উপর পাথরের মত মনে হয়।"

ওহে শিরাজ নগরীর মহাজ্ঞানী! বায়ু সত্যি সত্যি আমার হৃদপিন্ডের উপর পাথর চাপার মত যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিভাবে আমি বায়ু ত্যাগ করবো?

বায়ুত্যাগ করা জীবনের তিন পরমানন্দের একটি। প্রথমঃ যৌনক্রিয়া, দ্বিতীয়ঃ খুসকিপূর্ণ মাথায় তেল মালিশ করা, তৃতীয়ঃ একটি দীর্ঘ, আরামদায়ক বায়ুত্যাগ। আমার মধ্য বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে আমি এই ক্রমকে উল্টোভাবে সজ্জিত করেছি। জীবনের আনন্দে বায়ুত্যাগ করাকে তালিকার শীর্ষে স্থান দিয়েছি।

আবদ্ধ বায়ুর রাজা হচ্ছে ঢাক- আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে 'উত্তম পাদম' হিসেবে পরিচিত ছিল। এর আওয়াজকে বলা হতো 'ফাদাকাম।' বায়ুত্যাগ ইচ্ছার ব্যাপার। এটি ঘোষণাকারী শব্দ

এবং পুরুষোচিত। এর শব্দ বেশী হলে কিছু দুর্গন্ধ থাকে। উচ্চতম শব্দে দুর্গন্ধ কমে যায়। আমার বন্ধু, টাক মাথা, প্রার্থনার মত নিমীলিত চক্ষু ফটোগ্রাফার বিষয়টির উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছে। তার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, এই ঢাকের শব্দ সেইসব লোকের দ্বারাই উৎপাদিত হতে পারে, যারা তাজা ফল, মাটির উপরিভাগে জন্মায়, এমন সব্জি- এইসব তাদের খাদ্য তালিকায় রেখেছে। এসব খাবার সাত্ত্বিক ধরনের। (হাস-মুরগী, মাছ, মাংস যদিও পুষ্টিকর, তবুও মাধ্যমিক পর্যায়ের খাবার। মশলা, আচার, চাটনী, মাটির নীচে জন্মায়, যেমন-পিঁয়াজ, বাঁধা কপি, রসুন এবং মাটি স্পর্শ করে থাকে, এমন সব্জি পিঁয়াজ, বাঁধা কপি, শালগম, ফুলকপিও বায়ু উৎপাদনকারী খাদ্যের মধ্যে পড়ে।) আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু খালি পেটে একটি রসালো তরমুজ উদরস্থ করে ঢাকের শব্দের মহড়া দিয়েছিল। এক ঘন্টা পর সে বায়ুত্যাগ করে জেট বিমানের গতিতে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বায়ু ত্যাগের শব্দ সানাই-এর সুরের মত। আমাদের পূর্বপুরুষরা এর নামকরণ করেছেন 'মধ্যমা' এবং এই শব্দ নির্গত হয় 'থাই, থাই' সুরে। আমি এ ধরনের শব্দকে সানাই এর সুরের সাথে তুলনা করেছি। বায়ু চালিত এই সুরযন্ত্রকে বিখ্যাত করেছেন বারানসীর উস্তাদ বিসমিল্লা খান। ঢাকের শব্দের মত সানাই এর সুর উৎপাদনও ইচ্ছার ফসল। শারীরিক অবস্থানের একটু পরিবর্তন করেই এ ধরনের সুর উৎপাদন সম্ভব অথবা পেটে মৃদু চাপ দিলেও এমন সুর বেরুবে। নমনীয় শব্দ তরঙ্গের কারণে ঢাকের শব্দের চাইতে ভিন্ন এবং প্রলম্বিত। স্কটিশ ব্যাগপাইপের শব্দের সূচনাও এমন- পুনহ...।

তৃতীয় ধরনের বায়ু নির্গমণের শব্দ কাঁচা চামড়া অথবা খসখসে পুরনো পার্চমেন্ট কাগজ ঘসার শব্দের মত। এক দফায় শব্দ হয় না, বরং ধারাবাহিকতা থাকে- ফুরুৎ-ফুরুৎ-ফুরুৎ। সব্জিজাতীয় খাবার বেশী খেলে এ ধরনের শব্দের সাথে বায়ু নির্গত হয়। বয়সের ভারে পায়ুপথের পেশী দুর্বল হয়ে যাওয়ার লক্ষণও এটি।

চতুর্থ তাল হচ্ছে তবলার। ড্রামে আঘাত করলে উত্থিত আওয়াজের মত শব্দ। তবলার শব্দ তার প্রভুর সম্মতি ছাড়াই উত্থিত হয়। ফলে তাকে দারুণ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়, বিশেষ করে কোন সমাবেশে এমনটি হলে।

পঞ্চম ধরনের বায়ু নির্গমণ শব্দহীন দুর্গন্ধযুক্ত বোমার বিস্ফোরণের মত। যেহেতু এর কোন শব্দ নেই সে জন্য পাশের কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করা যায় 'গুপ্ত দান' হিসেবে। দাতাকে আবিষ্কার করা যায় তার 'আমি নই' মুখভঙ্গি দেখেই। সে নাকটা একদিকে সরিয়ে নেবে কাউকে দোষারূপ করার দৃষ্টিতে। সে নিশ্চয়ই জাপানী প্রবাদের প্রতি মনোযোগী, 'যে কথা বলেছে, সেই বায়ু ত্যাগ করেছে।' কেউ যদি দুর্গন্ধযুক্ত 'গুপ্তদান' করেই ফেলে তাহলে অন্যেরা এই দাতাকে খুঁজে বের করুক। বায়ুত্যাগ করা সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকানরা এ ব্যাপারে পুরোপুরিই নির্লজ্জ। এটি তাদের গ্রীক উত্তরাধিকারের কারণেই হয়েছে। নিয়ারকস (প্রথম শতাব্দী) পেটে বায়ু উৎপন্ন হলে যে কোন সময়ে তা ত্যাগ করার গুণাবলী বর্ণনা করে গেছেন;

"বায়ু আটকে গেলে একজন মানুষের মৃত্যু হতে পারে
নির্গত হতে দিলে বায়ু সঙ্গীতের সুর তুলবে।
স্বাস্থ্য দায়ী সঙ্গীত; বায়ু মারতেও পারে
জীবন রক্ষাও করতে পারে।
উদরের বায়ু এক শক্তিশালী সম্রাটের মত।"

নিয়ারকস শব্দহীন দুর্গন্ধ বোমা এবং শ্রবণযোগ্য প্রকরণের বায়ুর ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন,

"হেনরী কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না বায়ুত্যাগ করে?
দু'দিকেই তার নিঃশ্বাস খুব ভারী।"

সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যেও বায়ুত্যাগ সম্পর্কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে;

"জ্ঞানী ব্যক্তিদের থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন
আমাকে বলো, তোমরা কেন বায়ুত্যাগ করো না?
কখনো না? প্রিয় মিস ব্রাইট'
আমার বায়ুত্যাগের প্রয়োজন হয় না, আমি লিখি।"

যদিও শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলো মাছ মাংস ইত্যাদি ভোজন করে, যার ফলে তাদের বেশী বায়ু উৎপন্ন হয় না। যদি কখনো হয়, তারা প্রকাশ্যে সশব্দে তা ত্যাগ করে, ভদ্রতার ধার ধারে না। মদপানকারীদের ক্ষেত্রে গোপনে বায়ুত্যাগের ঘটনায় অনেকটা বিদ্রোহের ইঙ্গিত থাকে। কারণ মদপানে যে বায়ু উৎপন্ন হয়, তা অতি দুর্গন্ধযুক্ত। শ্বেতাঙ্গদের অভদ্রতা যে কতটা চরম হতে পারে তার প্রমাণ রেখেছে জনৈক ফরাসী, মঞ্চে তার বায়ুত্যাগের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। তার ট্রাউজারের পিছন দিকে একটি ফুটো করে দেয়া হয়েছিল এবং তার শক্তিশালী বায়ু তিন ফুট দূরে রক্ষিত মোমবাতি নিভিয়ে ফেলে।

শ্বেতাঙ্গরাই যদি এতো অভদ্র হয়, তাহলে ভারতীয়রা কম কিসে। ভারতীয়দের হাস্য রসিকতার অনুভূতি অতি নিম্নমানের এবং তাদের কাছে বায়ুত্যাগের ব্যাপারটিও রসিকতার মধ্যে পড়ে। যেহেতু তারা অতি মশলাযুক্ত খাবার খায়, সে জন্য বায়ুত্যাগেও তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন এবং বায়ুত্যাগের ঘটনা নিয়ে হাসাহাসি করে। একবার একজন কেবিনেট মন্ত্রীর বক্তব্য অল ইন্ডিয়া রেডিও বহিঃসম্প্রচার বিভাগের জন্য ধারণ করার সময় তিনি সশব্দে বায়ুত্যাগ করে ফেলেন। ফলে বক্তব্যটি সম্পাদনা করতে হয়। কিন্তু প্রচারের সময় ভুলবশতঃ মূল রেকর্ডটিই চালানো হয়েছিল। এতে একজন ভারতীয় বিশ্বজুড়ে তার বায়ুত্যাগের শব্দ শুনানোর বিরল বৈশিষ্ট লাভ করে। বিষয়টি গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, কর্তৃপক্ষের নোট করা উচিত।

বায়ুত্যাগ সম্পর্কে অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ইরানী ও আরবদের প্রতি অবশ্যই হাত বাড়িয়ে দেয়া উচিত। এক তরুণ ইরানী সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, সে ভরা মাহফিলে বায়ুত্যাগ করে ফেলেছিল। এ ঘটনার পর তার মনে এতো অনুশোচনা জাগে যে সে শহর ত্যাগ করে চলে যায়। অনেক বছর আত্মনির্বাসিত থাকার পর সেই এই আশা নিয়ে ফিরে আসে যে, তার এই ছোট্ট অভদ্রতা ইতিমধ্যে লোকজন বিস্মৃত হয়েছে। নিজের নাম বলে সে কিছু ছেলেকে তার পুরনো বাড়ীটি দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে। রাস্তার ছেলেগুলো জানতে চায়, 'তার মানে, অমুক বায়ুত্যাগকারীর বাড়ী?' হতভাগ্য লোকটি পুনরায় নির্বাসনে ফিরে যায়।

বায়ুত্যাগের জন্য কাউকে প্রথম পুরস্কার দিতে হলে অবশ্যই তা দিতে হবে বলখের সূফী আবদুল রহমান হাতাম ইবনে উনওয়ান আল-আসসামকে। বায়ুত্যাগ সম্পর্কে তার মহান দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি 'বধির হাতাম' নামে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, একবার তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয় ব্যাখ্যা করার সময় মহিলার বায়ু নির্গত হয়ে যায়। সূফী দরবেশ তার কণ্ঠ উঁচু করে বলেন, 'জোরে বলুন, আমি কানে কম শুনতে পাই।' সেই মহিলা পনের বছর ধরে জীবিত ছিলেন এবং হাতাম কানে কম শোনার ভান করেছেন এবং ভুক্তভোগী লোকজন তার কানের কাছে চীৎকার করেছে। 'বধির হাতাম' বিব্রত বায়ুত্যাগকারীদের পৃষ্ঠপোষক সূফী।

আমার সন্দেহ হয় যে, ভাগমতী আসল ঘটনার পরিবর্তে এই বিজ্ঞোচিত তত্ত্ব গ্রহণ করবে কিনা।

১৬

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

এলিস অন্ডওয়েল

আমার স্বামীকে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার পীড়াপীড়ির জন্য নিজেকেই ক্ষমা করতে পারি না। সে আমাকে বলতো, 'কলকাতায় অসুবিধা কোথায়? আমরা তো এখানে ভালোই আছি।'

আসলে কলকাতায় অসুবিধা কিছুই ছিল না। কিন্তু বহুবিধ কারণে আমি সেখানে থাকতে চাইনি। একটি কারণ হচ্ছে কলকাতা ইউরেশীয়তে পরিপূর্ণ এবং কেউ যদি তাদের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে তাহলে সম্ভ্রান্ত ইংরেজদের অধস্তনরা তাদেরই দলভুক্ত বলে তাকে সন্দেহ করবে। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ব্যক্তিগতভাবে ইউরেশীয়দের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমি কিছুসংখ্যক সুন্দর ভদ্রলোককে জানি যাদের রং কিছুটা কালচে। অসবর্ণ হওয়াটা কারো দোষ নয়। কিন্তু আমি তাদের থেকে দূরে থাকতে চাই, ব্যস। আমার মা কলকাতায় এতো দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন যে তিনি ভুলেই গেছেন, কোথা থেকে তার আগমন ঘটেছিল। তিনি ছোট লোকদের ভাষাও আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন।

আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমি একজন খাঁটি ইংরেজকে বিয়ে করেছিলাম-আলেকজান্ডার অন্ডওয়েল এসকোয়ার। মহারাণীর ডাক ও তার বিভাগে ছিল তার চাকুরী। আমার বয়স আঠার হলেও তার বয়স পঞ্চাশের উপরে। আগেই বলেছি, আমার স্বামী পাক্কা ইংরেজ, ষোল আনার সিক্কা রুপি। আমি চাইনি যে, কলকাতার ছোট লোকদের সাথে সে মিশুক।

আমাদের বিয়ের প্রথম দু'বছরের মধ্যে অ্যালেক আমাকে দু'টি কন্যা সন্তান দিলো। এরপর সে অকর্মণ্য হয়ে পড়লো। পঞ্চান্ন বছর বয়সে সে চাকুরী থেকে অবসর নিলো। আমি আশা করেছিলাম যে, সে আমাকে বৃটেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে কলকাতা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করলো, 'এখানে সস্তায় থাকা যায়। দেশে ফিরে গেলে আমরা 'আয়া' কিংবা 'ছোকরা' পাবো না।' সে চাকরি জীবনে কোন সঞ্চয় করতে পারেনি। ফলে বৃটেনে যাওয়ার খরচ যোগানোর অর্থও তার ছিল না। আমাদেরকে চৌরঙ্গী ও দেশীয় বাজারের মধ্যে ইউরেশীয় কোয়ার্টারে একটি ছোট্ট ঘর নিতে হলো। আমি যতটা সম্ভব প্রতিবেশীদের এড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু হাঁসকে পানিতে নিলে যে অবস্থা হয় অ্যালেক পড়শীদের সাথে তেমন মাখামাখি শুরু করলো। সে ইউরেশীয়দের সাথে তাড়ি পান ও তাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলো। আমি তার সাথে তর্ক করতাম, 'আমি চাই না যে আমার মেয়েরা হিন্দুস্থানে বড় হোক। দেশে তাদেরকে ভালো স্কুলে দিতে চাই আমি। তোমার পেনশনের অর্থে যদি সম্ভব না হয় তাহলে এখানেই এমন স্থানে যাই যেখানে সাহেবদের ঘাটতি আছে। আমি নিশ্চিত যে তুমি কোন একটা চাকরি পাবেই। তোমার বেতন আর পেনশনের অর্থে মেয়েদের যা প্রয়োজন তা দিতে পারবো। এরপর আমরা সঞ্চয় করে ওদের সাথে ইংল্যান্ডে মিলিত হবো। তার আগে আমরা উপযুক্ত ভালো লোকদের সাথে মেলামেশা করতে পারি।' আমি কোন কথা একবার বললে তা শতবার বলতে থাকি। কিন্তু এতেই কি আলেকজান্ডার অন্ডওয়েল শুনবে? তার এক কান দিয়ে প্রবেশ করবে, আর এক কান দিয়ে বের হয়ে যাবে। সে বলবে, 'আমার এই বয়সে কে আমাকে চাকরি দিতে যাবে?' এ কথা

বলে দ্রুততার সাথে সে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবে।

আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। অ্যালেককে কিছু না জানিয়েই আমি তার উর্ধতন কর্তা জর্জ অ্যাটকিনের কাছে গেলাম। অ্যাটকিন চমৎকার মানুষ। বয়স চল্লিশ হলেও এখনো অবিবাহিত। আমার কথা শুনে তিনি বিষয়টা নিয়ে ভাববেন বলে জানালেন। তিনি তার সাথে কলকাতা ক্লাবে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন। এটা আসলে চাল। দীর্ঘ পোশাকধারী পুরুষ, পুচ্ছওয়ালা পোশাকের মহিলা, বেয়ারা, খিদমতগার, আবদর, আরো কত কি! অ্যাটকিন কত মহৎ! আমাকে তিনি বললেন যে, আমার মত সুন্দরী নারীর সাথে নিজেকে দেখে তিনি ধন্য হবেন। বন্ধুত্বের দাবীতে আমি তার নাকটা নেড়ে দিলাম। রাতে ভোজন ও নাচের পর তার গাড়ীতে আমাকে পৌছে দিলেন। আমি গভীরভাবে তার মুখ চুম্বন করে বিদায় জানালাম।

কয়েকদিন পর জর্জ অ্যাটকিন আমাকে তার বাংলোতে নৈশভোজে ডাকলেন। রাতটা সত্যিই রোমান্টিক। মোমবাতির আলো, শ্যাম্পেন এবং আরো অনেক কিছু- ইংলিশ হ্যাম, পনির এবং কলকাতার শ্রেষ্ঠ দোকানের সর্বোত্তম সব জিনিস। আমি জানতাম, সে কি চায়। আমি কি চাই, তাও জানি। ভোজনের পর আমরা যার যার উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হলাম। আমি তাকে যথার্থই সুন্দর সময় উপহার দিলাম। আগেই বলেছি, আমার স্বামী নিঃশেষিত। আমার বয়স মাত্র ছাব্বিশ এবং এক বছরের অধিক সময় ধরে আমি কোন পুরুষ মানুষকে জানি না।

জর্জ অ্যাটকিন প্রেমের ক, খও জানে না। কিন্তু আমি জানি বিশ শিলিং-এ এক পাউন্ড হয়। সে তার অঙ্গটা প্রবেশ করিয়েই নিঃশেষ হয়ে গেল। কিন্তু নিজে নিজেই দ্বিতীয়বারের জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এবার সে কঠোর, ক্ষিপ্ত। সে আমার স্তনে কামড় বসালো, আমার ক্ষুদ্র নিতম্বে তার নখ বসালো এবং যত প্রবলভাবে সম্ভব সেভাবে আমাকে যেন পিষে ফেললো। আমি কাতরোক্তি করলাম, 'প্রিয়তম, আমাকে তো মেরেই ফেললে।' এবার দীর্ঘলয়ে চাপ দিয়ে জোরে 'ওয়াও' শব্দ তুলে সে নেতিয়ে পড়লো। আমি ভান করলাম যে, খুবই বিপর্যস্ত হয়েছি। তাকে সেন্ট জর্জের মত লাগছিল। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'আঘাত দিয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিও।' আমাকে আঘাত দেয়া, এতোই সোজা! অত্যন্ত ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম, 'না প্রিয়, আমি আহত হইনি।। অনুভূতিটা ছিল চমৎকার। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।' জর্জ অ্যাটকিন আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন তার বেতন দ্বিগুণ হয়ে গেছে এবং ক্রিকেট খেলায় সেঞ্চুরী করেছে। আমরা পাশাপাশি শুয়ে ছিলাম। সে এমনভাবে চিতিয়ে ছিল যেন বুকের উপর অনেকগুলো সোনার মেডেল লাগানো রয়েছে। আমি অ্যাটকিনের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ ও মর্দন করে তাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলাম। এই পক্রিয়ায় সাপের ঝাঁপি থেকে যেন সাপ বেরুচ্ছে। আমি আরো সক্রিয় হলাম। প্রথমবারের পরই তার ছোট বাবু নেতিয়ে ছিল। আমার চঞ্চল হাত তার গোপন লালচে কোকড়ানো কেশ ও ছোটবাবুর উপর দ্রুত চালনা করলাম। ছোট বাবুকে পূর্ণ অবয়বে আনতে জিভ ব্যবহার করলাম। আমি তাকে এমন একটি রাত উপহার দিতে চাচ্ছিলাম যে রাতের কথা সে যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন মনে রাখবে। হাত দিয়ে সে আমার পিঠ আঁকড়ে ধরে বললো, 'তোমার মধ্যে নিশ্চয়ই হিন্দুস্থানী প্রাবল্য রয়েছে যার কারণে তুমি এতোটা প্রেমিক।' তার মন্তব্য আমার মনঃপুত হলো না। তাকে বললাম, 'প্রিয় জর্জ, প্রেমের মধ্যে হিন্দুস্তানী বলে কিছু নেই। আমি তোমার মতই পরিপক্ক। একশ ভাগ বৃটিশ এবং এ জন্য গর্বিত। এখন একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে- তুমি দেশের উন্নত কোন স্থানে অ্যালেককে একটি চাকরি জুটিয়ে দেবে।' আমি তখনো সক্রিয়। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি আমাকে কথা দিচ্ছো।' সে অন্যদিকে চোখ ফিরাতে চাইলো। কিন্তু আমি তার মাথা দু'হাত দিয়ে ধরে সোজা রাখলাম, 'প্রতিজ্ঞা করো। আনন্দটা শেষ পর্যন্ত তোমাকেই দেব, সে বললো, 'আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।' এটুকুই যথেষ্ট। আমার মুখ তার মুখে আঠার মত যুক্ত করলাম। জিহ্বা তার মুখের ভিতর চালনা করলাম এবং দু'জনই জানোয়ারর মত আচরণ শুরু করলাম। কামড়, নখের আঁচড় সব চললো। চূড়ান্ত সময়ে একে অন্যকে মেরে ফেলার অবস্থা হলো। অ্যাটর্নির অফিসে যেমন বলা হয়, এবার তেমনটিই হলো- স্বাক্ষর, সিলমোহর ও হস্তান্তর। রাত তিনটায় তার সহিস আমাকে বাড়ি পৌছে দিল।

পরদিন সকালে আমি অ্যালেককে জাগিয়ে তাকে অ্যাটকিনের সাথে সাক্ষাৎ করতে বললাম।

(আমি তাকে বলেছি যে, আমি একজনের সাথে আলাপ করেছি সে বিষয়টা অ্যাটকিনের কাছে বলেছে।) আমার একটাই ভয় ছিল যে, অ্যাটকিন আমাকে কলকাতায় রাখতে চাইবে। কিন্তু অবাক ব্যাপার। এক সপ্তাহের মধ্যে সে দিল্লীতে অ্যালেকের জন্য একটি চাকরি ঠিক করলো। তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য বাংলোতে গেলাম। এবার কোন মোমবাতি নেই, শ্যাম্পেন নেই, রাতের খাবারও নেই। সে শুধু আমার উপর তার কাজটা সারলো।

১৮৫৬ সালের বসন্তে এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দিল্লী আগমন। আমরা দরিয়াগঞ্জে একটি বড়ো দ্বিতল বাংলো ভাড়া করলাম। সেই এলাকাতেই অধিকাংশ বেসামরিক ইউরোপীয় বাস করতো। বাংলো সংলগ্ন একটি বড় প্রাঙ্গন এবং আয়া, খানসামা, মশালচি, আবদর, ভিশতি,সহিস, জমাদার ও অন্যান্য ভৃত্যের আবাসিক ব্যবস্থা ছিল। সুউচ্চ প্রাচীর এবং বিশাল লৌহ ফটকসহ বাংলোটি দেখতে ঠিক দুর্গের মত। আমাদের বাংলোর পূর্বদিকের নগর প্রাচীর যা ঘেঁষে যমুনা নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

নবেম্বর মাসে আমাদের তৃতীয় সন্তান, আরো একটি মেয়ের জন্ম হলো। কাশ্মীরী গেটে অবস্থিত সেন্ট জেমস চার্চে নিয়ে তার খৃষ্টান নাম রাখা হলো। আমিই নাম পছন্দ করেছিলাম ঃ জর্জিনা। (আমি একটি কার্ডে মেয়ের জন্ম ও তার নামের কথা জানিয়ে অ্যাটকিনকে পাঠিয়েছিলাম)। জর্জিনার জন্মের ১৫ দিন পর আমরা একটি পার্টির আয়োজন করলাম। দিল্লীতে মোটামুটি উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকেই পার্টিতে আমন্ত্রিত হলো। পঞ্চাশের অধিক ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলার আগমন ঘটলো। রেসিডেন্ট থিওফিলাস মেটকাফি, যাকে বুড়া সাহেব বলা হয়, তিনিও কিছু সময়ের জন্য এসেছিলেন। প্রধান বাজারে অবস্থিত ব্যাংকের ম্যানেজার মিঃ বেরেসফোর্ড স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে এসেছিলেন। লাল কিল্লার প্রহরীদের কমান্ডার ক্যাপ্টেন ডগলাস কমিশনার সাইমন ফ্রেসারকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। শিশুটির কারণে আমি নাচতে বা মদ পান করতে পারিনি। কিন্তু অন্য সকলে আনন্দ পুরোপুরিই উপভোগ করলো।

আমরা দেশী কাউকে আমন্ত্রণ করিনি। তথাপি অনেকে উপহার পাঠিয়েছে। তার মধ্যে বাদশাহ বাহাদুর শাহের প্রিয়তমা পত্নী বেগম জিনাত মহলের পাঠানো একটি চমৎকার রেশমি কাপড়ও ছিল।

রেসিডেন্ট মিঃ মেটক্যাফি আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে আমার অনুগ্রহ কামনা করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি নবাবদের হারেমের সাথে যোগাযোগ, রাখার জন্য এমন একজনকে খুঁজছেন যার পক্ষে নবাব পত্নীরা কি আলাপ আলোচনা করে তা জানা সম্ভব। আমি জানি না, কি করে তিনি আন্দাজ করলেন যে, আমি হিন্দুস্থানী বুঝি। যেহেতু তিনি যেচে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে আলাপ করলেন, আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম, শিশুটি বুকের দুধ ছাড়লেই যে কোন কাজ করতে রাজী আছি।

দিল্লীর শীতকাল খুবই উপভোগ্য। ডিসেম্বরের মধ্যে আগুন পোহানোর মত শীত আসে। ভোরে কুয়াশায় মাটি ভিজে থাকে। দিবাভাগ উষ্ণ ও উজ্জ্বল। আমার জায়গাটাকে আরামদায়ক করে তুললাম এবং ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য একটি কক্ষ নির্ধারিত রাখলাম। ক্যাপ্টেন ডগলাস ও তার তরুণ জুনিয়র অফিসাররা নিয়মিত আমাদের বাংলোতে আসতেন। আমি তাদেরকে পরিবেশন করতাম লবঙ্গ ও জায়ফল সহযোগে আখের রস হতে প্রস্তুত মদ রাম। এটা তাদের পছন্দের পানীয়। ক্রীসমাসের প্রাক্কালে আমরা সেন্ট জেমস চার্চে যেতাম। পরদিন সকালে আমাদের বারান্দা ঝুড়ি ভর্তি ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ থাকতো। আমার স্বামীর অধঃস্তন দেশীয় কর্মচারীরা 'বড় দিন' উপলক্ষে এসব পাঠাতো। বিকেলে রেসিডেন্ট মিঃ মেটক্যাফির বাসভবনে ইউরোপীয়রা সমবেত হতো। আমরা কাশ্মীরী গেট থেকে একটু দূরে তার সুবিশাল ভবনের উদ্যানে মহারাণীর স্বাস্থ্য পান করতাম। সেই সন্ধ্যায় কিছু অবিবাহিত যুবক আমাদের ক্রীসমাস ট্রির চারপাশে জড়ো হতো। সুরাপানের আধিক্যে প্রত্যেকে মাতাল হয়ে যেত। অ্যালেকের অবস্থা এমন দাঁড়াতো যে তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে হতো। অবশিষ্ট লোকগুলো তখন আমার সাথে ফস্টিনস্টিতে মেতে উঠতো- কিন্তু তেমন গুরুতর কিছু নয়। ক্রীসমাস উপলক্ষে চুম্বন, আলিঙ্গন এইসব আর কি!

বক্সিং দিবসে অ্যালেক ক্যাপ্টেন ডগলাসের সাথে শিকারে গেল। তারা দুটি হরিণ, চারটি হাঁস এবং প্রায় পঞ্চাশটি তিতির শিকার করে আনলো। আমাদের বন্ধুদের কাছে হরিণের রান এবং তিতিরের ডানা প্রেরণ করলাম।

নববর্ষ উপলক্ষে আমরা জাঁকালো ভোজের আয়োজন করলাম। মিঃ মেটক্যাফি পুনরায় সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য এসে আমাদের সম্মানিত করলেন। আরো একবার তিনি আমাকে একান্তে ডেকে আমার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাকে এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী বলে মনে হলো। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম যে, দায়িত্বটা আমি পালন করবো। মিঃ মেটক্যাফি বিদায় নেবার পর আসল আনন্দ শুরু হলো। অ্যালেক প্রায় সংজ্ঞা হারালো এবং তাকে ধরাধরি করে বিছানায় রেখে আসতে হলে। অ্যালেক যেখানে পড়ে আছে তার এক গজের মধ্যে একজন জুনিয়র অফিসার আমাকে প্রায় ধর্ষণ করলো। আমার স্টুপিড, প্রায় অচেতন স্বামী তাকে উৎসাহিত করতে চীৎকার করলো, 'এই কুত্তিটাকে নিয়ে ফুর্তি কর-যাও।' এই হচ্ছে দিল্লীর জীবন।

মওসুমের উৎসব সমাপান্তে জর্জিনার জন্ম ও বড় দিন উপলক্ষে নেটিভদের যারা উপহার পাঠিয়েছিল তাদের স্ত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলাম। অনেক বেগম আমার সাথে সাক্ষাৎ করে প্রতিবাদ জানালো আমার চিঠির। কারণ একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এ ধরনের সৌজন্য অপ্রয়োজনীয়। (আমি কি নেটিভ পরিবারের সদস্য! সত্যি! নেটিভরা এ ধরনের অতিরঞ্জন পছন্দ করে। আমি সকলের 'বোন'। তাদের ছেলেমেয়েরা আমাকে ডাকতো 'মাসী'। সামনে তারা প্রশংসা ও চাটুকারিতায় জুড়িহীন, কিন্তু পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে সদা প্রস্তুত।

১৮৫৭ সালের এপ্রিল মাসের কোন এক সময়। আমার মনে পড়ে প্রচন্ড গরম পড়েছিল তখন। দরজার পর্দা ভিশতিরা সারাক্ষণ ভিজিয়ে রাখতো। বিকেলেও কারো পক্ষে বাইরে বেরুনো সম্ভব ছিল না। রাতও কষ্টদায়ক। গরমের প্রচন্ডতায় আমরা ছাদে ঘুমাতাম এবং সেখানে সারারাত 'পাংখাওয়ালারা' আমাদের বাতাস করতো। একদিন বেগম জিনাত মহল তার তালকত্তোরা মহালের তরমুজ ও আম পাঠালেন। আমি এসবের বাহককে বখশিশ দিলাম বিষয়টি মিঃ ম্যাটক্যাফিকে জানালাম। তিনি আমাকে জানালেন যে ইউরোপীয় মহিলাদের পার্টিতে আমার যাওয়া উচিত, যারা আমার মত ফলের ঝুড়ি পেয়েছে এবং জিনাত মহলকে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছে।

ব্যাংক ম্যানেজার মিঃ বেরেসফোর্ডের প্রেরিত ফিটনে আমার বড় দুই মেয়েকেও সঙ্গে নিলাম। লাহোর গেটে মিঃ ডগলাস আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিকেলটা মেমসাহেবদের। সেখানে ছিলেন সার্জেন্ট ফ্রেমিং-এর স্ত্রী ও তার কন্যা, মিসেস স্কালি এবং অন্যান্যরা। ক্যাপ্টেন ডগলাস আমাদেরকে হারেমের রক্ষীদের প্রধান একজন মোটা খোজা বসন্ত আলী খানের হাওলা করে দিলেন। লোকটি আমাদেরকে মীনা বাজার ও সুদীর্ঘ করিডোর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেলো। দু' পাশের কক্ষগুলো রাজপরিবারের সদস্যদের দখলে। বিশ্বের কোথাও এতো ঘুপচি, দুর্গন্ধময় স্থান পাওয়া কঠিন। আমার ভৃত্যদের বসবাসের জায়গাও এর চাইতে ভালো। মহিলাদের পোশাক আমার আয়ার পোশাকের চেয়ে বাজে। আমাদেরকে সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। এটি যমুনার ঠিক তীরে।

পারস্যের গালিচায় বসানো ডিভানে আমরা উপবেশন করলাম। ডিভানের পিছনের অংশ রেশমী বস্ত্রে আবৃত। গ্রীষ্মের এই উত্তাপের মধ্যে গালিচা! কিন্তু নেটিভরা আছে সেবার জন্য। প্রতিটি অতিথির জন্য দু'জন করে মহিলা পিছনে দাঁড়িয়ে বড় সড় পাখা দিয়ে বাতাস করছে। তারা গোলাপ ও কেওড়া জল ছিটাচ্ছে আমাদের উপর। এক মহিলা ঘোষিকা সম্রাজ্ঞীর আগমন বার্তা ঘোষণা করলো। 'মহিমান্বিতা হিন্দুস্থানের মহান সম্রাজ্ঞী, পৃথিবীর অধিশ্বরী, যুগের মুকুট,'- নেটিভরা এ ধরনের উচ্চ খেতাব পছন্দ করে। সম্রাজ্ঞী এলেন। তিনি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। বড় বড় পটল চেরা চোখ, সুন্দর মুখশ্রী এবং ঘন কালো চুল। তার নেটিভ শেমিজ ও ঘাগরা মূল্যবান ও জাঁকজমকপূর্ণ। মাথার উপর দিয়ে ঝুলছে পাতলা ওড়না। তাকে স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি প্রত্যেকের সাথে হাত মিলানোর সময় ইংরেজীতে বললেন, 'গুড আফটারনুন।' আমার দু'মেয়ের গাল টিপে আদর করলেন। আমার মেয়েরাও সৌজন্য দেখাল। ফল ও মিষ্টির ট্রে

এলো। তিনি আমাদেরকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। যদিও তিনি অল্প ইংরেজী জানেন, আমাদের সাথে ফারসী ও হিন্দুস্থানীতেই কথা বললেন। আমাদের সকলেই কিছু ফারসী ও হিন্দুস্থানী শব্দ বুঝে। ফলে ভাব বিনিময়ে খুব অসুবিধা হলো না। আমাদের শব্দ ভান্ডার ফুরিয়ে গেলে হাসির সৃষ্টি হলো।

বেগমরা আসছে যাচ্ছে। তাদের কন্যারা মেম সাহেবদের দেখতে ও তাদের সাথে কথা বলতে দারুণ আগ্রহী। জেনানা মহলে পুরুষদের প্রবেশের অনুমতি নেই। কিন্তু সম্রাজ্ঞীর একমাত্র পুত্র শাহজাদা জওয়ান বখতকে সস্ত্রীক আমাদের মাঝে আগমনের অনুমতি দেয়া হয়েছে। ষোল বছর বয়সী পান্ডুবর্ণের এই শাহযাদা অতি সম্প্রতি তার চাচাত বোনকে বিয়ে করেছে। সম্রাজ্ঞী আমাদের প্রত্যেককে উপঢৌকন দিলেন। আমরাও তাকে ও তার পুত্রবধূকে উপহার সামগ্রী দিলাম। আমার দুই মেয়ে পেল রেশমী শেমিজ, সালোয়ার ও একটি করে সোনার চুড়ি। আমি তাকে দিলাম এক বোতল সুগন্ধি এবং তার পুত্রবধূর জন্য একটি ঘড়ি। উভয়ে এই উপহার পেয়ে খুশী হলো।

এক পর্যায়ে পার্টি ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল। আমি জওয়ান বখত ও তার স্ত্রীর সাথে এক গ্রুপে ছিলাম। ছেলেটিকে এখনো শেখানো হয়নি যে, মেয়েদের সাহচর্যে কেমন ব্যবহার করতে হয়। সে সারাক্ষণ পান চিবুলো এবং একটি রৌপ্য পিকদানে রক্তবর্ণের থুথু ফেললো। একজন খোজা তার পিছু পিছু এই পিকদান নিয়ে ছুটাছুটি করলো। একজন সাধারণ নেটিভের মত জওয়ান বখত হাত দিয়ে তার গোপন স্থান চুলকালো। তাছাড়া তার বাজে অভ্যাস চাটুকারের কানে কানে ফিসফিস করা। এক সময় সে ফারসীতে মন্তব্য করলো এই ধারণায় যে, আমরা বুঝি না। যখন থেকে আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছি, তখন থেকে তার বদ নজর ও জিহ্বা আমার দিকে নিবদ্ধ। সে তার স্ত্রীর কাছে একটি ফারসী কবিতা আউড়ালো।

"পাপিয়ার কাছে বিশ্বস্ততা আশা করো না।
যে সর্বক্ষণ অন্য গোলাপে গান গায়।"

মূর্খ বালিকা দুই হাতে মুখ ঢেকে হাসিতে ফেটে পড়লো। যেহেতু জওয়ান বখতের দৃষ্টি আমার উপর, সন্দেহ করলাম, কবিতাটা আমার সম্পর্কেই ছিল। তার মা যখন কিছু মহিলার সাথে আলাপে রত তখন সে আবার ফারসীতে বলল, 'সুন্দরী তরুণীর পাশে একটি তীর একজন বৃদ্ধ লোক অপেক্ষা উত্তম' তার স্ত্রীর হাসির মাত্রা দ্বিগুণ হলো। এতে জওয়ান বখতের কবিতা আওড়ানোর উৎসাহই শুধু বাড়লো ঃ

"যখন সে তার স্বামীর হাতে কিছু দেখে
কিছুটা নরম, ক্ষুধার্ত মানুষের ঝুলে পড়া
নীচের ঠোটের মত-
আমার প্রচেষ্টা নিদ্রিতকে জাগ্রত করতে পারে
কিন্তু মৃতকে নয়।'

আমার খুব রাগ হলো। তার স্ত্রীকে বললাম, 'তোমার স্বামী কি বক বক করছে?' জওয়ান বখত চতুর হওয়ার চেষ্টা করলো। নির্বোধটা বুঝে উঠতে পারেনি যে, আমি ফারসী বুঝতে পারবো। বোকার মত হেসে সে উত্তর দিলো, 'অভয়েল মেমসাহেব, এটা যৌবন ও সৌন্দর্যের প্রশংসাসূচক একটি কবিতা। আপনার রাগের কোনো কারণ নেই। রাগান্বিত মেয়েদের সম্পর্কে একই কবি শেখ সা'দী বলেছেন, ফারসীতে সে আবৃত্তি করলোঃ

"যে নারী অতৃপ্ত অবস্থায় শয্যা ত্যাগ করে
সে তার পুরুষের সাথে ঝগড়া ও বিবাদ করবে
যে বৃদ্ধ লাঠির সাহচর্য ছাড়া দাঁড়াতে অক্ষম

কি করে তার নিজের লাঠি দাঁড়াবে?"

আমি তাকে ফারসীতে অতি সংক্ষেপে বললাম, 'আমি যথার্থই জানি এর অর্থ কি? নিজের কারণেই তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। তুমি যা বলছিলে তা কি তোমার মাকে বলবো? তোমার নিজ চেহারা কখনো দেখেছো? শুকনো কলাপাতার মত বিবর্ণ। ক্রিমির মত নড়চড় করছো।' তার মা আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা দু'জন কি নিয়ে ঝগড়া করছো?' উত্তর দিলাম, 'আপনার পুত্রকে জিজ্ঞেস করুন সম্রাজ্ঞী।'

আমি জওয়ান বখতের গ্রুপ ছেড়ে আমার দৃষ্টিতে পড়ার প্রচেষ্টায় রত একটি বালিকার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। সে যে ইংরেজীগুলো আয়ত্ত করেছে সেগুলো বলার চেষ্টা করলো। জওয়ান বখত দ্রুত ফিরে মিসেস স্কালির সাথে কথা শুরু করলো। আমি জানি না, সে কি বলেছিল, কিন্তু মিসেস স্কালি সহসা দাঁড়িয়ে মিসেস ফ্লেমিংকে বললো, 'মাম্মি তুমি কি শুনেছ, এই রাসকেলটা কি বলছে? সে বলছে যে, খুব শীগগীর সে ইংরেজদের পদানত করবে। এরপর হত্যা করবে হিন্দুদের।'

মিসেস ফ্লেমিং বৃদ্ধা এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী। রাগতঃস্বরে তিনি জানতে চাইলেন, 'জওয়ান বখত, তুমি কি এসব বলেছো?'

সম্রাজ্ঞী জিনাত মহলও তার পুত্রের দিকে ক্রোধভরে তাকালেন। জওয়ান বখত তার লাল দন্ত বিকশিত করে উত্তর দিল, 'আমি মস্করা করছিলাম।'

মিসেস ফ্লেমিং বললেন, 'তুমি কি ধরনের মস্করা শিখেছো? প্রথমে তুমি এক ভদ্রমহিলার সাথে রূঢ় আচরণ করেছো এবং এরপর ইংরেজ জাতিকে অপমান করেছো। হিন্দুস্থানে যদি কোন গোলযোগ হয় তাহলে সর্বপ্রথম তোমার কাঁধ থেকে কল্লাটা কেটে ফেলা হবে।'

পরিচারিকারা আতংকে উচ্চারণ করলো, 'লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা....।' জিনাত মহলের চোখে মুখে বিব্রত ভাব। সকলে জানে যে, সম্রাজ্ঞী সাহেবদের কাছে ধর্ণা দিচ্ছেন, যাতে জওয়ান বখতকে দিল্লীর পরবর্তী বাদশাহ ঘোষণা করা হয়। আর জওয়ান বখত তার আশায় শীতল পানি ঢালছে। 'এ কেমন বেয়াদবী কথাবার্তা। এক্ষুণি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত'-তিনি শক্তভাবে বললেন।

সে বিড় বিড় করে বললো, 'আমি শুধু বলছিলাম যে বাজারে জোর গুজব' পারসিকরা হিন্দুস্থানে হামলা চালাবে। একশ' বছর আগে নাদির শাহের মত তারা ধ্বংসলীলা চালাবে এবং বিধর্মীদের নির্মূল করবে। আম্মাজান আপনি তো জানেন, দিল্লীতে ইউরোপীয় ভদ্রমহিলাদের রক্ষার জন্য আমি নিজের জীবন দিয়ে দেব।'

নেটিভদের সম্পর্কে একটু আগে যা বলেছি, এ হচ্ছে তার প্রমাণ- চোখে মুখে তুখোড় মিথ্যাবাদী, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। যা হোক, মিঃ মেটক্যাফির জন্য কিছু জোগাড় হলো।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হলো। জিনাত মহল পানের জন্য পাঠিয়েছিলেন। পান এলে নিজ হাতে আমাদেরকে দিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয়ের মত আমিও পান সহ্য করতে পারি না। কিন্তু দরবারের সৌজন্যের খাতিরে পান নিতে হলো। আমরা পান মুখে পুরে সম্রাজ্ঞীকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আমার স্বামীকে লাল কিল্লার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বললাম। সে খুব বিস্মিত হলো না। সে বললো যে, পারসিক ও রুশদের হামলার আশংকার কথা সেও শুনেছে এবং জুমা মসজিদের প্রাচীরে সাটানো পোস্টারে বলা হয়েছে যে, এই অভিযান হবে গ্রীষ্মকালে। লর্ড ক্যানিং যেদিন থেকে ভাইসরয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই এই গুজব ছড়ানো শুরু হয়েছে। লর্ড ক্যানিং যেদিন শপথ গ্রহণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন সহসা গালিচায় পা আটকে তিনি পড়ে যান। নেটিভরা সেদিন থেকে বলাবলি করছে যে, এ হচ্ছে আল্লাহর ইশারা যে, ক্যানিং এর সরকারের পতন এভাবেই হবে। অ্যালেক বললো, অধিকাংশ নেটিভের বিশ্বাস, পলাশী যুদ্ধের একশত বছর পূর্তিতে হিন্দুস্থান হতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে। জুনের কোন এক সময়ে সেই একশত বার্ষিকী। সে আমাকে আশ্বস্ত করলো, 'এই নিগাররা শুধু বকবক করতে পারে। এদের বিচার করা হোক। আমরা তাদের নোংরা পশ্চাদ্দেশে তৈলসিক্ত বংশ দন্ড ঢুকিয়ে দেব। অ্যালেক যৌনকর্মে অক্ষম

হয়ে যাওয়ার পর থেকে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করছে।

অ্যালেক মিঃ মেটক্যাফির সাথে সাক্ষাত করে আমার সংগৃহীত তথ্যগুলো দিল। তারগুলোও বললো। তিনি অ্যালেককে ধন্যবাদ জানিয়ে বাদশাহর অনেক দৌহিত্রের মধ্যে একজন মির্জা আবদুল্লাহর হারেমের মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারটি আমাকে জানাতে বলেছিলেন।

মির্জা আবদুল্লাহ দরিয়াগঞ্জে বাস করে। আমাদের বাংলোর পিছনের রাস্তার পাশের বাসিন্দা হাসান আসকারী নামের এক লোকের অনুসারী এই মির্জা। হাসান আসকারী নাকি বাদশাহর শ্রবনেন্দ্রিয়ের মতো। বাদশাহর কন্যা, দু'বছর আগে যার মৃত্যু ঘটেছে সে ছিল আসকারীর বেগম। মির্জা আবদুল্লাহর বোনের সাথে আমার বহুবার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি কখনো পাল্টা সৌজন্য সাক্ষাতে যাইনি। কিন্তু মেটক্যাফি আমার স্বামীকে বলার পর ভাবলাম, দায়িত্বটা এবার পালন করা উচিত।

একদিন বিকেলে মির্জা আবদুল্লাহর বাসভবনে গেলাম। একজন ইউরোপীয় মহিলা সাক্ষাতের জন্য গেলে নেটিভরা কেমন তোষামোদিতে গলে পড়ে। মহিলারা এতো উৎফুল্ল হলো যে, কথা বলতে তাদের দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া সকলে অভিযান ও বিদ্রোহের গুজব সম্পর্কে আমাকে বলতে আগ্রহ দেখাচ্ছিল। মির্জার বড় বেগম বললেন, 'তোমরা নিশ্চয়ই মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারো না। মানুষ আছে তো গুজব থাকবেই।' হাসান আসকারী সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, 'হাসান আসকারী আল্লাহর মানুষ। কিন্তু আমাদের ধর্মমত থেকে তারটা ভিন্ন। তিনি শিয়া, আর আমরা সুন্নী। তার সাথে আমাদের করণীয় কিছু নেই।"

আমি জানতাম, কথাটি মিথ্যা। যে দর্জিটা আমার টুকটাক সেলাই এর কাজ করে দেয়, সে মির্জা আবদুল্লাহর বাড়িতেও কাজ করে। সে আমাকে বলেছিল, হাসান আসকারীকে প্রায়ই মির্জা আবদুল্লাহর বাড়িতে দেখে। আগেই বলেছি, নেটিভদের বিশ্বাস করা যায় না। যেদিন থেকে তারা কথা বলতে শিখে, সেদিন থেকে তারা মিথ্যাও শিখে। তারা মনে করে যে, সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলাই চতুরতা।

মির্জা আবদুল্লাহর বাড়ির তথ্যাদি অ্যালেক মিঃ মেটক্যাফিকে দিয়ে এলো। ফিরে এসে সে সৈন্য শিবিরে রহস্যময় আগুন এবং চাপাতি নিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় লোকদের চলাফেরার ঘটনা আমাকে বললো। আমরা নিশ্চিত হলাম যে আমাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারিনি যে কত শীঘ্র এই দু'মুখো, বিশ্বাসঘাতকরা পিছন থেকে আমার উপর ছুরি মারবে। কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো আমি যা আজো স্মরণ করতো পারি।

আমাদের নিয়মিত অভ্যাস হচ্ছে ধুলিঝড় না হলে প্রতি সন্ধ্যায় ছাদের উপরে উঠে সূর্যাস্ত দেখা এবং নৈশ ভোজ সারা। আগেই বলেছি ভিশতিরা আমাদের জন্য পানি ছিটায় এবং ভৃত্যরা বিছানা তৈরী করে। ঝাল তরকারি খেলে অ্যালেকের পাকস্থলীতে বায়ু উৎপন্ন হয় এবং সে পরিবেশটা দূষিত করে তোলে। ইতিপূর্বে আমার বিছানা অ্যালেকের বিছানার সাথে থাকলেও এখন ওর বিছানাটা একটু দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ফলে অ্যালেকের উৎপাদিত শব্দে আমাদের বিঘ্ন ঘটে না। রাতে ছাদের উপর ঠান্ডা থাকে এবং ভোরের বাতাসও উপভোগ্য।

রমযান মাসে মুসলমানদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অভুক্ত থাকার সময়। এমনি এক সকালে বিশ্বাসঘাতকতার সূত্রপাত। আমার মনে আছে নামাযের জন্য মুয়াজ্জিনের আজানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল। তখনো ঘন অন্ধকার। কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। দরিয়াগঞ্জে অনেকগুলো মসজিদ এবং এক মুয়াজ্জিনের আজান শেষ হলে অন্য মসজিদের মুয়াজ্জিন আজান দিতে শুরু করে। আমাদের মুসলমান ভৃত্যরা তাদের খাওয়া শুরু করেছিল। নদীর অপর তীরের জঙ্গলের উপর দিয়ে ভোরের আলো ফুটছে। এ সময় শাহী মসজিদ থেকে কামানের গোলা ছোড়া হলো। বিস্ফোরণের শব্দে অ্যালেক ও মেয়েদের ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ছাদের উপর মেয়েরা হৈ চৈ শুরু করলো। তারা দুধ পান শুরু করছে। আমি ও অ্যালেক চা পান করছি। এ সময়ই দেখলাম মোটা বানিয়া পিতলের লোটা হাতে এসে দেয়ালের পাশে উবু হয়ে বসে পড়লো। নেটিভরা দেয়ালের ধার ধারে না। অ্যালেক চা পানের সময় সাথে একটি

গুলতি ও নুড়িপাথর নিয়ে বসে। বানিয়ার মলত্যাগ শুরুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অ্যালেক গুলতি টান করে একটি নুড়ি ছুড়লো। নুড়ি পিতলের লোটায় লেগে টং করে শব্দ হলো। বানিয়া তাড়াতাড়ি উঠে ধুতি ঠিকঠাক করলো। 'এখান থেকে ভাগ, কালো হারামজাদা'- অ্যালেক গালি ছুড়লো। বেচারা দ্রুত কেটে পড়লো। আমরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম। একটু পর একটি লোক এলো তিতিরসহ খাঁচা নিয়ে। আরেকটি তিতির কয়েক গজ পিছনে অনুসরণ করছে আর ডাকছে- তিতুর, তিতুর, তিতুর। অ্যালেক তার বন্দুক উঁচু করলো। নদীর দিক থেকে আসা হাঁস বা অন্য পাখী দেখলেই গুলী করার জন্য অ্যালেক পাশে বন্দুক রাখে। তিতিরটির দিকে বন্দুক তাক করেই সে বললো, 'মোটাসোটা তিতিরটাকে মারবো। চমৎকার ভোজ হবে আজ! কি বলো?' তিতিরের দিকে প্রতিদিন সকালে বন্দুক তাক করে একই কথা বলে। অন্যান্য দিনের মতোই দিবসটির সূচনা হলো।

রক্তের মত লাল টকটকে হয়ে সূর্য উঠলো। উত্তাপ কড়া। সূর্যোদয়ের সাথে এলো মাছি। অ্যালেক ও মেয়েরা নীচে নেমে গেল। আমি যখন সিড়ির কাছে তখন নদীর অপর তীরে ধুলি মেঘ লক্ষ্য করলাম। ওটা আসলে কি, দেখার জন্য থামলাম। অশ্বারোহীদের একটি দল নৌকা দিয়ে তৈরী সেতু অতিক্রম করতে করতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলী ছুঁড়ছে। আমি চীৎকার করে ডাকলাম, 'অ্যালেক, অ্যালেক। উপরে এসে দেখো।' অ্যালেক ছাদে উঠতে উঠতে অশ্বারোহীরা কিল্লার পিছনে হারিয়ে গেল। আরেকটি দলকে দেখা গেল। এই দলটি দরিয়াগঞ্জের দিকে প্রাচীরের পাশাপাশি এগিয়ে এলো। ছাদের উপর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চীৎকার করলো, 'মার ডালো সালে ফিরিঙ্গি কো।' তাদের পরণে কোম্পানীর ইউনিফর্ম। আমরা দ্রুত নীচে অবতরণ করে বাংলোর গেট বন্ধ করে দিলাম।

শেষ সম্রাট

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, যখন কোন পাপী রোযা রাখে আল্লাহ দিনটিকে দীর্ঘ করে দেন। ১২৭৩ হিজরী সালের রমযান মাস অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসটাকে আমার কাছে অনুরূপ মনে হলো। ইসলামের বিধানাবলী প্রতিপালন করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করি না। কিন্তু এখন পেশী দুর্বল হয়ে গেছে এবং ইচ্ছার পরিতৃপ্তির কাছে প্রায়ই পরাভূত হয়। বিশেষতঃ মধু ফল আমের মওসুমের মধ্যে পড়েছে পবিত্র রমযান মাস। আমের স্বাদ গ্রহণের সর্বোত্তম সময় হচ্ছে সকাল থেকে বিকেলের মধ্যে। কিন্তু দিবাভাগে সবরকম খাওয়াই নিষিদ্ধ। এমনকি আমও। আল্লাহ যদি আমার বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে চান, তাহলেও বলবো আমি বাদশাহ হয়েও আমার সাম্রাজ্যে ফলের রাজা আম খাওয়া বর্জন করে চলেছি।

সূর্যোদয়ের এক প্রহর আগে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া আমার পুরোনো অভ্যাস। বারান্দায় বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমার হুকুম ছিল ফযর নামায শেষ না করা পর্যন্ত কেউ যাতে আমাকে বিরক্ত না করে। এর ফলে প্রতিদিন তিন থেকে চার ঘন্টা সময় নিজের সাথে একাকী কাটানোর সুযোগ হতো আমার। এই সময়টা আমি ধ্যানমগ্ন হতাম। অন্ধকারে নিজেকে জড়িয়ে নিরবে বসে থাকতে আমার ভালো লাগতো। যমুনার বুকে ভোরের ক্ষীণ জ্যোতির চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখতে ভালো লাগতো। চাঁদহীন রাতে অসংখ্য তারকার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সকালের আকাশে বিলীয়মান তারকার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করতাম। কোকিলের কুহুতানের মধ্যে সূর্যোদয় দেখতে আমি পছন্দ করতাম। ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়া অনেক সময় আমার বুকে কবিতার আবেশ সৃষ্টি করতো। কখনো কখনো মোমবাতি জ্বালিয়ে একটি বা দু'টি কবিতা লিখে ফেলতাম। কোন কোন সময় গজলের লাইনগুলো আমার মনের মধ্যে সঙ্গীতের সুরে পরিণত হতো। অনেক সকালে কবি জউক বা মির্জা গালিব কিংবা শহরের অন্য কোন কবির পাঠানো কবিতার লাইনগুলো মনে মনে আবৃতি করতাম।

শান্তি ও নিভৃতে থাকার এই সময়টুকুতে আমি সৃষ্টিকর্তার খুব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি বলে ভাবতাম। দিনের অবশিষ্ট সময় কাটতো কঠোর ব্যস্ততার চাপের মধ্যে। বিশ্ব যখন স্বয়ং রাতের মধ্যে আচ্ছাদিত হতো তখন মনের আয়নাটা হয়ে যেতো আকাশের মতো, যেখানে ভাবনাগুলো তারকার মতো মিটমিট করতো। নিজের অন্তরের সাথে বুঝাপড়া করার সর্বোত্তম

সময় এটি। বিশেষতঃ যদি কেউ নিজেকে রাজাধিরাজ ও হিন্দুস্থানের সম্রাটও ভাবে ,সে যে কত তাৎপর্যহীন তা উপলব্ধি করার সময়।

একাকীত্বে কাটানোর পর আমি আমার মহান পূর্বপুরুষ আলমগীর আওরঙ্গজেব (আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন) নির্মিত মোতি মসজিদে চলে যেতাম। মর্মর পাথরে নির্মিত মসজিদের তুষার শীতল পরিবেশে সৃষ্টিকর্তা ও তার নবী (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম। (যিনি তারকারাজি ও চাঁদকে রৌপ্যের ঔজ্জ্বল্য এবং সূর্যকে অগ্নি আলো দিয়েছেন।)

রমযান মাসে এই নিয়মের কিছু পরিবর্তন ঘটতো। রাতের শেষ প্রহরে রান্না ঘরে আগুন জ্বালানো হতো যাতে পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা দেখা দেয়ার পূর্বেই লোকদের খাবার দেয়া যায়। রমযানে ভোজের সময়টা দিওয়ান-ই-খাসে বসে তসবি টিপতাম এবং আল্লাহর নিরানব্বই নাম জপতাম।' সেহরী একাই খেতাম। আমার প্রিয়তমা রানী জিনাত মহল নিজ হাতে তৈরী পান পাঠাতো। পান চিবিয়ে হুক্কায় ধুমপান করতে করতে লক্ষ্য করতাম যে বেহেশতের আদেশে যমুনার স্রোতধারায় কেমন পরিবর্তন হচ্ছে। লাহোরী গেটের উপর কামানের গর্জনে রোযা শুরুর ঘোষণা হলে খিদমতগারদের একজন এসে হুক্কার নল সরিয়ে নিয়ে যেত।

আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে কি ঘটেছিল। ঠিক আগের রাতে বেগম জিনাত মহল ও আমি বারান্দায় পায়চারি করছিলাম। স্বচ্ছ আকাশের পূর্ণিমা চাঁদ নদীতে যে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে জিনাত মহল কথা বলছিল। আমি যখন আবহাওয়ার রুক্ষতা সম্পর্কে বললাম, সে উত্তর দিলো যে, এই উত্তাপ আসছে মরুভূমি থেকে এবং আমকে মধুর স্বাদ দিতে। জেসমিন ও অন্যান্য ফুলকে সুবাস দিতে। তার খোপায় বাঁধা ফুল দিয়ে তৈরী মালা খুলে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করলো। আমি সুগন্ধ নাকে টেনে তার হাতে ফিরিয়ে দিতে গেলে সে বললো, এটা আপনার বালিশের পাশে রাখুন, তাহলে দাসীর কথা সম্রাটের মনে পড়বে। রমযান মাসে যেহেতু নারী মিলন নিষিদ্ধ, সে জন্য আমি তার ফুলের উপহারটাই গ্রহণ করলাম। ফুলের সুবাস আমার স্বপ্নকে পরিপূর্ণ করলো। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, ভোরের তারকা ও ভোরের বাতাস আমার প্রিয়তমাকেই স্মরণ করিয়ে দিলো।

১১ই মে, অজু করতে ও নামায পড়তে আমার খানিক বিলম্ব হয়েছিল। তবু সূর্য উঠার আগেই কাজগুলো সম্পন্ন করতে পেরেছি। যমুনা তীরে তরমুজ চাষীদের জ্বালানো আগুন সূর্যের আলোতে ফিকে হয়ে এসেছে। সৈন্যরা নৌকার সেতুতে প্রহরী বদলাচ্ছে। তিতির পোলাও দিয়ে হালকা নাশতা হলো। এরপর কয়েকটি আম খেলাম। আমের মওসুমের কেবল শুরু। বরফ শীতল দুধও পান করলাম। পান চিবুতে চিবুতে হুক্কায় কয়েক টান দিলাম। ফযর নামায পড়ে দিওয়ান-ই-খাসে ফিরে এলাম। শাহী কবিরাজ হাকীম আহসান উল্লাহ খান হাজির হয়ে আমার নাড়ী পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহান আল্লাহ, যিনি একাই নশ্বর দেহের রহস্য নিরূপণ করেন তার অনুগ্রহে আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো। এরপর আগমন ঘটলো আমার ক্রীতদাস খোজা বসন্ত আলী খান ও উকিল গোলাম আব্বাসের। তারা রাজ পরিবারের খরচের হিসাব নিয়ে এলো। আমাদের ব্যয় বরাবরের মত আয় অপেক্ষা বেশী। আমি হিসাব দেখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ওদেরকে হাত তুলে বিদায় দিলাম। বিভিন্ন আবেদন নিয়ে আগতদের ভিড়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমি যমুনা নদীর মনোহর দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

সূর্য উপরে উঠেছে। ধোপারা নদী তীরে পাথরের উপর যে কাপড় আছড়াচ্ছে তার শব্দ আসছে। তাদের স্ত্রীরা কাপড়গুলো শুকানোর জন্য মেলে দিচ্ছে। বাচ্চারা বালিতে ছুটাছুটি করে খেলছে। তরমুজের ঝাঁকা মাথায় মুটেরা নৌকার সেতু দিয়ে নদী পার হচ্ছে। সকালটা গ্রীষ্মের অন্যান্য সকালের মতই।

সহসা কোলাহলের শব্দ কানে এলো। ফাঁকা গুলী করতে করতে একদল অশ্বারোহীকে সেতু পার হয়ে আসতে দেখলাম। সেতুর প্রহরীরা তাদের আগমন ঠেকালো না। অশ্বারোহীরা বালুচর অতিক্রম করে আমার কাছাকাছি কিল্লার প্রাচীরের কাছে এলো। তারা চীৎকার করে বলছে, 'দোহাই, দোহাই আমাদের ফরিয়াদ শুনুন।' কেউ কেউ শ্লোগান তুললো, 'বাদশাহ সালামত জিন্দাবাদ'। আমি কার্ণিশের উপর দিয়ে নীচে তাকালাম। লোকগুলোর পরনে ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির ইউনিফর্ম। আমাকে দেখা মাত্র তারা কুর্ণিশ করলো এবং চীৎকার করলো, 'হিন্দুস্থানের মহান বাদশাহ দীর্ঘজীবী হোন।' একজন তার কণ্ঠকে সর্বোচ্চ গ্রামে তুলে বললো, 'আমরা মীরাটে ফিরিঙ্গিদের হত্যা করেছি। নাসারারা আমাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়। আমরা এসব জঘন্য বিধর্মীদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবো। আমরা আপনাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বানাবো।' তারা শ্লোগান দিলো, 'মোগল বংশ দীর্ঘজীবী হোক।

'লা-হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আজিম'- ভয় নেই আল্লাহ প্রবল প্রতাপান্বিত ও ক্ষমতাশালী।' আমি বিস্মিত হলাম। 'এই লোকগুলো কে?' বসন্ত আলী খানের কাছে জানতে চাইলাম। সে উত্তর দিলো না। তার কালো মুখে বোকার মত হাসি। তাকে নির্দেশ দিলাম, 'অবিলম্বে ক্যাপ্টেন ডগলাসকে জানাও এবং দেখ, যাতে তারা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে।'

কুর্ণিশ করে বসন্ত আলী খান চলে গেল। তার ব্যবহারের কোন একটা পরিবর্তনে আমার মনে হলো, নির্দেশ প্রতিপালন করার ব্যাপারে তার তেমন গরজ নেই। ক্যাপ্টেনের কাছে আরেকজন দূত পাঠালাম। মীরাট থেকে আগত সৈন্যরা হারেমের কাছে প্রাচীরের নীচে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে, 'মালিকা-ই-হিন্দ' জিন্দাবাদ।' নৌকার সেতু পেরিয়ে আরো অশ্বারোহী এসেছে ইতিমধ্যে। কিল্লা রক্ষীদের দায়িত্বে নিয়োজিত ক্যাপ্টেন ডগলাসের আগমন ঘটলো। সে নীচে নেমে লোকগুলোর সাথে কথা বলতে চাইলো। তার জীবন বিপন্ন করতে নিষেধ করলাম। আমি বারান্দায় গেলাম। সে নাছোড়বান্দা। আমি তাকিয়ে থাকলাম, কেউ তার ক্ষতি করে কিনা দেখতে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি চাও? এভাবে মোগল সম্রাটকে বিরক্ত করার কি অধিকার তোমাদের আছে? অবিলম্বে তোমাদের নিজ নিজ বাহিনীতে চলে যাও। তা না হলে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' নীচের লোকগুলো চীৎকার বন্ধ করলো এবং ঘোড়া হাঁকিয়ে হারেমের জানালার নীচে সহযোগীদের সাথে মিলিত হলো। বিদ্রোহী দলটিকে আটক করার উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাপ্টেন ডগলাস তাদের ছেড়ে এলো।

আমি অপেক্ষা করলাম। আমি কোম্পানীর ইউনিফর্ম পরা আরো সৈনিককে সেতু পেরিয়ে আসতে দেখলাম। মিঃ সাইমন ফ্রেশার কিল্লাতেই বাস করতো। সে তাদের মহিলাদেরকে আমার হারেমে নিরাপদে পৌছানোর জন্য একটি পালকী ধার চেয়ে খবর পাঠালো। কিল্লার প্রবেশ পথে কামান বসানোর অনুমতিও চাইলো। আমি তার অনুরোধ প্রতিপালনে অনুমতি দিলাম। কিন্তু এসব নির্দেশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে আমি খোজা বসন্ত আলী খানের উপর নির্ভরশীল ছিলাম।

আমি তখনো অপেক্ষা করছি। নগরীর বিভিন্ন অংশ হতে গোলযোগের খবর এলো। আমি ভাবলাম, দ্বিধাদ্বন্দ্বের আগুনের মাত্রা যখন স্বল্প থাকে তখন আমরা কি কৌশলের বারি সিঞ্চনে তা নির্বাপিত করতে পারি না? আমি নির্দেশ জারি করলাম যে, বিদ্রোহীদের যাতে নগরীতে প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। নগরীর বাইরে না যাওয়ার জন্য সাহেবদের পরামর্শ দিলাম। কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না।

এক ঘন্টা পর আমি জানতে পেলাম যে, বিদ্রোহীরা নগরীতে প্রবেশ করেছে এবং দরিয়াগঞ্জের কিছু ইউরোপীয়কে হত্যা করেছে। এরপর খবর এলো, চাঁদনী চকে বেগম সামরুর প্রাসাদে বসবাসরত ব্যাংক ম্যানেজারকে হত্যা করা হয়েছে। কিল্লার ইউরোপীয়দের ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং তাদের মহিলাদের হারেমে আনা হয়েছে কিনা খোঁজ নিলাম। তখনই শুনলাম, বেচারা ক্যাপ্টেন ডগলাস ও ফ্রেশারের পরিবারের মেয়েদেরকে তাদের ঘরেই হত্যা করা হয়েছে।

বিদ্রোহীদের কিল্লায় প্রবশ করতে দেয়ার জন্য কেউ গেট খুলে দিয়েছে। সৈন্যরা আমাকে ঘিরে ধরেছে। তাদের মধ্যে কিল্লার অনেক রক্ষীও আছে। তারা আমাকে তাদের সত্যিকার শাসক ও হিন্দুস্থানের সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করলো। আমি প্রতিবাদ করলাম, 'কে আমাকে সম্রাট বলে? এই নগণ্য পৃথিবীতে আমি ফকির হিসেবে আমার জীবনকে শুধু প্রলম্বিত করছি। আমার বাহুতে আর শক্তি নেই, আমার দুর্বল কণ্ঠ কিল্লার প্রাচীরের বাইরে থেকে শোনা যায় না।' আমার কথা তারা শুনলো না। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মাঝে কাগজের নৌকার মত আমি ভাসছি।

সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমার প্রাসাদে আমন্ত্রণ ও ঘোষণা ছাড়াই সৈন্যদের আগমন অব্যাহত ছিল। দরবারের কোন রীতিনীতির তোয়াক্কা করলো না তারা। আমার ভৃত্যদের

একপাশে ঠেলে বিশেষ দরবার অনুষ্ঠানের জন্য দিওয়ান-ই-খাসে প্রবেশ করে আমার হাত আঁকড়ে ধরে অনেকে চুম্বন করলো এবং আমার দোয়া চাইলো। অনেকে আমাকে রৌপ্য মুদ্রা দিলো। অধিকাংশই আমাকে স্পর্শ করে ঠোঁটে আঙুল ছোয়ালো। সবকিছু স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। স্বপ্নটা যেন ভালো ও মন্দের সমন্বয়। অনেক সময় যেমন ঘটে, স্বপ্ন দেখে আমরা ভয়ানকভাবে জেগে উঠি তেমনি, বিস্ফোরণের শব্দকে হাজারটি বজ্রপাতের শব্দের মতো মনে হলো। আমার প্রাসাদ যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো। কিছুক্ষণ পর জানতে পেলাম ইংরেজ সৈন্যরা কাশ্মীরি গেটে বারুদে আগুন দিয়েছে। আমার কয়েক শ' প্রজা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে। গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে গোলযোগ।

এলিস অগুওয়েল ওরফে আয়েশা বানু বেগম

আমি কখনো কোনো হিন্দুস্থানীর কথা বিশ্বাস করিনি এবং প্রতিবার আমার সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সেই বিকেলে আমাদের মর্জি বা পছন্দের কিছু ছিল না। আমার স্বামীকে বললাম, 'অ্যালেক, আমাদের সব ডিম একটি ঝুড়িতে রেখো না। তুমি অন্যদের সঙ্গে যাও। আমি মেয়েদেরকে নিয়ে মির্জা আবদুল্লাহর বাড়ী যাচ্ছি।' অ্যালেক সম্মত হলো।

বেগম জিনাত মহল আমার মেয়েদের যে নেটিভ পোশাক দিয়েছিলেন, তাদেরকে তা পরিয়ে নিলাম। আমার আয়ার নিকট হতে ধার করা পরিষ্কার সালোয়ার কামিজ পরে তার উপর তার নোংরা বোরখা পরলাম। দুটো পালকী ডেকে দুই মেয়েকে একটিতে এবং আমি ও শিশু কন্যা অপর পালকীতে উঠলাম। ভৃত্যদের একজন আমার সাথে যেতে সম্মত হলো। অভিজাত ঘরের নেটিভ মেয়েরা পালকীতে উঠলে পর্দাগুলো নামিয়ে দেয়া হয়। আমিও তাই করলাম।

আগেই বলেছি, মির্জা আবদুল্লাহ বাদশাহর নাতি। শাহী মসজিদের কাছে উর্দু বাজারে থাকতেন তিনি। আমার স্বামীর বহু আনুকূল্য তিনি পেয়েছেন। তার বিবি ও বোন প্রায়ই আমার সাথে দেখা করতো। তারা আমাকে বলতো, আপনি আমাদের বোন এবং আমার মেয়েদের বলতো 'বেটি।'

জনতার ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করলাম। পথিমধ্যে কারো জেরা ছাড়াই উর্দু বাজারে পৌছলাম। মির্জা পরিবারের মহিলারা ভালোভাবেই আমাদের স্বাগত জানালো। মির্জার বোন আফর আমার মেয়েদের চুম্বন করে বললো যে, সে যতদিন জীবিত আছে তাদের মাথার একটি চুলও কাউকে স্পর্শ করতে দেবে না। আমি তাদের আশ্বস্ত করলাম যে, বিপদ কেটে যাওয়া মাত্র আমার স্বামী তাদের আতিথেয়তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেবে। উর্দু বাজার মুসলিম এলাকা। এখানে কিছু বই-এর দোকান এবং রকমারী জিনিসপত্রের দোকান আছে- কসাই, রজক, ঘুড়ি নির্মাতা, মিষ্টি বিক্রেতা, পান বিক্রেতা ইত্যাদি। এসব দোকানের পিছনে বিত্তবান নবাবদের সুরম্য অট্টালিকা। যদিও মির্জা আবদুল্লাহর বাসভবনের রাস্তাটি সংকীর্ণ। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই দুর্গন্ধ ছড়ানো নর্দমা। কিন্তু বাসভবনটি খোলামেলা। প্রশস্ত বারান্দা এবং খোলা প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের মাঝখানে একটি বিরাট পিপল গাছ। গাছে ঝুলানো আছে মির্জার কবুতরের ঝাঁকের বাক্স। বারান্দায় সাজানো রকমারী বাহারী ফুলের গাছ। প্রাঙ্গনের এক পাশে মহিলাদের থাকার ঘর, যেখানে মির্জার বিবিরা, তার মা, বোন, বেশকিছু মেয়ে আত্মীয় ও চাকরাণীরা থাকে।

মির্জা আবদুল্লাহ পক্ষী বিলাসী লোক। তার বাড়ীর ছাদে তারের জাল দিয়ে ঘেরা কুঠুরীতে শিকারী পাখী থাকে। প্রতিদিন বিকেলে তিনি একটি রুমাল ও হুইসেল নিয়ে সেগুলোকে নিশানা শেখান। তার কিছু তিতির ও লড়াকু কোয়েল আছে। রাজরক্তের অন্যান্য যুবরাজদের মতই মির্জা মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেনি। যদিও তার বয়স ত্রিশের কোঠায়, কিন্তু সে কোনো কাজ করে না। বাদশাহর নিকট হতে প্রাপ্ত ভাতার উপর সে নির্ভর করে থাকে। স্থানীয় বানিয়াদের কাছে সবসময় ঋণ গ্রহণ করে। তার বিবিদের গহনা চিরদিনের মতো বানিয়ার দোকানে বন্ধক দেয়া আছে। কিন্তু এ সবের কোনকিছুই তাকে বার বার বিয়ে করা অথবা বেশ্যালয়ে গমন থেকে বিরত করতে পারে না। ঘুড়ি উড়ানোতে পড়শীদের সাথে বাজী ধরে কিংবা পায়রা উড়িয়ে সে বিকেলটা কাটায়। সন্ধ্যায় সে তার কোয়েল ও তিতিরগুলোকে বের করে অন্য নবাবদের কোয়েল ও তিতিরের সাথে লড়তে নিয়ে যায়। নগরীতে কোনকিছু ঘটলে মির্জা আবদুল্লাহকে সেখানে অবশ্যই হাজির থাকা

চাই।

সন্ধ্যার পর মির্জা আবদুল্লাহ ঘরে ফিরলো। উচ্চস্বরে সে কথা বলছিল। তার গলা শুনে আমি বলতে পারি, সে দম্ভের সাথে কথা বলছে। যখন কেউ তার বাড়িতে আমার উপস্থিতির কথা বললো, সহসা সে নিঃচুপ হয়ে গেল। সে জেনানা মহলে এসে আমাকে স্বাগত জানালো এমন আন্তরিকতার সাথে যা সে পূর্বে কখনো ভাবার সাহসও করেনি। 'গুড ইভিনিং মেম সাহিব' সে ইংরেজীতে বললো, 'ম্যাডাম ও তার মেয়েরা যে পোশাক পরেছেন তাতে আমার বরং বলা উচিত 'আসসালামু আলাইকুম।'

নেটিভদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত আছে 'গরীবের বউ সবার ভাবী।' তারা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে রাত্রি যাপনকে অন্যায় মনে করে না। আমি নিশ্চিতভাবেই তাদের কাছে হতভাগ্য ভাবী।' আমি তার তোষামোদি গ্রহণ করে আন্তরিকতার সাথে উত্তর দিলাম 'ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য আমাদেরকে আশ্রয়দানের অনুমতি নবাব সাহেবের মহানুভবতা। এই দয়ার কারণে আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

সে তার গোপন স্থান চুলকাতে চুলকাতে মস্করার সুরে বললো, আপনাকে এখানে পাওয়া মহা সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু আমি আপনাকে উর্দু বাজারের চাইতে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার পরামর্শ দেব। উর্দু বাজার মুসলিম অধ্যুসিত এবং আপনি জানেন যে, মুসলমানরা ফিরিঙ্গি ও নাসারাদের সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে।' আমার বিশ্বাস হতে চাচ্ছিল না যে, সে আমাদের ক্ষেত্রে 'ফিরিঙ্গি' এবং হিন্দুস্থানের খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে 'নাসারা' শব্দ ব্যবহার করতে পারে। এদের সাথে কি কথা বলবো।

সে বলেই চলেছে, কিন্তু এখন আপনাকে খাঁটি মুসলমান মনে হচ্ছে। আপনাদের সকলের নিরাপত্তার জন্য উচিত এখন ইসলামের প্রতি আনুগত্য এনে ইসলামের নিয়ম-কানুন শেখা। আপনাকে শেখানোর জন্য আমি একজন মৌলভী ঠিক করে দেব। সে আপনাকে নয়া সড়কে আমার আরেকটি বাড়িতে নিয়ে যাবে। আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র এখানেই নিরাপদে রেখে যান। আপনার হুকুম বরদার আগামীকাল স্বয়ং সেখানে গিয়ে দেখবো যে আপনি স্বাচ্ছন্দে আছেন।'

আমার মেয়েদের জীবন রক্ষার জন্য আমি সবকিছু বিসর্জন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যখন মৌলভী এলো, তাকে আমি বললাম, আমার মা একজন কাশ্মীরী মুসলমান। যদিও ইংরেজ সাহেবের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি একজন মুসলিম হিসেবেই আছি। তার সাথে পড়লাম, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'- আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং মোহাম্মদ (সঃ) তার রসুল।' মৌলভী সাহেব আমাদের মুসলিম নাম দিলেন। এলিস থেকে আমি আয়েশা হলাম। বড় মেয়ে মেরীর নাম হলো মরিয়ম। দ্বিতীয় মেয়ে ফিয়োনা হলো ফাতিমা। জর্জিনার নাম দেয়া হলো জাহানারা। আমাদের ধর্মান্তকরণের কৃতিত্ব নিতে পারায় মৌলভী খুব খুশী।

মির্জা সাহেবের বাড়িতে নিরাপদে থাকবে বলে আমি সব রৌপ্য মুদ্রা রেখে গেলাম। বাড়ির মহিলাদের কাছে বিদায় নিয়ে মির্জার অপর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মেয়েদেরকে পালকীতে তুলে নিলাম। পথে বহুবার আমাদের গতিরোধ করা হলো। কিন্তু শশ্রুমন্ডিত মৌলভীর মুখের একটি কথাই পথ ছেড়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। নয়া সড়কে নবাবের হাভেলীতে পৌছার পর মৌলভী কেয়ারটেকারকে বললো, আমাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

চোখ অর্ধেক না খুলেই আমি বুঝে নিলাম, মির্জা আবদুল্লাহ এই বাড়িটি ব্যবহার করে তার প্রমোদের জন্য। কেয়ারটেকার একজন হিজড়া। যে রুমে সে পথ দেখিয়ে নিলো সেটি সম্পূর্ণ গালিচায় মোড়া। গালিচার উপর সাদা চাদর বিছানো। দেয়ালে বড় বড় আয়না। ছাদ থেকে একটি ঝাড়বাতি ঝুলছে। সংলগ্ন কক্ষটি অন্ধকার। সেখানে গুটিকয়েক খাটিয়া রয়েছে আমাদের থাকার জন্য। আমার মেয়েরা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। শোয়া মাত্র তারা ঘুমিয়ে পড়লো। আমি ওদের পাশে বসে সারা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে আমি ভৃত্যকে মির্জা আবদুল্লাহর কাছে পাঠালাম তার কাছে রক্ষিত আমার টাকা আনার জন্য। এক ঘন্টা পর সে ফিরে এসে বললো যে, আমার নিকট হতে কোন কিছু নেয়ার কথা মির্জা আবদুল্লাহ অস্বীকার করেছে। শুধু তাই নয়, বিকেলের মধ্যে আমাদেরকে তার

বাড়ী থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হিজড়া কেয়ারটেকার আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাপারটায় হস্তক্ষেপ করার অঙ্গীকার করলো, যদি আমি তার কথামত কাজ করি। আমি সম্মত হলাম। আমার মেয়েরা নিরাপদ থাকলে আমার কি হলো না হলো তার তোয়াক্কা করি না।

বিকেলে হিজড়া এলো নবাব সাহেবের জন্য আমাকে তৈরী করার কাজে সাহায্য করতে। সে আমার হাতের তালুতে ও পায়ের পাতায় মেহেদী লাগিয়ে দিলো। মেহদী শুকানোর অবসরে ভিশতিকে দিয়ে গোসলের টাব পানি ভর্তি করে তাতে গোলাপ জল মিশিয়ে দিলো। গোসলখানায় সে আমাকে উলঙ্গ করলো। তার রুক্ষ, খসখসে হাত আমার শরীরের উপর দ্রুত চালনা করলো। আমাকে মেঝের উপর শুইয়ে দিয়ে অবাঞ্ছিত লোম বিনাশ করে নোংরা আঙ্গুল দিয়ে আমার লজ্জাস্থান নেড়েচেড়ে দিলো। গোসল করানোর সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আমার স্তনে চাপ দিলো। একটি নোংরা তোয়ালে দিয়ে শরীরের পানি শুকিয়ে আমার গোপন স্থানে পাউডার ছড়িয়ে দিলো। নেটিভদের ধারণা, এতে মাংসপেশী দৃঢ় থাকে। পাউডার প্রয়োগে যে কাংখিত ফললাভ হয়েছে তা পরখ করে দেখতে সে আমাকে শুইয়ে তার জিহ্বা প্রয়োগ করলো। হিজড়াদের আসল বস্তুটা না থাকলেও অনেক কিছু করে সে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। হিজড়াটা উন্মত্তের মত হয়ে গেছে। সে দিগম্বর হয়ে তার সমতল মধ্যস্থল আমার মুখের কাছে এনে কর্কশভাবে বললো, এখানে চুমু দাও, চুমু দাও।' বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত হয়েছে। তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলাম। সে আমাকে চপেটাঘাত মেরে বললো, যদি মির্জা সাহেবের কাছে একটি কথাও বলো, তাহলে তোমার মেয়েদের গলা কেটে ফেলবো।

সে আমাকে সূচীকর্ম সম্বলিত রেশমী জামা পরালো। আমার চোখে কাজল লাগিয়ে একটি বিস্বাদ পান চিবানোর জন্য আমার মুখে পুড়ে দিলো। দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং লজ্জার মধ্যে আমি সারাটা বিকেল কাটালাম। আমার ভাগ্যে কি ঘটেছিল, তা বর্ণনা করছি শুধু এ কারণে যে, পৃথিবী জানুক হিন্দুস্থানীরা কত নীচ, প্রতিহিংসাপরায়ণ ও বিশ্বাসঘাতক। গোটা জাতিটাকে উচিত একটি প্রাচীরের সাথে পিষে হত্যা করা এবং তাদের মৃত দেহকে কুকুরের খাদ্য হিসেবে নিক্ষেপ করা। মির্জা আবদুল্লাহ এলো তার দুই স্যাঙ্গাতসহ। তাদের চুল তৈলসিক্ত, চোখে সুরমা লাগানো, সুগন্ধিযুক্ত তুলা কানে গোজা, পানের লাল রসে, মুখ রঞ্জিত। তাদের পরনে মিহি মসলিনের কুর্তা এবং ঢোলা পাজামা।

মির্জা আবদুল্লাহ তার বন্ধুদের কাছে আমাকে পরিচিত করিয়ে দেবার সময় চীৎকার করে বললো, 'বাহ্ বাহ্ মেম সাহেব! কি চমৎকার পোশাক! এরা আমার আসল ভাই এর মতো। ভাইদের চাইতেও আমার প্রিয়পাত্র।'

একজন বললো, 'অপূর্ব শিকার মিলেছে তোমার ভাগ্যে। দেখে মনে হয়, টসটসে পাকা এবং অভিজ্ঞ।'

এই চরম পরিস্থিতিতেও এ ধরনের মন্তব্য আমাকে আহত করলো।

অন্য একজন মন্তব্য করলো, 'গোরা রমণীর সঙ্গে প্রেম করা আমার হৃদয়ের একটি বিরাট বাসনা ছিল। আমার জীবনের এই আকাংখা পূরণের জন্য মির্জা সাহবেকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।"

মির্জা উত্তর দিলো, আমাকে তুমি অর্ধেক ধন্যবাদ দিতে পারো, কারণ তোমার বাসনার মাত্র অর্ধেকটা পূরণ হবে। এলিস ওরফে আয়েশা বেগম একজন অর্ধ মেম সাহেব। বাকী অর্ধেকটা কাশ্মীরী। সন্দেহ নেই তুমি বহু কাশ্মীরীর স্বাদ গ্রহণ করেছ।' লোকটি হাসিতে ফেটে পড়ে একে অন্যের হাত চাপড়ালো। ওদের আচরণ আমার মোটেই ভালো লাগছিল না।

মির্জা আবদুল্লাহ আমার হাত ধরলো এবং তার তাকিয়ার পাশে বসালো। অন্য দু'জন আমাদের মুখোমুখি বসলো। হিজড়া একটি সোরাহী এনে তা থেকে দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় চারটি রৌপ্য পাত্রে ঢাললো। মির্জা একটি আমার হাতে তুলে দিতে গেলে আমি মাথা নেড়ে আপত্তি জানালাম, রমযান মাসে মদ্যপান ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

'বাহ্! বাহ্! চমৎকার!' মির্জা বিস্ময় প্রকাশ করলো। গতকালের মুসলিম আমাদের ইসলামের বাণী শোনাচ্ছে। আয়েশা বিবি, জিহাদের সময় সব কিছুকে ক্ষমা করা হয়েছে।' সে সুরা গলধঃকরণ করে বললো, 'জিহাদের সময় সবকিছু অনুমোদিত। সবকিছু বুঝলে?' আমি বুঝলাম। লোকটি তার পাত্র নিঃশেষ করলে হিজড়া তা পরিপূর্ণ করে দিলো। মির্জা আবদুল্লাহ আমার ঠোটের

সাথে পাত্রটি লাগিয়ে নির্দেশ দিলো, 'পান করো, তা না হলে তোমার গলা দিয়ে নামানোর ব্যবস্থা করবো।' আমি জানতাম, এই কালো কুত্তাগুলো আমাকে কি করতে চায়। সে জন্য ভাবলাম, আমি বরং মাতাল হলেই এসব সহজে গ্রহণ করতে পারবো। আমি এক চুমুক মুখে নিয়ে গিলে ফেললাম। এর স্বাদ ব্র্যান্ডির মত। জ্বলতে জ্বলতে তরলটুকু আমার পেটে নেমে গেল।

'সাব্বাশ!' তারা জোরে চীৎকার করে উঠলো! 'এখন মেহফিল চলতে পারে'

আমার পাত্র আবার পূর্ণ করে দেয়া হলো। ব্র্যান্ডির প্রভাব তাদের জিহ্বা আলগা করে দিয়েছে। একজন শেখ সাদীর কবিতা আউড়ালো। মির্জা আবদুল্লাহ দরবারী কবি জওক ও গালিবের কবিতা আউড়ে উত্তর দিলো। তৃতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহের রচিত কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলো। এরপর তারা মোগল শাসনের গৌরব এবং ইংরেজদের শঠতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলো। মির্জা আবদুল্লাহ বললো, 'কোম্পানীর সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করা মাত্র আমরা সব ফিরিঙ্গিকে যোঁজা করে দেব এবং তাদের মহিলাদেরকে আমাদের হারেমে নিয়ে নেব।' এই মকরায় ওরা উচ্চস্বরে হাসলো।

মির্জা আবদুল্লাহ আমার হাঁটুতে হাত রাখলো। আমার হাঁটুতে চাপ প্রদান ও চিমটি কাটতে শুরু করলো। ক্রমে স্তনে হাত দিয়ে স্তনের বোটা নিয়ে খেলা শুরু করলো। তার বন্ধুরা উঠে বললো, 'আপনি অনুমতি দিলে আমরা পাশের কক্ষে বিশ্রাম করতে পারি।' মির্জা মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিলো। আমাদেরকে একই তাকিয়ায় হেলান দেয়া অবস্থায় রেখে দু'জন টলতে টলতে পাশের কক্ষে গেল।

মির্জা আবদুল্লাহ খানিকক্ষণ স্তনের বোটা নিয়ে খেললো। তার আরেক হাত আমার কোমরের চারদিকে ঘুরাফেরা করছে। এক ফাঁকে সে তার পাজামার ফিতা খুলে ফেলে আমার হাতটা টেনে তার মধ্যাঙ্গে স্থাপন করলো। তার তখন ক্ষিপ্তাবস্থা। আমি সুরাপাত্রটা টেনে নিয়ে তরল আগুন টুকু পেটের মধ্যে চালান করে দিলাম। এখন আমাকে কে কি করছে আমি তার তোয়াক্কা করি না। আমি নিজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করাই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করলাম। গালিচার উপর শয়ন করে মির্জাকে আহ্বান করলাম। মাতাল লোকের চরম সময় বিলম্বেই আসে। যখন সে চরমে উঠলো, তখন বন্ধুদের ডাকলো সে কি করছে তা দেখার জন্য। আমার গালে দাত বসিয়ে সে বীর্যপাত করলো। সে উঠে যাওয়া মাত্র তার বন্ধুরা হামলে পড়লো। আমি যেন এক টুকরা সাদা মাংস এবং দু'টি কুকুর তা নিয়ে লড়াই করছে। সারাটা রাত ধরে এ অবস্থা চললো। একজন যখন শেষ করে আরেকজন চেগিয়ে উঠে। তাছাড়াও ছিল হিজড়াটা। সে তার আঙ্গুল, জিভ এবং তার যা আছে তা ব্যবহার করলো। আমি ঘেমে ভিজে গেছি এবং ক্লান্তিতে মৃতপ্রায়। ভোর পর্যন্ত মির্জা আবদুল্লাহ ও তার দুই বন্ধু তাদের দূষিত দেহের সমুদয় বিষাক্ত বীর্য নিঃশেষ করে ফেলেছে। বিশ্রম্ভালাপ ও বেসুরো গান গাইতে গাইতে তারা বের হয়ে গেল। রইলো শুধু হিজড়া। আমি মৃতের মতো পড়ে আছি, আর সে মৃতদেহকে কুকুরের মত ছিন্নভিন্ন করছে। কামানের গোলার শব্দ সংযমের দিবসের সূচনা ঘোষণা করা পর্যন্ত এভাবে চললো। সূর্যের দু'টি উদয়ের মাঝে কতটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

জর্জিনার কান্নায় আমার ঘুম ভাঙ্গলো, 'মাম্মি, মাম্মি, উঠো।' মেয়েরা দারুণ আঘাত পেয়েছে। তারা আগে কখনো আমাকে এভাবে দেখেনি-উলঙ্গ ও শরীরে আঘাতের চিহ্নসহ।

একমাত্র আমার ভৃত্য আলী আহমদ ও তার বিবি নিমকহালালী করেছে। সে উপলব্ধি করেছে আমাকে নিয়ে তার কি করা উচিত। নিজ ব্যয়ে সে দু'টি পালকী ভাড়া করে তার ঝুপড়িতে নিয়ে গেল। খুব শীঘ্র বিপুল জনসমাগম হলো। আমি চীৎকার শুনলাম, 'ফিরিঙ্গি মেয়েটাকে আমাদের হাতে তুলে দাও।' আলী আহমদের বিবি খুব সাহস দেখিয়ে বাইরে বের হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে গালি ছুড়লো। সে চ্যালেঞ্জ দিলো, 'আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর বংশের কুরাইশ। যে মহিলা ও শিশুদের আশ্রয় দিয়েছি তারা মুসলিম। তাদেরকে স্পর্শ করার আগে প্রথমে আমাকে ও আমার স্বামীকে খুন করতে হবে। এখানে কি এমন কেউ আছে যে তার হাতে নবীর রক্ত লাগাতে চায়? এগিয়ে এসো। এটা পবিত্র রমযান মাস।' জনতার ভিড় কমতে শুরু করলো।

এই গরীব দুই বেচারার জীবন আমি বিপন্ন করতে চাই না। আলী আহমদকে বললাম আমার একটি চিঠি বাদশাহ ও জিনাত মহলের কাছে নিয়ে যেতে, আমি তাদের সাহায্য প্রার্থনা করবো।

আমি লিখলাম যে, আমি এক মুসলিম মায়ের ঘরে জন্মেছি এবং আমার দুই কন্যা ইতিমধ্যে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে। নিজের নাম স্বাক্ষর করলাম, আয়েশা অল্ডওয়েল। কোন উত্তর পেলাম না।

অনেক নবাবের কাছে লিখলাম। হয় তারা উত্তর দিলো না, অথবা সাহায্য করার অক্ষমতা জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলো। যখন সব ধনবান ও প্রভাবশালী লোকজন আমাদের পরিত্যাগ করেছে তখন যে আমাদের কাছে কোনভাবেই ঋণী নয়, এমন এক দরিদ্র লোক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো। সে একজন দর্জি, যার নাম আমি কখনো জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করিনি। সে আমার মেয়েদের ফ্রক তৈরী করে দিয়েছিল এবং তাদেরকে খুব পছন্দ করতো। একদিন সকালে সে তার চাচাত ভাই, যে একজন সৈনিক তাকে নিয়ে এলো। যদিও এই ভাইটি বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছে, তথাপি সে কুরআন স্পর্শ করে শপথ করলো যে, কাউকে আমাদের ক্ষতি করতে দেবে না। সেই দর্জির পরিবারের সাথে এক দিন ও এক রাত কাটালাম। সূর্যাস্তের পর মুসলমানরা যখন প্রার্থনায় ব্যস্ত আমরা তখন বাজার থেকে বের হয়ে পড়লাম। দর্জি ও তার সিপাহী ভাই আমাদের পালকীর সাথে কিল্লায় গেল। প্রহরীরা আমাদেরকে নিয়ে বাদশাহের পুত্র মির্জা মোগলের সামনে হাজির করলো। তখন আবিষ্কার করলাম, বাদশাহ ও জিনাত মহলের কাছে লেখা আমার চিঠি মির্জা মোগলের হাতে পড়েছে। সে প্রহরীদের নির্দেশ দিলো ভূগর্ভস্থ যে কুঠরীতে অন্যান্য ইউরোপীয়কে রাখা হয়েছে আমাদেরকে সেখানে রাখতে। কিন্তু আমাদের সাথে মুসলমানদের মত আচরণ করতে বললো। 'বদজাত নাসারাদের' আচরণ করতে নয়।

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে বুধবার আমার পরিবারের পুনর্মিলন হলো। আমার উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর জন্য অ্যালেক আমাকে ক্ষমা করলো। সে শপথ করলো, 'আমি হারামজাদা মির্জা আব্দুল্লাহর লিঙ্গ কেটে দু'টুকরা করবো।' কিন্তু ইংরেজ মহিলারা আমার সাথে শীতল আচরণ করছে। প্রহরীরা আমাদের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছে, তার কারণ আমি মুসলমান। সে জন্য তারা ক্ষুব্ধ। তাদেরকে মোটা চাপাতি দেয়া হয়, আর আমাকে দেয়া হয় মাংসের তরকারি। মাঝে মধ্যেই প্রহরীরা আমাকে ও আমার মেয়েদেরকে ডাকে তাদের সাথে খাওয়ার জন্য।

ভূগর্ভস্থ কক্ষটিতে গরম এবং দুর্গন্ধে ভয়ঙ্কর অবস্থা। কোন পায়খানা নেই সেখানে। কক্ষটির অন্ধকার কোনায় গিয়ে আমাদেরকে প্রাকৃতিক ক্রিয়াদি সম্পাদন করতে হয় এবং নিজ হাতে তা কিল্লার প্রাচীরের একটি গর্ত দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করতে হয়। এছাড়া সহ্য করতে হচ্ছে অপমান। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক জনতা আমাদের দেখতে আসে যেন আমরা চিড়িয়াখানার জন্তু। আমাদের দেখে জঘন্য গালিও ছুড়ে দেয়। একদিন জওয়ান বখত এসে আমাকে 'ভাবী' বলে সম্বোধন করলো। বোকার মত হেসে বললো, 'মির্জা আবদুল্লাহ আমার আপন ভাই-এর মতো। অতএব, আপনি আমার ভাবী, তাই নয় কি?'

এরপর এলো শনিবার। ১৬ই মে।

আমি জানতাম, ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। নাশতার জন্য চাপাতি জুটলো না। প্রহরী বললো, যেখানে যাচ্ছো, সেখানে প্রচুর চাপাতি পাবে।' তারা আমাকে আশ্বাস দিলো, আমার বাচ্চাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। ডজন খানেক সিপাহী কুঠরীতে প্রবেশ করে অন্যসব পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের বের হওয়ার নির্দেশ দিলো। আমার মেয়েরা অ্যালেকের কাছে ছুটে গিয়ে তার হাঁটু আঁকড়ে ধরলো। সিপাহীরা পিতার নিকট হতে জোর করে ছাড়িয়ে আমার দিকে মেয়েদের ঠেলে দিলো। মেয়েরা কাঁদলো, 'ড্যাডিকে নিয়ে যেতে দিও না।' আমি সিপাহীদের সাথে কথা বললাম। কিন্তু আমাকে ওরা পাত্তাই দিলো না। অন্যদের সাথে বেচারী অ্যালেককেও সিপাহীরা ঠেলে নিয়ে গেল। আমাদের রেখে দরজা বন্ধ করে ওরা চলে গেল। আমরা ছাড়া সেখানে অবশিষ্ট ছিল এক মুসলিম বুড়ী। ইউরোপীয়দের সাহায্য করার কারণে তাকে আটক করা হয়েছে।

আমি শুনলাম, লোকজন চীৎকার করছে। এরপর গুলীর শব্দ। নারী ও শিশুদের কান্না। তারপর সব কিছু শান্ত হয়ে গেল। একবারে শান্ত।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা হলেও বলছি যে, এখন আমার প্রথম চিন্তা এলো যে, আমার

ব্যাপারে নাক গলাবার আর কেউ রইলো না। শুধুমাত্র মির্জা আবদুল্লাহ ও তার বন্ধুরা আমার কথা বলবে। এই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলেই আমি অ্যালেকের পেনসন পাবো। মেয়েদেরকে ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো। কেউ আমার সম্পর্কে নোংরা কথাবার্তা বলবে না যে, আমি কে ছিলাম বা কোথা হতে এসেছি। আমি প্রাণভরে কাঁদলাম।

বাহাদুর শাহ জাফর

শেষ বিকেলে জনা চল্লিশেক ইউরোপীয়কে হাত বাঁধা অবস্থায় আমার সামনে হাজির করা হলো। তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ এবং সম্ভবতঃ কিছু শিশুও ছিল। তাদের পিছনে বিরাট জনতা এবং জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে সিপাহীরা হিমসিম খাচ্ছিল। তারা চীৎকার করছিল, 'দোহাই! 'দোহাই! ওরা আমাদের লোকজনকে হত্যা করেছে। আমরা ন্যায়বিচার চাই। এই ফিরিঙ্গিদের ফাঁসিতে ঝুলাও অথবা আমাদের হাতে তুলে দাও।' তারা বারুদে বিস্ফোরণের ফলে নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গরা আমাদের ও আমাদের পূর্ব পুরুষদের সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে। কিন্তু যাদের সাথে বারুদে আগুন দেয়ার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলাম। আমি বন্দীদেরকে কারাগারে আটক করার নির্দেশ দিলাম।

জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। অনেকে শ্লোগান দিতে শুরু করলো, যা আমার বাদশাহী মর্যাদার পক্ষে হানিকর। আমি সেনাপতিকে নির্দেশ দিলাম জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য। সে চীৎকার করলো, 'তখলিয়া' এবং লাল পর্দা ফেলে দিলো। আরো কিছু সময়ের জন্য গোলযোগ অব্যাহত থাকলো। বিদায় দেয়ার আগে লোকগুলো চীৎকার করে বলছিল, 'খালক খোদা কি, মুলক বাদশাহ কা, হুকুম জাঁহাপনা কা'-মানুষের মালিক আল্লাহ, দেশের মালিক বাদশাহ এবং আইন একজনের, পৃথিবী যার আশ্রয়ে থাকে।' আমি শাহী পাকশালা থেকে ইউরোপীয় বন্দীদের খাবার সরবরাহের নির্দেশ দিলাম।

বিকেলে মোতি মসজিদে আছর নামায আদায় করলাম। দেখলাম, আমার পিছনে অনেক অপরিচিত লোক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে। আমি শান্ত থাকলাম। কারণ তখন আমি আল্লাহর ঘরে। কিন্তু আমার মনের শান্তি বিঘ্নিত হলো। আল্লাহর কাছে দিক নির্দেশনা লাভের প্রার্থনা করতে পারলাম না। যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখনও লোকগুলো ফিরিঙ্গিদের রক্ত দাবী করে ধ্বনি দিচ্ছিল। অনেকে বন্দীদেরকে তাদের হাতের তুলে দেয়ার দাবী জানানোর ধৃষ্টতা পর্যন্ত দেখালো। আমি আরেকবার তাদের দাবী পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানালাম। বিস্ফোরণে যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মীয়-স্বজনকে আমার সমবেদনা জানালাম এবং আল্লাহর মর্জির কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করে নিহতদের দাফন করার পরামর্শ দিলাম।

সন্ধ্যায় খবর এলো যে, জুমা মসজিদে আমার নামে খুতবা পাঠ করা হয়েছে। আমার সভাসদরা আমার পূর্ব পুরুষ ও আমার গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। এভাবেই দুর্যোগপূর্ণ মেঘমালার মধ্যে আমার ভাগ্যের ঘুড়ি আকাশে উড়লো। কিন্তু সূতা আমার হাতে নেই, যা দিয়ে আমি ঘুড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো।

তের বছরের অধিক সময় ধরে ভূগর্ভস্থ কক্ষে পড়ে থাকা রজত সিংহাসনে আবার আসীন হলাম। আমার পূর্বপুরুষরা ঃ তৈমুর লং, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, আওরঙ্গজেব, প্রথম বাহাদুর শাহ, জাহান্দর শাহ ফররুখ শিয়ার, মোহাম্মদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর, শাহ আলম এবং আমার পরম পিতা দ্বিতীয় আকবর শাহ এই রজত সিংহাসনে বসেছেন। সূর্য সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত হওয়ার পর কামানের গোলা নিক্ষেপের মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমার প্রজাদের নিকট হতে শ্রদ্ধা গ্রহণ করলাম।

দরবার সমাপ্ত ঘোষণার পরও জনতা বিদায় নিলো না। বহু লোক দিওয়ান-ই-আমের চত্বরেই তাদের চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো রাত কাটাবার উদ্দেশ্যে। তাদের ঘোড়া উদ্যানের ফুলগাছ খেয়ে উদর পূর্তি করলো। শুধুমাত্র নদীতীরের প্রাসাদটিই আমার জন্য রয়েছে।

একাকী চিন্তা করার সুযোগ দেয়ার জন্য আমি বললাম। দিওয়ান-ই-খাসের বিছানায় শুয়ে 'আমার চোখ ছাদের প্রতি নিবদ্ধ করলাম। সে সব দিনের কথা স্মরণ করলাম, যখন এই ছাদ

রজত ও সুবর্ণ পত্রপল্লবে খচিত ছিল। এখন প্রাসাদের বহু স্থানে পলেস্তারাও উঠে যাচ্ছে।

আমি শ্বেতপাথরের স্তম্ভ এবং শূন্য খিলানগুলো দেখলাম যা এক সময় রুবি এবং অন্যান্য মূল্যবান মণি ও পাথর দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। আমার দৃষ্টি পড়লো অস্পষ্ট কিছু লেখার উপর যা আমার মহান পূর্বপুরুষ শাহজাহানের সময় উৎকীর্ণ হয়েছিল, তা অতীত গৌরবকে ঘোষণা করছে,

"গর ফিরদৌস বারুরু-এ-জমিনাস্ত, হামিনাস্তো, হামিনাস্তো, হামিনাস্ত"- পৃথিবীতে যদি কোন বেহেশত হতো তবে এই সেই স্থান, এই সেই স্থান, এই সেই স্থান।' আমার বুক থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। আমার চোখ অশ্রুপূর্ণ হলো।

আমি যখন গভীর চিন্তা মগ্ন তখন হালকা কাশির শব্দের প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। হারেমের প্রধান পরিচারিকা কুর্ণিশ করে জানালো যে, তার মনিব অর্থাৎ আমার সম্রাজ্ঞী জিনাত মহল আমার সাথে ইফতার করার সুযোগ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

আমি শ্রান্ত পা দু'খানি হারেমের উদ্দেশ্যে চালালাম। খোজা ও নারী প্রহরীরা আমার আগমন ঘোষণা করছিল এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে। গত বাইশ বছর ধরে যে শব্দগুলো আমি শুনে আসছি, এবার মনে হলো শব্দগুলো নতুন অর্থ অর্জন করেছেঃ 'সিরাজুদ্দিন খান মোহাম্মদ আবু জাফর বাহাদুর শাহ গাজী, পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া হিন্দুস্থানের মহান সম্রাট।' আমি বেগম জিনাত মহলের কক্ষে প্রবেশ করলাম। খাবার সাজানো। ঝাড়বাতি থেকে জেসমিন ও সুগন্ধি ছড়ানো ফুলের মালা ঝুলছে। কক্ষের কোণায় ফুলদানিতে কেওড়া পাতা সাজানো। আমার প্রবেশের সাথে সাথে পরিচারিকা কুর্ণিশ করে বিদায় নিলো। আমি গালিচার উপর বসে তাকিয়ার উপর ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলাম।

বেগম জিনাত মহলের আগমন ঘটলো। সে এমন পোশাকে সেজেছে ঠিক যেন সতের বছর পূর্বে আমি যেদিন তাকে বঁধু হিসেবে হারেমে এনেছিলাম- সাপের ফণার মতো করে বাঁধা চুলের উপর দিয়ে সোনালী কাজ করা সাদা ওড়না ছড়ানো। তার বড় বড় হরিণ চোখে কামনার ঔজ্জ্বল্য। এতো উৎফুল্লভাবে আমার দিকে সে এগিয়ে এলো যে, তার পায়ে কোন ঝুমুর না থাকলেও আমার কানে ঝুমুরের সুর মনে হচ্ছিল। মনে হলো কোন অদৃশ্য হাত বাতির সলতেগুলো উসকে দিয়েছে এবং আলো আরো উজ্জ্বল হয়েছে। শেখ সা'দী বলেছেন, 'রাতে অলৌকিক কিছু আবির্ভূত হলে অন্ধকার বিদূরিত হয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়।" অলংকারপূর্ণ বাক্য প্রয়োগে তার রূপের বর্ণনা করা যায় না।

'আপনার নগন্য দাসী কি হিন্দুস্থানের মহান সম্রাটকে কুর্ণিশ জানাবার অনুমতি পাবে?' অবনত হয়ে সে তিনবার আমাকে সালাম করলো।

তার সৌন্দর্যের পানে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলাম, 'সোবহান আল্লাহ'! আমার চোখ যখন তার উপর প্রথম পড়েছিল, তখন কেবল এই শব্দই আমার মুখ থেকে বের হয়েছিল 'সোবহান আল্লাহ'! তখন তার বয়স ছিল ষোল বছর আর আমার বয়স পয়ষট্টি। সতেরটি গ্রীষ্ম তার সৌন্দর্যকে আরো বিকশিত করেছে এবং তার জন্য আমার ক্ষুধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার জন্য সে যে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেছে তার স্বাদ গ্রহণ অপেক্ষা তার মাংসল কোলে মাথা রেখে তাকে আমার পাকা চুলে অঙ্গুলি চালনা করতে দিলেই বরং আমার ভালো লাগতো। সে বোধ হয় আমার মনের ভাষা পাঠ করতে পেরেছে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো এই আয়োজনে আমি সন্তুষ্ট কি না। আমি শেখ সাদীর কবিতার উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

'আমি ক্ষুধার্ত এবং ক্ষুধার্তের বিপরীত, এবং
খাদ্যে পরিপূর্ণ টেবিলের বিপরীতে
আমি যেন কামুক এক যুবক
নারীপূর্ণ হাম্মামের দরজায়।"

কবিতা শুনে তার গাল আপেলের মত লাল হয়ে উঠলো।

আমি লক্ষ্য করলাম, জিনাত মহল আমার প্রিয় খাবারগুলো প্রস্তুত করেছে। ভেড়ার গোশতের

কাবাব দিয়েছে নয়টি উপাদানে তৈরী নওরতন চাটনী সহযোগে। এছাড়া আছে ময়ুর ও কোয়েলের পাখনার কাবাব, কুলফীতে ঢাকা আমের টুকরা ইত্যাদি। সে আমাকে হাত ধুতে সাহায্য করলো। নিজ হাতে খাবার তুলে আমার মুখে পুড়ে দিলো। আমি স্মরণ করতে পারলাম না যে, সর্বশেষ কখন সে আমার প্রতি এতোটা মমতা দেখিয়েছে। খাবার শেষ হলে সে একটি পানপাতায় চুন, খয়ের এবং সুগন্ধি জর্দা দিয়ে আমার মুখে তুলে দিলো।

যখন পান চিবুচ্ছিলাম, সে সাহস করে করে বললো যে, আমার শয্যায় রাতটা অতিবাহিত করার সুযোগ পাবে কিনা। আমি একটু ধাক্কা খেলাম। কিন্তু ও কিছু নয়। আমার মোগল পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কথা আছে যে, তারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নারী সঙ্গ উপভোগ করতেন। যদিও আমাদের উত্তরাধিকারের খুব অল্পই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আমার পূর্ব পুরুষদের রক্তের ঐতিহ্য থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। সত্তর বছর বয়সে প্রস্তর সংকুল পর্বতে নীলগাই-এর পিছনে ধাওয়া করে তরবারি দ্বারা মাথা কেটে ফেলেছিলাম।

আল্লাহ আমার মাঝে পূর্ব পুরুষের সেই শক্তি দিয়েছেন। বয়সের ভার নয়, শরীয়তের পবিত্র আইন আমার মাথা ও হৃদয়ের সমন্বয় ঘটতে বাধা দিচ্ছে। জিনাত মহল আমার চোখে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বুঝতে পারলো। সে আমাকে আশ্বস্ত করলো যে, মানসিক চাপের মুহূর্তে শরীয়ত পবিত্র রমযানেও নারী সংসর্গের অনুমতি দিয়েছে। তাছাড়া এখন আমরা জেহাদ করছি। সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র একটি ত্রুটিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। সুরেলা কণ্ঠে সে হাফিজের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিলো ঃ

"তোমার প্রেম বা সুরা ছাড়া
এক মুহূর্ত বসে থেকো না
এখন সময় এসেছে উৎসবের
গোলাপ ও জেসমিনের।"

তার মুখের গন্ধ এতো সুবাসিত। তার তুলতুলে মাংসল নিতম্বের উদার উষ্ণ আমন্ত্রণে আমার বিরাশি বছর বয়সের শৈথিল্য, দীর্ঘ গোলযোগপূর্ণ সময়ের জড়তা কাটিয়ে আমার অঙ্গগুলো সচল হয়ে উঠলো। আমি একই কবির কবিতা থেকে বললাম ঃ

"সুরার হাসি ও বালিকার চুলের বেনী
অনুশোচনার পর কত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে?"

আমার জন্য হাকিম আহসান উল্লাহর তৈরী কামোদ্দীপক দাওয়াই গ্রহণ করলাম বড় এক চামচ। অল্পক্ষণ পরই আমি আমার বেগমকে আমাদের প্রথম মিলনের আবেগ নিয়ে গ্রহণ করলাম। কর্ম সমাপান্তে আমি তাকে বুঝানোর জন্য হাফিজের উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

"আমি পরিতৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত
আমার আকাংখাকে সংযত করি না,
কিংবা আমার দেহ তাকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত
দেহ থেকে আত্মার মিলন না হওয়া পর্যন্ত।
যখন আমার মৃত্যু হবে
আমার সমাধি উন্মুক্ত করে দেখবে
আমার হৃদয় আগুনে জ্বলছে, আর
কাফন থেকে ধুঁয়া বের হচ্ছে।"

তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার মত আমরা একে-অন্যের বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিলাম। আমাদের দেহে কোন বস্ত্র ছিল না। কামানের গর্জনে আমরা জাগ্রত হলাম। জিনাত মহল তার বড় বড় চোখ খুলেই লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। দ্রুত কাপড় চোপড় পরে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো,

'রাতের এই প্রহরে কারা কামান দাগছে।' সে শব্দ গুনতে শুরু করলো, "এক... দুই.... তিন...একুশ। হিন্দুস্থানের মহান সম্রাটের প্রতি অভিবাদন। মহামহিমকে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধা জানানোর অনুমতি আপনার দাসীকেই দিন।" সে তিনবার সালাম করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

আমি কলম তুলে নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শুরু করা কবিতাটা শেষ করার চেষ্টায় নিমগ্ন হলাম ঃ

"প্রেমে শান্তি নাশ হয় না
ধৈর্যের ক্ষেত্রে আমি শোক করি।
প্রেমের যন্ত্রণা আমার বন্ধুর মত
বিশেষ করে অন্যান্য বন্ধুরা যখন
শপথ ভঙ্গ করেছে-।
এখন পর্যন্ত এটাই আশ্চর্য যে
সাকীরা আর সুরাপাত্র ও সুরা আনে না
কারণ তারা জেনে গেছে যে
আনন্দের দিনগুলো
পৃথিবীতে চিরদিন থাকে না।
আমি নিজে তো কিছুই জানি না
কিন্তু অন্যের ভালো ও মন্দ জানি
আমার দৃষ্টি আমার মন্দ কাজের উপরই পড়ে
আমার চেয়ে মন্দ আর কেউ নেই।
সূর্যের ঝলমলানির মতো, আজ
দীর্ঘদিন পর সে এসেছিল
আমার সকল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলাম
তার সব লজ্জাও তাকে বিরত রাখতে পারেনি।
জাফরকে মানুষ মনে করো না,
সে যতই চতুর ও জ্ঞানী হোক না কেন
যে তার আনন্দের জন্য আল্লাহকে ভুলে যায়
তার উপর বিধাতার ক্রোধ পড়বে।"

এভাবেই ভাগ্যের গগনে আমার আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হলো। হিন্দুস্থানের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরে আমাদের পুরনো ভঙ্গুর ভেলা ভাসালাম।

যৌবনে প্রেমের রাত্রিতে নিদ্রার কথা স্মরণই হয় না। অতীতের কথা ভেবেই বা কি লাভ? মধ্যরাতে কামানের শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গলো। বয়সের ভার জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে আরামদায়ক শয্যা হতে উঠলাম। মসজিদে গিয়ে অজু করে এশা নামায আদায় করলাম। রমযান, মাসের বিধান ভঙ্গ করায় আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম।

মসজিদে কিছু সময়ের জন্য বসলাম। চাঁদ আমার ঠিক মাথার উপরে। শ্বেতমর্মরের মেঝে হিমালয়ের তুষারের মতই শীতল। মনে হলো, এখন রমযান মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। আল্লাহ মহানবী (সঃ)কে আহ্বান করে তার উপর স্বর্গীয় দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন। আমি পৃথিবীতে প্রেরিত কুরআনের প্রথম বাণী পাঠ করলাম ঃ

'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক
খালাকাল ইনসানা মিন আলাক
ইকরা ওয়া রাব্বিকা আকরামুল্লাজি আল্লা মা বিল কালাম'-

"পড়। তোমার প্রভুর নাম সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন-সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পড়! এবং তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল, যিনি মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। যিনি মানুষকে সেই শিক্ষা দান করেছেন যা সে জানতো না। কক্ষনো না। নিশ্চয়ই মানুষ সীমা লংঘন করে এ কারণে যে, সে তার প্রভুকে নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত দেখতে পায়। নিঃসন্দেহে তাকে ফিরে যেতে হবে তোমার প্রভুর দিকেই।"

আমার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতির জন্ম হলো যে, আল্লাহ আমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং আমাকে ক্ষমা করেছেন। ভারমুক্ত হৃদয় নিয়ে মসজিদ ত্যাগ করলাম এবং কয়েক ঘন্টা আরামে নিদ্রা যাওয়ার সুযোগ পেলাম। কোন ভৃত্য জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই আমি ঘুম থেকে উঠলাম এবং অষ্টকোণাকৃতি বুরুজে আরোহন করে কিছু সময় নিজেকে নিয়েই কাটালাম। একদিন পূর্বে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা আমার মনের মধ্যে ভিড় করলো। আমি কি সঠিকভাবে কাজ করেছি? না কি কোন পুতুল নাচিয়ের হাতে পুতুলের অভিনয় করছি?

আমি কয়েকটি লাইন লিখলামঃ

'আমি কালের চক্রে ধরা পড়েছি
সহজ জীবন আর নিদ্রা বিদায় নিয়েছে
আমি জানি, মৃত্যু অনিবার্য
সকাল বা সন্ধ্যায় জীবন চলে যাবে।'

আমার মনের আয়না স্বচ্ছ নয়। আমি নামে মাত্র বাদশাহ। আমি এমন এক প্রাসাদে বাস করি যা এক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ ছিল। এখন এটি শুধু নামেই প্রাসাদ। সেটিও আমার পুত্রদের দেয়া হবে না। আমাকে জানানো হয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর (আল্লাহ কি তা শীঘ্র ঘটাবেন!) আমার পরিবারকে লাল কিল্লা পরিত্যাগ করার জন্য বলা হবে। আমার মহান পূর্ব পুরুষরা যে সম্পদের সাগর রেখে গিয়েছিলেন, ফিরিঙ্গিরা তা থেকে বিন্দুমাত্র আমাকে দিয়েছে। আমি সেই বিন্দুই গ্রহণ করেছি সম্মান হিসেবে। একজন সম্রাটের জন্য এর চেয়ে আর কোন্ শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে? ফিরিঙ্গিরা বলেছে, এটা পেনসন। একজন সম্রাট তার প্রজাদের পেনসনভোগী!

বিশাল হিন্দুস্থানকে ফিরিঙ্গিরা ধীরে ধীরে গিলে ফেললো। বন্ধু বা শত্রু কাউকে ছাড়লো না। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে অযোধ্যার নবাব যে ফিরিঙ্গিদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল, তাকে ফিরিঙ্গিরা তার ভূখন্ড শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। অযোধ্যার আগে তারা দখল করেছে নাগপুর, ঝাঁসি, সাতারা, তাঞ্জোর, মুর্শিদাবাদ ও কর্ণাটক।

পবিত্র কুরআনে আছে, "নিপীড়নকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।' ফিরিঙ্গিরা দরিদ্র মানুষের উপর যে নির্যাতন করেছে তা আর কেউ করেনি। তারা ধর্মবিশ্বাসের উপরও হস্তক্ষেপ করেছে। তাদের কাছে ধর্ম পবিত্র ও অপবিত্র মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। তারা-গরু ও শুকর উভয়ই খায়। কিন্তু তাদের কি অধিকার আছে আমাদের হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যদের গরু ও শূকরের চর্বি মাখানো গুলী মুখ দিয়ে খোলার নির্দেশ দেয়ার? তারা যে ইসলাম ও হিন্দুত্বকে ধ্বংস করে প্রত্যেককে খৃষ্টান বানাতে চায় এ জন্য কি আরো প্রমাণের প্রয়োজন আছে? তাদের পাদ্রীরা আমাদের মহানবী ও পবিত্র কুরআনকে বিদ্রুপ করে। একজন মানুষ তার বিশ্বাস ও নিজের নামের সম্মান ছাড়া কি নিয়ে বাঁচে?একজন মানুষ মরে গেলে তার নাম ছাড়া তো আর কিছুই থাকে না। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তিনি যথার্থই বলেছেন, "সাগরের তরঙ্গে তার কি ভয়, যার চালক স্বয়ং নূহ (আঃ)।"

এরপর আছে আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগের বিতর্কিত প্রশ্ন। আমার প্রিয়তমা বেগম জিনাত মহলের আকাংখা যে, আমাদের দু'জনের সন্তান জওয়ান বখতকে তার বয়োজ্যেষ্ঠ মির্জা দারা বখতের চাইতে অগ্রাধিকার দিয়ে মনোনয়ন দেয়া হোক। গভর্নর জেনারেল আমার পরামর্শ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। পরম জ্ঞানের আধার আল্লাহতায়ালা শাহ রুখ ও মির্যা দারা বখতকে তুলে নিলেন। দুই পুত্রকে হারাবার পর জিনাত মহলের চাপে মির্জা জওয়ান বখতের দাবীটা আবার

তুলেছিলাম। কিন্তু গভর্নর জেনারেল পুনরায় আমার পরামর্শ উপেক্ষা করে আমার বহু পুত্রের মধ্যে মির্জা ফখরুকে স্বীকৃতি জানালেন।

ফখরুকে ঘুষ দিয়ে একটি চুক্তিতে সই করিয়ে নেয়া হলো যে, সামান্য ভাতার বিনিময়ে সে লাল কিল্লা ছেড়ে দেবে। এরপর আল্লাহ মির্জা ফখরুকে ডেকে নিলেন। আল্লাহ আমাকে তিনটি পুত্র থেকে বঞ্চিত করার পর ফিরিঙ্গিরা তাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করলো, যার ফলে কিল্লা ও প্রাসাদে আমার উত্তরাধিকারীদের বসবাসের অধিকার ও আমার উত্তরাধিকারী নিয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। 'হে জাফর, এই শাসন তোমার জীবদ্দশা পর্যন্তই। তোমার পর আর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না এই ভূখন্ড শাসনের জন্য।' পৃথিবীতে আমার অবস্থানকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য ফিরিঙ্গিরা কত আগ্রহী যে, একবার আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে ফিরিঙ্গিরা নিজেদের রক্ষীদের প্রাসাদের ফটকে মোতায়েন করেছিল। আমি বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্টকে লিখেছিলাম, মহোদয়, আমি কি শান্তিতে মৃত্যুবরণ করার সুযোগটুকুও পাবো না? আপনি কি সন্দেহ করছেন যে, আমার মৃতদেহ আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে জেগে উঠবে?"

শেখ সা'দী বলেছেন, 'এক কম্বলের নীচে দশজন দরবেশ ঘুমাতে পারে। কিন্তু একটি রাজ্যে দু'জন বাদশাহ'র স্থান হয় না।' হিন্দুস্থানেও একই প্রবচন আছে, "একটি দেশে দু'জন শাসক থাকতে পারে না, যেমন এক খাপে দুই তরবারির স্থান হয় না।"

আমি শাহযাদাবৃন্দ, ওমরাহ এবং সিপাহীদের প্রতিনিধিদের দরবারে আহ্বান করলাম। তাদের পরামর্শ দিলাম প্রশাসনকে পুনর্গঠন করে বিদেশীদেরকে সাম্রাজ্য থেকে বহিষ্কারের পরিকল্পনা তৈরী করার জন্য। দরবার আমার পুত্র মির্জা মোগলকে প্রধান সেনাপতি হিসেবে পছন্দ করলো। মির্জা আবু বকর যে তার তরবারি বাগিয়ে ধরতে খুব আগ্রহী তাকেও একটি দলের সেনাপতিত্বের দায়িত্ব দেয়া হলো।

দরবার শেষ করে আমি হাসান আসকারীকে তলব করলাম। আসকারী একজন দরবেশ, যিনি ধ্যানমগ্ন এবং অলৌকিক জ্ঞান নিয়ে আবির্ভূত হন। তার দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখেন। আমার জান্নাতনশীন কন্যা নওয়াব বেগমের দরিয়াগঞ্জের বাড়িতে তিনি বাস করেন। আমি যখন দরবেশের আগমণের প্রতীক্ষা করছি তখন দৈনিক পত্রিকা পাঠ করে শুনাতে বললাম। দিল্লীর উর্দু পত্রিকা, 'সিরাজ-উল-আখবার' কাশ্মীরী গেটের বিস্ফোরণের ঘটনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা প্রকাশ করেছে। বর্ণনায় শত শত শহীদের নামও আছে। ইংরেজী পত্রিকা 'দিল্লী গেজেট' চাইলাম, তারা এ ব্যাপারে কি লিখেছে জানতে। আমাকে জানানো হলো যে, দিল্লী গেজেট প্রকাশিত হয়নি। কারণ গেজেটের সকল ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে। শুধুমাত্র একজন আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করায় তাকে হত্যা করা হয়নি। কোন মন্তব্য না করেই আমি শুনলাম এবং পত্রিকা পাঠককে বিদায় দিলাম।

হাসান আসকারীর আবির্ভাব হলো। তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আসন থেকে উঠলাম। তিনি আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন তার জীবনের বিশটি বছর নিয়ে তা আমার জীবনের সাথে যোগ করতে। তাকে আমার পাশে বসলাম এবং নগরীর উপর দিয়ে প্রবাহমান ঝড় সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাইলাম।

দরবেশ তার কথা জড়ো করে রাখেন, একজন কৃপণ যেভাবে স্বর্ণ মজুত করে। তিনি চোখ বন্ধ করে তার তসবি টিপতে শুরু করলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ছাদের পানে মুখ তুলে দুই হাত দিয়ে দাড়ি হাতিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'শুকুর আল্লাহ! শুকুর আল্লাহ।" আমি অধৈর্য হয়ে অনুরোধ করে বললাম, "দরবেশ সাহেব, আপনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, দয়া করে বলুন আমার ভাগ্যে কি আছে?"

দরবেশ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানেন। আমি বিশ্বাসীদের পদধুলির সমতুল্য। কখনো কখনো সময়ের দর্পনে কিছু দেখার সুযোগ আমার ঘটে।" তিনি আবার নীরব হয়ে তসবি টিপতে লাগলেন। তাকে পুনরায় মিনতি করে বললাম, "আল্লাহর ওয়াস্তে ভবিষ্যতের আয়নার দিকে দয়া করে তাকান এবং জিহ্বাটা বের করুন। এই হতভাগ্যের উপর আর জুলুম করবেন না।' অবশেষে দরবেশ বললো, 'সম্রাট, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমার স্বপ্নের কথা যে, 'বন্যা সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে, শুধু মোগল

সিংহাসন ছাড়া।'

'হ্যা আমার স্মরণ আছে।'

'তখন আমি সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, পারসিক বা রুশরা হিন্দুস্থানে আক্রমণ চালাতে আসছে। এখন আমি দেখছি হিন্দুস্থানের ভিতর থেকেই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই বন্যায় মোগল বংশের দুশমনরা নিমজ্জিত হবে। শুধুমাত্র ময়ুর সিংহাসন বন্যার পানির উপরে ভাসবে। (যদিও একশ বছর পূর্বে নাদির শাহ ময়ুর সিংহাসন দখল করে নিয়ে গেছে। কিন্তু রৌপ্য আবরণে ঢাকা কাঠের টুলকেই আমাদের লোকজন ময়ুর সিংহাসন হিসেবে বর্ণনা করে।)

আমি উল্লাসিত হলাম, 'আমিন! আমিন! প্রিয় বান্দার ভবিষ্যত বাণী নিঃসন্দেহে পরিপূরণ হবে।"

ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদে সহায়তার জন্য পারসিক বাহিনীর আগমনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিধর্মীদের বিরুদ্ধে তরবারি ধরতে ইসলামী বাহিনী আগ্রহী। দরবেশ হাউস কাজীতে এক হিন্দু মহিলার তিনটি কন্যা সন্তান প্রসব করার ঘটনা বললেন। জন্মের পর পরই ওরা নাকি কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথম জন বলেছে, 'আগামী বছর ভয়াবহ দুর্যোগ ঘটবে।' দ্বিতীয়জনের বক্তব্য "যারা বেঁচে থাকবে তারা দেখবে।" তৃতীয় জন বলেছে, "চলতি মওসুমে হিন্দুরা যদি হোলি পালন করে তাহলে তারা মন্দ থেকে রক্ষা পাবে। ঈশ্বর একমাত্র সর্বজ্ঞ।" দরবেশ আসকারী বললেন, "হিন্দুরা শীত শেষে হোলির স্বাভাবিক মওসুমের পরিবর্তে এখন হোলি পালন করছে।'

হাসান আসকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার জন্য নিয়মিত দোয়া করতে অনুরোধ জানালাম। তাকে একটি সোনার মোহর দিয়ে তার আপত্তি তোলার পূর্বেই হারেমের দিকে পা বাড়ালাম।

দরবেশ সাহেব যা বলেছেন, তা জিনাত মহলকে বলার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। জিনাত মহল আমাকে দেখে তার দর্শনার্থী ও পরিচারিকাদের বিদায় দিলো। আমি বললাম, দরবেশ হাসান আসকারী এসেছিলেন।' আমি তারপর আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করলাম।'

জিনাত বললো, "এবং তিনি মহান সম্রাটকে তার বন্যার স্বপ্নের কথা বলেছেন। হিন্দুদের হোলির কথা, তিন শিশু কন্যার কথা, যারা জন্মেই কথা বলতে শুরু করেছে। আপনার দাসীকেও খৃষ্টান শাসনের অবসান এবং মোগল বংশের পুনরুত্থানের ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য সোনার মোহর দেয়া উচিত।"

প্রাসাদের অভ্যন্তরে কত দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে। যেন প্রাচীরের কান আছে এবং বাতাসের আছে জিহ্বা। আমার হতবাক হওয়াটা জিনাত লক্ষ্য করেছে। তার কপাল নির্দেশ করে আরো বললো, 'মহান সম্রাট কিসমতের কিতাবে কি লিপিবদ্ধ আছে তা পাঠ করার নিজস্ব পদ্ধতি আমার আছে।' হাফিজ এটাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সে দিওয়ানে হাফিজ খুললো এবং পাঠ করলো ঃ

'বেহেশতের সবুজ প্রান্তরে আমি
নতুন বাঁকা চাঁদ দেখে বললাম, 'হে ভাগ্য,
তুমি ঘুমাও, আর
সূর্য জেগে উঠে। উত্তর এলো-
অতীতের মত হতাশ হয়ো না।"

শেষ পংক্তিটি সে পুনর্বার পড়লো। তাকে খুশী দেখে আমিও সন্তুষ্ট হলাম এবং তার গালে চুম্বন করলাম। সে লজ্জিত হলো, "দিনের বেলায়, এসব কি হচ্ছে। মহামহিম কি লজ্জার মাথা খেয়েছেন?'

"তুমি লজ্জার কথা বলছো। লজ্জাই আমার খ্যাতি।" আমি হাফিজের উদ্ধৃতি দিলাম।

বিদ্রোহের পর প্রথম দু'দিন আমি সত্যি সত্যি অনুভব করলাম যে, আমি হিন্দুস্থানের যথার্থ সম্রাট এবং ফিরিঙ্গিরা আমার সাম্রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু মোহাচ্ছন্নতার যে মেঘ দৃষ্টির উপর বিস্তার লাভ করেছিল তৃতীয় দিনেই তা কেটে গেল। আমার পুত্র মির্জা মোগল শাসকের

সকল কাজ দখল করে নিয়েছে। লোকজন তার কাছে যাচ্ছে নির্দেশ লাভের জন্য। এমনকি খোজা বসন্ত আলী খানের মত আমার ব্যক্তিগত ভৃত্যও তার দরবারে হাজিরা দিচ্ছে।

আমি যেসব ইউরোপীয়কে নিরাপত্তার খাতিরে আটকে রেখেছি, মির্জা মোগল তাদের বিরুদ্ধে নগরীর বিদ্রোহীদের প্ররোচিত করলো। আমি তার সাথে তর্ক করলাম এবং বসন্ত আলী খানের মত লোকদের কাছে 'কান' বন্ধক রাখার বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক করে দিলাম। কিন্তু আমার সতর্ক বাণীতে কোন কাজ হলো না। তিনদিন পর যন্ত্রর মনে পড়ে,সেদিন ছিল ১৬ই মে শনিবার-তারা গোপন কুঠুরী থেকে বন্দীদের বের করে ৩৯ জনের শিরোচ্ছেদ করলো, যার মধ্যে নারী ও শিশু ছিল। ঠিক যেন বকরী ঈদ উপলক্ষে ভেড়া কোরবাণী করা হলো। প্রাসাদের সম্মুখে শাহী ফোয়ারা এইসব নিরীহ লোকগুলোর রক্ত ও লাশে পূর্ণ হলো। আমি হারেমে চলে গেলাম। জিনাত মহল আমার কোলে মাথা গুঁজে শিশুর মত কাঁদলো। মৃত্যুর পূর্বে হতভাগ্যদের চীৎকারের যে শব্দ, কান থেকে তা সরাতে পারছিলাম না। রাতে নদী তীরে শৃগালের ডাক শুনে মনে হতে লাগলো যেন মৃতের শেষ- কৃত্যানুষ্ঠানে কোন মহিলার কান্না।

আমি যখন মির্জা মোগল ও উদ্ধত খোজা বসন্ত আলী খানকে তিরস্কার করলাম, তখন তারা আমাকে এ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখাল যে, আমি জিহাদের পক্ষে, নাকি বিধর্মীদের পক্ষে। তারা পরোক্ষভাবে বললো যে, বেগম জিনাত মহলের পিতা এবং আমার চিকিৎসক আহসান উল্লাহ খান ফিরিঙ্গিদের বেতনভোগী।

আমি বধিরের মত এসব অপবাদ শ্রবণ করলাম। কিন্তু আমার হৃদয় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। কখনো কখনো আমি দ্রুত বিজয় লাভ এবং আমার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশা করতাম। কখনো মনে করতাম সাহেবরা আমাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে, আমাকে এবং উত্তরাধিকারীদের হিন্দুস্থানের বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আমার নামে সাম্রাজ্য পরিচালনা করবে। উভয় ক্ষেত্রেই আমি শান্তির জন্য দোয়া করতাম, যাতে আমি জীবনের শেষ দিনগুলো ইবাদতের মধ্যে কাটাতে পারি এবং জনবিচ্ছিন্ন খানকায় ধ্যানমগ্ন হতে পারি।

২৪শে মে রোববার সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ উঠলো। ধূলির কারণে আমার দৃষ্টি চাঁদকে নির্দিষ্ট করতে না পারলেও জিনাত মহল অস্তমিত সূর্যের লাল আভার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমাকে নিশ্চিত করলো যে, চাঁদটি একটি বক্র ছুরিকার মত জ্বল জ্বল করছে। পরদিন আমার প্রিয় হস্তী মওলা বখশের পিঠে আরোহন করে নগরীর বাজার এলাকা পরিদর্শনে বের হলাম এবং প্রজাদের সাথে শাহী মসজিদে আছরের নামায আদায় করলাম। ফেরার পথে ভিখারীদের ভিড়ের উপর মুদ্রা ছড়িয়ে দিলাম। যখন লাহোরী গেটে উপনীত হলাম তখন সূর্য অস্ত গেছে। প্রাসাদের প্রাচীরে তেলের প্রদীপ সাজানো হয়েছে। আমি আবার নগরীর দিকে হস্তী চালনার নির্দেশ দিলাম। দেখলাম জুমা মসজিদসহ গোটা নগরীতে আলোর ঝলকানি। আকাশে আতশবাজি ছোড়া হচ্ছে এবং বহুবর্ণের তারকার আকারে সেগুলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়লো। আমার সম্মানে একুশ বার তোপধ্বনি করা হলো।

ঈদুল ফিতরের দিনটি সবসময়ই উৎসবমুখর থাকে। রমযান মাসে বিশ্বাসীদের বিরত থাকার সকল বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। লোকজনকে আমোদ প্রমোদের সুযোগ দেয়ার জন্য আমার চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু আমার পুত্ররা জানতো না যে, অন্যদের আঘাত না করেও কি করে তাদের আনন্দ উদযাপনের সুযোগ দেয়া যায়। মধ্যরাতে প্রাসাদের দারোগা আমাকে জাগালো, দারিবায় এক ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীর বাড়িতে লুটপাটের জন্য গমনকারী পুত্রকে বিরত থাকার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সাহায্য করতে। আরেক পুত্রকে উলঙ্গ ও মাতাল অবস্থায় লাল কুয়ানের হিজড়া বেশ্যা পল্লী থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। তৃতীয় এক পুত্রকে উচ্ছৃংখলতার জন্য আটক করা হয়েছে যে এক শাহযাদী পরিচালিত দরিয়াগঞ্জের গণিকালয়ে ছিল। তৈমুর লং ও বাবর প্রতিষ্ঠিত বংশের অধঃপতন এভাবেই হয়েছে।

পরদিন সকালে পুত্রদের তলব করলাম, লোকজন কি বলছে তা শোনার জন্য। তারা মাথা নীচু করে অভিযোগগুলো শুনলো। তাদের রক্ত লাল চোখ, বিধ্বস্ত চেহারার মধ্যে আমি দেখতে পেলাম যে, তাদের নীরবতা সাময়িক এবং অন্তরে অনুশোচনা নেই।

প্রশাসনের দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছে তারা বেপরোয়া অশ্বপৃষ্ঠে নবীশ চালকের মতো। তারা

ব্যয় করতে জানে, কিন্তু আয় করতে জানে না। হিসাব নিয়ে তাদের মাথাব্যাথা নেই। ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক লোকের সংখ্যা আগমন। কিন্তু কেউ তাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা ভাবলো না। তাদেরকে যুদ্ধ করতে পাঠানো হলো কুঠার, বর্শা এবং ছুরি হাতে দিয়ে। অপরদিকে যাদের বিরুদ্ধে তারা লড়বে তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং হাতে বন্দুক। ঈদুল ফিতরের পাঁচদিন পর যমুনা নদীর অপর পারে একটি সংঘর্ষে ফিরিঙ্গিরা বিজয়ী হলো। আমাদের গাজীরা শাহাদাতবরণ করলো। আরো কয়েকদিন পর গ্রান্ড ট্রাংক রোডে 'বদলী-কি-সরাই' এ এক যুদ্ধে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো।

দরবেশ হাসান আসকারী আমাকে বললেন যে, এই পরাজয়গুলো হচ্ছে আমাদের উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কতা। আমাদের জ্যোতিষীরাও ভবিষ্যদ্বাণী করলো যে, পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী ২৩শে জুন ফিরিঙ্গি শাসনের অবসান ঘটবে। আমাদের হাজার হাজার গাজী শহরতলীতে প্রাচীরের কাছে সব্জীমন্ডিতে দুশমনের উপর আপতিত হলো। আরো একবার আল্লাহ গাজীদেরকে বেহেশতের হুরীদের কাছে প্রেরণ করলেন এবং বিজয়ের আনন্দ দান করলেন ফিরিঙ্গি ও তাদের ভাড়াটে শিখ, গুর্খাদের।

সব্জী মন্ডিতে পরাজয় নগরের উপর বিষাদের ছায়া ফেললো। সিপাহীরা সেনাপতিদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললো। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলো যে, তারা ফিরিঙ্গিদের নিকট হতে ঘুষ নিয়েছে। মরুভূমি থেকে প্রবাহিত লু হাওয়া লোকদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে। সহসা বণিক ও মহাজনরা তাদের পণ্যভান্ডার শূন্য করে ফেললো। বাজারে খাদ্য শস্য পাওয়া যায় না। দরিদ্র মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠলো। অনেকে চুরি, ডাকাতি শুরু করলো। আমি জানি না এর পরিণতি কি? এ সময় দিল্লীতে এক অদ্ভুত লোকের আবির্ভাব ঘটলো।

নিহাল সিং

জন্মের পর থেকেই আমি দিল্লীর কথা শুনে আসছি। আমি যখন খুব ছোট আমার মা দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কথা বলতেন। আওরঙ্গজেব আমাদের গুরুর মস্তক কেটে ফেলেছিল। মা তার নাম উচ্চারণ করতেন 'আওরঙ্গ' এবং প্রতিবার নাম উচ্চারণ করে থুথু ফেলতেন। আমিও আওরঙ্গের নামে 'থু' দিতে শিখেছিলাম। যখন বড় হলাম, আমার বাপু তার পূর্বপুরুষদের কথা বলতেন, যারা দিল্লীতে হামলা চালিয়ে গর্দভের পিঠ বোঝাই করে সোনা ও রুপা এনেছিল। তিনি সরদার বাঘেল সিং-এর কথাও বলতেন, যিনি যেসব স্থানে গুরুরা নিহত হয়েছিলেন প্রতিটি স্থানে একটি করে গুরুদুয়ারা নির্মাণ করেছিলেন। আমি পাঞ্জাবের পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেয়ার পর আমার বন্ধুরা বললো, 'তুমি যদি দিল্লী না দেখো তাহলে তোমার কিছুই দেখা হয়নি। দিল্লীতে তুমি সব কিছু পাবে। আমের গুটির আকৃতির স্তন উঠেছে এমন কিশোরী বেশ্যা, লাউয়ের মত নিতম্ব বিশিষ্ট বালক, অথবা অল্প পয়সা খরচ করে একটা হিজড়াকেও পেতে পারো। তাহলে আরো বেশী মজা লুটতে পারবে। আমি প্রার্থনা করলাম, কোন কারণে আমার দিল্লী যাওয়া হোক।

গুরু, যিনি আমার অন্তরের কথা জানতেন, আমার মনোবাসনা পূর্ণ করলেন। একবার ছুটি কাটানোর সময় আমি যখন বাড়িতে অবস্থান করছি তখন দু'জন লোক আমাদের গ্রামে এলো। একজন ঢোল পিটিয়ে সকলকে বড় পিপল গাছটার নীচে জড়ো হওয়ার আহ্বান জানালো। অন্যজন বললো, মুসলমানরা 'জান কোম্পানীর' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং দিল্লীর সিংহাসনে একজন মোগলকে বসিয়েছে। সেই মোগল হচ্ছে, আমাদের গুরুকে হত্যাকারী আওরঙ্গের নাতির নাতি। সে বললো যে, আমরা যদি জান কোম্পানীতে যোগ দিয়ে দিল্লী দখল করতে পারি তাহলে সেখানে সোনা-রুপা যা দেখবো, সবই আমাদের। আমি লোকটিকে বললাম, থানায় আরজি লিখে আমার ছুটি বাড়িয়ে দেয়ার জন্য। বাড়ি এসে মা ও বাবার পদধুলি নিয়ে দিল্লীর পথ ধরলাম।

আমার সাথে গ্রামের আরো দু'টি ছেলে ছিল-লেহনা ও নাথা। অসহ্য গরম পড়েছে, যেন গোটা পৃথিবীটা গনগনে চুল্লীর মধ্যে। ধূলি উড়ে এসে পড়ছে আমাদের চোখে, নাকের ছিদ্রে। ধূলির আবরণে কালো দাঁড়ি মেটে বর্ণ ধারণ করলো। নিজেকে বললাম, 'শিখ সিংহের কাছে গরম আবার কি?' পথের ধারে কুয়ার পানিতে নিজেদের ধৌত করি, নিম গাছের ছায়ায় বিশ্রাম এবং আবার পথে নামি। দুই দিনে আমরা আম্বালায় পৌছলাম।

বিরাট টাকওয়ালা এক সাহেব, যার মুখ বানরের পাছার মত লাল, সে আমাদের দেখতে এল। রাজা জিন্দের সরবরাহ করা একশ' শিখ ইতিমধ্যে তার সাথে আছে। পথিপার্শ্বের গ্রামগুলো থেকে আরো একশ' শিখকে সংগ্রহ করলো। আমার পরনে পুলিশের ইউনিফর্ম এবং নিজের ঘোড়াও আছে। সাহেব সে জন্য আমাকে নিয়ে নিলো। লেহনা ও নাথাকেও সে নিলো। এরপর সে অচেনা এক ভাষায় কথা বললো। শুধু এটুকু বুঝলাম যে, আমাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে এবং আমাদের গুরু আওরঙ্গকে বলেছিলেন যে, সাহেব উদিত সূর্যের দিক থেকে আগমন করবে এবং শিখদের সাহায্যে মোগল বংশকে উৎখাত করবে। আমার মা কিংবা বাবা কেউই ইতিপূর্বে গুরুর এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বলেননি। যা হোক, আমি নিজেকে বললাম, সাহেবরা যা বলে তাই সত্য, কারণ সাহেবরা জ্ঞানী লোক। একদিন সকালে কুচকাওয়াজের সময় একজন সাহেব, যার নাম পরে জেনেছি হডসন, সে লাইনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় যুবকদের বুকে, পেটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেখছে এবং বাহু পরীক্ষা করছে। আমাকেও সে পরীক্ষা করলো। সে আমার আপাদমস্তক পায়ের জুতা থেকে পাগড়ী পর্যন্ত নজর বুলালো। লাইনে আমি সকলের চেয়ে দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যবান।

সাহেব জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

'নিহাল সিং।'

খাঁটি পাঞ্জাবীর মত সে বললো, 'নিহাল সিংহ। নিহাল সিংহ, তুমি হবে আমার আর্দালী।' হডসন সাহেব এরকমই। কারো কাছে কিছু চায় না। শুধু আদেশ দেয়। আমার সঙ্গী যুবকরা আমার সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হলো। তারা পিঠ চাপড়ে বললো, 'সাব্বাশ! ভাদহাই-ই (ধন্যবাদ)। কিন্তু আমি তাদের দৃষ্টির আড়াল হওয়া মাত্র বলতে শুরু করলো, 'সাহেবের চামচা।' আমি ওদের কথার তোয়াক্কা করি না। হডসন সাহেবকে আমার ভালো লাগলো। হডসন সাহেবও আমাকে পছন্দ করলো। যদিও আমার বেতন বাহিনীর অন্য ঘোড় সওয়ারদের চাইতে বেশী নয়, তবু আমাদের সুবেদার মান সিংহ অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে ডাকতেন, 'ভাই নিহাল সিংহ।' আমাদেরকে নতুন ইউনিফর্ম, লাল পাগড়ী, খাকী সার্ট, লাল কোমরবন্দ, লাল তকমা দিলো। অন্য সাহেবরা আমাদের বলতে শুরু করলো, ক্লেমিংগো। আমাকে একটি নতুন ম্যাচলাইট দিলো যা দ্রুত আগুন জ্বালাতে সাহায্য করে এবং একটি দীর্ঘ ছোরা দেয়া হলো।

কয়েকদিন কুচকাওয়াজের পর আমরা দিল্লীর উদ্দেশ্যে রাজপথে নামলাম। কর্ণালে পৌছার পর পর্বত থেকে গোরা কোম্পানী নেমে এলো আমাদের সাথে যোগ দিতে। গোরা সৈন্যরা প্রখর সূর্যতাপ ও গরম বাতাস সহ্য করতে পারে না। অতএব আমরা রাতে অশ্ব চালনা করতাম এবং দিনের বেলায় গাছের ছায়ায় ঘুমাতাম। আমরা খারাউন্দা, সামাল খা, রাঈ ইত্যাদি এলাকা অতিক্রম করলাম। এই শহরগুলো জান কোম্পানীর বিরুদ্ধে মাথা উঠিয়েছে। কিন্তু তারা আমাদের সামনে কিছু প্রকাশ করার সাহস করলো না। একদিন রাতের অন্ধকারে আমরা দিল্লী নগরীর উপকণ্ঠে উপনীত হলাম। আমাদেরকে তাবুতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। সাহেবদের বন্দোবস্ত অত্যন্ত চমৎকার।

অসহ্য গরমে রাতের অন্ধকারে আমরা ২০ মাইল পথ পেরিয়ে এসেছি। সকলে খুব ক্লান্ত এবং কোমরবন্দ ও জুতা না খুলেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি খুব উত্তেজিত এবং চোখ বন্ধ করতে পারছি না। আমার তাবুর ১২ জন লোক নাক ডাকছে ও শব্দ করে বায়ু ত্যাগ করছে। তাবু থেকে বের হয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটি পাথরের চাতালের উপর শুয়ে পড়লাম। দীর্ঘ চুল খুলে দিলাম। নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শীতল বাতাস আমার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠলো। আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন চোখ খুললাম, তারাগুলো অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে এবং আকাশ ধূসর। আমার হৃদয় বড় হতে হতে পৃথিবীর মতো হয়ে গেল। আমি গুরু নানকের বাণী স্মরণ করলাম, যা তিনি তার শিষ্যদেরকে বলেছিলেন, "আমার পুরুষ ভাইয়েরা, প্রভুর লীলা দেখো।"

নিজেই বিস্ময় প্রকাশ, করলাম, "বাহ! ভাই বাহ! মহান গুরু নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর শহর সৃষ্টি করেছেন।" আমার বাম দিক যে দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছিল, সেদিকে সুতলেজ নদীর মত প্রশস্ত এক নদী। নগরীর ধূসর প্রাচীরের পিছন দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নগর প্রাচীর সুউচ্চ এবং

সুদীর্ঘ। নদী তীর থেকে প্রাচীরটি চলে এসেছে সূর্যাস্তের দিকে এবং যতটা দেখতে পাচ্ছি গাছের সারির মধ্যে হারিয়ে গেছে প্রাচীরটি। প্রাচীরের স্থানে স্থানে বুরুজ ও ফটক। ধূসর প্রাচীরের পিছনেই আমি দেখতে পাচ্ছি আরেকটি লাল প্রাচীর ও সুবিশাল কিল্লা। কিল্লা প্রাচীরের স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের মিনার, গম্বুজ ও খিলান। যুদ্ধের কোনো আলামত আমি দেখলাম না। অথবা সেখানে যে জনপ্রাণীর বাস আছে তাও মনে হলো না।

লাল সূর্যটা যখন নদীর উপরে উঠলো, তখনই কামানের গোলার একটি শব্দ উত্থিত হলো। হাজার হাজার কবুতর সেই শব্দে আকাশে উড়লো এবং কাকের কা কা শব্দে' চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। হঠাৎ আমি দেখলাম শত শত শকুনি গাছের শাখায় বসে আছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো অর্ধেক খাওয়া একটি মৃতদেহ গাছের শাখায় ঝুলছে। আমার গলায় বমি এসে গেল। আমি তাবুর ভিতরে গিয়ে আমার সঙ্গীদের পাশে শরীর এলিয়ে দিলাম। আমি খুব ক্লান্ত।

বিউগল বাজলে আমরা উঠলাম। এক মগ চা হাতে নিয়ে আমাদের শিবির কেমন হয়েছে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমরা পাথরের উপর বেশ উঁচু স্থানে রয়েছি। এই স্থানটির সবচেয়ে উঁচুতে একটি বড় বাড়ী। বাবুর্চি বললো, এটি মারাঠা হিন্দু রাও এর বাড়ী। বাড়িটি দুশমনদের কামানের আওতার বাইরে বলে সাহেব অফিসাররা এটি দখল করেছে। গোরা পল্টন স্থান নিয়েছে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। আমরা কালোরা প্রাচীরের কাছাকাছি অবস্থানে। আমাদের সাথে আছে পাঠান, বেলুচী ও পাঞ্জাবী মুসলমান। বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, মুসলমানরা এখানে কেন?' সে বললো, 'বিদ্রোহী দলের হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা লড়বে।' আবার বললাম, 'আর গুর্খারা?' সে বললো, 'সাহেবরা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলে গুর্খারা যে কারো বিরুদ্ধে লড়বে। গুর্খার খুলি লোহা দিয়ে তৈরী এবং ভিতরটা গোবরে ঠাসা। সাহেব যদি বলে, তোমার বাবাকে গুলী কর। তাহলে সে তার বাবা-মাকে গুলী করবে।' কি অদ্ভুত! সাহেবরা কিভাবে আমাদেরকে একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গুরু তাদেরকে মহা জ্ঞান দান করেছেন। সাহসও দিয়েছেন প্রচুর। হডসন সাহেব বলে থাকেন, "একজন শ্বেতাঙ্গ দশজন কালোর সমান।"

তখন ভর দুপুর। সূর্য মাথার ঠিক উপরে। নিম গাছের ছায়ায় আমি নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলাম। একজন আমাকে চীৎকার করে ডাকছিল, 'আরে ও নিহলিয়া। বিউগলের আওয়াজ তোমার কানে ঢুকেনি? তুমি কি ঘুমের মধ্যে মরতে চাও?" আমি লাফ দিয়ে উঠে পাগড়ীটা মাথায় পেঁচিয়ে নিলাম। আমি কি দেখছি? সাহেবরা চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখছে। তারা যে দিকে দেখছে, আমিও সেদিকে তাকালাম। আমি কি দেখলাম? নগরীর একেবারে ডানদিকে সব্জী মন্ডির দিক থেকে দুশমনের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের দিকে আসছে। অশ্বারোহীদের পিছনে পদাতিক বাহিনী। তাদের পরনে জান কোম্পানীর ইউনিফর্ম। আমার তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই নগর প্রাচীর এলাকার মধ্য থেকে গোলাবাজী শুরু করলো, যেন কারও বিয়ের উৎসব হচ্ছে। কামানের মুখ থেকে বম বম শব্দে গোলা বেরিয়ে ফাটছে শাঁ শাঁ। গোলায় আমাদের তাবু বিধ্বস্ত হলো। কিছু ঘোড়াও মারা গেল। স্বীকার করতেই হবে দুশমনের নিশানা খুব পাকা। তারা নানা কৌশলও জানে। আমরা অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করা মাত্র তাদের দামামা বাজতে শুরু করলো এবং 'হর হর মহাদেব.... আলী! আলী! আলী!, রবে আমাদের উপর হামলা চালালো। হডসন সাহেব তরবারি বের করে চীৎকার করলো, 'হামলা।' তাদের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে আমরা দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করলাম। তাদের আওতার মধ্যে আসতেই বন্দুকের গুলী ছুঁড়তে শুরু করলো আমাদের উপর এবং ঘুরে দ্রুত কেটে পড়লো। আমরা যখন আমাদের হতাহতদের গণনা করছিলাম তাদের গুপ্ত ঘাতকরা সাহেবদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। একজন আমার উদ্দেশ্যে চীৎকার করলো, 'সরদারজী তুমি কেন ফিরিঙ্গি শুকরের কাছে তোমার জীবন বেচতে গেছ? আমাদের দলে এসো, আমরা আরো বেশী টাকা দেব।' ওরা আমাদের বহু লোককে হত্যা করেছে। আমরাও তাদের কিছু লোক হত্যা করেছি। কিন্তু তারা আমাদের কাউকে জীবন্ত ধরে নিতে পারেনি। আমরা তাদের ত্রিশ জনকে পাকড়াও করেছি।'

তাদের মৃতদেহ তল্লাশী করে কোমরে অনেক সোনা ও রূপার মুদ্রা পেলাম। তাদের আঙ্গুল ও কান থেকে আংটি খুলে নিলাম। হডসন সাহেব যুদ্ধবন্দীদের একটি গাছের নীচে দাঁড় করালো

এবং পরে হাঁটু গেড়ে বসার নির্দেশ দিলো। তার পিস্তলে গুলী ভরে পাকা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের প্রতি তাক করে বললো, 'তুমি কতদিন কোম্পানীর নিমক খেয়েছো?'

পাকা দাড়ি দুই হাত জোড় করে বললো, 'কসুর হুয়া। মাফ কিজিয়ে।' আরো ক'জন একইভাবে কাতরকণ্ঠে মিনতি জানালো, 'হুজুর! আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের যা আছে সব নিয়ে নাও। কিন্তু দয়া, করে প্রাণে মেরে ফেলো না।' তারা কোমরবন্দ খুলে মুদ্রা, আংটি এবং অন্যান্য গহনা বের করলো।

হডসন সাহেব সে সবের দিকে ফিরেও তাকালো না। পাকা দাড়িকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোন রেজিমেন্টের?'

'২৬ রেজিমেন্টের। বহু যুদ্ধে আমরা সাহেবদের পক্ষে লড়েছি। আমাদের যেখানে পাঠাবে সেখানেই তোমাদের হয়ে লড়াই করবো।' হডসন সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে বৃদ্ধ বললো। হডসন সাহেব আরেক পায়ে তাকে লাথি মেরে সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলো, 'তোমাদের সেনাপতি কে?'

'মির্জা মোগল...। সাহেব আমাদের প্রাণে মেরো না। আমরা যা জানি সব তোমাদের বলবো।'

'তোমরা সংখ্যায় কত?'

রেজিমেন্টের নাম দেয়ার জন্য তারা একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। ওদের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা দশ সহস্র বা আরো বেশী। হডসন সাহেব যা জানতে চায় আসলে সে তা জানে। সে পিস্তল রেডি করলো এবং বৃদ্ধের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলো, এই নিমকহারাম বিদায় নিক।'

বৃদ্ধ লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ তুললো, 'ইয়া আল্লাহ'।

সে নির্দেশ দিলো, 'সব নিমক হারামের' কল্লা কেটে নামিয়ে দাও, এবং এদের মৃতদেহ শৃগালকে খাওয়াও।'

বন্দীরা এই নির্দেশ শুনে জীবন্ত শবে পরিণত হলো। আমরা তাদের কোমরবন্দ খুলে নিলাম। আমাদের মেথররা তাদের ইউনিফর্ম ও বুট খুলে নিল। তাদের উলঙ্গ অবস্থায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম ঢালুর দিকে। সারিবদ্ধ করে হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করতে বললাম। তারা বিড়বিড় করলো, প্রস্রাব করলো, কেউ কেউ মলত্যাগও করলো। আমাদের কৃপানের আঘাতে তাদের মাথা বিচ্ছিন করে ফেললাম। ঠিক গুরুর শিরনি পাকানোর আগে ছাগলের মাথা কাটার মত। মানুষের গলা ছাগলের চাইতে একটু মোটা এবং সব সময় এক কোপে বিচ্ছিন্ন করা যায় না-এটুকুই পার্থক্য।

হডসন সাহেব আমাদের জন্য মদ সরবরাহ করলো।

আমাদের দু'জন সৈনিক গুরুতর আহত হয়েছে। শিবিরের হাসপাতালে তাদের দেখতে গেলাম। তাদেরকে কীকর গাছের নীচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। নেটিভদের জন্য ভিতরে কোন স্থান নেই। ডাক্তাররা গোরাদের চিকিৎসার জন্য ব্যতিব্যস্ত। তাদের অনেকের কলেরা, আমাশয় অথবা কম্প জ্বর উঠেছে। কেউ কেউ প্রখর রৌদ্রতাপে মোমের মত গলে গেছে। আমি সিপাহীদের পাশে বসে তাদের পা টিপে দিচ্ছিলাম। হডসন সাহেব একজন ডাক্তার আনলো। ডাক্তার এক প্যাকেট মলম মাটিতে ছুড়ে দিয়ে বললো, 'আঘাতের উপর মলম মেখে দু'দিনের মধ্যে কাজে যোগ দাও।'

বিকেলে আমি হডসন সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। সাহেব তার তাবুতে কিছু লিখছিল। বললাম, সাহেব নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত।আমি কি সাহেবের বুট খুলে দেব।' সাহেব মুখ না খুললেও চেয়ার ঘুরালো। আমি মাটিতে বসলাম। তার পা থেকে বুট খুলে মর্দন শুরু করলাম। সাহেব লিখা বন্ধ করে আমার দিকে ফিরে বললো, 'ভালো যুদ্ধ হয়েছে, কি বলো?'

আমি বললাম, 'ওরা আমাদের বহু লোককে হত্যা করেছে।'

সাহেব কাগজের উপর দৃষ্টি দিয়ে বললো, সতের জন নিহত। ২৫ জন আহত। এছাড়া ২০টি ঘোড়াও মারা গেছে।'

আমি সতের জনের অধিক মরতে দেখেছি। আমি বুঝলাম। সাহেব শুধু গোরাদের মৃতদেহ গণনা করেছে। 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছিল শৃগালরা। হামলা খুব বড় ধরনের হলেও

আমরা ওদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছি।' সাহেব বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলো, 'আজ ছিল ২৩শে জুন। পলাশী যুদ্ধের শতবার্ষিকী। সেদিন মুসলমানরা ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতো, একশ বছর পর তারা জিতবে। সাহেবদের পরাজিত করতে শৃগাল বাহিনীর চাইতেও বেশী কিছু লাগবে।'

আমি তার পা মালিশ করতে করতে বললাম, 'সাহেবরা বাহাদুর।' সাহেব বললো, 'পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো যোদ্ধা।'

আমি মাথা নাড়লাম, 'শিখরাও বাহাদুর। একজন শিখ অন্যদের এক লাখ পঁচিশ হাজার জনের সমান।'

কথাটা হডসন সাহেবের পছন্দ হলো না। তার হাত টাকের উপর বুলিয়ে জানতে চাইলো, 'মুদকী, ফেরুশহর, সাবরাও, মুলতান, গুজরাট ও চিল্লিআনওয়ালায় কি ঘটেছিল'

'সাহেব, অফিসাররা শিখ সৈনিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।'

'পরাজিত হলে সকলেই এই কথা বলে, আমাদের কমান্ডাররা আমাদের লড়তে দেয়নি।'

হডসন সাহেবের মেজাজ সহজে বিগড়ে যায়। তর্ক করে তার মেজাজ খারাপ করতে চাই না। মনে মনে বললাম, 'শিখরা যদি বিশ্বাসঘাতকের পরিবর্তে ভালো সেনাপতি পায়, তাহলে তারা তোমাদের লন্ডন পর্যন্ত গমন করবে এবং তোমাদের মাদের...।'

আমার মালিশের প্রভাবে সাহেবের চোখ বন্ধ হয়ে আলো। বিড়ালের মত গর গর শব্দ বেরিয়ে এলো গলা থেকে। কিছু পর সে মুখ খুললো, 'ঠিক হ্যায়, তুম যাও।'

আমি স্যালিউট করে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে আমি আবার আহত সৈনিকদের দেখতে গেলাম। কিন্তু কীকর গাছের নীচে তাদের দেখলাম না। আমি হাসপাতালে গেলাম। সেখানেও তারা নেই একজন মেথর বললো, রাতে তারা মারা গেছে এবং তাদের দাহ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দিল্লীওয়ালারা আমাদের দম ফেলতে দিলো না। মধ্যরাতে আমরা যখন গভীর ঘুমে অচেতন তখন দুশমন আমাদের প্রতি কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করে। উত্তপ্ত বিকেলে যখন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করি তখন তারা চোরের মত উঠে এসে বন্দুকের গুলী ছোঁড়ে। আমাদের শিবিরে তারা দূত প্রেরণ করলো। মুসলমানের কাছে মুসলমানকে পাঠালো কুরআন হাতে দিয়ে এবং তাদেরকে শূয়োরখোর ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নেয়ার আহ্বান জানালো। শিখদের কাছে প্রেরণ করলো পিতলের লোটায় গঙ্গাজল ভরে ব্রাহ্মণকে দিয়ে। তারা গরুখোর ম্লেচ্ছদের হত্যা করার জন্য অনুরোধ করলো। প্রত্যেক গোরাকে হত্যার জন্য তারা একশ' রুপি করে দিতে চাইলো, চাকরি করলে আরো অধিক অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলো। কিন্তু আমরা আমাদের নিমকের প্রতি অনুগত রইলাম। তারা যে অর্থ এনেছিল তা নিয়ে নিম গাছের ডালে তাদের ঝুলিয়ে দিলাম।

সাহেবরাও গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল। গুপ্তচর প্রধান এক চোখ বিশিষ্ট রজব আলী। যখন খুশী সে আমাদের শিবিরে আসতো এবং নগরীতে ফিরে যেতো। তারা বলতো, বাদশাহর কথা সে শুনতে পারে এবং হডসন সাহেবের কানেও ফুসফুস মন্ত্রণা দিতো। তার নিকট হতে অর্থও নিতো। কালোরা হডসন সাহেবকে পছন্দ করতো, কিন্তু গোরা সৈন্যরা তার পরোয়া করতো না। পেশোয়ার থেকে গাইডস্ নামে একটি পল্টন এখানে এসে পৌছলে তার প্রমাণ পেলাম। হডসন সাহেব প্রায়ই বলতো, 'যব হাম গাইডস মে থা...।' সে যেভাবে বলতো তাতে মনে হতো গাইডসরা বিশ্বের সেরা যোদ্ধা। আমি জানি না, হডসন সাহেব কেন সেই পল্টন ছেড়ে এসেছে। শুধু একবার সে কিছু 'হ্যাংকি প্যাংকি' উল্লেখ করেছিল। যা হোক, গাইডসরা মার্চ করে শিবিরে প্রবেশ করেই হডসন সাহেবকে দেখলো এবং কালো সিপাহীরা লাইন ভেঙ্গে তার সাথে কোলাকুলি করার জন্য দৌড় লাগালো। সে কি অভাবিত দৃশ্য। পাঠান, বেলুচ, শিখ সবাই হডসন সাহেবকে আলিঙ্গন করছে। সাহেবরা এমনভাবে রইলো যেন তারা ব্যাপারটি জানে না।

একদিন এক গোরা প্রশ্ন করেছিল, 'আমি কে?'

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, 'হডসনের ঘোড়া'। সে হাসলো। অন্য গোরাদের প্রতি তাকিয়ে

বললো, 'হডসনের ঘোড়া।' সকলে হেসে উঠলো। আমি বুঝতে পারলাম না গোরাদের হাসির কারণ।

জঙ্গী লাট উইলসন সাহেবও হডসন সাহেবকে পছন্দ করতো না। আরো সৈন্য সমাবেশের পূর্বে তাকে দিল্লী আক্রমণের অনুমতি দিলো না। হডসনের মেজাজ বিগড়ে গেলো।

জুলাই এর প্রথম দিকে একদিন এমন ধুলিঝড় শুরু কলো যা আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। সূর্যতাপে দগ্ধ ধূলি আমাদের চোখ ও নাকে প্রবেশ করতো। এক ঘন্টা পর ধূলি ঠান্ডা হয়ে গেল। দিন রাতে রূপান্তরিত হলো। বিদ্যুতের চমক ও বজ্রপাতে আকাশ যেন বিস্ফোরিত হচ্ছে। এরপর নামলো তুমুল বৃষ্টি। কিছু পূর্বের ধূলি এবং সবকিছু ধুয়ে নিয়ে গেল। আমি গৌড়ে তাবু থেকে বের হয়ে বন্ধুদের ডাকলাম চীৎকার করে, 'ও লেহনিয়া, বৃষ্টি হচ্ছে। ও নাথিয়া! এই আফিমখোরেরা বেরিয়ে আয়। আকাশ ফেটে বৃষ্টি নেমেছে।'

আমরা পাগড়ী, ইউনিফর্ম খুলে ফেলে অন্তর্বাস পড়ে বৃষ্টিতে নেমে পড়ে মাথার লম্বা চুল খুলে দিয়ে নাচলাম, গান গাইলাম। 'আজ যদি শুধু আমাদের মাশুকা থাকতো তাহলে তার পদতলে বিছিয়ে দিতাম আকাশের তারকারাজি।'

গোরারা নেটিভদের জিজ্ঞেস করলো যে, আমাদের কি হয়েছে। পাঠানরা মাথা নাড়িয়ে শুধু হাসলো। ডোগরারা বললো, 'সাহেব, শিখদের চুল লম্বা, গরম তাদের পেয়ে বসে এবং তারা পাগল হয়ে যায়।' আমরা চীৎকার করলাম, 'উল্টো পাল্টা বলছিস কেন, তোদের মা বোনদের চুলও তো লম্বা। তাদেরকেও নিশ্চয়ই গরমে পেয়ে বসে। তাদেরকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দে। আমরা তাদের দুই উরুর মাঝে যে উত্তাপ তা একদম ঠান্ডা করে দেব।' এ কথায় ওদের মুখ বন্ধ হয়।

সারা রাত ধরলো বৃষ্টি ঝরলো। আমাদের তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ছে গর্জনের মত। কখনো মনে হয় দূর হতে আগত শব্দ। কেউই ভালো করে ঘুমাতে পারলো না। ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। আকাশ ধূসর ও কালো মেঘে, ঢাকা। সবকিছু মনে হচ্ছে, বিধৌত এবং সবুজ। আমি একটি ময়ূরের ডাক শুনলাম, পাঁও, পাঁও।' তিনটি ময়ূর হেঁটে বেড়াচ্ছে হিন্দুরাও এর প্রাসাদের পাঁচিলে। একটি পুরুষ ও দু'টি মেয়ে ময়ূর। ময়ূরটি পেখম মেলে ধরলো। আমি তাঁবুর ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে চিৎকার করলাম, 'এই আফিমখোরেরা উঠ। ময়ূর নাচছে।'

লেহনা পাশ ফিরে ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'ময়ূরকে ওর মায়ের সাথে ঘুমাতে দাও।' দু'জন তাবু থেকে বেরিয়ে এলো এই অপূর্ব দৃশ্য দেখতে। ঘূর্ণায়মান মেঘমালাকে পিছনে রেখে একটি বাড়ীর ছাদে ময়ূরের নৃত্য দেখতে পাওয়ার মূল্য লক্ষ রুপি। গুরু এই পাখীকে কি অপূর্ব সৌন্দর্য দান করেছেন। ময়ূর তার গলা পিছন দিকে যেভাবে বক্র করে, তাতে মনে হয়, তরুণ যুবরাজ তার পুরুষত্ব প্রদর্শন করছে। এটি দুই পা এগিয়ে আসে, আবার দুই পা পিছিয়ে যায়। পাখনার নীচের ধূসর রং দেখে মনে হয়, ধৈর্যহারা প্রেমিকের দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। ময়ূরের পালক উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল।

'ঠাস্!'

ময়ূর দেয়ালের উপর গড়িয়ে পড়লো।

'ঠাস্। ঠাস্।'

দু'টি ময়ূরী মাটির উপর পতিত হলো।

'হুররে, তিনটিকেই পেয়েছি'-গোরারা চিৎকার করলো।

আমি ভেজা মাটির উপর বসে পড়লাম এবং কাঁদলাম। এই ময়ূর ঘাতক হারামজাদাদের জন্য আমরা লড়াই করছি! এই সাদা বানরগুলো বৃষ্টির কি জানে? বর্ষার কালো আকাশ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তাদের মেয়েদের কালো চুল নেই। অথবা তরঙ্গায়িত সাদা মেঘমালাকে স্মরণ করানোর জন্য তাদের মেয়েদের গোলাকৃতির বড় স্তন নেই। তাদের মেয়েরা জানে না, কিভাবে আম গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দুলতে হয় অথবা বর্ষায় গান গাইতে হয়। কেউ কি গোরাদের গান শুনেছে কখনো।

আমি আম্বালার গীর্জায় ওদের গান শুনেছি। মেম সাহেবরা আর্তনাদ করে 'হি হি হো হো', আর সাহেবরা গর্দভের ডাক দেয়। কি করে তারা মেঘের রাগ ও ময়ূরের নৃত্য পছন্দ করবে? চার

পাশের পৃথিবী যখন সবুজ ও সুন্দর এই গোরারা কেবল ভাবে হত্যার কথা। হডসন সাহেবকে মগভর্তি সকালের চা দেয়ার জন্য গেলে সে বললো, 'এখন হামলা করার সময়। যুদ্ধের জন্য লোকদের প্রস্তুত হতে বলো।'

ভারী কামান টানার কাজে হাতী ব্যবহার করা হলো। উট এবং ষাড় টেনে নিয়ে গেল হালকা কামান! মাটি পিচ্ছিল। সুতরাং আমাদের পা খালি। শুধুমাত্র হডসন সাহেব অশ্ব পৃষ্ঠে। বৃষ্টি কমে এখন গুড়ি গুড়ি ঝরছে। পাথুরে চড়াই এ পথ চলা চমৎকার। কিন্তু সবজী মন্ডির কাছে হাঁটু পর্যন্ত কাদা। একটি হাতী পিছলে কাদায় পতিত হয়ে জোরে চীৎকার করলো। কামান গড়িয়ে মাটির সাথে পল আটকে থেকে গেল। হাতী কোনমতে পায়ের উপর দাঁড়ালো এবং কামানকে সোজা করতে বিশজন লোক লাগলো। পিছলে পড়া হাতী খুব মজার আচরণ করে। পিছলে পড়া উটের আচরণ আরো মজার। উটের আচরণে কেউ হাসলে উট খুব রেগে যায়।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যেই আমাদের ঠেলে নেয়া হচ্ছে। আমরা পিছলে পড়ছি, উঠে দাঁড়াচ্ছি। সবজী মন্ডি পর্যন্ত দেড় মাইল পথ যেতে আমাদের দুই ঘন্টা সময় লাগলো। দুশমনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়াই আমরা সেখানে পৌছলাম। তারা বর্ষার প্রথম দিন উপভোগ করছে মাওকার সাথে, ভাং খেয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশের স্থানে স্থানে নীল দেখা গেল। শীঘ্রই দিল্লী নগরীর আকাশ বহু বর্ণের অসংখ্য চিলে ছেয়ে গেল। তারা মধ্যাকাশে লড়াই শুরু করে পতনের পর্যায়েও অদ্ভুত কৌশলে আবার পাখা মেলে। এই দৃশ্যে ছেলেদের উল্লাসের আওয়াজ শুনলাম। আকাশে কবুতর উড়া দেখে রুমাল উড়াচ্ছে অনেকে, হুইসেল বাজাচ্ছে। সবজী মন্ডির কিছু বাড়ী থেকে নাচিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছে, দিল্লীর সবাই বিয়ে করতে যাচ্ছে।

'বম, বম, বম।' কাশ্মীরি গেটে আমাদের কামানের আওয়াজ উঠলো। সে আওয়াজে চিল দ্রুত আকাশ থেকে নেমে এল। কবুতর তার বাসায় ফিরে এল। নাচ, গানের শব্দ থেমে গেল। কাশ্মীরি গেট ও মোরি গেটের কাছের বুরুজ থেকে দুশমনের কামানের আওয়াজও ছুটে এল। আমাদের কৌশলে কাজ হয়েছে। কাশ্মীরি ও মোরি গেটে যখন কামানের গোলা বিনিময় হচ্ছে এবং সকলের মনোযোগ সেদিকে, আমরা তখন সবজী মন্ডির একটি এলাকা, একটি বাজার এবং উদ্যানসহ এক বিরাট বাড়ি ঘিরে ফেললাম। আদেশ হলো, 'হামলা'।

আমাদের কামানের গোলা ছুটলো বাজারের দিকে। আমরা দ্বিগুণ সংখ্যায় বাজারে প্রবেশ করলাম। কোন জানালায় কাউকে দেখা মাত্র গুলী ছুড়লাম। পুরুষ, মহিলা, শিশু-যেই সামনে পড়ছে আমাদের বেয়োনেটের খোঁচায় প্রাণ হারাচ্ছে। শুধুমাত্র উদ্যানের মাঝখানে বিরাট বাড়িটি থেকে আমাদের গুলীর জবাব আসছে। আমরা গাছের আড়ালে অবস্থান নিলাম। যখনই আমাদের বাহিনীর কেউ বাড়িটির কাছাকাছি পৌছার চেষ্টা করছে, সেই গুলীবিদ্ধ হচ্ছে। আমরা কামান আনলাম। প্রথম গোলায় প্রাচীরে বড় গর্ত সৃষ্টি হলো। দ্বিতীয় গোলায় আরেকটি গর্ত। এভাবে ছাদের একটি অংশ ধসে পড়লো। আমরা বাড়ীর মধ্যে মুহুর্মহু গুলী ছুড়লাম। যাকে পেলাম বেয়োনেটের আঘাতে হত্যা করলাম। আমাদের মোকাবিলা করার আর কেউ নেই। তবু আমরা হুশিয়ার না হয়ে পারি না। এবার শুধু বাড়িটি ঘেরাও করলাম এবং সকলে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আমি একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে একটি বড় কক্ষ অতিক্রম করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। কিন্তু আমি একি দেখছি? আমি কাউকে হাজার বার সুযোগ দিতে রাজী, তবুও কেউ সঠিকভাবে আন্দাজ করতে সক্ষম হবে না। একজন নারী! সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দুটি তারকার মত উজ্জ্বল। তার নাকে একটি হীরক খন্ড জ্বল জ্বল করছে। সেখানে সে কি করছে? আমার দিকে তরবারি উঁচু করে রেখেছে।

'আরে ও নাথিয়া।' চিৎকার করে নাথাকে ডাকলাম। 'দেখে যা আমার সামনে কি পড়েছে?'

নাথা আমার পাশে এসে মেয়েটির দিকে তাকালো। সে বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'বোলে বোলে।' অন্যদেরকেও সে ডাকলো। বন্দুকধারী শিখ সিপাহীতে জায়গাটা মুহূর্তের মধ্যে ভরে গেল। উপরে পুরনো তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে মহিলা। সে কম বয়সী বালিকা নয়। তার বয়স কমপক্ষে চল্লিশ বছর। নগরীর আর সব মহিলার মতই মোটা ও পান্ডুর বর্ণের। তার পাকা

চুলগুলোতে মেহেদী মেখে লাল করা হয়েছে। দাঁতে পানের দাগ। তার সুবৃহৎ স্তন পাতলা মসলিনের জামার নীচে বিদ্রোহ করছে।

নাথা তার হাতের তলোয়ারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, 'বিবি, তুমি কি ওটা দাঁত খিলাল করতে ব্যবহার করো?' সে সাহসের সাথে উপরে উঠে তলোয়ারটি নিয়ে নিলো। 'বিবি, তুমি কি এর দ্বারা আমাদের খুন করতে চাও? তোমার চোখ দিয়ে বরং আমাদের সহজে হারাতে পারো।'

নাথাকে বললাম 'ওর সাথে মস্করা করো না। তোমার মায়ের বয়সী মহিলা?'

নাথা উত্তর দিলো, 'এর মধ্যে আবার মায়ের কথা আসে কোত্থেকে?'

নাথা বললো, 'আমি একজন নামকরা মাদারচোদ।'

সে উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করলো

হডসন সাহেবের আগমনে আমাদের হাসি থামলো। নাথা মহিলাকে টেনে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে হডসনের ঘোড়ার পায়ের কাছে ফেলে দিল। মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি আমাকে গুলী করতে চাও? তার কণ্ঠে সামান্য জড়তাও নেই।'

হডসন সাহেব পিছিয়ে গেল। তার কণ্ঠে বিস্ময়, 'আওরত?' সে ধারণা করে নিলো মহিলাটি জীবিকা নির্বাহের জন্য কি করতে পারে। প্রশ্ন করলো, 'তুমি কি বারবনিতা? এই বাড়িতে তুমি কি করছো?' সে বললো, 'আমি একজন মুজাহেদীন। বদজাত নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদে আমার ভাইদের সাহায্য করছি।'

'বদজাত নাসারা' শব্দের অর্থ ভালোভাবে বুঝবার হিন্দুস্থানী হডসন সাহেবের জানা আছে। সাহেবকে খুশী করার জন্য মহিলা পিঠে বেয়োনেট ঠেকিয়ে তাকে সতর্ক করলাম, 'তুমি যদি জিভ না সামলাও তাহলে বেয়োনেটের আরেক প্রান্ত তোমার নাভি দিয়ে বেরুবে।' নিলজ্জ এই নগণ্য মহিলা তবুও কম্পিত হলো না।

দুই জন সাহেব নির্দেশ দিলেন, নিহাল সিংহ, মহিলাকে শিবিরে নিয়ে যাও জেরা করার জন্য। এরপর ওকে বেহেশতে পাঠিয়ে দাও, যেখানে যাবার জন্য সে উদগ্রীব।'

আমরা তাকে সামনে রেখে মার্চ করিয়ে শিবিরে আনলাম। সে ধীরে হাঁটলে তার নিতম্বে চাপড় দিয়ে জোরে চলতে বাধ্য করলাম। তার পিছনে আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা দিলাম। পথে খুব মজা হলো।

নাথা খুব উৎফুল্ল, 'ভাইসব, আজ রাতে আমাদের যন্ত্র পালিশ করবো।'

লেহনা বললো, 'ভালো মেয়ে! আমাদের গরম যন্ত্র ঠান্ডা করবে। আমরা একটি বুলেট তোমার দেহে ঢুকিয়ে দেব।'

মহিলা কোন কথা বললো না। আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখছে না। আমি তাকে সাহেবের কক্ষে নিয়ে গেলাম। সাহেব তার হেলমেট ও তরবারি খুলে রেখেছে। কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়িয়েই মহিলার মুখে সজোরে চড় কষালো। সাহেব আকৃতিতে বড় না হলেও শক্তিশালী। মহিলা ঘুরে মেঝের উপর পড়ে গেল। সে কাঁদতে শুরু করলো, 'আমাকে খুন করতে চাইলে কর। আমার উপর অত্যাচার করছো কেন?

হডসন সাহেব তার চেয়ারে বসলো। নোটবুক খুলে প্রশ্ন করলো, 'নাম কি?'

'আনোয়ার বাঈ।'

'কোথায় থাকো?'

'চওরী বাজারে।'

'তোমার দলের সেনাপতি কে?'

'বেরেলীর সেনাপতি বখত খান। দু'দিন আগে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন।'

'নিমক হারাম সুবেদারকে কে সেনাপতি বানালো" জানতে চাইলো হডসন। 'সবজী মন্ডিতে কত সৈন্য আছে?'

'আমি জানি না। আজই আমাকে সেখানো পাঠানো হয়েছিল প্রহরার জন্য। আমি সাধারণত মেয়েদের ব্যারাকে থাকি।'

'মেয়েদের ব্যারাক?'

'জী হুজুর! আমাদের কিছু মহিলা মুজাহেদীন আছে। কেউ আমার মত সৈন্যদের সাথে, অন্যরা কাজ করে হাসপাতালে অথবা সৈন্যদের জন্য রান্নার কাজ করে।

'ঐ বাড়িতে তুমি কি করছিলে?'

'সাহেবকে আমি ইতিমধ্যে বলেছি আমি প্রহরায় ছিলাম। দুই মাস পূর্বে জিহাদে যোগ দেয়ার পরই আমি পেশা ছেড়ে দিয়েছি। আশা করি আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করবেন।'

হডসন সাহেব রাগান্বিত হলেন। 'নিরীহ নারী ও শিশুদের হত্যা করাকে বলছো জিহাদ!'

মহিলা উত্তর দিলো না। হডসন সাহেব গর্জে উঠলো, 'উত্তর দাও। এভাবেই কি তোমরা রক্তপিপাসু মুসলমানরা জিহাদ কর?'

মহিলাটি যে শুধু লজ্জাহীন তাই নয়? তার মধ্যে ভয়ও নেই। তার জবাবটা কি ছিলো? 'সাহেব, আমি দেখেছি তোমার লোকজন মহিলাদের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজের চোখে দেখেছি, শিশুদের উপর ছুড়ে দিয়ে নীচ থেকে বেয়োনেটে গেঁথে হত্যা করতে।'

হডসন সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেল। এর আগে কখনো তাকে এতোটা ক্রুদ্ধ দেখিনি। তার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। কিন্তু মহিলা কথা বলে যাচ্ছে যেন তাকে কে কি করবে সে ব্যাপারে তোয়াক্কাই করে না, 'আর, এখন নিজ হাতে তুমি এক মহিলার রক্তপাত ঘটাবে।' সে অত্যন্ত ধূর্ত মহিলা। সে জানতে চায় যে, সাহেব তাকে কি করবে। সাহেব কিছুক্ষণ নিরব থাকলো। এরপর শীতল হলে আমাকে বললো, 'কোন মহিলা যখন অস্ত্র ধারণ করে, তখন অন্য সৈন্যদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় এই মহিলার তা থেকে ভিন্ন কিছু আশা করার অধিকার নেই। ওকে নিয়ে যাও। তার সম্পর্কে আমি আর কোন কিছু শুনতে চাই না।' আমি মহিলার হাত পাকড়ে বাইরে নিয়ে গেলাম।

সূর্য অস্ত যাওয়ার পথে। শীঘ্রই অন্ধকার নামবে। মহিলার উপর প্রথম অধিকার আমার। কারণ আমি সাহেবের আর্দালী। এরপর আমি ঘুমাবো। অন্যরা তখন সুযোগ নেবে। আমি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও সুযোগ নিতে পারি। ভোরে তাকে এক কোণায় নিয়ে গুলী করবো। আমাদের এলাকায় একটি প্রবাদ আছে, 'প্রথমে তোমার তৃষ্ণা মেটাও, এরপর কুয়ার থুথু ছিটাও।'

মহিলাকে আমাদের তাবুতে নিয়ে এলাম। সৈন্যরা চাপাতি খাচ্ছে। তারা হাসি ঠাট্টা শুরু করলো। একজন বললো, 'আরে ভাই ছেড়ে দাও। এতো এক বুড়ী?'

'আমি বাজী ধরতে পারি ওর চুল্লী এখনো উত্তপ্ত। ও একজন বেশ্যা! তার উরুর ফাঁক দিয়ে অনেক রেজিমেন্ট অতিক্রম করেছে। তুমি তাতে রুটি সেঁকতে পারবে।'

'নিহালিয়া। তুমিই প্রথমে তোমার অস্ত্র শাণ দাও। তারপর আমরা বাড়তি বীর্য থেকে মুক্তি পাবো।'

মহিলাটি যেন বধির হয়ে গেছে। সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'সরদারজী, যদি অনুমতি দাও, তাহলে আমি মাগরিব নামাযটা পড়তে চাই। এরপর আমাকে নিয়ে তোমাদের যা খুশী করতে পারো। সে এতো শান্তভাবে কথাটা বললো যেন আমাকে তার জন্য একটা বেগুন পুড়ে দিতে বলছে।

সকলে সমস্বরে তার আবেদন অনুমোদন করলো, 'নিহালিয়া, ওকে ওর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে দাও।' এতে যদি তার হৃদয়টা হালকা হয়, তাহলে সে আমাদেরটাও হালকা করে দেবে।'

'ঠিক আছে।' আমি বললাম, 'কিন্তু জলদি করো, ফটাফট।' মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বললাম।

মহিলা তার দোপাট্টা ভেজা মাটিতে বিছিয়ে হাঁটু পেতে বসলো। অস্তায়মান সূর্যের দিকে তার মুখ। তার নাকের হীরক খন্ড ঝিলিক দিলো।

নাথা প্রশ্ন করলো, 'ওর নাকের ফুলটি কে পাবে?'

কেউ উত্তর দিলো না। লেহনা বললো, ওর কানে ও হাতে সোনার গহনা আছে। নিহাল সিং ওগুলো বিক্রি করে দিক। আমরা টাকা ভাগ করে নিতে পারবো।'

মহিলা উঠে দাঁড়ালো। তার দু'চোখ বন্ধ। ঠোঁট নড়ছে। সে নীচের দিকে ঝুঁকলো। তার মসলিনের জামার ভিতর দেখতে পাচ্ছি স্তনজোড়া অতি পাকা ফলের মত ঝুলছে।

সে হাঁটুতে বসে কয়েকবার মাটিতে কপাল স্পর্শ করলো। এরপর সে পায়ের গোড়ালির উপর

বসে হাতের দুই তালু যুক্ত করে মেলে ধরলো যেন একটি বই পাঠ করছে। তার মুখে দীপ্তি ঝলসে উঠছে। তাকে নিয়ে আমাদের ঠাট্টা বন্ধ হয়ে গেল। তার চোখ অশ্রুতে ভরে গেছে। অশ্রু গাল বেয়ে মসলিনের জামায় পড়লো। আমাদের কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেল। তার ঠোঁটের নড়াচড়া বন্ধ হলো। সে তার মুখ প্রথমে ডানে এবং পরে বামে ফিরালো। আমি জানি মুসলমানরা এভাবে তাদের ডান ও বাম পাশের লোকদের জন্য দোয়া করে। আমরা তার ডানদিকে বসা। এবার সে হাতের তালু মুখের সামনে তুলে ধরে অশ্রুভেজা মুখটা মুছে নিল। জামার পকেট থেকে একটি তসবি বের করে বিড় বিড় জপতে লাগলো। ইতিমধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তসবি সে গলায় পড়ে উঠে দাঁড়ালো, 'সরদার সাহেব, এখন আমি প্রস্তুত।'

কেউ উত্তর দিল না। কেউ মুখ তুলে তার দিকে তাকালো না। একটু পর আমি বললাম, 'ভিতরে এসো।' সে হেঁটে তাবুতে প্রবেশ করলো। আমি তাবুর পর্দাটা ফেলে দিয়ে বললাম, 'বসো।' তার হাতে তিনটি চাপাতি ও ডাল দিয়ে বললাম, 'খাও।'

অনেকটা বিস্মিত হয়ে সে বললো, 'আমাকে যখন হত্যাই করবে, তাহলে কেন আর এই কষ্ট করছো?'

'আগে খেয়ে নাও, পরে কথা বলবো।' সে কয়েক গ্রাস খেলো। তাকে আমার পানির বোতল দিলাম। প্রচুর পানি পান করলো সে। এখন ঘন অন্ধকার। আমি বন্দুকটা তুলে নিয়ে তাকে তাবুর উল্টো দিক দিয়ে বের হবার নির্দেশ দিলাম। আমার বন্দুকের নল তার প্রায় মেরুদন্ড স্পর্শ করে আছে।

প্রহরীরা আমাকে থামালো। পাস ওয়ার্ড বলে তাদেরকে আমার কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলাম, 'একজন বন্দীকে গুলী করা হবে।' আমরা আবর্জনার স্তূপের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি। দুর্গন্ধ অসহনীয়। মহিলা তার দোপাট্টা দিয়ে নাক চেপে ধরলো। সবজী মন্ডিতে যেখানে তাকে আটক করেছিলাম, সেখানে দুশমনের বন্দুকের আওতার মধ্যে চলে এলাম। তাকে বললাম, 'এখান থেকে কি তুমি পথ চিনতে পারবে?'

সে ঘুরে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো, 'আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করুন.... আল্লাহ তোমাকে ও তোমার সন্তানদের দীর্ঘজীবন দান করুন... । আল্লাহ, তোমাকে.... ।'

আমি মাটিতে বন্দুক রেখে তার পা স্পর্শ করলাম, 'আমরা তোমার সাথে যে আচরণ করেছি, সে জন্য ক্ষমা করে দিও। আমাদের বাজে কথাবার্তার জন্য ক্ষমা করো.... । তুমি আমাদের মায়ের মত।'

'আল্লাহ সকল পাপের মার্জনাকারী। আল্লাহ যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে তিনি তোমাদেরকেও অবশ্যই ক্ষমা করবেন।'

মহিলা অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আমি কাদায় তার চপ্পলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সে শব্দ ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। আমি একজন বিদ্রোহী প্রহরীকে কাউকে চ্যালেঞ্জ করতে শুনলাম।

আমি বন্দুকটা উঠিয়ে আকাশের পানে একটি গুলী ছুড়লাম।

বাহাদুর শাহ জাফর

বখত খান আকৃতিতে যেমন বড়, তেমনি মেঘের মত কালো। তার চোখ বিদ্যুতের মত চমকে উঠে, তার কণ্ঠ বজ্রের মত প্রচন্ড। সকলে যখন বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছিল, ঠিক সে সময় দিল্লীতে তার আগমন। বখত খান দরবারের শিষ্টাচার কিছুই জানে না। যখন সে আমাকে অভিবাদন করে আমার হাতে কিছু গুজে দিলো তখন বুঝলাম ,আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন। আমি তাকে মর্যাদাসূচক আঙরাখা দান করলাম। সেই আঙরাখা পরে যখন সে আবার আমার সামনে এলো তখন তাকে অভিহিত করলাম সেনাপতি বখত খান হিসেবে।

বিহারের আঞ্চলিক উচ্চারণে সে উত্তর দিলো, 'বাদশাহ সালামত, আমি সেনাপতি টেনাপতি কিছু নই। আমি একজন সুবেদার মাত্র। কিন্তু আমার অধীনে আছে দশ হাজার গাজী। মহান বাদশাহর জন্য আমাদের রক্ত বিসর্জনের সম্মান ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না।'

আমি শুনেছিলাম, আমাদের সিপাহী, হিন্দু-মুসলিম নগরবাসী বখত খানকে স্বাগত জানিয়েছে। আমি তাকে বললাম, 'বখত খান, আমি তোমাকে আমাদের বাহিনীর জেনারেল ও কমান্ডার ইন-

চীফ নিযুক্ত করলাম। আল্লাহ তোমার তরবারিকে বিজয়ের সম্মান দান করুক।'

শিষ্টাচার পরিহার করে সে বললো, 'আরে ভাই, বাদশাহ। আপনার নাম হচ্ছে জাফর, তাই নয় কি? জাফর অর্থ বিজয়, তাই নয় কি? আপনিই হবেন 'জাফর'। যে কেউ এ ব্যাপারে আমার সাথে বাজী ধরতে পারে দৃঢ়তার সাথে সে হাত বাড়িয়ে দিল।

বখত খানের সাথে এলো বর্ষা। আমাদের শরতের উদ্যানে স্বল্প স্থায়ী বসন্ত এলো। যুদ্ধের বিষয় কিছু সময়ের জন্য বখত খানের উপর ন্যস্ত করলাম। আমি বর্ষাকালীন প্রাসাদ 'শাওন-ভাদো'তে দিন কাটাতে চলে গেলাম। মোতি মসজিদের পিছনে হায়াত বখশ উদ্যানে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছি। মসজিদ ও প্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় পুকুর এবং পুকুরের মাঝখানে প্রস্তর নির্মিত একটি ছোট অট্টালিকা, দেখে মনে হয় পানির উপর ভাসছে। আমার প্রজারা এর নাম দিয়েছে 'জাফর মহল'। এখানে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে বন্ধুদের মনোরঞ্জন, কবি সম্মিলনী ইত্যাদির আয়োজন করা হতো। সে বছর আমি জিনাত মহলের বোন অর্থাৎ আমার শ্যালিকা তাজমহল বেগমের সম্মানে একটি ছোট মুশায়রার আয়োজন করি। জিনাত স্বয়ং তাকে আমার হারেমের সদস্যা হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। জিনাতের সম্মতিতে আমি তার কুমারী বোনকে মর্যাদা দান করে আমার শয্যা সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করি।

কিছুদিন বন্দুকের শব্দ কানে এলো না। শুধুমাত্র কালো মেঘের গর্জন, বৃষ্টিপাত এবং নর্তকীদের ঘুঙুরের শব্দ ভেসে আসতো। সকালে কবুতর উড়িয়ে কাটাতাম।

এরপর এলো ফুল বিক্রেতাদের উৎসব। জিনাত মহল ও মির্জা জওয়ান বখতকে সাথে নিয়ে মেহরুলিতে গেলাম কুতুবদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযারে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে। আমার প্রিয় হস্তী মওলা বখশে উঠে লাহোরী গেট পেরিয়ে চাঁদনী চকে এলাম। বাল্লিরামে হাতির পিঠ থেকে নেমে আমার আধ্যাত্মিক গুরু কালে খান সাহেবের মাযারে শ্রদ্ধা জানালাম। বেগম ফতেপুরী মসজিদ থেকে বামে ঘুরে লাল কুয়ানে গেলাম। সেখানে জিনাত মহলের পিতা আসাদ কুলী খান আমাকে নজর ও এক ঝুড়ি আম উপহার দিলেন। 'কাজী-কা-হাউজ' এ গণিকালয়ের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় গণিকারা বারান্দা থেকে আমাদের উপর ফুল ছিটালো।

আজমিরী গেট দিয়ে নগর থেকে বের হলাম। পাহাড়গঞ্জ ও রায়সিনা গ্রাম অতিক্রম করলাম। রাজা সিংহের মান মন্দির জন্তর মন্তর, জিনাত মহলকে দেয়া ফলের বাগান তালকতোরায় আমাদেরকে আরেক ঝুড়ি আম দেয়া হলো। সফদর জং এর মাযারে থেমে সেখানকার মসজিদ ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করলাম। ইউসুফ সরাই এ পরবর্তী যাত্রা বিরতি করে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত আমের স্বাদ গ্রহণ করে খানিক সময় বিশ্রাম নিলাম। বিছানা থেকে যখন উঠলাম তখন দুপুর গড়িয়েছে এবং দক্ষিণ দিগন্তে ভারী মেঘ জমেছে। মাহুত মওলা বখশের গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিলো।

যখন মেহরুলিতে পৌঁছলাম তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। কয়েক ঘন্টা ধরে অপেক্ষমান নগরবাসী আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। গায়ক, নর্তকসহ তারা শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। মেহরুলির অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে হলো। জনসাধারণ আমাদের উপর ফুলের পাঁপড়ি বর্ষণ করলো। বেহেশত থেকে বর্ষিত হচ্ছে বৃষ্টি। যখন জাহাজ মহল প্রাসাদে পৌঁছলাম তখন শুরু হলো আতশবাজি। আতশবাজির বিচিত্র বর্ণে শামসি তালাব প্রতিবিম্বিত হলো। কি সুন্দর, এই পৃথিবী। ছাদের উপর বর্ষণের শব্দ এবং প্রবাহিত পানির শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আকাশ স্বচ্ছ, মেঘমুক্ত। আউলিয়া মসজিদে ফযর নামায আদায় করলাম। এই ছোট্ট মসজিদে ইবাদত করেছেন এবং চিল্লা (চল্লিশ দিনব্যাপী বিরামহীন ইবাদত) দিয়েছেন আজমীরের খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি, পাক পাত্তানের ফরিদুদ্দিন গঞ্জই-ই-শকর এবং আরো অনেক দরবেশ। নামায আদায় করে কুতুবদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযারে গেলাম। সেখানে আমাদের অনেক পূর্বপুরুষ ও সমাহিত রয়েছেন। তাদের রূহের মাগফিরাতের জন্য ফাতেহা পাঠ করলাম।

আমার সাথে জিনাত মহল থাকলেও তাকে মাযারের মধ্যে প্রবেশ করতে দেয়া হলো না। তার দেয়া গোলাপ ও জেসমিনের পুষ্পমাল্যটি মাযারের উপর ঝুলিয়ে দিলাম। এরপর আমরা

একটি কূপে ডুবুরীদের আশি ফুট পানির নীচে গিয়ে ফিরে আসা প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম। দিনের অবশিষ্ট সময় মেহরুলির আশে পাশের অসংখ্য ধ্বংসস্তূপ দেখে কাটালাম। প্রথমে গেলাম কুতুব মিনার ও কুওয়াতুল ইসলামে। আলাউদ্দিন খিলজী, ইলতুৎমিশ ও ইমাম জামিনের মাযারে ফাতেহা পাঠ করলাম। এরপর মেটফ্যাফি সাহেবের বাড়ি ও কবি কামালী মসজিদের পাশ দিয়ে সম্রাট বলবনের মাযারে এলাম। মাযারটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। সেটি সংস্কারের নির্দেশ দিলাম।

সন্ধ্যা কাটালাম জাহাজ মহলে। শামসি তালাবের অপর পার্শ্বে ছাতার মত কিছু ঘর। সেখানে সানাই বাদকদের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দিলাম। সানাই-এর সুর পানির উপর দিয়ে ভেসে আমাদের কানে আসে। সুরের ধীর গতির সাথে সাথে আকাশের মেঘ বিক্ষুব্ধ হতে শুরু করলো। সুর যখন পরবর্তী ধাপে, মৃদুমন্দ বাতাস জোরে প্রবাহিত হতে লাগলো। মেঘ এতো দ্রুত যাচ্ছে, মনে হচ্ছিল যেন তবলার তালের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। কি অদ্ভুত! আমি বজ্রপাতের শব্দ, বাতাসের হিসহিস শুনলাম। বিদ্যুতের চমক লাগছে চোখে। আকাশ মেঘে অন্ধকার হয়ে এলো। আলো জ্বালানো হলো। সানাই এর সুর যখন চরমে তখন বৃষ্টি নামলো। এ কথা যথার্থই বলা হয়ে থাকে যে, উস্তাদের সানাই-এর সুর বেহেশতের অশ্রু ঝরাতে পারে। আমরা 'রাগ মেঘ মালহার' শুনলাম এবং তারপর 'দীপক'। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

একেবারে বন্ধনহীনভাবে তিনটি দিন কাটালাম। স্মৃতিসৌধে বেড়ালাম, গান শুনলাম, কথক নাচ দেখলাম। কখনো বা তাকিয়ায় মাথা রেখে আকাশের মেঘ দেখে কাটিয়ে দিলাম। যখন দিল্লীতে ফিরে এলাম, পরিস্থিতি শেখ সা'দীর ভাষায় 'নিগ্রোর চুলের মত জট বেঁধে গেছে।' দুশমন শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং ট্রেন আটকে দিয়েছে। আমাদের বাহিনীর সবকিছু ঘাটতি পড়তে শুরু করেছে। বারুদ, রসদ সবকিছুর ঘাটতি। মির্জা মোগল ও বখত খান একে অন্যের প্রতি শুধু বাক্যবাণ নিক্ষেপ শুরু করেছে। সিপাহীরা ব্যবসায়ীদের দোষারোপ করছে দুশমনের সাথে ব্যবসা চালানোর জন্য। আমাদের সিপাহীদের অধিকাংশই মুসলিম এবং ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই হিন্দু। বকরী ঈদ ঘনিয়ে আসছে। মির্জা মোগল এবং অন্যান্য কিছু ওমরাহ হিন্দুদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে। কারণ হিন্দুরা ফিরিঙ্গিদের সমর্থন করছে।

বখত খান এই নীতির বিরুদ্ধে। আমি তাকে সমর্থন দিলাম। আমি ঈদে গরু কোরবানী নিষিদ্ধ করে নিজে নজীর স্থাপনের লক্ষ্যে একটি উট কোরবানী দিলাম। ঈদ ভালোভাবে কাটলো।

ঈদের দু'দিন পর বারুদে শয়তানের হাত পড়লো। বিপুল পরিমাণ বারুদ নিঃশেষ হয়ে গেল। বহু মানুষ ও বাড়ীঘর বিধ্বস্ত হলো। আমাদের দুর্ভাগ্যের পুরো সুযোগ গ্রহণ করলো ফিরিঙ্গিরা। তারা জাল প্রচারপত্র বিতরণ করলো যে, বারুদে বিস্ফোরণের ঘটনায় আমার বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হাকীম আহসান উল্লাহ ও বেগম জিনাত মহলের হাত ছিল। জনতা আহসান উল্লাহর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করলো। তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করার জন্য আমার প্রহরীদের প্রেরণ করলাম। বিক্ষুব্ধ জনতা জোরপূর্বক দিওয়ান-ই-খাস পর্যন্ত পৌঁছে আমার বিরুদ্ধে তার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগ করলো। আমার দৃঢ়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলো। আমি শপথ করলাম যে, হাকীম আহসান উল্লাহ'র সম্পত্তি যদি কারো কাছে পাওয়া যায় তাহলে তার পেট চিড়ে ফেলা হবে।

"শত্রুরা আমাকে ঘিরে ফেলেছে চারদিক থেকে
ইয়া আলী! আল্লাহর ওয়াস্তে
আমাকে সাহায্য করতে অদৃশ্য সৈন্যদল পাঠাও
তোমার নিকট হতেই বিজয় প্রার্থনা করি!"

দিল্লীর উপর সন্দেহের বিষবাষ্প ভেসে বেড়াতে লাগলো। আমি ধরেই নিলাম যে, আমার ভাগ্য বিরূপ হয়েছে এবং আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। দিল্লী ধ্বংস হয়ে গেল। অভিজ্ঞতা আমাকে বলে দিল যে, এ অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে আমাদের যা আছে তাই নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। দুশমন বাহিনীর সেনাপতি উইলসন সাহেবের কাছে গোপনে দূত প্রেরণ করলাম। তাকে

জানালাম, আমার, জিনাত মহল ও আমার সন্তানদের জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান ও পেনশন নিশ্চিত করা হলে আমরা তার সৈন্যদের প্রবেশের জন্য নগরীর ফটক খুলে দেব। আমাকে উত্তর দেয়ার সৌজন্যবোধটুকুও তিনি দেখালেন না।

বালিঘড়ির শেষ বালিকণাটুকু নীচে গড়িয়ে পড়া পর্যন্ত আমি প্রতীক্ষা করলাম। সাতদিন এভাবে কাটলো। ১৪ই সেপ্টেম্বর ফিরিঙ্গি ও তার মিত্র পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, শিখ, ডোগরা ও গুর্খারা দিল্লীর উপর আক্রমণ চালালো। কাবুল গেট থেকে যমুনা নদী পর্যন্ত উত্তর দিকের প্রাচীর এলাকায় বেপরোয়াভাবে গোলাবর্ষণ করা হলো। লাল কিল্লায় কামানের গোলা এসে পড়লো। কিছু ঘর ভেঙ্গে পড়লো।

সেনাপতি বখত খান বীরত্বের সাথে লড়াই করলো। তাকে সর্বত্র দেখা গেল- সকালে সব্জী মন্ডিতে, বিকেলে মোরি গেটে, সন্ধ্যায় কাশ্মীরী গেটে। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি জানানোর জন্য সে প্রাসাদে এলো। দুশমন নগরীতে প্রবেশ করেছে। নগরবাসীর সাথে রাস্তায় রাস্তায় তাদের যুদ্ধ হচ্ছে। এমনকি নারী ও শিশুরা হামলাকারীদের উপর পাথর ছুড়ছে। যদিও বার্ধক্য আমার অস্থিকে দুর্বল করে ফেলেছে তবুও আমার আরবী ঘোড়া হামদামে উঠে সিপাহীদের উৎসাহ দিতে বের হলাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আমাদেরকে অপমানজনকভাবে শিক্ষা দেবেন।

২১শে সেপ্টেম্বর বখত খান আমাকে বললো যে, দিল্লীর পতন রোধ করার আর উপায় নেই। সে আমাকে তার সাথে অযোধ্যার দিকে যেতে অনুরোধ করলো যাতে আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। আমি তার কাছে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলাম। বিরাশি বছরের ভার খুবই কঠিন। শ্রদ্ধেয় শেখ সা'দী বলেছেন, 'অবসরের প্রাসাদে বসে থাকাই উত্তম ভেবেছি। সাহচর্যকে গুটিয়ে ফেল'।

লোকজন শহর ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে। আমিও যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রথমে মেহরুলিতে যাওয়ার কথা ভাবলাম, সেখানে খাজা বখতিয়ার কাকীর পবিত্র ধুলি-কণার কাছাকাছি থাকতে পারবো। কিন্তু আমার শ্বশুর মির্জা এলাহী বখশ আমাকে পরামর্শ দিলেন আমার পূর্বপুরুষ সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য। তিনি বললেন, মেহরুলিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল। অপরদিকে হুমায়ুনের সমাধি দুর্গের মত সুরক্ষিত এবং সাহেবদের সাথে আলোচনা চালানোর সুবিধাজনক স্থান হবে। আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করলাম।

ভাগ্য আমাদের বিদায়ের দামামা বাজালো। আমার হৃদয় ভারী হয়ে গেছে। প্রিয় হাতী মওলা বখশ ও অশ্ব হামদামের কাছে বিদায় নিলাম। এই দু'টি প্রাণী যৌবনকাল থেকে আমার সঙ্গী ছিল। কবুতরের খাঁচা থেকে সব কবুতর ছেড়ে দিলাম এবং বললাম আমাদের দুর্ভাগ্যের খবর ছড়িয়ে দিতে। আমাদের পালকী আগ্রা রোড ধরে চললো। হারেমের পরিচারিকা ও ভৃত্যরা আমাদের সাথে এলো। হাজার হাজার লোক গরুগাড়ী, এক্কা, গাধার পিঠে ও পায়ে হেঁটে পালাচ্ছে। আরব-কি-সরাই এ পৌঁছে দেখলাম সমাধিসংলগ্ন উদ্যান ভর্তি মানুষ। আমাদের সব পুত্র, দৌহিত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সেখানে উপস্থিত। সেই রাতে আমরা সম্রাট হুমায়ুনের সমাধিতে বিশ্রাম নিলাম।

পরদিন সকালে লোকজন যখন মৃতের মত শুয়ে আছে আমি তখন হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযারে গেলাম। কোন নকীব ঘোষণা করলো না যে, 'বাদশাহ গাজী, পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া, হিন্দুস্থানের সম্রাট, আসছেন। প্রার্থনার পর আউলিয়ার মাযারের পাদদেশে বসে তসবিহ পাঠ করলাম। আমার পিতা দ্বিতীয় আকবর শাহ, ভ্রাতা মির্জা জাহাঙ্গীর, বেগম জাহানারা ও কবি আমীর খসরুর মাযারে ফাতেহা পাঠ করলাম। শীঘ্রই আমিও তাদের মধ্যে ঘুমাতে যাবো। দরবেশের প্রার্থনা আমিও উচ্চারণ করলাম। "হে প্রভু, দুষ্ট লোকদের ক্ষমা করো, কারণ তুমি ইতিমধ্যে ভালো লোকদের ক্ষমা করেছ তাদের ভালো হিসেবে সৃষ্টি করে।" আল্লাহ ভাগ্যে যা রেখেছেন সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমি হুমায়ুনের সমাধিতে ফিরে এলাম।

নিহাল সিং

এরপর প্রতিদিন বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যমুনা নদীর পানি স্ফীত হলো এবং বন্যার তোড়ে নৌকার সেতু ভেসে গেল। এটা আমাদের জন্য ভালো খবর। কারণ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকাংশ সিপাহী

ও রসদের যোগান পায় নদীর ওপার থেকে। বর্ষণের সময় খুব বেশী সংঘর্ষ হলো না। মাঝে মধ্যে কুদসিয়া উদ্যানে ছিটেফোটা সংঘর্ষ অথবা একে অন্যের প্রতি কামানের গোলাবর্ষণ।

বৃষ্টি হঠাৎ যেভাবে শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। আরো গোরা সিপাহী আমাদের শিবিরে যোগ দিলো। তারা বড় বড় কামান ও বারুদের শলা এনেছে। দু'জন সাহেব, নিকলসন ও টেইলর, যাদেরকে বিরাট যোদ্ধা বলা হয় তারা এসেছে দিল্লী আক্রমণের নেতৃত্ব দিতে। যেসব বানিয়া আমাদের কাছে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করতে আসতো, তারা বললো যে, নগরীতে লাল মরিচের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে আর গোল মরিচের দাম ধীরে ধীরে কমছে। কানা রজব আলী প্রতিদিন আসতে শুরু করেছে এবং হডসন সাহেবের কানে প্রচুর কথা শোনাচ্ছে। একদিন সাহেবের পা মালিশ করতে করতে বললাম, 'সাহেব, ওই কানা লোকটা তোমার কানে কি ফুস ফুস করে?' প্রথমে হডসন সাহেব খুব রেগে গেল এবং বললো, 'তুমি কি তা শুনতে চেষ্টা করো?' আমি উত্তর দিলাম, 'না সাহেব, আমি শুনলে কি আর তোমাকে জিজ্ঞেস করি।' তখন হডসন সাহেব বললো, 'বৃদ্ধ বাদশাহ বলছে যে, আমরা যদি তাকে প্রাণে রক্ষা করি এবং পেনশন দিতে রাজী থাকি তাহলে তিনি দিল্লীর দরজা খুলে দেবেন।

'তোমরা কি বললে?' আমি জানতে চাই।

'আমি বলি, আগে দরজা খোল, এরপর আমরা আলোচনা করবো।'

এ ধরনের কথাবার্তা শুনে আমি ভাবলাম, যে কোন দিন হামলা শুরু হবে। কিন্তু কিছু ঘটলো না। দুই হাজারের অধিক গোরা সৈন্য হাসপাতালে। প্রতিদিন কয়েকজন করে গোরা বমি করতে করতে অথবা রক্ত আমাশয়ে প্রাণ হারাচ্ছে। অন্য গোরারা পর্যাপ্ত মদ না পাওয়ার অভিযোগ করছে এবং হিন্দু রাও এর প্রাসাদের প্রাচীরে অশ্লীল চিত্র আঁকছে। এ ধরনের লোক কি করে যুদ্ধে যাবে? উইলসন সাহেব প্রতিদিন বলছে আগামীকাল... আগামীকাল...।' এবং সুবেদার বা সেনাপতি বখত খান প্রতিদিন আমাদের শিবিরে হামলা করে সৈন্য ও ঘোড়া মারছে।

গোরাদের সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন, যখন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তখন তাদের মত যোদ্ধা পৃথিবীতে আর কোন জাতির নেই। নিকলসন সাহেবের কথাই ধরা যাক। লোকটা রাবণের মত বিশাল এবং আমাদের গুরুর মত দীর্ঘ তার দাড়ি (কোন কোন আহম্মক তাকে বলে নিকালসাইনী, এমনকি এ কথাও বলে যে, আমাদের কোন এক গুরুর পুনর্জন্ম হয়েছে তার মধ্যে।) সে এতো শক্তিশালী যে তরবারির এক আঘাতে ষাড়ের শিরোচ্ছেদ করতে পারে। আমাদের হডসন সাহেবের যদিও মাথায় চুল নেই, বা থুতনি নেই কিংবা নিকলসনের মত বিশাল দেহও নেই, কিন্তু সিংহের মত তার সাহস। নিকলসন ও হডসন সাহেব অস্থির হয়ে উঠলো। উইলসন সাহেব বাহাদুর কেমন জঙ্গী লাট! তার মুখে শুধু একটি কথা- আগামীকাল, আগামীকাল।' তারা উভয়ে উইলসন সাহেবের কাছে গিয়ে বললো, 'আমাদের এখনই যুদ্ধ শুরু করা উচিত।' ঠিক এই সময়ে কানা রজব আলী খবর আনলো যে, বখত খান পাঞ্জাব থেকে আগত গোরা পল্টনের উপর হামলা করার জন্য বিরাট ফৌজ নিয়ে নজফগড় ও রোহতাকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। অতএব, উইলসন সাহেব নিকলসনকে বললো, 'তুমি যদি যুদ্ধ করার জন্য এতোই উদগ্রীব হয়ে থাকো, তাহলে নজফগড় যাও।' হডসন সাহেবকে বললো, 'যুদ্ধের এতো খাহেশ থাকলে তুমি যাও রোহতাক।

পরদিন সকালে রোহতাকের উদ্দেশ্যে আমরা ঘোড়ায় উঠলাম। আমরা পাঁচশত ঘোড় সওয়ার এবং নেতৃত্বে দশজন গোরা অফিসার। সারারাত চলার পর ভোরে রোহতাকের এক মাইল দূরে আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। সেখানে চা খেলাম এবং ঘোড়াকে দানা দিলাম। সূর্য যখন উঠলো, আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আধঘন্টা পর শহরের ফটকগুলো খুলে গেলো এবং বন্দুক ধারী অশ্বারোহীদের স্রোত ধেয়ে এলো আমাদের দিকে। আমাদের উপর তারা চড়াও হলো।

হডসন সাহেব আমাদেরকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দিলো। আমরা আধ মাইল পিছিয়ে এলাম। হামলাকারীরা ভাবলো, আমরা পালাচ্ছি। 'আলী! আলী!' রবে তারা ধাওয়া করলো। তারা যখন আমাদের একেবারে উপরে হডসন সাহেব তখন নির্দেশ দিলেন, 'ঘুরে হামলা করো।' আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। বন্দুক বাগিয়ে গুলী করলাম। দুশমনের পঁচিশ জন পড়ে গেল। আমরা

বর্শা দিয়ে তাদের আক্রমণ করলাম। তাদের শৃংখলা ভেঙ্গে পড়লো এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিছুসংখ্যক সাহসী যোদ্ধা রইলো আমাদের মোকাবিলার জন্য। নিজ চোখে দেখলাম, কিভাবে আমার সাহেব যুদ্ধ করতে ভালোবাসে। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে দুশমনের একজনকে আহ্বান করলো দ্বন্দ্বযুদ্ধে। প্রতিদ্বন্দ্বী এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালালো, টিকতে না পেরে পিছিয়ে গেল। সাহেব বললো, 'আবার চেষ্টা করো.... এটাই কি তোমার তলোয়ারবাজি শিক্ষা? আরো দু'জন চেষ্টা করলো। একজনকে সাহেব তলোয়ারের এক আঘাতে দু'টুকরো করে ফেললো। এরপর আরেকজন। এভাবে তিনজন পড়ে গেল। 'বাহ বাহ হডসন সাহেব। তুমি লক্ষজনের সমতুল্য।'

আমাদের মাত্র দু'জনকে হারিয়ে আমরা দুশমনের তিনশত সৈন্যকে খতম করলাম।

সন্ধ্যার মধ্যে আমরা শিবির প্রান্তরে ফিরে এলাম। নিকলসন সাহেবও ফিরে এসেছে। সে বেরেলীর সেনাপতি বখত খানকে এমন ধোলাই দিয়েছে যে, সে কুকুরের মত দুই পায়ের মাঝে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছে।

এখন আর উইলসন সাহেবের বলার কারণ নেই যে, 'আগামীকাল'। আমাদের যত বন্দুক ও কামান দরকার পাঞ্জাব থেকে আগত গোরা পল্টন তা এনেছে। তারা অবস্থান নিয়ে গুলী ছুঁড়তে শুরু করলো। কয়েক ঘন্টার মধ্যে নগর প্রাচীরের অবস্থা দেখে মনে হলো, প্রাচীর গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়েছিল। বড় হামলার পূর্বে প্রাচীর উড়িয়ে দিতে হবে। এই কাজটা ছেড়ে দেয়া হলো আমাদের মজহাবী শিখদের উপর। মহান গুরু এই বেচারা মজহাবীদের কি সাহস দিয়েছেন। একদিন তারা থলে ভর্তি বারুদ নিয়ে বের হলো। প্রাচীরের নিকটে উপনীত হতেই তারা বিদ্রোহী ঘাতকদের নজরে পড়ে গেল। কিন্তু তাদের ফিরে আসার সময়ও ছিল না। অতএব একজন বারুদের থলেবাহী শিখ গুলীর শিকার হলো। আরো দু'জন বারুদের থলেটা তুলে কয়েক পা এগুলো। দু'টি গুলীতে উভয়ে নিহত হলো। তৃতীয় মজহাবী থলে তুলে নিয়ে প্রাচীরের কাছে পৌছলো। এভাবে গুরুর চল্লিশজন সাহসী সন্তান জীবন দিয়ে দিলো। ভোরের পবিত্র মুহূর্তে গুরুর আশীর্বাদে তাদের কাজ সফল হলো। বারুদের থলে স্থাপন করা হলো প্রাচীরের নীচে এবং তা প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো। এতো প্রচন্ড শব্দ আগে কখনো শুনিনি। মাটি কেঁপে উঠলো। প্রাচীরের একটি অংশ ধসে পড়লো। ধসে পড়া অংশটুকু লাঙ্গলসহ পাঁচ জোড়া ষাড়ের পাশাপাশি ঢুকে যাওয়ার মত যথেষ্ট প্রশস্ত।

কখন চূড়ান্ত হামলা চালানো হবে সাহেবরা আমাদের তা বলে না। তারা একজন আরেকজনের সাথে গিটমিট করে। আমাদের কালোরা কেউ যদি তাদের নিকটস্থ হয় তাহলে তারা খারাপ শব্দ ব্যবহার করে 'রাডি, ড্যাম' এবং কথা বলা বন্ধ করে দেয়। খুব সহজে তাদের মেজাজ খারাপ হচ্ছে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। একদিন খুব ভোরে আমাদের কামানে আওয়াজ উঠলো। এভাবে চললো মধ্যরাত পর্যন্ত। মধ্যরাতে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলা হলো চূড়ান্ত হামলা শুরু হবে সূর্য উঠার আগেই।

আমাদের বাহিনীকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে দেয়া হলো, যারা নদী তীর থেকে সব্জী মন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় যুগপৎ হামলা চালাবে। আমাদেরকে ছয় মাসের অতিরিক্ত বেতন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো।

রাতটা নিগ্রোর মুখের মতই কালো। আমার নিজের হাত সামনে মেলে ধরেও দেখতে পারি না। সকলের কথা বলা নিষিদ্ধ। আমরা জুতা খুলে ফেললাম এবং চোরের মত পা ফেলে হাঁটলাম। আমরা কাশ্মীরী গেটের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছি। ধূসর ভোরের আবির্ভাব হলো। কামান গর্জে উঠলো। বিদ্রোহীরা আমাদের গতিবিধি আঁচ করেছে। উভয় পক্ষই তাদের সবকিছু দিয়ে গুলী ছুঁড়ছে। এভাবে চললো এক ঘন্টা ধরে। এরপর বন্দুক স্তব্ধ হয়ে গেল। কি ভয়ঙ্কর নিরবতা। আমার কপাল থেকে ঘাম ঝরছে। আমার মদটুকু গিলে ফেললাম। প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণ ঘটলো। আকাশে পাথর উত্থিত হলো। কাশ্মীরী গেট থেকে ধূলি ও ধূঁয়ার স্তম্ভ উঠলো। গেটটি উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমাদের সুবেদার মানসিংহ কৃপাণ বের করে চীৎকার করতে শুরু করেছে, 'বোলে সো নিহাল।' আমরাও নিজ নিজ কৃপাণ বের করে উত্তর দিলাম, 'সত শ্রী

আকাল।' আমরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে গেলাম।

বিদ্রোহীদের দামামা বাজছে। তারা গুলী ছুঁড়ছে আমাদের দিকে এবং আমাদের চীৎকারের সাথে পাল্টা দিয়ে বলছে, "আলী! আলী" অথবা "হর হর মহাদেব"। কে বলে তাদের মধ্যে যুদ্ধের ইচ্ছা শেষ হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে বহু কামান, বহু বন্দুক এবং সিপাহী ও অনেক। অতএব আমরা মৃত ও মৃতপ্রায়দের দেহ মাড়িয়ে চললাম। এক চোখা হারামজাদা রজব আলী বিদ্রোহীদের প্রায় কাছে শুয়ে ছিল। সে জানাল, ওরা অস্ত্র সমর্পণ করবে। আমাদের উপর তারা আপতিত হলো বোলতার মত। জীবনের যেন কোন পরোয়া নেই। তাদের মহিলা ও শিশুরা গালি ছুঁড়তে লাগলো। তারা আমাদের বললো, 'ফিরিঙ্গির জুতা চাটার দল' এবং মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়লো।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা কাশ্মীরী গেট থেকে মোরি গেট পর্যন্ত বাজারগুলো দখল করে নিলাম। কাশ্মীরী গেটে অনেকগুলো মদের দোকান। দরজা ভেঙ্গে আমরা যা পেলাম আকণ্ঠ পান করলাম। গোরা সৈনিকরা মাতাল হয়ে গেল। আমরা বাড়ীঘর তছনছ করলাম, মৃতদের নিকট হতে সোনা ও অর্থ নিয়ে নিলাম। গরু ও মহিষগুলোকে তাড়িয়ে আমাদের মজহাবীদের কাছে ন্যস্ত করলাম সেগুলোকে নগর প্রাচীরের বাইরে নিরাপদে রাখার জন্য। উইলসন সাহেব রাগান্বিত হয়ে নির্দেশ দিলো, কাউকে লুট করতে দেখা গেলেই গুলী করা হবে। কে কাকে গুলী করবে? সাহেবরা বললো, লুটের মাল ভাগ করার জন্য তারা লোক ঠিক করবে। আমরা বললাম, 'আচ্ছা'।

পরদিন সকালে আবার শুরু হলো লড়াই। প্রতিটি রাস্তা ও গলিতে লড়াই হলো। সর্বত্র আমরা দেখলাম, বোরখা পরা মেয়েরা ও ছোট ছোট বালকেরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে। গোরারা বলে যে, বিদ্রোহীরা তাদের মেম সাহেব ও বাচ্চাদের খুন করেছে, সে জন্য তারাও তাদের দৃষ্টিতে যত মহিলা ও শিশু পড়লো সকলকে হত্যা করলো।

লাল কিল্লার ফটক আমাদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত করার পূর্বে বাজারগুলোতে চারদিন ধরে যুদ্ধ হলো। আমাদের ব্যান্ড বাজিয়ে লাহোরী গেট দিয়ে কিল্লায় প্রবেশ করলাম। শুধুমাত্র এক অন্ধ মহিলা ও এক পঙ্গু বৃদ্ধ লোক ছাড়া কিল্লায় কেউ নেই। গোরা সৈন্যরা এই দু'জনকে নিয়ে খেললো। একজন তাদের বেয়োনেট সামনে দিয়ে বিদ্ধ করে, অন্যজন পিছন থেকে। তাদের প্রচেষ্টা দু'টি বেয়োনেট একত্রিত হয় কিনা তা পরীক্ষা করা।

কিল্লায় বৃটিশ পতাকা উত্তোলন করা হলো। আমরা পতাকাকে সালাম করলাম। গোরা সৈন্যরা তাদের রাণীর দীর্ঘ জীবন কামনা করে সঙ্গীত পরিবেশন করলো। তার সম্মানে একুশ বার তোপধ্বনি করা হলো। গোরাদের স্থান হলো প্রাসাদে। পরিখা থেকে দূরে আমাদের শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেয়া হলো।

পরদিন আমরা চাঁদনীচক ও জুমা মসজিদের চারপাশের বাজারগুলো থেকে বিদ্রোহীদের বিতাড়ন করলাম। চৌরী বাজারে কোন বাঈজী নেই। কাজী কা হাউজে কোন বারবনিতা নেই। লাল কুয়ানে কোন হিজড়া নেই। কিন্তু আমরা প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য, গরু ও মহিষ পেলাম। আমরা অনেক প্রাসাদ উড়িয়ে দিলাম। রাস্তায় অগ্নিসংযোগ করলাম। গোরা সৈন্যরা শাহী মসজিদ উড়িয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু উইলসন সাহেব বললো, 'না, এটি উড়িয়ে দিলে পাঠান, বেলুচী ও পাঞ্জাবী মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হবে।' সাহেবরা খুব জ্ঞানী।

মসজিদটি বরাদ্দ করা হলো শিখ ফৌজের জন্য। গম্বুজের নীচের স্থান সৈন্যদের জন্য। প্রান্তদেশের টানা বারান্দা ঘোড়ার জন্য। বিশাল চত্বরের মাঝখানে দুটি জলাধার। একটি আমরা ব্যবহার করতাম গোসলের জন্য, অন্যটি ঘোড়াকে গোসল করানোর জন্য।

দিল্লী শহরটিকে এক নজর দেখার জন্য আমি মসজিদের একটি মিনারে আরোহণ করলাম। নিজেকে ভাবলাম, রাজ্য দেখতে প্রয়াসী রাজার মত। প্রাসাদ, বাড়ীঘর, মসজিদ, বাজার এবং আমাদের লাগানো আগুনের ধূয়া দেখতে পাচ্ছি। দক্ষিণ দিকে তাকালাম। আমি কি দেখছি? অসংখ্য মানুষ নগরীর ফটকগুলো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটি গুলীর শব্দ পেলাম। কার্ণিশের একটি টুকরা ছুটে আমার দাড়িতে পড়লো। কেউ আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে।

চৌরী বাজারের দিক থেকে গুলীটা এসেছে। সব গণিকা যখন পালিয়ে গেছে তখন ঐ বাঞ্চোৎ গণিকালয়ে বসে কি করছে? আমি ভীত হলাম। নিজেকে আড়ালও করলাম না। সেই সন্ধ্যায় আমি হডসন সাহেবকে বললাম, ওরা সবকিছু নিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কিছুই পাবো না। সেই তার টাক মাথায় হাত বুলিয়ে বিষয়টি ভাবলো। এরপর সে উইলসন সাহেবের কাছে গেল এবং দক্ষিণ দিক হতে নগরীর উপর হামলা করার অনুমতি লাভ করলো।

দু'দিন পর হডসন সাহেবের ঘোড়া নগর প্রাচীর প্রদক্ষিণ করে এলো। আমাদের খেলা শুরু হলো। আমরা পলায়নপর লোকদের বর্শায় বিদ্ধ করলাম। যারা বর্শা থেকে রক্ষা পেয়ে ছুটে পালালো, তাদেরকে বন্দুক দিয়ে গুলী করলাম। দিল্লী গেট দিয়ে নগরীতে পুনঃপ্রবেশ করলাম। দরিয়াগঞ্জ ঘুরে জুমা মসজিদে ফিরে এলাম। এই বিরাট অভিযান ও বিরাট 'শিকারের' পর মসজিদের জলাধারে বর্শা পরিষ্কার করলাম। এর ফলে পানি এতো লাল হয়ে গেল যে, ঘোড়াও পানি পান করা থেকে মুখ তুলে নিলো।

বাহাদুর শাহ্ জাফর

আমি দু'দিন অপেক্ষা করলাম। তৃতীয় দিন সকালে একজন গোরা পঞ্চাশজন শিখ অশ্বারোহীর একটি দলকে নিয়ে সমাধিসৌধের গেটে উপস্থিত হলো। তাদের দূত হচ্ছে তোষামোদকারী কানা রজব আলী, যে প্রায়ই অবনত হয়ে আমার কাছে হাজির হতো এবং আমার পদচুম্বন করার অনুমতি কামনা করতো। সে জানালো যে, ইংরেজ বাহিনীর কমান্ডার উইলসন সাহেব বাহাদুরের কাছে মির্জা এলাহী বক্স (মির্জা ফখরুর শ্বশুর) প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমাদের গ্রেফতার করার সুযোগ করে দেয়ার ব্যাপারে। হডসন নামে একজন মেজর গ্রেফতারী পরোয়ানা কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে। হাকীম আহসান উল্লাহ দুশমনের সাথে যোগ দিয়ে আমাদের সম্পত্তির তালিকা তৈরী করছে এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এ কথা তাহলে যথার্থ, 'যে সর্পের চামড়া যত মসৃণ তার থলিতে তত বিষ।'

কাউকে আর কিছু বলার নেই। কূটচরিত্র, জঘন্য বেজন্মা রজব আলী আমাকে আশ্বাস দিল যে, আমি যদি তার সাথে গমন করি তাহলে আমার জীবন রক্ষা করা হবে। বিরাশি বছর বয়সে আমার জীবনের মূল্য কতটুকু? আমাকে ভাবতে হলো জিনাত মহল ও জওয়ান বখতের কথা। এছাড়া আছে জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা মোগল। সে রজব আলীর মুখে থুথু দিতে চাইলো। সে চীৎকার করলো, 'আমি এই গোরা ও শিখ বর্বরদের কেটে কাবাব বানাবো।'

এক ঘন্টা ধরে আমি ওদের তর্কবিতর্ক শুনলাম। আমি মন থেকে কোন কথা না বলে জিনাত মহল ও জওয়ান বখতকে ডেকে পাঠালাম। দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সমাধির সিঁড়ি বেয়ে অবতরণ করলাম। মির্জা মোগল ও তার সিপাহীরা আমাদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করছে। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া অন্য কোন পরামর্শের প্রতি আমি এখন বধির। মির্জা মোগল ও আমার অন্য পুত্রদেরকে বরং পরামর্শ দিলাম, সাহেবরা আমাদের সাথে কি আচরণ করে তা দেখে তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। তাদেরকে আলিঙ্গন করলাম। কারণ আমার উপলব্ধি হলো যে, এদের আলিঙ্গন করার আর সুযোগ পাবো না। আত্মীয় পরিজন ও ভৃত্যদের নিকট হতে বিদায় নিলাম। তারা আমার হস্তচুম্বন করে কাঁদলো।

আমার পালকী সমাধির গেটের বাইরে আনা হলো। সেখানে আমার গ্রেফতারকারীরা অপেক্ষমান। পালকী থেকে নামার পূর্বে আমি আল্লাহর নাম দশবার স্মরণ করলাম। দুই হাত তুলে বললাম, আল্লাহ আমি তোমার দাস বাহাদুর শাহ জাফর নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করছি। আমাদের প্রতি তোমার করুণা বর্ষণ করো।' শিখ অশ্বারোহী দলের ইংরেজ অধিনায়কের দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে, সে আমার, আমার সম্রাজ্ঞী ও পুত্রের জীবন রক্ষার ব্যাপারে আশ্বাসটি পুনর্ব্যক্ত করবে কিনা। হডসন পুনরায় সম্মতিসূচক মাথা ঝুঁকালো। পারস্যের বিজয়ী বীর নাদির শাহ কর্তৃক আমার পূর্বপুরুষকে উপহার হিসেবে দেয়া বিখ্যাত তরবারী 'জুলফিকার' হডসনের হাতে তুলে দিলাম। আমার পুত্র তার তরবারি সমর্পণ করলো। হডসন সাহেব আমাদের পালকীতে উঠার নির্দেশ দিলো। আমরা ফিরিঙ্গীর হাতে বন্দী হলাম।

দিল্লীতে ফিরে যেতে সারাটা দিন লেগে গেল। আমরা জনতার চীৎকার শুনছি এবং বহু স্থানে পালকীর গতিরোধ করা হলো। বিকেলের মধ্যে গোলযোগ থেমে গেল। শেষ পর্যন্ত আমরা যখন 'দিল্লী দরওয়াজা' দিয়ে প্রবেশ করলাম তখন এটা ছিল 'শহর-ই-খামোশান' (নিস্তব্ধ নগরী)। আমাদের পরিবেষ্টন করে নিয়ে যাওয়া ঘোড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ উত্থিত হচ্ছে না। লাহোরী গেটে পৌঁছে হডসন সাহেব আমাদেরকে গোরা সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করলো।

অতীতে আমরা যখনই লাল কিল্লায় প্রবেশ করেছি আমাদের আগমন বার্তা ঘোষণার জন্য তোপধ্বনি করা হতো এবং 'নহবত খানায় বাদ্য বাজানো হতো। এবার আমার নাম বিকৃতভাবে উচ্চারিত হলো, 'বাহাদুর শা'। মীনা বাজারের মাঝ দিয়ে পালকী অগ্রসর হলো। ভূগর্ভস্থ কক্ষে আমাদের স্থান হলো, যেখানে কয়েক মাস পূর্বে আমরা ইউরোপীয় পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। অবশ্য পরে বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের হত্যা করে। বাহির থেকে দরজা আটকে দেয়া হলো এবং দরজায় সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করা হলো। আমরা সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। ভাগ্যের ধনুক আমার দেহে একশ' বিষ মাখানো তীর ছুঁড়ে দিয়েছে। রক্তের স্বল্পতায় আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তীর বেঁধার যন্ত্রণা অনুভব করছে না। ঠিক একইভাবে আমার হৃদয়ে দুঃখের অনুভূতিও যন্ত্রণা দিচ্ছে না।

নিহাল সিং

লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীদের খুঁজে নির্মূল করতে সাতদিন লেগে গেল। এরপরই শুধু আমরা বলতে পারলাম যে, দিল্লী জান কোম্পানীর সম্পত্তিতে পরিণত হলো। দিল্লীতে অবশিষ্ট যা আছে তা হলো শূন্য বাড়িঘর ও মৃতদেহ। কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর মৃতদেহ ভক্ষণের জন্য ছুটাছুটি করছে। কয়েকদিন পর হিন্দুদেরকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করে তাদের দোকানপাট খোলার অনুমতি দেয়া হলো। মুসলমানদের মধ্যে যারা হিন্দু সেজে আসার চেষ্টা করলো তাদেরকে জীবন দিতে হলো। আমরা তাদের কাপড় খুলে ফেলতে বাধ্য করলাম। আমরা তাদের লিঙ্গে বেয়োনেট দিয়ে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সঙ্গীটির উপরিভাগ কিভাবে উধাও হলো?' তাদের মুখে রক্ত উঠে আসতো, তারা পেশাব করতে শুরু করতো। আমরা জানতাম, তারা ফিরে এসেছে পুঁতে রাখা স্বর্ণ ও রৌপ্য তুলে নিতে। সুতরাং আমরা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতাম এবং যা কিছু চোখে পড়তো তা নিয়ে তাদেরকে সাহেব বিচারকের কাছে হস্তান্তর করতাম। বিচারক তাদের গুটিকয় প্রশ্ন করে ফাঁসিতে ঝুলানোর নির্দেশ দিতো। চাঁদনী চকের মধ্যখানে কোতোয়ালীতে আনা হতো তাদের। সেখানে কয়েকটি ফাঁসি কাষ্ঠ দাঁড় করানো হয়েছিল। রাতের খাবার খেয়ে সাহেবরা ঘোড়ায় চড়ে সেখানে আসতো। খিদমতগাররা তাদের জন্য সোফা ও চেয়ার সাজিয়ে দিতো, আদবররা গ্লাসে ভরে দিতো ব্র্যান্ডি এবং তাদের চুরুটে আগুন ধরিয়ে দিতো। এরপর শুরু হতো তামাশা। বন্দীদের ছয় জনের এক এক দলকে আনা হতো। তাদের হাত পিছনে বাঁধা। ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিয়ে গলায় পরিয়ে দেয়া হতো ফাঁস। সাহেবরা তুড়ি বাজিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি নামিয়ে নেয়ামাত্র পায়ের নীচ থেকে তক্তা সরিয়ে নেয়া হতো। এ সময় সাহেবরা বাজি ধরতো কোন বন্দীটির প্রাণ নির্গত হবে বিলম্বে। কে দ্রুত মারা পড়বে তা বলা সহজ। ফাঁসির দড়িটা গলায় চেপে বসতেই যে বেশী হাত পা ছুঁড়ে সেই দ্রুত মরে। তাদের চোখ বিস্ফারিত হয়। নাক দিয়ে বেরিয়ে আসে রক্ত। অনেকে দ্রুতই মরে। অন্যরা বাঁচার শেষ চেষ্টা করে মরে যায়। সাহেবদের কাছে এই দৃশ্যগুলো খুব উপভোগ্য ছিল। তারা অট্টহাসি হাসতো, ঠাট্টা মস্করা করতো, মদ্যপান করতো এবং জুয়া খেলতো।

হডসন সাহেব এ ধরনের তামাশা দেখে সময় নষ্ট করতো না। তার মনে সব সময় বড় বড় চিন্তা ছিল। একদিন সে উইলসন সাহেব বাহাদুরের কাছে গিয়ে বললো, 'আমাকে দিল্লীর বাদশাকে গ্রেফতার করার অনুমতি দিন।' জঙ্গী লাট উত্তর দিলো, 'আচ্ছা, কিন্তু আমি তার কোন গোরা সৈন্য হারাতে চাই না।' হডসন বললো, 'আমি আমার শিখ সিপাহীদের সাথে নেব।' এরপর হডসন আমাকে বললো, 'নিহাল সিংহ, সবচেয়ে সাহসী পঞ্চাশ জনকে বাছাই করে এবং কাল সকালে 'বড় শিকারের' জন্য প্রস্তুত থাকো।'

সেদিন ছিল ২১শে সেপ্টেম্বর। আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ছে এবং গুড়িবৃষ্টির মত শিশির পড়ছে। আমি পঞ্চাশ জনকে বাছাই করলাম। এর মধ্যে লেহনা ও নাথাও ছিল। তাদের মসজিদের প্রবেশদ্বারের কাছে ঘুমানোর জন্য বললাম। ভোরের অন্ধকার থাকতেই ওদের জাগিয়ে দিলাম। কয়েকটি চাপাতি ও এক মগ চা পান করে ইউনিফর্ম পরে সিঁড়ির নীচে ঘোড়ার পিঠে উঠলাম। হডসন সাহেব এলো। তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে দু'জন মুসলমানও এসেছে। একজন সেই কানা রজব আলী। অন্যজনের পোশাক দেখে নবাবের মত মনে হচ্ছে। মাথায় মস্ত ফারের টুপি এবং সোনার কাজ করা পোশাক। আমার সাহেব অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে সম্বোধন করছে, 'মির্জা সাহেব' বলে। (পরে জেনেছিলাম যে, তার নাম মির্জা এলাহী বখশ এবং লোকটি বাদশাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিছুদিন আগে যার মৃত্যু হয়েছে তার শ্বশুর)।

মির্জা সাহেব হডসন সাহেবের কানে কানে কিছু কথা বললো এবং বিদায় নিলো। ঘোড়ার পায়ের খটখট, খটখট খুরধ্বনি তুলে আমরা ফৈয়াজ বাজার হয়ে দিল্লী দরওয়াজার বাইরে এলাম। হডসন সাহেব সবার সামনে। তার কাঁধে ঝুলছে বন্দুক। কানা রজব আলী তার পিছনে। কানার ঠিক পিছনেই আমি পঞ্চাশ ঘোড় সওয়ারের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রত্যেকের হাতে খোলা বর্শা। আমাদের গুলী ভর্তি বন্দুক কাঁধে ঝুলছে। আমাদের প্রত্যেকের কাছে দু'টি করে কৃপাণ একটি ঘোড়ার জিনের সাথে বাঁধা, আরেকটি কোমরবন্ধের সাথে। সূর্য যখন উঠছে আমরা তখন আগ্রা অভিমুখী রাজপথে। রাজপথের পার্শ্বে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসস্তূপ। সেগুলো দিল্লী থেকে পলায়নপর মানুষে পরিপূর্ণ। তারা বন্দুক ও তরবারি সজ্জিত। কিন্তু কেউ আমাদের কাছে আসতে বা একটি কথা বলার মত সাহস দেখালো না।

কানা রজব আলী এখন সাহেবের পাশাপাশি চলছে এবং সাহেবকে পুরোনো এই ভবনগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছে। হডসন সাহেবের এসবে মনোযোগ নেই। কিন্তু সে বলেই চলেছে 'সাহেব, ঐ যে ফিরোজ শাহের প্রাসাদের উপর একটি বৌদ্ধ স্তম্ভ।' আমার জানতে ইচ্ছে হলো, একজন মুসলমান বাদশাহ'র প্রাসাদের উপর একটি বৌদ্ধ স্তম্ভ কি করছে। পুরানা কিল্লার সুউচ্চ প্রাচীর অতিক্রমকালে কানা রজব আলী বললো, 'স্যার, এটি পুরানো কিল্লা এবং এ সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি প্রথমে নির্মাণ করেছিল আর্যরা এবং তখন এটি পরিচিত ছিল 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নামে। এখানে শের শাহ্ শূরীর নির্মিত একটি মসজিদ এবং সম্রাট হুমায়ুনের লাইব্রেরী আছে।' কিন্তু সাহেবকে কে বলবে যে, একটি হিন্দু কিল্লার মধ্যে মসজিদ থাকতে পারে না। আমি নিঃস্তব্ধ থাকি। বিশেষ করে হডসন সাহেব যেখানে কানা টাট্টুর কথায় মনোযোগ দিচ্ছে না। সূর্য যখন বেশ উপরে উঠেছে আমরা তখন উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটি বিশাল অট্টালিকার দরওয়াজায় উপস্থিত হলাম। বাইরে থেকে শুধুমাত্র একটি বিশাল শ্বেত পাথরের গম্বুজ দেখতে পাচ্ছি। কানা রজব আলী বললো, এটি হুমায়ুন বাদশাহর সমাধি সৌধ। বৃদ্ধ সম্রাট ও তার পরিবার এখানেই লুকিয়ে আছে।

কানার মুখে এখন আরো বেশী কথা ছুটছে 'সাহেব বাহাদুর। এটা ঈশা খানের মাযার। এবং তার ওপাশে যেখানে লোকজন ভিড় করে আছে একসময় সেটি পরিচিত ছিল আরব কি সরাই নামে। তারও পরে যেটি দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে সম্রাট আকবরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী আবদুর রহিম খান-ই-খানানের মাযার। সাহেব, আপনার পিছনের অট্টালিকাগুলো মহান শেখ নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযার। এই দরবেশের আশেপাশেই কবরস্থ আছেন বহু বাদশাহ, রাণী ও যুবরাজ।"

হডসন সাহেবের বিরক্তি ধরে গেছে। অধৈর্য হয়ে সে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ রজব আলী, অন্য কোন সময় তুমি আমাকে এসব সৌধ সম্পর্কে বলো। আমাদের হাতে এখন অনেক জরুরী কাজ। জলদি এ কাজ সারতে হবে। সারাদিন নষ্ট করার মত সময় নেই।

হডসন সাহেব ও কানা রজব ঘোড়া থেকে অবতরণ করে। আমিও অবতরণ করি তাদের ঘোড়ার রাশ ধরার জন্য। কানা রজব আলী বিশাল দরওয়াজার উপর করাঘাত করে। ভিতর থেকে আওয়াজ আসে, 'ওখানে কে?'

'কোম্পানী বাহাদুরের দূত মৌলভী রজব আলী। মহান বাদশাহর জন্য আমার একটি জরুরী পয়গাম আছে।'

বিশাল দরওয়াজার এক কোণের ছোট পাল্লাটা উন্মুক্ত হয়। একজন প্রহরী তার মাথা বের করে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠে, 'মহামহিম, হিন্দুস্থানের সম্রাট, বাদশাহদের বাদশাহ, পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া

বাহাদুর শাহ গাজীর কাছে কোম্পানী বাহাদুরের উকিল মৌলভী রজব আলীর আগমন ঘটেছে। মৌলভী রজব আলী। আপনাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া গেল।' রজব আলী ছোট্ট দরওয়াজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাথে সাথে দরওয়াজাও বন্ধ হয়।

হডসন সাহেব মাটিতে থুথু ফেলে। দরওয়াজার সামনে সে পায়চারি করতে শুরু করে। কারো সাথে একটি কথাও বলে না কিংবা আশেপাশের প্রাচীর ও ভবনশীর্ষ থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা জনতার দিকে ফিরেও তাকায় না। এতো জনতা, অথচ সূচপতন নিস্তব্ধতা। সহস্র লোকের এই নিরবতা আমাকে আতংকিত করে তুলে। আমার কানে শুধু ঘোড়ার লেজ নাড়ানো, ঘাড় দুলানো ও পেশাব করার শব্দ। কিছু কাকের কা কা রব। হঠাৎ ভেসে এলো লোকজনের বাকবিতন্ডার শব্দ এবং উচ্চকণ্ঠে ভেসে এলো 'নারায়ে তাকবীর' সহস্র কণ্ঠের সমবেত উত্তর এলো, 'আল্লাহু আকবর'।

আরো চীৎকার ভেসে এলো, 'মার ডালো ফিরিঙ্গো কো-ফিরিঙ্গিদের খুন করো।'

সহস্র জনতার বিরুদ্ধে, পঞ্চাশজন শিখ ও একজন গোরা কি করতে পারে। ইচ্ছে করলে ওরা আমাদের মাংসপিন্ড বানিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু হডসন সাহেবকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। তার জুড়ি কেউ নেই। তার পায়চারি অব্যাহত আছে এবং এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, সে একটি শব্দ ও শোনেনি।

আরো এক ঘন্টা কাটলো। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শীতল ঘামে আমার সর্বাঙ্গ সিক্ত। প্রাচীরের অপর পাশের কণ্ঠ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। হডসন সাহেব ঘোড়ার পিঠে উঠে। কানা রজব আলীর ঘোড়া একটি গাছে বেঁধে আমিও ঘোড়ায় উঠে বসি। হডসন পিস্তল বের করে গুলী ভরে নেয়। আমি বর্শা বাগিয়ে ধরি। ধীরে ধীরে বিশাল দরওয়াজার পাল্লা পিছনে সরে যায়। তিনটি পালকী। একটি আরেকটির পিছনে। উৎকণ্ঠিতভাবে তাকিয়ে থাকা জনতা তরবারি ও বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। কিছু মহিলা পালকীর চারপাশে ঘুরে বিলাপ করতে থাকে। তারা দেখে যে, হডসন সাহেব ও শিখ সওয়াররা প্রস্তরবৎ হয়ে গেছে। কানা রজব আলী সাহেবের কাছে এসে কিছু বলে। তারপর ফিরে যায় দ্বিতীয় পালকীর কাছে এবং মধ্যে থাকা কারো সঙ্গে কথা বলে। পালকী থেকে এক বৃদ্ধ নেমে আসে। লোকটি দীর্ঘদেহী। খুব হালকা এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তার দীর্ঘ পাকা দাড়ি। মাথায় বড় ফারের টুপি এবং পা পর্যন্ত দীর্ঘ ফার কোট। লোকটি সাহেবের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে মুখ তুলে তাকায় এবং জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি হডসন সাহেবের সাথে কথা বলছি?'

'জি হ্যাঁ, আমি মেজর হডসন। আপনি কি বাহাদুর শাহ?,

'ওই নামেই এই ভাগ্যহত লোকটি পরিচিত। হডসন সাহেব বাহাদুর, আমি কি তোমার নিকট হতে আমার, আমার স্ত্রী জিনাত মহলের এবং যুবরাজ জওয়ান বখতের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি পেতে পারি?'

'জি হ্যাঁ, জঙ্গী লাট উইলসন সাহেব বাহাদুর আপনাদের জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।' জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠে এ সময়।

হডসন সাহেব পিস্তল উঁচিয়ে সজোরে চীৎকার করে, 'সমবেত জনতা, তোমরা শুনে রাখো! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করো তাহলে আমি পালকীর তিনজন লোককে হত্যা করবো। বুঝেছো!'

কি ধৃষ্টতা! জনতা পিছু হটে যায়। বৃদ্ধ বাদশাহ তার তরবারি কোমর থেকে খুলে এবং কম্পিত হাতে তুলে ধরে। হডসন সাহেব ঘোড়া থেকে অবতরণ করে এবং তরবারিটি গ্রহণ করে আমার হাতে দেয়। কি অদ্ভুত তরবারি! সবুজ পাথর, সোনার বাট, তাতে খচিত মূল্যবান মণিমুক্তা! এরপর বাদশাহ'র পুত্র, একজন তরুণ, যার নাম জওয়ান বখত, শেষ পালকী থেকে নেমে এসে তার তরবারি সাহেবের হাতে তুলে দেয়। সাহেব সেটিও আমার হাতে দেয়। এটিও অপূর্ব সুন্দর তরবারি। সোনা, হীরা ও রুবির সমন্বয়। হডসন সাহেব পালকী তিনটি বাইরে আনার নির্দেশ দেয়। সম্মুখে পঞ্চাশ ঘোড় সওয়ার। এরপর পালকী। এরপর আমার সাহেব ও আমি। আমাদের পিছনে বিপুল জনতা। আমরা পিছনে তাকাই না, তাহলে হয়তো ওরা ভাববে আমরা পিছন থেকে গুলীর আশংকা করছি। আমার শিড়দাঁড়া দিয়ে শিরশির কম্পন উঠানামা করছে এবং আরো শীতল

ঘাম বইছে শরীরে। কিন্তু হডসন সাহেব। তার লাল মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। আমরা পুরানা কিল্লার ধ্বংসস্তূপ অতিক্রম করে এসেছি। জনতা তখনো আমাদের পিছু পিছু আসছে। পুরোনো ইন্দ্রপ্রস্থ কিল্লা থেকে হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাহী বেরিয়ে এলো। আমরা তাদেরকে গ্রাহ্য না করে পালকী বাহকদের গতির সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হলাম। আরো অর্ধক্রোশ আসার পর জনতা কমতে শুরু করলো এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা শুধুমাত্র পঞ্চাশজন শিখ সওয়ার ও হডসন সাহেব রইলাম। আমরা বন্দী হিসেবে নিয়ে চলেছি হিন্দুস্তানের সম্রাট, তার রাণী ও পুত্রকে। এ হচ্ছে মহান গুরুর অলৌকিক লীলা। দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশের পরিবর্তে আমরা বামদিকে সূর্যাস্তের দিকে গিয়ে তুর্কমেন ও আজমিরী দরওয়াজা, ডানদিকে কাবুলী দরওয়াজা অতিক্রম করে ডানদিকে কাবুলি দরওয়াজা দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলাম। হডসন সাহেব দিল্লীবাসীকে জানিয়ে দিতে চায় যে, তাদের সম্রাট, সম্রাজ্ঞী ও রাজপুত্র আমাদের হাতে বন্দী। কিন্তু রাস্তাগুলো জনশূন্য। শুধুমাত্র কুকুর মৃতদেহ ছিড়ে খাচ্ছে। কুকুরগুলো বারেক চোখ তুলে তাকালো। শকুনীরা নিরাসক্তভাবে একটু সরে আমাদের পথ করে দিলো। কোতোয়ালীর সামনে এখনো ছয়টি মৃতদেহ ঝুলছে। একঝাঁক কাক সেগুলো ছেকে ধরে ঠুকরাচ্ছে। আওরঙ্গের হাতে নিহত আমাদের নবম গুরুর স্মরণে নির্মিত গুরুদুয়ারা অতিক্রম করার সময় আমাদের কৃপাণ খুলে অভিবাদন জানালাম। আমি শিখ যুদ্ধ ধ্বনি তুললাম, 'বোলে সো নিহাল'। পঞ্চাশ ঘোড় সওয়ার সমস্বরে জবাব দিলো 'সত শ্রী আকাল'।

আমরা যখন লাল কিল্লার বাইরে উপনীত হলাম তখনো উজ্জ্বল দিন। একজন গোরা প্রহরী দরওয়াজার আড়াল থেকে প্রশ্ন করলো, 'ওপারে কে?'

'আমি মেজর হডসন, দিল্লীর সাবেক বাদশাহ বাহাদুর শাহ, তার বিবি জিনাত মহল ও পুত্র জওয়ান বখতকে বন্দী করে এনেছি। বন্দীদের হস্তান্তর করতে চাই।'

দরওয়াজা উন্মুক্ত হলো। হডসন সাহেব ও কানা রজব আলী পালকীর সাথে ভিতরে প্রবেশ করলো।

আমরা জুমা মসজিদে ফিরে এলাম।

বিশটি ছাগল জবাই করলাম। সেগুলো যখন পুড়ে কাবাব তৈরী করা হচ্ছিল আমরা তখন প্রচুর মদ্যপানে মশগুল ছিলাম। মাতাল হয়ে আমরা গান গাইতে শুরু করলাম। লোহনা একজন বৃদ্ধ সম্পর্কে গান শুরু করলো। লেহনা এই 'বুড্ডা বাবা' সম্পর্কে প্রচুর গান জানে। কিন্তু আমার কিসমত অন্যরকম। সাহেবের সহিস এসে বললো, সাহেব আমাকে লাল কিল্লায় তলব করেছে। মদ পান করে আমার বেসামাল অবস্থা, তবু তাকে অনুসরণ করলাম।

অশ্ব পৃষ্ঠে সাহেবের বাসভবনে গেলাম। সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করে দেখলাম, সকালে সমর্পিত তরবারি দু'টি মনোযোগ সহকারে পরখ করে দেখছে। লণ্ঠনের আলোতে তরবারির বাটের পাথরগুলো তারকার মত জ্বলছে। কি অপূর্ব কারিগরি! সাহেব বললো, একটিতে জাহাঙ্গীরের নাম খোদাই করা আছে। অন্যটিতে পারস্যের হামলাকারী নাদির শাহের। হডসন সাহেবকে খুব সন্তুষ্ট মনে হলো না। আমাকে বললো, 'এগুলোই মাত্র পেয়েছি উইলসন সাহেব বাহাদুরের নিকট হতে। একটি 'সাব্বাশ' পর্যন্ত নয়। আমার মনে হচ্ছে বাদশাহ ও তার পুত্রকে আমার হত্যা করা উচিত ছিল।'

'সাহেব, তুমি যদি আমাকে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিতে, তাহলে আমি ওদের দেহ থেকে মাথা পৃথক করে ফেলতাম।'

অধৈর্যভাবে সে উত্তর দিলো, 'আমি তা জানি, আমি জানি। আমার নিজ হাতেই তা করা উচিত ছিলো। কিন্তু সাদা চামড়ার মানুষের কথার সম্মান দিতে হবে। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্নতর হবে। বাদশাহর অন্যান্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের আটক করার অনুমতি আমি পেয়েছি। এই বদমাশগুলো মেম সাহেব ও তাদের সন্তানদের হত্যা করেছে। উইলসন সাহেব বলেছেন, এদের সাথে তোমার যা খুশী করো। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে আর বিরক্ত করো না। সুবেদার মান সিংহকে বলো, আগামীকাল একই সময়ে একশ' সওয়ার নিয়ে প্রস্তুত থাকতে। ঘটনা শেষ করে প্রচুর শরাব মিলবে।'

পরদিন ভোর রাতে লোকদের তৈরী করতে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। হডসন সাহেব আরেকজন গোরা ম্যাকডোয়েল সাহেবকে সাথে এনেছে। কানা রজব আলী তো আছেই। মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে আমরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেছি। রজব আলীর সাথে দুই সাহেব সামনে। আমি তাদের পরই। (আমি কানা রজব আলীর কানা চোখের পাশে বলে আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হচ্ছিল না।) আমাদের পিছনে দু'জন সুবেদার। এরপর একশ শিখ ঘোড় সওয়ার। তাদের পাগড়ীর প্রান্তদেশ বাতাসে দুলছে। বর্শার ফলা চকচক করছে সকালের সূর্যালোকে। রজব আলী আমার কাছে দিল্লীর প্রাচীর, ভবন সম্পর্কে বকবক করার চেষ্টা করলো না।

হুমায়ুনের সমাধিসৌধের উত্তর দরওয়াজায় আমরা উপস্থিত হলাম। আমরা পৌঁছামাত্র জনতা ভিড় করতে শুরু করলো। অনেকে এলো পার্শ্ববর্তী 'আরব কি সরাই' থেকে। কিছু নিজামুদ্দিন থেকে। ভবনের প্রাচীর ও ছাদ শীঘ্রই লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অনেকের হাতে বন্দুকও দেখা যাচ্ছে।

আবার রজব আলী সমাধিসৌধের প্রাচীরের মধ্যে গেল। আরো একবার আমরা ধ্বনি শুনলাম, 'আল্লাহু আকবর'। ধ্বনি ক্রমেই দরওয়াজার নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। ধীরে ধীরে দরওয়াজা উন্মুক্ত হলো। দু'টি বড় সড় ষাড়ে টানা একটি গাড়ী বের হলো। তিনজন লোক গাড়ীর উপরে বসা। কানা রজব আলী চাকার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গরু গাড়ীর পিছনে বন্দুক ও তরবারিধারী বদ চেহারার কিছু লোক। সাহেব দু'জন অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহন করে এবং গরু গাড়ির দিকে অগ্রসর হয়। হডসন সাহেব চীৎকার করে বলে, 'রজব আলী, এই তিনজন বন্দীর পরিচয় ঘোষণা করো।'

কানা রজব আলী সামনে এগিয়ে একজন বন্দীর উপর তার হস্ত স্থাপন করে বলে, 'মির্জা মোগল বাহাদুর'। লোকটি গাড়ী থেকে নেমে কম্পিত হাতে তরবারি এগিয়ে দেয়। ম্যাকডোয়েল সাহেব তরবারি গ্রহণ করে।

আরেক বন্দীর উপর হস্ত স্থাপন করে কানা রজব চীৎকার করে, 'মির্জা আবুবকর'। এই লোকটিও নেমে ম্যাকডোয়েল সাহেবের কাছে তার তরবারি অর্পণ করে।

'মির্জা খিজির সুলতান।'

তৃতীয় ব্যক্তিও পূর্বের দু'জনের নজীর অনুসরণ করে। তিনজনই গাড়ীতে উঠে বসে। জনতা উৎকণ্ঠার সাথে গোটা দৃশ্য অবলোকন করে। দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে, কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ক্রোধের গুঞ্জন ধীরে ধীরে ভয়ঙ্কর গর্জনে পরিণত হয়। গরুর গাড়ী সামনে অগ্রসর হতেই জনতা তরঙ্গের মত এর পিছু নেয়।

হডসন সাহেব ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে উঁচু করে ধরে এবং চীৎকার করে নির্দেশ দেয়, 'থামো'। জনতা থামে এবং নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। হডসন সাহেব পঞ্চাশজন সওয়ারকে গরুগাড়ীসহ সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়। ম্যাকডোয়েল ও হডসন জনতার মুখোমুখি এগিয়ে যায়। জনতা ধীরে ধীরে পিছুতে থাকে এবং সমাধিসৌধের দরওয়াজা পর্যন্ত যায়। হডসন সাহেব গগণবিদারী কণ্ঠে নির্দেশ দেয়, 'তোমাদের অস্ত্র মাটিতে ফেলে দাও'।

গুরুও কি অলৌকিক লীলা! তারা নিজ নিজ বন্দুক ও তরবারি মাটিতে নিক্ষেপ করে। এই অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে গরুগাড়িতে বোঝাই করতে দুই ঘন্টা লেগে যায়। আমার জীবনে এমন মুহূর্ত কখনো এসেছে বলে স্মরণ করতে পারি না। হডসন সাহেব বাহাদুরের মত মানুষও আর কখনো দেখিনি। লোকটি, আমি আগেই বলেছি লাখে একজন।

আমাদের অগ্রবর্তী দলকে ধরার জন্য আমি একটি তাজী ঘোড়ায় উঠি। গোটা পথের দু'পাশে সশস্ত্র ব্যক্তিদের দল। নগরীর যত নিকটবর্তী হচ্ছি দলগুলো তত বড় হচ্ছিল। বন্দীদের প্রহরা দিয়ে যে সওয়াররা যাচ্ছিল আমরা তাদের সাথে যোগ দিলাম। আমাদের ঘিরে এবং নগর প্রাচীর পর্যন্ত সমবেত সশস্ত্র জনতা চীৎকার করেই যাচ্ছিল 'আল্লাহু আকবার'। আমাদের দিকে তারা তরবারি দেখিয়ে আস্ফালন করছিল। আমি গুরুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, এ যাত্রা যদি আমার প্রাণ রক্ষা পায় তাহলে চাঁদনী চক গুরুদুয়ারাতে এক টাকা চার আনা দান করবো। গুরু আমার প্রার্থনা শুনলেন। হডসন সাহেব ঘোড়ার গতি দ্রুত করে বন্দীদের বহনকারী গরুর গাড়ীর কাছে এসে

থামার নির্দেশ দিলো। জনতার গুঞ্জন থেমে গেল। নগর থেকে অর্ধ মাইল দূরবর্তী দরওয়াজা আমরা অতিক্রম করলাম। আমাদের ডানে কানা রজব আলীর বর্ণনা অনুযায়ী সেই বৌদ্ধ স্তম্ভসহ একটি মুসলিম প্রাসাদের ধূসর-কালো ধ্বংসাবশেষ। এছাড়া সেখানে শুধু মানুষের মাথা আর মাথা। মাথার উপরে উঁচানো নাঙ্গা তরবারি ও বন্দুক। সূর্য প্রায় অস্তমিত। হডসন সাহেব হাত উঁচু করে অশ্ব ঘুরিয়ে দাঁড়ালো, সবার উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য, 'দিল্লীবাসীরা, শুনে রাখো।' দিল্লীবাসী শুনছে। হডসন চীৎকার করলো, 'আমাদের হাতে এই তিনজন বন্দী খুনী। তোমরা এখন কোম্পানী বাহাদুরের ন্যায় বিচার প্রত্যক্ষ করবে। তোমরা পিছনে সরে দাঁড়াও, দেখো এবং স্মরণ রাখো।'

জনতা পিছু হটে যায়। আমাদের ঘোড় সওয়াররা গরু গাড়ী ঘিরে বৃত্তাকারে দাঁড়ায়। হডসন সাহেব নির্দেশ দেয়, 'তোমরা তিনজনই গাড়ী থেকে নেমে নিজ নিজ পোশাক খুলে ফেল।'

তিনজন নির্দেশ প্রতিপালন করে। তাদের চেহারা হলদে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পোশাক খোলার সময় তাদের হাত কাঁপে। 'সব কিছু খুলতে হবে।' হডসন পুনরায় নির্দেশ দেয়।

তাদের পরনের প্যান্টের মত পাজামা খুলে পড়তে তাদের হাঁটু কাঁপে। এই মুসলমানগুলোর লিঙ্গের অগ্রভাগ যে কাটা তাই নয়, তাদের গোপন কেশগুচ্ছও মুন্ডিত। আমি অতীতে কখনো এমন করুণ দর্শন লিঙ্গ দেখিনি। মাথা কাটা লিঙ্গ যেন লজ্জায় ঝুলে আছে।

'এই যে, আবু বকর, তুমি সামনে এসে দাঁড়াও।' হডসন সাহেব নির্দেশ দেয়।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী স্বাস্থ্যবান একজন স্খলিত পদে একটু এগিয়ে আসে। আবু বকরের বাহুতে সাটানো একটি ধাতব অলংকার দেখিয়ে হডসন সাহেব বলে, 'নিহাল সিং ঐ বস্তুটি হাত থেকে খুলে নাও'।

আমি সেটি খুলে আমার পকেটে রাখি।

'তোমার বন্দুক আমার হাতে দাও।'

আমার বন্দুক সাহেবকে দেই।

আবুবকর করজোড়ে মিনতি করে, 'সাহেব, মত মারো, আমাকে প্রাণে মেরো না।'

হডসন সাহেব বক্ষ সোজা বন্দুক তাক করে। 'ঠাস'। আবু বকর চীৎকার করে, 'ইয়া আল্লাহ' এবং রক্তস্রোতে পতিত হয়।

জনতা আতংকে বোবা হয়ে গেছে। কোন একটি লোকেরও নড়াচড়া নেই। অপর দুই বন্দী জীবিতের চেয়েও অধিক মৃত, যখন হডসন তাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলী করে।

তিনটি মৃতদেহ ধূলায় পড়ে আছে। ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। হা করা মুখ থেকে ফেনা বেরুচ্ছে। চোখ ধূসর মার্বেল পাথরের মত হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার সশস্ত্র জনতা যারা এই মৃত্যুদন্ড অবলোকন করেছে তাদেরকে আমাদের পদপ্রান্তে শায়িত মৃতের মতই মৃত হলে মনে হচ্ছে।

সুবেদার মান সিংহ তার কৃপাণ উচিয়ে ধ্বনি দেয়, 'জো বোলে সো নিহাল'। আমরাও কৃপাণ তুলে ধরে উত্তর দেই, 'সত শ্রী আকাল।'

মৃতদেহ তিনটিকে গরুগাড়ীতে তোলা হয়। আমরা নগরীর দিকে যাত্রা শুরু করি। সূর্য কিরণ লাগার পূর্বেই যেমন শিশির নিঃশেষিত হয়, আমাদের সামনে উপস্থিত জনতাও সেভাবে হ্রাস পেতে থাকে। আমরা দরিয়াগঞ্জ দিয়ে অগ্রসর হই। চাঁদনী চকে বামে মোড় নিয়ে আমাদের গুরুদুয়ারায় আসি। গুরুদুয়ারার সিঁড়িতে মৃতদেহ তিনটি নিক্ষেপ করি। জুমা মসজিদে আসি মদ পান ও বকরীর মাংস খেতে। লেহনা তার বুড্ডা বাবার গান ধরে যে একটি উষ্ট্রীর সাথে সঙ্গম করতে চেয়েছিল।

পরদিন সকালে দারুণ সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য হডসন সাহেবকে অভিনন্দন জানাতে যাই। তার কক্ষে প্রবেশ করে স্যালিউট দেই। সে চিঠি লিখছিল। (হডসন সাহেব তার মেম সাহেবের কাছে প্রতিদিন চিঠি লিখে)। যেন কোন কিছু ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে সে বলে, 'কি খবর নিহাল সিং!' আমি কোন উত্তর না দেয়ায় জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি চাও?'

'সাহেব, তোমার বাহাদুরির কারণে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাতে এসেছি'।

হডসন মাথা নাড়ে এবং লিখা চালিয়ে যেতে থাকে, যেন আমি সেখানে নেই। আমি দাঁড়িয়ে

আছি, জানি না যে, এরপর কি করতে হবে। তবু বলি, 'কোন কিছুর জন্য কি আমাকে সাহেবের প্রয়োজন? সে চিঠিটি খামে ভরে মুখ বন্ধ করে আমার হাতে দিয়ে বলে, 'ডাক।' আমি চিঠি হাতে নেই। সহসা তাকে একটু আনন্দিত মনে হয়, 'সুবেদার মান সিংহকে বলো তার সওয়ারদের জানাতে যে, সাহেব খুব খুশী হয়েছে। তারা যতটা চায় মদ দাও। কিছু দিনের জন্য আর কোন কাজ নয়।'একটু থেকে আবার বলে, 'শিবিরে তারা কি বলাবলি করছে, বলো তো শুনি।'

'সাহেব প্রতিবার তোমার নাম মুখে আনতে লোকজন বলে, 'বাহ, বাহ।'

হডসন সাহেব সন্তুষ্ট। তখন আমি তাকে জুমা মসজিদ ছেড়ে আসার মুহূর্তে শোনা একটি গল্প সম্পর্কে বলি। 'সাহেব, তুমি যে তিনটি লোককে গুলী করলে তাদের মাথা কেটে বৃদ্ধ বাদশাহর কাছে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে, এ কথা কি সত্য? তিনি কি বললেন?'

হডসন সাহেবের মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো। আমার চোখে চোখে তাকালো, 'নিহাল সিং' তুমি কোথায় এই গুজব শুনেছ?'

'লোকজন বলাবলি করছে, সাহেব।'

হডসন সংক্ষেপে কথা সারে। 'শোন। সাহেবরা সভ্য মানুষ। তারা হিন্দুস্থানের নেটিভদের মতো নয়। তারা লোকজনের মাথা কেটে তা তাদের আত্মীয়দের সামনে থালায় করে উপস্থিত করে না। কোম্পানী বাহাদুর ন্যায়পরায়ণ-শক্তিশালী, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ। বুঝলে!'

'জি হুজুর' আমি উত্তর দেই। সাহেবকে স্যালিউট দিয়ে আমি জুমা মসজিদে ফিরে আসি।

বাহাদুর শাহ জাফর

আমাদের কুঠুরীতে একজন দূত প্রবেশ করে আমার জ্ঞাতি ও সমর্থকদের মৃত্যুর কথা অবহিত করে। আমার দুই পুত্র মির্জা মোগল ও মির্জা খিজির এবং দৌহিত্র মির্জা আবু বকরকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। আমি কোন প্রতিবাদ করলাম না। কিন্তু একটি দরখাস্ত করলাম যে, আমার নিকট হতে উদ্ধারকৃত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করেও যাতে তাদের যথাযথ দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। মির্জা মোগল, মির্জা খিজির ও মির্জা আবু বকরের মৃতদেহ সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি সংলগ্ন স্থানে কবরস্থ করা হয়। ঝাজ্জার ও ফররুখনগরের দুই নবাব, যাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে, তাদেরকে মেহরুলিতে হযরত কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযার সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। বল্লভগড়ের রাজা বাহাদুরকেও ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল। হিন্দু হওয়ার কারণে তাকে যমুনা তীরবর্তী নিগমবোধ শ্মশানে দাহ করা হয়। আমার অন্যান্য পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দৌহিত্রদের মধ্যে যারা নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না পেলেও সম্ভবতঃ তাদেরকে নিজামুদ্দিন বা মেহরুলিতে দাফন করা হয়েছে। সাহেবদের দ্বারা গুলীতে বা ফাঁসিতে নিহত হাজার হাজার লোকের মধ্যে আমার বন্ধু কবি শেখ ইমাম বখশ শা'ভাই ও তার দুই পুত্রও ছিল। কেউ জানে না সাহেবরা তাদের মৃতদেহ নিয়ে কি করেছে।

শরতের আকস্মিক তুফান উদ্যানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো, যা এক সময় আমার সাম্রাজ্য ছিল। এই ঝড়ে প্রতিটি বৃক্ষ উৎপাটিত হলো। আমার মনের শান্তি বিনষ্ট হলো। বেঁচে থাকার ইচ্ছাও তিরোহিত হলো। বন্দী পাখী যেমন খাঁচায় পাখা ঝাপটায়, আমিও অনুরূপ ছোট্ট কুঠুরীর প্রাচীরে মাথা ঠুকি এবং ভাগ্যের দোষ দেই। এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্বকে মনে হতো পুষ্পোদ্যান, যেখানে বিকেলের সূর্যতাপে ফুলের কুঁড়ি উষ্ণতা লাভ করতো তার সৌন্দর্যের ভান্ডারকে বিকশিত করার জন্য। সেই বিশ্বই এখন শত সহস্র গলিত শবের দুর্গন্ধে বিষিয়ে উঠেছে। এখানে একটি নগরী ছিল যা দিবাভাগে সূর্যের এবং রাতে চন্দ্রালোকে স্নাত হতো। এখানে একটি নগরী ছিল যেখানে বেহেশতের হুরীদের মতো সুন্দরী রমণীরা বাস করতো। কে এই নগরীকে ধ্বংস করলো? কে এই নগরীকে লুণ্ঠন করলো? এই নগরী ছিল দিল্লী, বিশ্বের সকল নগরীর রাণী, আর এখন হয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিচ্ছিন্ন। 'হে জাফর, কি দুর্যোগ এসেছিল? অথবা তোমার নিজের যৌবন কি পলায়ন করেছে?'

আমাদের সথে যে আচরণ করা হয়েছে ও হচ্ছে সে কাহিনী লিখতে অশ্রুতে পরিপূর্ণ একটি কালির কূপের প্রয়োজন হবে। সকল প্রহরে লোকজন জানালা দিয়ে উঁকি মারে, যেন আমরা কোন ধরনের জন্তু। সাহেব দলের দেখার সুবিধার্থে সহসা কুঠুরীর দরওয়াজা খুলে দেয়া হয়। আমার

বিবি জিনাত মহল দেয়ালের দিকে ফিরে মুখ লুকায়। প্রত্যেকটা সাদা চামড়ার পুরুষ ও নারীকে সালাম জানাতে হয় দাঁড়িয়ে। তারা বিদ্রূপ করে, 'তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হতে চেয়েছিলে? হয়েছো কি?' কখনো কোন তরুণ গোরা ছাগলের মতো আওয়াজ করার চেষ্টা করে। 'বৃদ্ধ, কোথায় তোমার তরুণী স্ত্রী,' তারা জিজ্ঞেস করে। আল্লাহর ইচ্ছা হিসেবেই আমি এই অপমান সহ্য করি।

কলম ও কাগজের জন্য আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়। আমার হুক্কার কাঠকয়লার টুকরা রক্ষা করেছিলাম এবং কুঠরীর প্রাচীরকে ব্যবহার করি শ্লেট হিসেবে। সময় কাটাই ইবাদতে এবং কবিতা রচনা করে।

আমার তরুণ বয়সে একজন প্রেমিকার বন্দীদশা ও তার প্রেমিক কর্তৃক লাঞ্ছনার অভিযোগ সম্পর্কে একটি কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল 'যা কিছুটা এ রকম ঃ

"আমার প্রিয় কারারক্ষক কেন লাঞ্ছনা করে না
আল্লাহ যেন কাউকে কারো অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত না করেন।"

এই দু'টি পংক্তি কতটা উপযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ করে কারারক্ষক যেখানে প্রেমিক নয়, বরং দুশমন!

সাদা চামড়ার মানুষগুলোর কথা শীঘ্রই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তারা আমাদেরকে বর্বর বলে উল্লেখ করলো, কারণ আমাদের সিপাহীরা তাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে। কিন্তু কিছু লোক তো জানে যে, আমি নিজে এই হত্যাকান্ড বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। সাহেবরা আমার কথা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলো। তাদের তিন ডজন লোক হত্যার পরিবর্তে তারা তিন ডজনের হাজার গুণ অধিক মানুষকে হত্যা করেছে। দূষিত বীর্যজাত, জুতা লেহনকারী কানা রজব আলী কর্তৃক আমাকে দেয়া আশ্বাস সত্ত্বেও আমাকে বিচারের সম্মুখীন করা হলো। সাহেবরাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনকারী, আমার আইনজীবী ও বিচারক। আমার নিমকখোর ব্যক্তি-হাকীম আহসান উল্লাহ, দরবেশ হাসান আসকারী, রজব আলী, গোলাম আব্বাস, মুকুন্দ লাল ইত্যাদিকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হয়েছে। তাদেরকে যা বলার জন্য শিখানো হয়েছে, তোতা পাখীর মত তাই বলছে।

যারা আমার বিরুদ্ধে জিহ্বা ঘুরিয়ে এখন কথা বলছে তাদের মধ্যে একজনের ভূমিকা আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। সে হচ্ছে অসবর্ণের আয়েশা ওন্ডওয়েল। এই মহিলা ও তার তিন কন্যার জীবন রক্ষার জন্য আমি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। এই আয়েশার মাতা একজন গোরা স্বামী গ্রহণ করেছিল। আয়েশা মুসলমান হিসেবেই বড় হয়েছিল। কিন্তু তার পিতার দিক হতে উজ্জ্বল চামড়ার অধিকারী এবং তার নিকট হতে ইংরেজীতে গিটগিট করতে শিখেছিল। সাদা চামড়া হিসেবেই সে নিজেকে বিবেচনা করে এবং এক বৃদ্ধ গোরাকে বিয়ে করে। আমি তার স্বামীকে রক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু সে কোরআনের আয়াত পাঠ করতে পারায় এবং তার কন্যারা 'কলেমা' উচ্চারণ করতে পারায় আমি তার পক্ষ হতে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম সে তার সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু তার উভয় বিশ্বাসের প্রতিই আস্থাহীন প্রমাণিত করলো নিজেকে-মুসলিম ও খৃষ্টান বিশ্বাস। আল্লাহ তাকে শাস্তি দিন!

আল্লাহ আমার একমাত্র সাক্ষী। কোন একজন মানুষ আমার পক্ষে মুখ খোলার সাহস দেখালো না। আমার বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগেই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। আমার পূর্বপুরুষ যে ভূখন্ড বিজয় করে তিনশ' বছর ধরে শাসন করেছে সেই দেশ থেকে আমাকে নির্বাসনের শাস্তি বিধান করা হলো। এর চাইতে বরং আমার মৃত্যুদন্ড বিধান করলে দিল্লীর পবিত্র ধুলিকণার সাথে আমার অস্থি মিশে যাওয়া আমার কাম্য ছিল।"

"কিতনা বদনসীব জাফর দাফন কি লিয়ে,
দো গজ জমিন ভি মিল না সাকে কুওয়ে ইয়ার মে।"

-জাফর, তুমি কতই দুর্ভাগা যে দাফনের জন্য নিজের প্রিয় জন্মভূমিতে দুই গজ মাটিও

মিললো না।"

আমার চৌদ্দজন বিবি ও পুত্র জওয়ান বখত আমার নির্বাসনের দুর্ভাগ্যে শরীক হতে সম্মত হলো। কিন্তু তাদের অনেকেই পরে এটা সেটা বাহানা দিয়ে তাদের মন পাল্টালো এবং হিন্দুস্থানের সীমানা অতিক্রম করার পূর্বেই তারা আমাকে পরিত্যাগ করলো। আমার প্রিয়তমা বিবি জিনাত মহল আমার পাশেই রইলো। দুঃখের বিপুল বোঝার মধ্যে সে ছিল আমার সহযোগী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নবী করিম (সঃ) তার বিবি খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বলতেন তা আমার স্মরণ হলো ঃ "আমি যখন দরিদ্র ছিলাম তখন সে আমাকে বিত্তবান করেছে, গোটা বিশ্ব যখন আমাকে পরিত্যাগ করেছে তখন সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে যখন মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে সে তখন আমাকে বিশ্বাস করেছে।"

নির্বাসনের পথে আমি কবিতা রচনা করলাম ঃ

"আমার প্রিয় এতো নিপীড়িত?
আমি নিজের ভূখন্ড ছাড়তে বাধ্য হলাম
জ্বলন্ত বাতি থেকে যেমন মোম গলে পড়ে
তেমনি আমি জীবনের বৃত্ত ছেড়ে যাচ্ছি
আমার চোখ হতে অশ্রু ঝরছে
মালী তার উদ্যানে খেলতে নিষেধ করেছে
আমি এসেছিলাম হাসি নিয়ে
বিদায় নিচ্ছি বিলাপ করে।"

১৭

ভাগমতী

আমার উপর ভীষণ চটে আছে ভাগমতী এবং খুব হতাশ আমার ব্যাপারে। তার কথা হচ্ছে, 'পাঞ্জাবীরা যখন দিল্লীতে আসে তখন তাদের পকেট সম্পূর্ণ খালি থাকে। এখন তাদেরকে দেখুন! গোটা শহরের মালিক বনে গেছে তারা। নিজেদের জন্য প্রাসাদ তৈরী করেছে। তারা তন্দুরী চিকেন খায় এবং হুইস্কি পান করে। আমদানি করা মোটর গাড়িতে তাদের মোটা স্ত্রীদের নিয়ে দিল্লীর হাওয়া খেতে বের হয়। আর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেই একই ছোট ফ্ল্যাট, সেই লক্কড়ঝক্কড় পুরনো মোটর গাড়ী, যার হর্ণ ছাড়া প্রতিটি অংশই শব্দ উৎপন্ন করে। এমনকি কয়েক বছর পূর্বে আপনার নিজের গ্রাম থেকে যারা এসেছে, তারাও দিল্লীর অর্ধেকটার মালিক বনে গেছে এবং তারা কোটিপতির মত বসবাস করে। আপনি সারাদিন পত্রিকার উপর মরা মাছি খুটে কি পান? বহু বছর ধরে আপনি আমাকে একটি শাড়ি বা চুড়িও কিনে দেননি।'

ভাগমতী যখন এমন সুরে কথা বলে তখন চুপচাপ থাকাই উত্তম। কিন্তু কখনো কখনো আমার নীরবতা তাকে আরো কথা বলতে প্ররোচিত করে। 'আপনি কিছু বলছেন না কেন? কিছু করছেন না কেন? সারাদিন আর্মচেয়ারে বসে ও বায়ুত্যাগ করেই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন।'

এই খোঁচা খেয়ে আমি ক্ষুব্ধ হই। জোরে ধমক দেই, 'শাট আপ! লোকে তোমার উপর উপগত হলেই পয়সা পেয়ে যাও। আর কি চাই তোমার?' সে আমার চোখে চোখ রেখে মজা করে বলে, 'এখন ওসবও খুব হচ্ছে না। আর পয়সার কথা। দরজার বাইরে যে বুদ্ধু সিং সেও প্রতিবার তার পাওনা চায়। যখন যাই, সে বলে, 'উনি তোমাকে পান বিড়ির জন্য কি দিয়েছেন?' আপনি আমাকে যা দেন, তা দিয়ে পান বিড়ি কেনার পয়সাই হয়। আমার সত্য কথা আপনাকে আঘাত দিচ্ছে বটে। কিন্তু আমি বলছি আপনার ভালোর জন্য। আমি বলি, কিছু একটা ধান্দা করুন, ঠিকাদারী ব্যবসা, রেডিমেড গার্মেন্টস রফতানি। পত্রিকার জন্য লেখালেখির চাইতে অনেক টাকা কামাতে পারবেন এবং মেম সাহেবদের কুতুব মিনার দেখাতে নিয়ে যেতে পারবেন।

'তার কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু আমার এই বয়সে কি করে নতুন ধান্দা শুরু করবো।' যার কিছুই আমি জানি না। তাছাড়া ধান্দা করার মত অর্থই বা পাবো কোত্থেকে? আমি নীরবতায় ডুবে যাই। নীরবতা এবং মুখ গোমড়া করে থাকা এ ধরনের আক্রমনের বিরুদ্ধে উত্তম প্রতিরোধ। একটি বই তুলে নিয়ে পড়ার ভান করি। আমি চাচ্ছি সে চলে যাক এবং আমি একা থাকি। দিল্লীর ব্যাপারে আমি যেমন হতাশ, ভাগমতীকে নিয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখনকার কোন এক দিনে যদি আমার হাতে প্রচুর টাকা আসতো তাহলে লন্ডন অথবা নিউইয়র্কের টিকেট কেটে ভাগমতীকে কিছু না জানিয়ে মধ্যরাতে দিল্লী থেকে কেটে পড়তাম। ভাগমতী আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে নেয় এবং আমার সামনে মেঝের উপর বসে পড়ে। সে আমার হাঁটুর উপর তার হাত রেখে বলতে থাকে, "আপনি আজকাল রেগে থাকেন। আমি যখনই কিছু বলি আপনি আমার সাথে 'গোসসা' করেন। আমার উপর আপনার রাগ কখনো কমে না। আপনার কি হয়েছে?'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি। উত্তর দেই না। আমি জানি যে, সে যা বলছে, তা সত্য। দুই হাতে সে

পা টিপতে শুরু করে। এতে খুব আরাম লাগে এবং অনুভূতি জেগে উঠে। আমি জানি, যুদ্ধে আমি হেরে গেছি। ভাগমতীর মত আরেকটি নারী কোথায় খুঁজে পাবো, যে আমার উত্তপ্ত মেজাজ শীতল করতে নিজের মর্যাদা বিসর্জন দেবে? সে আমার দুই পা তার কোলে তুলে নেয় এবং পায়ের তলা মালিশ করতে থাকে। মালিশ করায় তার দক্ষতা অতুলনীয়। সে জানে আমি মালিশ উপভোগ করতে শুরু করেছি। যৌন ক্রিয়ার চাইতেও মালিশ অধিক উপভোগ্য। কখনো এমন হয় যে, সে আমার মাথায় তেল ডলে তার শক্ত আঙ্গুল দিয়ে খুসকির চুলকানি দূর না করা পর্যন্ত আমার যৌনাকাংখা জাগ্রত হয় না। মাথার পরই আমার স্পর্শকাতর অঙ্গ হচ্ছে পা। ভালোভাবে পা মর্দনেও আমি দ্রুত চেগিয়ে উঠি। আমি যদি ঘুমিয়ে না পড়ি তাহলে মর্দনকারিনীর সাথে শয্যায় গমনের মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটাই। আমার অস্থির স্নায়ু শিথিল হয়ে আসে। আমার রাগ নিঃশেষিত হয়। আমি ভাগমতী ও দিল্লী থেকে বিদেশে পালানোর উদ্দেশ্যে আর টিকেট নিতে চাই না। আমি তো বলেছি, একবার কেউ যদি তাদের খপ্পরে পড়ে তাহলে উদ্ধারের আর আশা থাকে না।

১৮

ভারতে বৃটিশ শাসনের অন্তিমলগ্ন

আমাদের দেউড়ী ঘরের প্রাচীরে দু'টি রঙ্গিন চিত্র আছে। ঘরটি আমাদের বাড়ীর প্রবেশ পথ এবং পুরুষ অভ্যাগতদের জন্য বৈঠকখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমার বাবা কাঠের যে পাটাতনটিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে উপবেশন করে, তার উপর যে ছবিটি সেটি রাণী ভিক্টোরিয়ার। দেয়ালে রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবির মুখোমুখি ছবিটি গুরু নানকের। প্রতিদিন সকালে মা তার প্রার্থনা শেষ করে দু'টি আগরবাতি জ্বেলে। একটি করে আগরবাতি উভয় ছবির সামনে স্থাপন করে করজোড়ে ভক্তি প্রদর্শন করেন। প্রথমে গুরুকে, পরে রাণীকে। এবং প্রতি সন্ধ্যায় আমার পিতা তার প্রার্থনা সেরে রাণীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে উচ্চস্বরে বলেন, 'ঈশ্বর আমাদের সম্রাজ্ঞীকে অনুগ্রহ বর্ষণ করুক। তার শাসন দীর্ঘজীবী হোক এবং তার প্রজাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোক। আমরা যাতে চিরদিন অনুগত ও সন্তুষ্ট থাকতে পারি।"

১৯০১ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া মৃত্যুবরণ করলে আমরা দু'দিন দু'রাত ধরে অবিরামভাবে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করলাম এবং প্রার্থনা করলাম যাতে আমাদের গুরুর পাদপদ্মে তার আত্মার স্থান হয়। যখন তার পুত্র এডওয়ার্ড রাজমুকুট ধারণ করলেন আমরা সেই আনন্দে 'ভাই চা'রার' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করলাম। নয় বছর পর যখন সম্রাট এডওয়ার্ড মারা গেলেন তখন আরেকবার আমরা অবিরাম গ্রন্থ পাঠ করলাম। কিছুদিন পর পঞ্চম জর্জকে হিন্দুস্তানের সম্রাট ঘোষণা করা হলে আমরা মিষ্টি বিতরণ করে উপলক্ষটা পালন করলাম। আমাদের পরিবার গুরুর প্রতি যতটা উৎসর্গকৃত ছিল, তেমনি আমাদের ইংরেজ শাসকের প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম, কারণ আমরা তাদের নিমকখোর।

১৯১১ সালের ২রা ডিসেম্বর রাজা জর্জ ও রাণী মেরীকে বহনকারী জাহাজ বোম্বে বন্দরে ভিড়লে বাবা ও আমি ট্রেনযোগে দিল্লীতে পৌঁছলাম। তিনি আমাদের শাসককে 'দরশন' ও অট্টালিকা নির্মাণের ঠিকাদারী লাভের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। কয়েক বছর ধরে তিনি নির্মাণ কাজের ঠিকাদারীতে নিয়োজিত আছেন। তিনি পর্বত গাত্রে সুড়ঙ্গ খনন ও কালকা ও গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলার মধ্যে রেলপথ স্থাপন করেছেন। কিন্তু পরে তার ধারণা জন্মেছে যে, পর্বতে গর্ত খোড়ার চেয়ে অট্টালিকা নির্মাণের মধ্যেই অধিক অর্থ রয়েছে। স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা দেয়ার পূর্বেই তিনি আমাকে পড়াশুনা শেষ করতে বাধ্য করেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে' অর্থের জন্য। অর্থ বানানোর জন্য তোমার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, কি করে যোগ, বিয়োগ, গুণ করা যায় এবং সরল ও যৌগিক সুদের হিসাব করা যায় তা জানা।-তুমি তো এসব শিখে ফেলেছো। অবশিষ্ট শিক্ষা একেবারেই আলতু-ফালতু। আমি যখন প্রতিবাদ করলাম যে, কি করে ইংরেজদের মত ইংরেজী বলা যায় আমি তা শিখতে চাই তখন তিনি খুব রাগান্বিত হয়ে আমাকে বললেন, 'ভারুয়া'। এটি তার সবচেয়ে প্রিয় গালি। যখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এ কথা বলে তিনি আমার অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছেন, তখন ভদ্রভাবে যোগ করলেন যে, যেসব হিন্দুস্তানী ইংরেজদের মত ইংরেজী বলে, ইংরেজরা তাদের পছন্দ করে না। বরং তারা টুটি ফুটি ইংরেজীতে (ভাঙ্গা ইংরেজী) বলতে পারা লোকদের পছন্দ করে।

আমার বাবার মেজাজ আরো খারাপ যাতে না হয়, সে জন্য আমি আর কথা বাড়াই না। তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, চৌদ্দ বছর বয়সে আমি যা কিছু শেখার সব শিখে ফেলেছি তখন

আমাকে স্কুল ত্যাগ করে তার ঠিকাদারী ব্যবসায় যোগ দিতে হলো। আমার বয়স যখন সতের তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমার বিয়ে করার উপযুক্ত বয়স হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের তের বছর বয়স্কা এক বালিকাকে আমার স্ত্রী হওয়ার জন্য পছন্দ করলেন। তার বয়স আঠার হওয়ার পূর্বেই (আমার বয়স বাইশ বছর) সে আমাকে দু'টি পুত্র সন্তান দিলো। এরপর আমার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, স্ত্রী ও পুত্রদের গ্রামে রেখে আমাকে ভাগ্যান্বেষণে তার সাথে দিল্লীতে যেতে হবে।

দিল্লীর মত বিশাল ও সুন্দর শহর আগে কখনো দেখিনি। বিশেষ করে তখন শহরটি আরো বড় ও আরো জাকজমকপূর্ণ লাগছিল। কারণ পাঁচ শতাধিক রাজা ও মহারাজা তাদের সাঙ্গপাঙ্গসহ দিল্লীতে আস্তানা গেড়েছে। মহান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে 'দরশনের' জন্য দূর প্রদেশগুলো থেকে শত সহস্র সাধারণ মানুষ দিল্লীতে এসেছে। থাকার জায়গা খুঁজতে আমাদের তিন দিন লাগলো। ডাফরিন ব্রীজের নিকটে এক বায়োস্কোপের পিছনে একটি পুরোনো বাড়ির দোতলায় দু'টি কামরা আমরা ভাড়া করলাম। এই ব্রীজের নীচ দিয়ে ট্রেন দিল্লী-পাঞ্জাব, দিল্লী-রাজপুতানা, দিল্লী-মধ্য ভারতের মধ্যে যাতায়াত করছে। আমরা দরবারের প্রস্তুতি দেখার জন্য বেরুবার আগেই খাটিয়া, চেয়ার, টেবিল ক্রয় করলাম।

নগরীর উত্তরে পূর্ব দিকে যমুনা নদী হতে পশ্চিমে শালিমার গার্ডেন ছেড়ে পঁচিশ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত এলাকা জুড়ে স্থাপিত কিংসওয়ে ক্যাম্প ৪০ হাজার তাবুর এক বিশাল নগরী। সারা দিন জুড়ে সামরিক কুচকাওয়াজের অনুশীলন, সুসজ্জিত হাওদাধারী হাতিকে হাঁটু গেড়ে বসে শুড় উঁচু করে স্যালিউট দেয়ার চর্চা করানো হচ্ছে। মহারাজা ও তাদের পুত্রদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে শিখানো হচ্ছে রাজা ও রাণীর সামনে কি করে কুর্ণিশ করতে হবে। প্রতিটি মুহূর্তের কর্মসূচী বারবার ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ, তার প্রধান উপদেষ্টা ম্যালকম হেইলে পরীক্ষা করে দেখছেন। ঘোড়ার পিঠে উঠে খুটিনাটি যাচাই করছেন। তারা বললেন যে, দরবারের কার্যধারায় যাতে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে সে জন্য গত মাসে ৯০ হাজার ইঁদুর মারা হয়েছে। যে অ্যালার্ম ঘড়িটা আমার বাবার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতো ১৯১১ সালের ২রা ডিসেম্বর ভোর চারটায় সেটি বেজে উঠলো। তখন প্রচন্ড শীত। বরফ শীতল পানিতে মুখ ধোয়ার সময় আমার দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছিল। গত সন্ধ্যার রেখে দেয়া শক্ত চাপাতি দ্রুত গিলে অতিরিক্ত মিষ্টি গরম চা পান করে আবছা অন্ধকারের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। রাজা ও রাণীর ট্রেন ডাফরিন ব্রিজের নীচ দিয়ে অতিক্রম করার বহু পূর্বে আমরা ব্রিজ অতিক্রম করলাম। এ পথেই তার ট্রেন দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছবে। কারণ পরে সেটি কোন দুর্ঘটনার আশংকায় পুলিশ ঘিরে ফেলবে।

আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্য বিপুল জনতার স্রোতের সাথে সাথে প্রায় তিন মাইল পথ হাঁটতে হলো। কিংসওয়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি রাস্তাগুলো উজ্জ্বল আলোতে সাজানো। রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সময়ের মধ্যে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেলাম। উজ্জ্বল সূর্য উদিত হলো খোলা দিগন্তে। দিগন্তের এক প্রান্তে লাল গালিচায় আচ্ছাদিত একটি পাটাতন। শামিয়ানার নীচে পাটাতনের উপর দু'টি সিংহাসন। খোলা চত্বরের চারদিকেই বিভিন্ন পর্যায়ের চেয়ারের সারি। বেষ্টনীর মধ্যে লক্ষাধিক লোক তো হবেই। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, দিল্লী ছাড়া এই ভারতের কোথায় এতো সুশৃংখল ভদ্রলোক দেখা যাবে? শেতাঙ্গ সৈন্যরা লোকদেরকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসার ব্যবস্থা করছে। কেউ তাদের একটি প্রশ্ন করতে সাহসী হচ্ছে না। কোন চীৎকার নেই। ঠেলাধাক্কা নেই। সারাক্ষণ বাজছে সামরিক বাদ্য। পিতলের ব্যান্ড বাজানো থামলে ব্যাগপাইপের সুর ভাসছে। সেটি শেষ হলে শুরু হচ্ছে ড্রামের বাজনা। সহসা ব্যান্ড থেমে গেল। দূর থেকে আমরা শুনলাম একুশবার তোপধ্বনি। রাজা ও রাণী দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছেছেন। এক ঘন্টা পর আমাদের কানে নগরীর দিক থেকে জনতার গর্জন ভেসে এলো, যা ক্রমশঃ নিকটতর হচ্ছে। আমরা অনুভব করলাম যে, রাজকীয় শোভাযাত্রা এগিয়ে আসছে। ঘন্টাধ্বনি করে হাতীর একটি সুসজ্জিত দল এগিয়ে আসছে, যা প্রথমেই দৃষ্টিতে এলো। সামরিক বাদক দল তার পশ্চাতে। তাদের অনুসরণ করে এলো পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী বাহিনী, আরো বাদক দল এবং পিছনে আরো যাত্রী। আমি হাতীর প্রতিটি হাওদার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছি যে, ছবিতে রাজা ও রাণীর ছবি দেখেছি তাদের চিনতে পারি কিনা। হাতীগুলো সামনে দিয়ে

চলে গেলো। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রাজা ও রাণী কোথায়? তিনিও তাদের দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন। হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘদেহী একজনকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ঐ যে লাট সাহেব।' আমার বাবার পাশে বসা এক লোক বললো, 'লর্ড হার্ডিঞ্জের পাশে সাদা ঘোড়ার উপর খাটো লোকটিই রাজা। আমি হতাশ হলাম। তার থাকা উচিত ছিল হাতীর পিঠে। দীর্ঘদেহী ভাইসরয়ের পাশে রাজাকে মনে হচ্ছিল শ্মশ্রুধারী গোলাপী বামুন। আমি নিশ্চিত যে সামনে দিয়ে অতিক্রমের সময় খুব কম লোকই বুঝতে পেরেছে যে, উনিই রাজা, যতক্ষণ না রাজা ও রাণী সিঁড়ি বেয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসেছেন। তখন সকলে দাঁড়িয়ে যায় এবং ব্যান্ডের তালে তালে জাতীয় সঙ্গীত সুর মিলায়, 'গড সেভ দ্য কিং...।'

আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান থেকে বক্তৃতা শুনতে পারিনি। যদিও শ্বেতাঙ্গ সৈন্যরা ভারতীয়দের চুপচাপ স্ব স্ব স্থানে বসে থাকার জন্য নির্দেশ ও ভীতি প্রদর্শন করেছিল, কিন্তু পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই, যার পক্ষে ভারতীয়দের সারাক্ষণ কথা বলা বন্ধ করা সম্ভব। প্রত্যেকে প্রত্যেককে বলছিল, 'ইয়ে দেখ্, ও দেখ্?' হঠাৎ করে একটি শোরগোল শোনা গেল। একটি শামিয়ানা আগুনে জ্বলছে এবং লোকজন পালাতে শুরু করেছে। ঘোষকরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চীৎকার করছে, 'বসে পড়ো। বসে পড়ো।' কে কার তোয়াক্কা করে। প্রত্যেকে তার জীবনকে সবকিছুর উপর মূল্যবান বিবেচনা করে। বাবা ও আমি জনতার সাথে দৌড় দিলাম এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্যাম্প এলাকার বাইরে চলে আসতে সক্ষম হলাম। আমাদের বাসস্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমরা দম নেইনি।

আমি বেঙ্গল ও মহারাষ্ট্রে হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার কথা পাঠ করেছিলাম। সম্ভবত শামিয়ানায় অগ্নিসংযোগের পিছনে তাদের হাত আছে। বাজারে লোকজন গুজব ছড়াচ্ছিল কে কাজটি করেছে, কতজন লোক নিহত হয়েছে। কেমন করে অল্পের জন্য রাজা ও রাণী রক্ষা পেলেন ইত্যাদি। এভাবে কথা ছড়িয়ে পড়ছে। এটা নিশ্চিত যে নগরীর উপর সরকারের আক্রোশ পতিত হবে এবং নগরীর একটি অংশ ভস্মীভূত করার নির্দেশ দেবে সরকার। কিন্তু সন্ধ্যায় স্থানীয় সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা মারফত জানতে পারলাম যে, আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট হতে। দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। কোন প্রাণহানি ঘটেনি। সংবাদপত্রে সরকারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথাও প্রকাশিত হয়েছে। একটি হচ্ছে, ছয় বছর আগের গৃহীত সিদ্ধান্তে কার্যকর 'বঙ্গভঙ্গ রদ' এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তর।

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত হিন্দুদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তারা বলছিল যে, এটি হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবধান আরো বৃদ্ধি এবং পূর্ববঙ্গে একটি মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির লক্ষ্যে করা হয়েছে। তরুণ বাঙ্গালী হিন্দু, মহারাষ্ট্রীয় এবং কিছুসংখ্যক বিভ্রান্ত শিখ বঙ্গভঙ্গকে অকার্যকর এবং বৃটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে শপথ গ্রহণ করে। বাংলায় বৃটিশ অফিসারদের উপর বোমা নিক্ষেপ এবং অনেককে হত্যা করা হয়। ভাইসরয় হিসেবে লর্ড কার্জনের পর দায়িত্ব গ্রহণকারী লর্ড মিন্টোকে হত্যার জন্য গুজরাটে তার উপর হামলা চালানো হয়। লন্ডনে পড়াশুনারত এক পাঞ্জাবী যুবক ওয়াইলিকে গুলী করে হত্যা করে। ইংরেজরা জ্ঞানী হওয়ার কারণে উপলব্ধি করে যে, বঙ্গভঙ্গ বঙ্গবাসী হিন্দুদের মনে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করেছে এবং সন্ত্রাসের অবসানের আশায় বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু সময়ের জন্য হলেও তাদের সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয়। কিন্তু এর ফলে ভারতবাসীর মনে এই ধারণারও জন্ম হয় যে, বোমা ও পিস্তলের দ্বারা ইংরেজদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করা যায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা বলে যে, এ ধারণা যথার্থ নয় যে, বাদামী মানুষের চাইতে ইংরেজরা সেরা। জাপানীরদর মতো বিবর্ণ বামনরা যদি রাশিয়ার শ্বেতাঙ্গ জারের সাম্রাজ্যকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে পনের কোটির এই বিরাট ভারতীয় জাতি ভারতে অবস্থানরত কিছুসংখ্যক ইংরেজকে মাংসের পিন্ডে পরিণত পারে। তারা বলে, ভারতীয়রা যদি এক সঙ্গে একটি পুকুরে প্রস্রাব করে তাহলে ভারতে বিদ্যমান ইংরেজদের ডুবিয়ে মারার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ব্যাপকভাবে অভিনন্দিত হলো। কোলকাতায় অবস্থানরত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এতে খুশী হতে পারলো না। তারা সন্দেহ করলো যে, এই উদ্যোগের পশ্চাতে লর্ড হার্ডিঞ্জের হাত আছে এবং তারা তাকে বরখাস্ত করার অভিযান শুরু করলো। তারা

বললো, H.M.G অক্ষর তিনটিরও মর্মার্থ এখন আর His Majesty's government (হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্ট) নয়, এর মানে হচ্ছে Hardinge Must Go. তাদের প্রচেষ্টায় কিছু হলো না। দিল্লী বরাবর হিন্দুস্থানের রাজধানী ছিল। দিল্লী দেশটির হৃদয়ের নিকটবর্তী। হার্ডিঞ্জের পূর্বের অনেক ভাইসরয় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা দিল্লীকেই ভারতের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নগরী হিসেবে বিবেচনা করেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড লেটন রাণী ভিক্টোরিয়াকে হিন্দুস্থানের সম্রাজ্ঞী উল্লেখ করে ঘোষণা পাঠ করেন দিল্লীতে। ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে দরবারের আয়োজন করেন দিল্লীতেই।

ঘোষণা করার পর তা আবার পাল্টানোর প্রশ্ন আসে না। দরবার উদ্বোধনের তিন দিন পর রাজা কিংসওয়ে কাম্পে নতুন রাজধানীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরদিন তারা নেপাল গমন করেন ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পূর্বে ব্যাঘ্র শিকার করার জন্য।

আমার বাবা অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং টাকা কামাবার দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। বাদাম, পিয়াজ ও আলু কিনতে গেলেও তিনি ভীষণভাবে দর কষাকষি করতেন। প্রায়ই তিনি বলতেন, 'টাকা বাঁচানোর অর্থই হচ্ছে টাকা কামাই করা। আজ ব্যাংকে একটি টাকা জমা রাখ এবং চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ জমা হতে থাকুক। সেই একটি টাকা ব্যাংকে বসে থাকলেও একশ' বছরে এক লক্ষ টাকায় পরিণত হবে। যদিও তিনি ইংরেজী বলতে পারতেন না, কিন্তু ইংরেজ অফিসারদের আশেপাশে ঘুরঘুর করে তিনি যা চাইতেন তা করিয়ে নিতেন। যখনই ইংরেজ অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন তখন তার বড় সাদা পাগড়ীটা মাথায় পরে নিতেন। গায়ে থাকতো কালো কোট এবং কাঁধ থেকে আড়াআড়িভাবে কোমর পর্যন্ত ঝুলতো সোনালী কাজ করা একটি বেল্ট। তিনি বাজারের সেরা ফল কিনে সাহেবদেরকে প্রদান করতেন এই বলে যে, এগুলো তার নিজস্ব বাগানের ফল। আমাদের কোন ফলের বাগান ছিল না। আমাদের গ্রাম হাদালীতে একটি মাত্র ফল হতো, তা হচ্ছে খেজুর। বাবা আমাকে বলতেন, "সাহেবদের নগদ অর্থ কিংবা অলংকারাদি দেয়ার চেষ্টা করো না। এর ফলে তারা তোমাকে গালি দেবে এবং লাথি মেরে বের করে দেবে। কিন্তু ফল একটি গ্রহণযোগ্য উপহার, সাহেবদের চাপরাশি ও কেরানীদের নজরানা দেবার ক্ষেত্রে তিনি উদার হস্ত ছিলেন। পরে আমাকে ব্যাখ্যা করতেন, এগুলো বখশিশ নয়। নিরাপদ বিনিয়োগ।' তার এ কথা সত্য। তার পক্ষে সাহেবেদের নির্দেশ কখনো সরকারী ফাইলের ভিড়ে হারিয়ে যায়নি, বরং খুব দ্রুত কাজ নিষ্পন্ন হয়েছে।

দরবার অনুষ্ঠানের পর তাবু গুটিয়ে ফেলার সাথে সাথে নতুন রাজধানী নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হলো। ম্যালকম হেইলেকে কমিশনার পদে উন্নীত করে রাজধানী প্রকল্পের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হলো। বাবা হেইলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বেশ আগে, যখন হেইলে আমাদের জেলা শহর শাহপুর সফরে গিয়েছিলেন। কমিশনার হওয়ার পর বাবা যখন তাকে অভিনন্দন জানাতে গেলেন, তখন আমাকেও সাথে নিলেন। আমরা ফতেপুরি বাজারে তখন যেসব ফল পাওয়া যায় কমলা, আপেল, কান্দাহারী বাতাবী লেবু ইত্যাদি কিনলাম। ফলের ঝুড়িগুলো পাতলা গোলাপী কাগজ দিয়ে সুন্দরভাবে মুড়ে রুপালী সুতোয় তা বাঁধলাম। একটি ঝুড়ি দিলাম সাহেবের ব্যক্তিগত সহকারীকে এবং অন্য একটি ঝুড়ি আর্দালীদের মধ্যে বিতরণ করলাম। ব্যক্তিগত সহকারীই সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দিলো যে, আমার বাবা ইতিপূর্বে তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং এখন তার নিজের বাগানের ফল এনেছেন উপহার দিতে। হেইলে নিশ্চয়ই জানেন যে, শাহপুরের আশেপাশে কোন ফল উৎপাদিত হয় না, তবুও অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তিনি আমার বাবাকে পাঞ্জাবীতে জিজ্ঞেস করলেন যে, তার জন্য তিনি কিছু করতে পারেন কিনা। বাবা তার কাছে আমাকে তার নিজের সন্তানের মত বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং নির্মাণ কাজে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলেন। হেইলে সাহেব আমাদের নাম ঠিকানা একটি কাগজে টুকে রেখে বললেন, কোন কিছু হলে তোমাকে খবর দেব।'

হেইলের নিকট হতে চিঠির প্রতীক্ষা করা ছাড়া যেহেতু আমাদের আর কোন কাজ নেই। সে জন্য বাবা অন্যান্য অফিসারদের সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের মধ্যে ছিলো ব্যাংক ম্যানেজার, জমির মালিক, দিল্লীর প্রভাবশালী পরিবারগুলোর প্রধান ইত্যাদি। আমাকে বলতেন,

তুমি কখনো জানো না কখন তাদের মধ্য থেকে একজন উপকারী প্রমাণিত হবে। যার কিছু গুরুত্ব আছে তার সাথে একজনের অবশ্যই সম্পর্ক থাকা উচিত। আমরা লাল কিল্লা, শাহী মসজিদ, শিখ গুরুদুয়ারা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শিখ গুরুদুয়ারাগুলোর অবস্থা করুণ। কারণ, দিল্লীতে শিখদের সংখ্যা বেশী নয় এবং যারা আছে তাদের কেউই বিত্তবান নয়। এমনকি শীশগঞ্জ গুরুদুয়ারায় রোববারের প্রার্থনায় সমবেত নারী-পুরুষের সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যায় না। নবাগত হিসেবে আমরা যাদের সাথেই পরিচিত হলাম তারা জানতে চাইলো আমরা কুতুব মিনার দেখেছি কিনা। তারা বললো, এটি বিশ্বের সর্বোচ্চ স্তম্ভ এবং এর উপরে উঠে বহুদূর পর্যন্ত বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বাবা একদিন বললেন, একদিন আমরা টাঙ্গা ভাড়া করে কুতুব মিনার দেখতে যাবো। ইতিমধ্যে আমি নিজের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি নিজের গাড়ী চালিয়ে কুতুব মিনার দেখতে যাবো।' তখনকার দিনে দিল্লীর মাত্র ডজনখানেক ধনী ভারতীয় পরিবারের নিজস্ব গাড়ী ছিল। আমি দেখলাম, বাবা আমার উচ্চাভিলাষে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবু তিনি হেসে, 'ভারুয়া' উচ্চারণ করে বললেন, মোটর গাড়ী কেনার কথা বলার আগে কামাই করতে শিখো। তুমি কি জানো মোটর গাড়ীর দাম কত?' বাবা আমাকে একটি বাইসাইকেল কিনে দিলেন। ইংল্যান্ডে তৈরী গাঢ় সবুজ সুন্দর র‍্যালে বাইসাইকেল। সাইকেল চালনা শিখতে আমার খুব বেশী সময় লাগলো না। এই র‍্যালে সাইকেলটিই পরবর্তী পনের বছর আমার রোলস রয়েস ও ডিমলার গাড়ী ছিল।

ইংরেজরা যখন বলে যে, তারা তোমার জন্য কিছু করবে, তাহলে তুমি নিশ্চিত হতে পারো যে কাজটি হবেই। এক মাস পর আমরা হেইলের সাথে দেখা করলাম। তিনিই আমাদেরকে দেখা করার জন্য খবর দিয়েছিলেন।

সেখানে বেশ কিছু ইংরেজ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। হেইলে সাহেব আমাদেরকে সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের সালামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেই চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন, তোমরা রাস্তা ও কেরানীদের বাসস্থান নির্মাণের মাধ্যমে কাজ শুরু করতে পারো। আগে তোমাদের কাজ দেখবো, এরপর আমরা অন্য কাজের কথা ভাববো। কাল সকালে সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের সাথে দেখা করো।'

বাবা সোজা পিডব্লিউডি অফিসে গিয়ে কে কি দায়িত্বে নিয়োজিত এবং কার গুরুত্ব কতটুকু সেসব বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন। একজন কেরানীর নিকট হতে বাবা সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে চাপরাশি পর্যন্ত প্রত্যেকের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করলেন। বাসায় ফেরার পথে আমরা টেলিগ্রাফ অফিসে থামলাম। আমি ছোট ভাই-এর কাছে টেলিগ্রাম করলাম তাকে কিছু বিশ্বস্ত লোক দিল্লীতে পাঠানোর জন্য, যারা শ্রমিকদের তত্ত্বাবধান ও হিসাব রাখতে পারবে। আমাদের অনুপস্থিতিতে ছোট ভাইটি গ্রামের সম্পত্তি দেখাশুনা করছিল।

পরদিন সকালে পিডব্লিউডি অফিসে যাওয়ার পূর্বে আমরা সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের বাসায় গেলাম। সাথে ছিল 'আমাদের বাগানের' ফলের ঝুড়ি। তার চাপরাশিদের ভালো বখশিশ দিলাম। সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে দেখা করলেন না। তার আর্দালী বললো যে, সাহেব কখনো ইঞ্জিনিয়ারদের তার বাড়িতে আসা পছন্দ করেন না। এখন পর্যন্ত আমি জানি না, আমরা যে ফল প্রদান করি তা তার কাছে পৌঁছে, নাকি তার চাপরাশিরাই সাবাড় করে দেয়।

আমরা পিডব্লিউডি অফিসে গেলাম। কয়েক মিনিট পর সুপারেনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার গাড়ী হাঁকিয়ে এসে আমাদের তলব করলেন। আমি যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে সহজ ছিলেন তিনি। আলীপুর রোডে যে অস্থায়ী সচিবালয় ভবন নির্মিত হবে তার রাস্তার ডিজাইন সম্বলিত একটি ম্যাপ দিলেন। কোন টেন্ডার আহ্বান করা হলো না। দু'দিনের মধ্যে ব্যয়ের হিসাব এবং কতটা সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে বিবরণ পেশ করার জন্য বললেন তিনি। সেদিন বিকেল ধরে আমরা শ্রমিক, পাথর, সিমেন্ট, বালি, পরিবহন ইত্যাদি ব্যয়ের হিসাব দাঁড় করালাম। মোট ব্যয় কয়েক লাখ টাকা দাঁড়ালো। পরদিন বাবা ব্যয়ের হিসাবটি ওভারশিয়ারের হাতে দিলেন তার জন্য এক হাজার টাকার একটি নোটসহ। পরদিন ওভারশিয়ার আমাদের সাথে দেখা করতে এলো। তিনি আমাদের হিসাবে সামান্য কাটছাট করলেও মুনাফা ভালোই থাকবে। বাবা তাকে আরেকটি হাজার টাকার নোট ও এক বোতল ফচ হুইস্কি দিলেন। ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব জোরদার করার

লক্ষ্যে তারা পরস্পর আলিঙ্গন করলেন। এটাই আমাদের কর্মজীবনের কৌশলে পরিণত হলো। আমাদের নির্মাণ কাজে যেসব ভারতীয়ের কিছু করার ছিল তাদেরকে তা করতে হতো অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে। এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা আমাদের কাছে আশা করতো নগদ অর্থ অথবা হুইস্কি। ইংরেজ সাহেবরা যদি জানতে পারতো যে ঘটনা কি ঘটছে, তাহলে তারা ফলের ঝুড়ি কিংবা বড় দিনের পার্টির জন্য হুইস্কি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করতো না।

ব্যবসার সাথে পাল্লা দিতে আমার খুব বেশী দিন লাগলো না। শ্রমিক সংগ্রহের জন্য আমরা রাজপুতানায় লোক পাঠালাম। এ কাজ খুব কঠিন ছিল না, কারণ মরু এলাকায় খরা ও দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো। দৈনিক আট আনা মজুরীতে তারা খুব সন্তুষ্ট ছিল। মহিলা শ্রমিকদের মজুরী আরো কম। তারা পাথর ভাঙ্গতো, গর্ত খনন করতো, পাথর ও সিমেন্ট মিশাতো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সন্ধ্যা হলে তারা দল বেঁধে তাদের ঝুপড়িতে ফিরে যেতো। মেয়ে শ্রমিকরা যেতে যেতে গান গাইতো। আমরা যারা টাকা কামাই করতাম, তারা টাকা গণনা করে এবং যেসব ঠিকাদার আমাদের চাইতে অধিক টাকা বানাচ্ছে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সময় কাটাতাম।

১৯১২ সালের এপ্রিল মাসে রাজার অনুমোদিত স্থপতি এডউইন, লুটিয়েনস শহর নির্মাতার একটি দলসহ দিল্লীতে এলেন রাজধানীর স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা কিংসওয়ে ক্যাম্পে গেলেন। যমুনার তীর ধরে 'মজনুন কা টিলা' থেকে ওখলা পর্যন্ত পরিদর্শন করলেন। বার কয়েক তারা স্থানটি দেখলেন হাতীর পিঠে উঠে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিংসওয়ে রাজধানীর জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। কারণ এলাকাটি নীচু, নদীর খুব নিকটবর্তী এবং জলমগ্ন হওয়ার আশংকামুক্ত নয়। পাহাড়গঞ্জ ও মেহরুলি এবং পুরানা কিল্লা থেকে খোলা প্রান্তর পর্যন্ত এলাকার মধ্যে আরো পনের দিন ঘুরাফেরা করে কাটালেন। তারা স্থির করলেন যে, ভাইস রিগ্যালের প্রাসাদ ও সচিবালয় রায়সিনা পাহাড়ের উপর নির্মিত হওয়া উচিত। লর্ড হার্ডিঞ্জ, যিনি কিংসওয়ে ক্যাম্পের স্থান পছন্দ করেছিলেন। তিনি তাদের সাথে একমত হলেন। রাজা যে কিংসওয়ে ক্যাম্পে রাজধানীর জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, তা নিয়ে তারা খুব একটা ভাবলেন না। স্থানের ব্যাপারে পবিত্রতার কিছু নেই বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করলেন। একই ভিত্তিপ্রস্তর অন্য কোথাও পুনঃস্থাপিত হতে পারে।

তাই হলো। হেইলে আমার বাবাকে ডেকে (ইতোমধ্যে বাবা তার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারে পরিণত হয়েছেন।) বললেন যে, তিনি ভিত্তিপ্রস্তর কিংসওয়ে থেকে সরিয়ে নতুন স্থান মালচায় স্থাপন করবেন। এই কথাটি আর কারো কাছে প্রকাশ করা হলো না। তিনি নিজের গাড়ী চালিয়ে সফদর জং-এর সমাধিতে গেলেন এবং আমাদেরকে নিয়ে মালচার কাছে একটি স্থান দাঁড়ালেন যেখানে ভিত্তিপ্রস্তরটি পুনরায় স্থাপিত হবে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে স্থানটি ঘেরা এবং কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরারত।

ভিত্তিপ্রস্তর অপসারণ করে নতুন স্থানে স্থাপন করার কাজটি বাবা আমার উপর ন্যস্ত করলেন। আমি খুব উত্তেজিত অনুভব করলাম। প্রথমে একটি গর্ত করতে হলো। এরপর একটি গরুগাড়ী ভাড়া করে এ কাজের জন্য ছয় জন শ্রমিক ঠিক করলাম। আমাদের প্রহরার জন্য চারজন পুলিশ দেয়া হলো। শেষ পর্যন্ত মে মাসের এক সন্ধ্যায় আমি গরুগাড়ির পাশে পাশে সাইকেল চালিয়ে শ্রমিক ও পুলিশদের নিয়ে সন্ধ্যার আধ ঘন্টা পর কিংসওয়ে ক্যাম্পে পৌঁছলাম। ভিত্তি প্রস্তরটি তুলে গরুর গাড়িতে খড়ের উপর সেটি স্থাপন করে তারপলিন দিয়ে ঢেকে দিলাম। এরপর প্যাট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালিয়ে আমরা ফিরতি যাত্রা শুরু করলাম। এবার আমি সবার সাথে গাড়ীর পিছন পিছন হাঁটলাম। মনে হচ্ছিল আমরা শবযাত্রী। দূরত্ব নেহাত কম নয়। মধ্যরাতের পর আমরা মালচায় পৌঁছলাম। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে আরো এক ঘন্টা লাগলো। প্রত্যেক শ্রমিককে মজুরীর অতিরিক্ত এক টাকা করে দিলাম পুরস্কার হিসেবে। যখন ঘরে ফিরলাম তখন সূর্য দিনের আলো ছড়াচ্ছে। আমার বাবা তার প্রাতঃকালীন প্রার্থনা বন্ধ করে জানতে চাইলেন, কাজটা ঠিকঠাকমত করতে পেরেছি কিনা। তাকে বিস্তারিত বললাম। যখন তাকে শ্রমিকদেরকে এক টাকা করে অতিরিক্ত প্রদানের বিষয়টি জানালাম, তিনি আমাকে 'ভারুয়া' বলে উল্লেখ করলেন।

আমরা ভালো বাসস্থানে থাকার মত পর্যাপ্ত অর্থ কামাচ্ছি এখন। (অবশ্য আমরা গ্রামে মলত্যাগ করার জন্য খোলা জায়গায় বসতে অভ্যস্ত বলে একটি নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা

আমাদের জন্য বিরক্তিকর।)

অস্থায়ী সচিবালয় ভবন নির্মাণের কোন কাজ আমরা পেলাম না। পুরো কাজটাই করছে পিডব্লিউডি। আমরা অবসর সময়টুকুতে নতুন নগরীর জন্য নির্ধারিত স্থানে একটি বাড়ী নির্মাণে নিয়োজিত হলাম। আমাদের কাছে যে শ্রমিক ও নির্মাণ সামগ্রী আছে তা কাজে লাগানোর ফলে কয়েকটি কক্ষ, কিচেন ও আঙ্গিনাসহ বাড়ী তৈরী করতে এক মাসের কম সময় লাগলো। বাড়িটি হলো একটি পুরোনো আটা কলের কাছে। আমাদের পথ অনুসরণ করে অন্যান্য শিখ ঠিকাদার আমাদের পাশেই ঘর তুললো। এলাকাটি পরবর্তীতে ওল্ড মিল রোড হিসেবে পরিচিত হয়েছে। যদিও আমরা পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছি এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতের লোক, তবুও শীঘ্রই আমরা এক পরিবারের সদস্যদের মতো হয়ে গেলাম।

এডউইন লুটিয়েন্স নতুন নগরীর একটি পরিকল্পনা তৈরী করলেন এবং তাতে ভাইস রিগ্যাল প্রাসাদ ও সচিবালয়ের স্থান নির্ধারিত ছিল। আমি জানতে পেরেছিলাম যে, লুটিয়েনসের মূল পরিকল্পনায় তিনি সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির পিছনে যমুনা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ এবং লাল কিল্লা থেকে পুরানা কিল্লা পর্যন্ত একটি সুবিস্তৃত লেক তৈরী করতে চেয়েছিলেন। লেকের পাশাপাশি থাকতো প্রশস্ত রাজপথ এবং নগরীর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত লেক নৌ চলাচলের জন্যও ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়নি বিপুল ব্যয়ের কারণে। লুটিয়েনস ভাইস রিগ্যাল প্রাসাদ থেকে পুরাতন মোগল নগর প্রাচীর ও বাজার ভেদ করে জুমা মসজিদ পর্যন্ত একটি রাজপথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এটিও বাতিল করা হয়। বাদবাকী পরিকল্পনা ভাইসরয় এবং রাজা জর্জ অনুমোদন করেন। লুটিয়েনেসের একজন বৃদ্ধ সহকর্মী ছিলেন হার্বার্ট বেকার। নগরীর সাধারণ পরিকল্পনার অতিরিক্ত লুটিয়েনস স্বয়ং ভাইস রিগ্যাল প্রাসাদ, যুদ্ধস্মরণী স্তম্ভের নকশা তৈরী করেন। হার্বার্ট বেকার তৈরী করেন সচিবালয় ও পার্লামেন্ট ভবনের নকশা। বাদবাকী কাজ নিজেরা ভাগ করে নিয়েছিলেন। তারা দীর্ঘদিনের পরিচিত ছিলেন। বেকার লুটিয়েনসকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার সহস্থপতি হিসেবে কাজ করার জন্য পছন্দ করেছিলেন। দিল্লীকে গড়ে তোলার ব্যাপারে লুটিয়েনস হার্বার্ট বেকারকে আমন্ত্রণ করে তার সৌজন্যের বিনিময় করেন। সবাই ভাবতো তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু লুটিয়েনসের মেধা ও রাজ পরিবারের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা বেকারের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

লুটিয়েনস দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। যদিও লুটিয়েনস বা বেকারের মধ্যে আমাদের পুরোনো প্রাসাদ, মসজিদ ও মন্দির সম্পর্কে কোন দুর্বলতা ছিল না, তবুও তারা তাদের ডিজাইনে ভারতীয় রীতির ছোঁয়াচ দিতে সম্মত হলেন। লুটিয়েনসের ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে প্রভাবিত হলাম। রাস্তা নির্মাণের পূর্বেই তিনি প্রস্তাবিত রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণের নির্দেশ দিলেন। উপযুক্ত জাতের বৃক্ষের চারা উৎপাদনের জন্য একটি বিশাল নার্সারী তৈরী করা হলো। তিনি চেয়েছিলেন এমন গাছ যেগুলো ধীরে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু আকারে বিশাল হবে। বট, নিম ইত্যাদি দীর্ঘজীবী গাছও তার তালিকায় ছিল। সরকারী উদ্যানবিদ আফ্রিকা থেকে আফ্রিকান টিউলিপসহ দুষ্প্রাপ্য জাতের কিছু বৃক্ষও আমদানি করলো। লুটিয়েনস বলতেন যে, তিনি এমনভাবে নগরীর পরিকল্পনা করছেন যাতে নগরবাসীর দু'শ' বছরের চাহিদা পূরণ হবে। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করেন যে, একদিন বৃটিশরা ভারত ত্যাগ করবে এবং ভারতীয়রা নিজেরাই নিজেদের বিষয় দেখাশুনা করবে। আমি নিশ্চিত নই যে, তিনি কিছু উন্মাদ ইংরেজের মতো ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন কিনা। কিন্তু তার স্ত্রীর সম্পর্কে এ কথা প্রচলিত ছিল। গুজব ছড়িয়েছিল যে, লুটিয়েনসের স্ত্রী মাদ্রাজে পালিয়ে গিয়ে এক হিন্দু যুবকের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হন। আমি শুধু বলতে পারি যে, যদিও আমি অফিস ও বাংলোতে বহুবার লুটিয়েনসকে দেখেছি, কিন্তু কখনো তার স্ত্রীকে দেখিনি। তাছাড়া ইংরেজরা লুটিয়েনসের স্ত্রী সম্পর্কে আলোচনা করতে পছন্দ করতো না।

দিল্লীতে আমাদের প্রথম গ্রীষ্মেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা এখানেই বাড়ী তৈরী করবো। মরুভূমিতে আমাদের গ্রামের চাইতে এখানে উষ্ণতা কম এবং বর্ষাকাল অত্যন্ত মনোরম। উপরন্তু আমরা আমাদের কল্পনার চাইতেও অধিক অর্থ বানাচ্ছিলাম। শরৎকালের মধ্যে আমরা বাড়িতে আরো কক্ষ সংযোজন করলাম। মালী ও কিছু চাকর রাখলাম। আমার মা, স্ত্রী-পুত্রেরা দিল্লীতে চলে এলো। আমাদের গ্রামের যে সব লোককে কেরানী, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, স্টোরকিপার

হিসেবে কাজ দিয়েছিলাম তাদের অনেকে পরিবার নিয়ে এলো। এরপর আমরা গ্রামে যেতাম শুধুমাত্র আত্মীয়দের বিবাহ বা পরিচিতজনের মৃত্যু উপলক্ষে।

রাজকীয় দরবার অনুষ্ঠানের ঠিক এক বছর পর আরেকটি দরবার আয়োজিত হলো। ভাইসরয় ও ভাইসরেইনের দিল্লীতে আনুষ্ঠানিক বসবাস উপলক্ষে এই দরবার। তাদের সম্বর্ধনা প্রদানের উদ্দেশে দিল্লী রেলওয়ে স্টেশন ও লাল কিল্লায় ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হলো। স্টেশন থেকে হাতীর পিঠে তুলে শোভাযাত্রা সহকারে তাদেরকে পৌর উদ্যান, চাঁদনী চক হয়ে লাল কিল্লায় নেয়া হবে। আগের বৎসরের মতোই বহুরকম অনুশীলন এবং কোনরূপ অনাকাংখিত ঘটনার মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল, যাতে অনুষ্ঠানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন না হয়। হেইলে এই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন। সিআইডি'র লোকেরা পথিপার্শ্বের সকল বাড়ী ও দোকানে তল্লাশি চালিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলো যে, কোন সন্ত্রাসী আয়োজন পন্ড করতে ওঁৎ পেতে নেই। চাঁদনী চকে বাড়ীর ছাদে পুলিশ মোতায়েন করা হলো আমার মনে হলো, এই সতর্কতা বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়। কারণ তখন পর্যন্ত এমন একজন দিল্লীবাসীকেও পাইনি যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছু বলেছে।

রাজকীয় দরবারের দিনের মতোই ভাইসরিগ্যালের দরবারের দিনে ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠলাম। এটা অপ্রয়োজনীয় ছিল, কারণ বিকেলের পূর্বে অনুষ্ঠান শুরু হবে না। কিন্তু শোভাযাত্রা ভালো করে প্রত্যক্ষ করার জন্য স্থান খুঁজে পাবার উৎকণ্ঠায় আমরা সময়ের অনেক আগে প্রস্তুতি নিলাম। ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ছিল শীতল এবং নীল আকাশ ছিল মেঘমুক্ত। সূর্য যখন উদিত হলো তখন প্রতিটি ফুল এবং ঘাসের পাতা শিশিরে ধুঁয়ে স্বচ্ছ হয়েছে।

বাড়ী থেকে বেলা ১১টায় বের হলাম। চারটি টাঙ্গা ভাড়া করলাম নিজের জন্য এবং চাকর, কেরানী তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য। শত শত শ্রমিক ও তাদের স্ত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জনতার ভিড়ে গতি মন্থর হয়ে এসেছে। আজমিরী গেটে টাঙ্গা ছেড়ে দিলাম এবং চৌরী বাজারে গণিকালয়, নয়া সড়কের মাঝ দিয়ে হেঁটে দুপুরের একটু পর ক্লক টাওয়ারের সামনে পৌছলাম। জনতা ইতিমধ্যে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেছে। আমরা চাঁদনী চক দিয়ে এগিয়ে শীশগঞ্জ গুরুদুয়ারায় গেলাম। কেয়ারটেকারদেরকে শুধুমাত্র শিখদের প্রবেশ করতে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেদিনের জন্য। আমরা চাঁদনী চকের উল্টোদিকে ফোয়ারার মুখোমুখি একটি ব্যালকনিতে জায়গা পেলাম।

কামানের গোলার শব্দে বুঝতে পারলাম যে, ভাইসরিগ্যালের ট্রেন পৌছেছে। স্টেশনে লর্ড ও লেডী হার্ডিঞ্জকে অভ্যর্থনা জানালেন কিছু মহারাজা। পৌর অট্টালিকায় দিল্লীবাসীর পক্ষ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ দেয়া হলো। পুলিশ ব্যান্ডের পিছু পিছু শোভাযাত্রা, আমাদের নীচ দিয়ে অতিক্রম করছে। আমার দৃষ্টি ক্লক টাওয়ার ছড়িয়ে আর দূরে যায় না। কিন্তু দেখলাম যে এক সারি হাতী আমাদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ডজন খানেকের বেশী হবে হাতীর সংখ্যা। ভাইসরয় ও ভাইসরেইন অষ্টম হাতীর পিঠে উপবিষ্ট। ভারতের এই বৃহত্তম হাতিটির নাম গাজমাত। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ফরিদকোটের রাজা হাতীটি ধার দিয়েছেন।

হঠাৎ থেমে গেল শোভাযাত্রা। বহুলোক উচ্চকণ্ঠে চীৎকার শুরু করলো। আমি নিশ্চিত যে, একটি বিস্ফোরণের শব্দ আমার কানে এসেছে। কিন্তু তা পটকা কি বোমার বিস্ফোরণ তা বলতে পারি না। সামনের সারির যে চারটি হাতী থেমে গেছে তা আমাদের নিকট থেকে কয়েক গজ দূরে। আমি লোকদেরকে চাঁদনী চক থেকে দৌড়াতে দেখলাম। তারা পাশের গলিতে ঢুকে পড়ছে। যারা ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিল তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে। ক্লক টাওয়ার এলাকায় রাস্তার উপর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক চীৎকার করছে 'ভাগো, ভাগো'। অন্যান্য শব্দের মধ্যে আমি শুনলাম, 'বোমা' এবং 'মার ডালা'। কেউ কি ভাইসরয়ের হাতীর উপর বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং ভাইসরয়, তার স্ত্রী ও সহযোগীদের হত্যা করেছে?

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কোন দিকে যাবো। ভাইসরয় যদি সত্যিই নিহত হয়ে থাকেন, তাহলে পরিণতি কি ঘটবে তা আমরা জানি। গুরুদুয়ারার বাম দিকে কয়েক গজ দূরে একটি মসজিদ 'সুনেহরী মসজিদ' একটি থানা দিয়ে বিভক্ত। এই মসজিদ থেকেই নাদির শাহ দিল্লীবাসীদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ কেউ তার উপর গুলীবর্ষণ করেছিল। সাহেবদের রাগ উঠে ধীরে ধীরে। কিন্তু একবার রাগান্বিত হলে তার পরিণতি

ভয়াবহ। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজরা এই চাঁদনী চকেই শত শত মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল এবং শাহী মসজিদের সামনের ভবন ও দোকানপাটসহ পুরো বাজারটাই বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা গুরুদয়ারার দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং গ্রন্থ সাহেব পাঠকারীর বক্তব্য শোনার জন্য জড়ো হলাম। নগরী তার ভাগ্যে কি ঘটবে তারই প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

গুরুদুয়ারা হতে বের হওয়ার জন্য আমরা রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কোন টাঙ্গা বা এক্কা পাওয়া গেল না এবং জনশূন্য রাস্তায় অন্ধকারের মাঝে আমাদেরকে হেঁটেই বাড়ী ফিরতে হলো। আমার বাবা সারাটা রাস্তা 'হায় গুরু! হায় গুরু!' বিলাপ করলেন।

সে রাতে আমার ভালো ঘুম হলো না। ভাইসরয় যদি নিহত হন তাহলে কি ঘটতে পারে? তারা কি এরপরও দিল্লী গড়ার কাজ এগিয়ে নেবে? এই অভিজ্ঞতার পর ইংরেজরা কি ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস করবে?

সকালের পত্রিকা পাঠ করে জানতে পারলাম গতকাল বিকেলে আসলে কি কি ঘটেছিল। একটি ব্যাংক ভবনের ছাদ থেকে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। বোমার আঘাতে ভাইসরয়ের ছত্রধর নিহত হয়েছে এবং ভাইসরয় স্বয়ং গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত ভৃত্য আহত হয়েছে। ভাইসরয়ের স্ত্রী এবং অন্যান্য চাকরবাকর যারা একই হাতীর পিঠে আরোহী ছিল তারা অক্ষত রয়েছে।

রেডফোর্টের অনুষ্ঠানে ভাইসরয়ের পক্ষে মিঃ ফ্লিটউড উইলসন ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন নগরী সম্পর্কে তেমন চিন্তা-ভাবনা করেননি, কিন্তু এই ঘটনায় নগরীও যেন মুহ্যমান হয়ে পড়লো। ভাইসরয়ের আঘাত সারতে দীর্ঘ সময় লাগলো। লুটিয়েনসের জাঁকালো নগর পরিকল্পনার ব্যাপারে তিনি অধৈর্য হয়ে উঠলেন এবং হার্বার্ট বেকারের পরামর্শের জন্য হাত বাড়ালেন। ভাইসরয়ের স্ত্রী লুটিয়েনসের পক্ষ নিলেন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হলো বড় ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য। অস্ত্রোপচারের পরই তার মৃত্যু ঘটলো। ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকায় ইউরোপে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার গুজব প্রকাশিত হতে শুরু করলো। যুদ্ধ লড়ার সময় কে একটি নগরী নির্মাণের কথা ভাববে? ইংল্যান্ড যদি যুদ্ধে হেরে যায় তাহলে কোন নতুন দিল্লী হবে না।

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে ইংল্যান্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের পক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা পাঠ করলেন। ম্যালকম হেইলে আমার বাবাকে তলব করলেন। তার চিরকুটে আমাকেও সাথে নিতে বলেছেন। তিনি অত্যন্ত বন্ধুসুলভ এবং তার কথা খুব স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, 'সুজন সিং (বাবার নাম), তুমি জানো, ভারত জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। যুদ্ধে লড়ার জন্য আমার প্রচুর সৈনিকের প্রয়োজন। তুমি এমন এক এলাকার অধিবাসী যারা দেশের সবচেয়ে সেরা সৈনিক। তুমি হাদালীতে ফিরে গিয়ে সেনাবাহিনীর জন্য লোক নির্বাচন করো। তোমাকে সে জন্য উত্তমরূপে পুরস্কৃত করা হবে।

বাবা হেইলেকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং ইংল্যান্ডের বিজয়ের জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন। আমরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে নিলাম। আমি দিল্লীতে ব্যবসা দেখবো। বাবা শাহপুর জেলার গ্রামে গ্রামে গেলেন। লোক নির্বাচনে বেগ পেতে হলো না। কারণ গ্রামে প্রচুর সংখ্যক বেকার যুবক রয়েছে, যাদের করার মত কাজ নেই। তাদের অধিকাংশই বেলুচী মুসলিম, সেনাবাহিনীতে যাদের অনেক আত্মীয় চাকরিরত। তিনি কিছু শিখ যুবককেও তালিকাভুক্ত করতে সক্ষম হলেন। আমাদের ছোট্ট গ্রাম হাদালীতে বড় জোর দুশ' পরিবারের বাস। এর মধ্য থেকে তিনি যুদ্ধে যাওয়ার জন্য চারশঃ সাইত্রিশ জন যুবককে সংগ্রহ করলেন। তিনি নামের তালিকাটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন যাতে আমি হেইলেকে দেখাতে পারি। আমার পক্ষে অনুকূল শর্তে আরো অধিক ঠিকাদারী পেতে কোন সমস্যা হলো না। হেইলে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি আমাদেরকে নতুন দিল্লীতে যতটা সম্ভব জমি কিনতে দেবেন যাতে আমরা অট্টালিকা তৈরী করে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, প্রেক্ষাগৃহ হিসেবে লোকদের বরাদ্দ দিতে পারি।

যখন যুদ্ধ চলছিল তখন বড় ধরনের কোন নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয়া হলো না। ভাইসরয় যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তিনি সমগ্র ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করলেন। তার

পরিবারে যে দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল সে কারণেও তার মন ছিল বিক্ষিপ্ত। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র ফ্রান্সে যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়। তার তিনজন এডিসি কয়েক মাসের মধ্যে নিহত হয়।

বৃটিশরা ধারণা করেছিল যে, অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে। কিন্তু সে যুদ্ধ থামলো না। আমরা যেমনটি বিশ্বাস করেছিলাম সবকিছু সেভাবে হলো না। যদিও আমাদের হাজার হাজার লোক বৃটিশের পক্ষে লড়ছিল, কিন্তু আমরা স্বভাবে চরিত্রে যেহেতু খাঁটি ইন্ডিয়ান, সে কারণে যেখানে তারা পরাজিত হচ্ছিল, গোপনে আমরা তা উপভোগ করছিলাম। যখনই যুদ্ধের আলোচনা হতো তখন যে কেউ একজন উর্দু কবিতার উদ্ধৃতি দিতো, 'বৃটিশ জাতি বিজয়ী, কিন্তু ভূখন্ড দখল করছে জার্মানরা।'

ভাইসরয়ের দায়িত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও লর্ড হার্ডিঞ্জ অতিরিক্ত ছয় মাস দায়িত্ব পালন করলেন। তার উত্তরাধিকারী লর্ড চেমসফোর্ড রাজধানী প্রকল্পের ব্যাপারে তার পূর্বসূরীর চাইতে কম আগ্রহ প্রদর্শন করলেন। এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, লুটিয়েনস ও বেকার পরস্পর কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এ কথা বিশ্বাস করা খুব কঠিন যে, বিশ্বের সেরা দু'জন স্থপতি ভাইস রিগ্যাল প্রাসাদ ও সচিবালয় ভবনের তুলনামূলক উচ্চতার মত হালকা বিষয়গুলো নির্ধারণের সাথে নিজেদের মর্যাদার লড়াই এ লিপ্ত হন। সচিবালয়ের মাঝ দিয়ে প্রাসাদে রাস্তা যাবে কিনা তা নিয়েও দ্বন্দ্ব ছিল। লুটিয়েনস প্রাসাদ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে এবং রাস্তাগুলো এমনভাবে বিন্যাসের পক্ষে ছিলেন যাতে বহুদূর থেকে প্রাসাদটি নজরে পড়ে। বেকার দু'টি ভবনই সম উচ্চতায় নির্মাণ ও রাস্তা এমনভাবে বিন্যাসের পক্ষে ছিলেন যাতে, রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকে এবং মাঝামাঝি স্থানে পৌছলে প্রাসাদ নজরে পড়ে। বিষয়টি লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে পেশ করা হলে তিনি বেকারের পক্ষে সম্মতি দেন। এটি পুনরায় লর্ড চেমসফোর্ডের কাছে পেশ করা হলে তিনি পূর্বসূরীর সিদ্ধান্তের পক্ষে সম্মতি দেয়াকেই সহজ মনে করেন। মূলতঃ বিষয়টি আমার মত অনেকের কাছেই বাতাসে অট্টালিকা নির্মাণের মতো হচ্ছিল। বিশেষতঃ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর যেখানে স্থাপিত হয়নি। যুদ্ধ যত দীর্ঘতর মনে হচ্ছিল, ভারতীয় রাজনীতিবিদরা তত অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। তারা ছিলো বানিয়া ও আইনজীবীরা- যারা আমাদের যুদ্ধরত সৈনিকদের সাহায্যের জন্য একটি আঙ্গুলও উঁচু করেনি। কিন্তু স্বশাসনের জন্য উচ্চকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছিল। এর ফলে তারা উপকৃত হবেন। চেমসফোর্ড দুর্বল মানুষ হওয়ার কারণে সহজে তাদের ফাঁদে ধরা দিলেন। তিনি লন্ডনে তার সরকারকে লিখলেন যে, ভারতীয়দের হাতে আরো ক্ষমতা দেয়া উচিত। আটত্রিশ বছর বয়স্ক একজন ইহুদি এডউইন মন্টেগু ১৯১৭ সালের নভেম্বরে দিল্লীতে এলেন পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য। তিনি প্রায় ছয় মাস ভারতে কাটালেন। তিনি এবং চেমসফোর্ড সংস্কারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরী করলেন, যার নাম দেয়া হয়েছিল ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন। প্রশেগুলোতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আরো বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো। কেন্দ্রে ভাইসরয়ের ছয় জন কাউন্সিলরের মধ্যে তিনজন ভারতীয় হবে বলে বিধান করা হলো। স্থানীয় রাজাদের নিজেদের সংগঠন বা চেম্বার রাখা হলো। এসবের বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধের সফল সমাপ্তি পর্যন্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

১৯১৮ সালের নভেম্বরে হঠাৎ করেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলো। আমাদেরকে পুরস্কৃত করার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এখন তা আদায়ের উপযুক্ত সময়। আমরা যেমনটি আশা করেছিলাম, তার চাইতে ভালো কাজ করেছি। পাঞ্জাবের খাল এলাকায় আমাদেরকে প্রচুর জমি বরাদ্দ দেয়া হলো। যখন ভবন নির্মাণের টেন্ডার আহ্বান করা হলো আমি সচিবালয়ের দক্ষিণ ব্লক, যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ এবং সরকারী কর্মচারীদের কোয়ার্টার নির্মাণের সুযোগ প্রার্থনা করলাম। বাবা ইতিমধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধ হয়েছেন। সাহেবরা তাকে 'সরদার সাহিব' সম্মানে ভূষিত করলো। তার জীবদ্দশায়ই আমি পরিবারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমার ছোট ভাইকে পাঞ্জাবে আমাদের জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দেখাশুনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে আমি পুরোপুরি নির্মাণ কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং নিজের মোটরগাড়ীতে কুতুব মিনারে যাওয়ার আকাংখা পূরণের জন্য শুধু অর্থ বানাচ্ছিলাম।

চার বছরব্যাপী যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ভারতে শান্তি আনতে পারলো না। যুদ্ধের সময়েই আমরা বরং বেশী শান্তিতে ছিলাম। যুদ্ধ শেষ হতেই বিশৃংখলা দেখা দিলো। এ সব ব্যাপার আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করছিলাম কারণ আমাকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং আমাকে প্রায়ই ডেপুটি কমিশনার সাহেব তলব করতেন পুলিশ নিয়ে নগরীর বিশৃংখলাপূর্ণ এলাকায় যাওয়ার জন্য।

দৃশ্যপটে একজন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটলো- তিনি গান্ধী। সরকার বিরোধী আন্দোলনে তিনি হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের সহযোগিতা পেলেন। এই সময়ে হঠাৎ করে দেখে মহামারী আকারে ইনফ্লুয়েঞ্জা দেখা দিলো এবং লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো। প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদিত না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ হলো। সবকিছুর উপরে গান্ধী দাবী করলেন যে, যুদ্ধ যেহেতু শেষ হয়েছে, সেহেতু যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত সরকারের বদলে এখন নতুন সরকার গঠন করা উচিত। তার সবচেয়ে আপত্তিকর কাজ ছিল তুর্কী খেলাফতের উপর থেকে বিজয়ী বৃটিশদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সমর্থন করা। ভারতের হিন্দু ও শিখ যারা দেশটির মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশ, তাদের কাছে তুরস্ক বা খেলাফতের মূল্য কি? কিন্তু এই কৌশল কাজে লাগলো। আমি নিজে দেখলাম হিন্দু ও মুসলমানরা একই কলের পানি পান করছে। হাতে হাত দিয়ে বাজারে শ্লোগান দিচ্ছে 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই...।' মুসলমানরা জুমা মসজিদে শুক্রবারের জামাতে একজন হিন্দু শ্রদ্ধানন্দকে আমন্ত্রণ করলো। সরকার অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই গান্ধীর দিল্লী প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। এরপর তিনি চেষ্টা করলেন পাঞ্জাবে যেতে, যেখানে লাহোর ও অমৃতসরসহ অনেক শহরে গোলযোগ দানা বেঁধে উঠেছিল। এই পরিস্থিতি আফগানিস্তানের আমীর শাহ আমানুল্লাহকে ভারতে হামলা চালানোর জন্য উৎসাহিত করে। সরকার শক্ত হাতে পরিস্থিতি মোকাবিলা করলেন। তিন সপ্তাহ ধরে আমি পুলিশ নিয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য দিনরাত দায়িত্ব পালন করলাম। অমৃতসরে জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগে এক বেআইনী সমাবেশের উপর গুলী চালিয়ে সাড়ে তিন হাজারের বেশী লোককে হত্যা এবং সহস্রাধিক লোককে আহত করলো। পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করা হলো। বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হলো। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও নেতৃবৃন্দকে নির্বাসিত করা হলো। আমানুল্লাহ,যিনি ভারতে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি গদিচ্যুত হলেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সাল ভারতের জন্য সত্যিকার অর্থেই দুর্দিন ছিল। অন্যদিকে এই দিনগুলো ছিল আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সূচনা।

কিন্তু কোন কিছুই সরকারের নগর নির্মাণ কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারলো না। একটি ন্যারো গেজ রেললাইন স্থাপন করা হলো দিল্লী থেকে বিশ মাইল দক্ষিণে বদরপুর গ্রামে এবং সেখান থেকে বর্তমান কনট প্লেস পর্যন্ত এসে শেষ হলো। এর নাম দেয়া হলো ইম্পেরিয়াল দিল্লী রেলওয়ে। রেললাইন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল নির্মাণ এলাকায় লাল পাথর, বেলে পাথর এবং অন্যান্য উপকরণ পরিবহন করা। দু'টি বিরাট ছাউনির নীচে পাথর কাটার মেশিন বসানো হলো। হাজার হাজার পাথর কাটার শ্রমিক নিয়োগ করা হলো। পাথর ও মার্বেলকে প্রয়োজনীয় মাপে কাটার জন্য বেঙ্গল থেকে ৫০ হাজার পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক আনা হলো। আমার নিজস্ব কর্মচারী বহরে ছিল পঞ্চাশ জন মুন্সী ও হিসাব রক্ষক এবং তিন হাজারের অধিক শ্রমিক। রাজনীতিবিদরা আইনসভায় যখন তাদের বক বক করছিল, রাজধানী প্রকল্পের জন্য অর্থ ব্যয়ের সমালোচনা করছিল কঠোরভাবে, তখন আমরা এমন একটি নতুন নগরী গড়ে তুলছিলাম, যা ভারত কল্পনাও করতে পারেনি।

১৯২০ সালের শীতকালের মধ্যে পরিস্থিতি ভালোর দিকে মোড় নিল। আমার পরিবার আমার সাথেই দিল্লীতে বাস করছিল (ইতিমধ্যে আমার পুত্র সংখ্যা তিন ও কন্যা একজন)। বাবা গ্রামে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছোট ভাই-এর সঙ্গে জমিজমার দেখাশুনা করতে। যদিও আমার এখন গাড়ী কেনার সামর্থ হয়েছে, তবুও বাবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলাম। এ ধরনের অপব্যয়ের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর সোচ্চার। এর বদলে আমি চার চাকার একটি ভিক্টোরিয়া গাড়ী ও একটি ঘোড়া ক্রয় করলাম আমার ছেলেমেয়েদের দরিয়াগঞ্জের স্কুলে আনা নেয়া করতে। সেই গাড়িতে আমিও বিভিন্ন নির্মাণ স্থলে ঘুরে বেড়াতাম। রাত ১০টার পূর্বে সচরাচর আমার ঘরে ফেরা

হতো না। কখনো কখনো দিনের কাজ শেষে আমি বন্ধুবান্ধবের সাথে দেখা করতে যেতাম এবং হুইস্কি পান, চৌরী বাজারের বারবণিতাদের 'মুজড়ো' শুনতাম। আমার বাবা দিল্লীতে থাকতে আমি এসবের কিছুই করতে সাহস পাইনি।

জন্তর মন্তর রোডে আমি নিজের জন্য একটি দোতলা বাড়ী তৈরী করলাম। সেখানে আরো ছ'জন শিখ ঠিকাদার বাড়ী তৈরী করছে। যদিও আমি তাদের চেয়ে অনেক বেশী আয় করতাম, তথাপি তারা আমার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয় করতো। একজন ঠিকাদারী পেয়েছিল পাথর ও মার্বেল সংগ্রহের, সে নিজে পাথর ও মার্বেল দিয়ে দিল্লীর যে কোন বেসরকারী ভবনের চাইতে প্রাসাদোপম ভবন তৈরী করলো। অন্য একজন যার পিতা ছিল ডাকাত, সে আমার অর্ধেক কামাই না করেও দু'টো গাড়ীর মালিক হলো।

গ্রীষ্মে আমি ছোট ভাই-এর নিকট হতে টেলিগ্রাম পেলাম যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং আমার শীঘ্র বাড়ী যাওয়া উচিত। সে সময় তারা মিয়া চাননুনে বাস করতো যেখানে আমার ভাই একটি সুতার কল চালাতো এবং বিপুল আয়তনের খামার পরিচালনা করতো। সে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে তদবির করে নিকটবর্তী রেল স্টেশনের নাম বাবার নামে কোট সুজন সিং রেখেছিল। যথা সময়ে আমি মিয়া চাননুনে পৌছলাম। আমার মনে হচ্ছিল যে বাবা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেয়ার পূর্বে আমার সাথে দেখা করার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তার শয্যাপার্শ্বে যাওয়া মাত্রই তিনি ব্যবসা সম্পর্কে প্রশ্ন শুরু করলেন। নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করলেন। তিনি ভেঙ্গে পড়লেন এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন যে, তিনি আমার ছোট ভাই এবং অপরিশোধিত এক লাখ টাকার ঋণ রেখে যাচ্ছেন। আমরা তাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলাম যে, এই ঋণের ব্যাপারটি যদি তার মনঃপীড়ার কারণ হয়ে থাকে তাহলে এই মুহূর্তেই চেক লিখে ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারি। কারণ আমাদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। তিনি বললেন যে, তা হতে পারে, কিন্তু একজন মানুষকে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই তার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে হিসাব পরিষ্কার রাখা উচিত। তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, কারণ তিনি খুব দুর্বল। আমরাও কাঁদলাম, কারণ তিনি কাঁদছেন। এরপর তিনি সবার কাছে অনুরোধ জানালেন, মা ও ছোট ভাই ছাড়া অন্যদের কক্ষ থেকে চলে যাওয়ার জন্য। সকলে চলে গেলে তিনি বললেন, 'আমি চাই তোমরা দু'ভাই তোমাদের মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করবে যে, তোমরা উভয়ে একত্রে থাকবে এবং কি লাভ বা কি লোকসান হয় সবকিছু ভাগাভাগি করে নেবে। আমরা দু'ভাই কোলাকুলি করে বাবার বুকের কাছে ঝুঁকে পড়লাম তার আশীর্বাদ নেয়ার জন্য। বিষয় বুদ্ধি সম্পর্কে অতি সচেতন আমার বাবা এরপরও বললেন, 'যদি কখনো পরিবারকে বিভক্ত করার চেষ্টা করো তাহলে সৌহার্দের সাথে তা করবে, যাতে পৃথিবীর আর কেউ তা জানতে না পারে। তোমাদের মাঝে কোন বিষয়ে যদি মতানৈক্য হয় তাহলে বিনা বাক্যে মায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। মা এতক্ষণ ধরে পা ডলে দিচ্ছিলেন এবার তিনি বাবার বিলাপ করতে শুরু করলেন, 'আমাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা বলো না, ডাক্তাররা বলেছে তুমি সেরে উঠবে। মহান গুরু তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেবেন।'

ডাক্তাররা তাকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ দিলেন। কিন্তু গুরু তার জীবনের হিসাব বই বন্ধ করে ফেলেছেন। আধঘন্টা পর তিনি উঠে বসে চারদিকে তাকালেন, যেন কিছু চাইছেন। তিনি বিরাট হা করে চীৎকার করতে চেষ্টা করলেন এবং হঠাৎ বালিশের উপর মাথা ছেড়ে দিলেন। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। মা নিজ হাতে বাবার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং বিলাপ অব্যাহত রাখলেন, 'এক ঈশ্বরের নাম হচ্ছে আমার আলো এবং দুঃখ হচ্ছে তার তেল।'

বাবার মৃত্যু সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়িয়ে পড়লো। এক ঘন্টার মধ্যে মনে হলো শিখ, হিন্দু ও মুসলমানদের গোটা জনগোষ্ঠী আমাদের দুঃখে শরীক হতে এসেছে। পেশাদার মহিলা বিলাপকারীরা দল বেঁধে এসে বুক চাপড়ে মৃতের প্রশংসা সঙ্গীত গাইলো। সেই বিকেলেই তার শবাধার রঙ্গিন কাগজ ও বেলুন দিয়ে সাজিয়ে দুই সহস্রাধিক লোকের শবযাত্রা শুরু হলো। আমাদের পরিবারের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একজন বৃদ্ধ লোক মারা গেলে শোক প্রকাশের পরিবর্তে পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হয়। বাবার বয়স হয়েছিল পয়ষট্টি বছর।

আমার ছোট ভাই এর সাথে শোকের দশটি দিন কাটিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দিল্লীতে ফিরে এলাম। কয়েক মাস পর আমার স্ত্রী আমাদের শেষ সন্তান, একটি পুত্রের জন্ম দিলো। আরো কয়েক মাস পর আমি একটি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ী কিনলাম জনৈক ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট হতে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছেন। লোকটি আমার ঠিকাদারী লাভে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলে আমি তার পুরোনো গাড়ীর জন্য নতুন গাড়ীর মূল্যই দিলাম। বিনিময়ে তিনি আমার আটকা পড়া সকল বিল পাস করে দিলেন।

আমি গাড়ী চালাতে জানি না। একজন মুসলিম শোফার রাখলাম যে আমাকে নির্মাণ স্থলে নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ী চালনাও শিখাবে। আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজ গাড়ী চালিয়ে কুতুব মিনারে যেতে হবে। গাড়ী চালনা শিখতে এক মাস সময় লাগলো। একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার কারণে আমি ড্রাইভিং টেস্টে অবতীর্ণ না হয়েই লাইসেন্স পেয়ে গেলাম। সেই মহান দিনটি এলো। আমার পরিবারের সদস্যদের জানালাম যে, আগামী রোববার আমরা কুতুব মিনারে পিকনিক করবো। আমার স্ত্রী বিরাট প্রস্তুতি নিলো। পরাটা, আলু, ফল ইত্যাদি দিয়ে ঝুড়ি ভরে নিলো। বিশ জন মানুষকে খাওয়ানোর মত পর্যাপ্ত খাবার ছিল তাতে। আমি যখন স্টিয়ারিং ধরলাম তখন গাড়ীতে ডজনখানেক লোক। ড্রাইভার হ্যান্ডেল ঘুরালো স্টার্ট দেয়ার জন্য (তখনকার গাড়ীর সেলফ স্টার্টার ছিল না।) এবং গাড়ীতে জীবন এলো। আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও পরিচারিকা পিছনের আসনে গাদাগাদি করে বসেছে। আমার হেড ক্লার্ক, শোফার বসেছে আমার সাথে সামনে। চারজন ভৃত্যের দু'জন করে দু'পাশে দন্ডায়মান পাদানির উপর। আমরা 'সত শ্রী আকাল' ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। ভৃত্যদের একজন সারা রাস্তা বাদ্য হর্ণ বাজালো। আমরা সফদর জং এর সমাধি এবং আরো শত শত পুরোনো ভবন, ইউসুফ সরাই, হাউজ খাস অতিক্রম করলাম। কুতুব মিনার আমাদের দৃষ্টি সামনে এলো। সবাই চীৎকার করে উঠলো 'ঐ যে, ঐ যে, কুতুব মিনার।'

ভৃত্যরা চাদর বিছিয়ে খাবার সাজিয়ে দেয়ার অবসরে আমরা কুতুব মিনারে উঠলাম। সবগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে উঠে নীচের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকালাম। নীচে নেমে এসে কুওয়াতল ইসলাম মসজিদ চত্বরে ঘুরাফেরা করে লৌহ স্তম্ভ দুই হাতে বেষ্টন করার চেষ্টা করলাম। আমি ইতিহাস খুব বেশী জানি না, নির্মাতাদের নাম ইত্যাদি কিছুই জানি না। আমার বড় ছেলে দিল্লীর প্রথম মুসলিম নগরী, কুতুবুদ্দিন, ইলতুৎমিশ ও আলাউদ্দিন খিলজী সম্পর্কে বললো। আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম যে, স্কুলে সে অল্প সময়ে অনেক কিছু শিখেছে।

আমরা আলু পরাটা খেলাম। ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ ঘুরে ঘুরে দেখলো। আমি চাদরে গা এলিয়ে দিয়ে মিনারের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম যেন মেঘ মিনারকে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছে। আমি বিস্মিত হলাম যে, ঠিকাদাররা এই স্তম্ভ তৈরী করতে কত টাকা বানিয়েছিলো। আমি নিশ্চিত যে, তারা প্রচুর মার্বেল ও পাথর সরিয়েছে পুরনো ভবন থেকে এবং নতুন বলে চালিয়ে দিয়েছে। তারা কি স্থপতি ও ওভারশিয়ারদের ঘুষ দিয়েছিল তাদের বিল পাস করার জন্য। কিভাবে তারা কংক্রীট ও সিমেন্ট ছাড়া সৌধ নির্মাণ করে হাজার বছর পর্যন্ত টিকাতে সক্ষম হলো? আমি যে সব ভবন তৈরী করলাম তা কি পাঁচশ' বছর পর্যন্ত টিকে থাকবে? কেউ কি জানতে পারবে যে সেগুলো আমি তৈরী করেছি? অথবা সেগুলো কি লুটিয়েনস বা বেকারের কাজ হিসেবে পরিচিত হবে অথবা ভাইসরয়ের নামে হবে, যার সময়ে কাজ শুরু বা শেষ হয়েছে। যা হোক, এসব ভাবনা আমাকে অবসাদগ্রস্ত করলো না। কারণ আজ এমন এক দিন, যে দিন আমার একটি আকাংখা পূরণ হলো। আমি গাড়ী চালিয়ে কুতুব মিনারে এসেছি। শীঘ্রই আমি প্রতি বছর নতুন গাড়ী কেনার ব্যাপারে সমর্থ হবো। আমি যথারীতি একজন বিত্তবান মানুষ- কোটিপতিতে পরিণত হওয়ার পথে। কোন মানুষের মধ্যে আর কি আকাংখা থাকতে পারে?

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটেনের রাজার চাচা ডিউক অব কনট নয়াদিল্লী সফরে আসেন। তখনো দিল্লী বসবাসযোগ্য নগরীর মতো মনে হতো না। থাকার মধ্যে প্রশস্ত রাজপথের পাশে কিছু বাংলো। ভাইসরিগ্যাল প্রাসাদ, সচিবালয় ভবন, যুদ্ধের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের কাজ পিছিয়ে গেছে। তথাপি ভাইসরয় ডিউকের সফরকে কিছু মাত্রায় স্থায়ী রূপ দেয়ার ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন। সে কারণে তাকে দিয়ে সচিবালয়ের কাছাকাছি পার্লামেন্ট ভবন, প্রিন্স চেম্বারের

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়ে নেয়া হলো। ঘোষণা করা হলো, দিল্লীর প্রধান শপিং সেন্টার যা সচিবালয় থেকে আধ মাইল দূরে প্রতিষ্ঠিত হবে তার নাম দেয়া হবে ডিউকের নামে কনট প্লেস। তখন সেখানে কোন ভবন ছাড়াই একটি বৃত্তাকার রাস্তা ছিল। ভাইসরয় যেসব ঠিকাদারদের ডিউকের সাথে সাক্ষাত করিয়ে দিলেন আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। ভাইসরয় তাকে জানালেন যে, ভবিষ্যত নগর কেন্দ্রে আমি প্রচুর জায়গা ক্রয় করেছি। সে জন্য ডিউকের সামনেই তিনি বললেন, এই লোকটি নগরীর প্রথম শপিং সেন্টার নির্মাণ করবে আপনার নামে। যেখানে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি থাকবে। তখন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল না যে এতো জমি দিয়ে আমি কি করবো। দিল্লীতে তখনো এতো লোক ছিল না যে দোকান বা রেস্টুরেন্ট লাভজনকভাবে চালানো যাবে। কিন্তু আমি জানতাম ভাইসরয়ের মত একজন লোকের ইঙ্গিতই নির্দেশের মত, যা প্রতিপালন করতে হবে। আমাকে উৎসাহিত করার জন্য রাজার পরবর্তী জন্মদিনে আমাকে 'সরদার সাহিব' খেতাব দেয়া হলো।

ঠিকাদারদের পরিবার সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আমরা পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকা হতে এসেছি এবং দিল্লীতে আমাদের সাক্ষাতের পূর্বে কেউ কারো সম্পর্কে জানতাম না। তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই স্কুলে গেছি এবং কিছু ইংরেজী রপ্ত করেছি। অন্যরা এব্যাপারে অজ্ঞ এবং কয়েকজন তো কোন ভাষায়ই তাদের নাম পর্যন্ত লিখতে পারে না। কিন্তু এর ফলে কোন সমস্যা হয়নি। আমরা শিখ এবং আমরা একে অন্যকে নিজের জাতি হিসেবেই দেখতে শুরু করলাম। শিখ ইঞ্জিনিয়ার ও ওভারশিয়ারও ছিল গুটিকয়েক। যদিও তারা আমাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতো এবং আমাদের বিল পাস করার জন্য কমিশন নিতো, তারাও আমাদেরকে তাদেরই অংশ মনে করতো। উত্তেজনাকর মুহূর্তে (বিশেষ করে নগরীতে হিন্দু-মুসলিম রায়ট শুরু হলে) আমরা একে অন্যের বাড়ি পাহারা দিতাম। আমাদের কোন ছেলে যদি পুলিশের সাথে গোলযোগে জড়িয়ে পড়তো তাহলে আমরা একত্রে চাপ দিয়ে তাকে ঝামেলামুক্ত করতাম। একদিন বিকেলে জনৈক শিখ ইঞ্জিনিয়ারের আঠার বছর বয়স্কা কন্যা তার মুসলিম সঙ্গীত শিক্ষকের সাথে পালিয়ে গেল। তার পিতা আমাদের সতর্ক করল। আমরা দিল্লী থেকে বের হওয়ার প্রতিটি রাস্তায় এবং রেলওয়ে স্টেশনের প্রত্যেক প্ল্যাটফর্মে লোক মোতায়েন করলাম। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার পূর্বেই যমুনা ব্রিজের দিকে ধাবমান একটি গাড়ী হতে দম্পতিকে আটক করা হলো। মেয়েটিকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেয়া হলো তিনি যে শাস্তি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তা দেয়ার জন্য। মুসলিম যুবককে আচ্ছা করে ধোলাই দেয়া হলো যাতে সে সহজে ভুলতে না পারে। যুবকটি ঘটনা পুলিশকে জানালো যে, মেয়েটি ধর্মান্তরিত হয়েছে এবং সে বিয়ে করেছে। মেয়েটির উপর অধিকার দাবী করাসহ বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে উদ্ধার প্রচেষ্টা চালালে আমরা তাকে জানালাম যে, ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা ঠুকে দিয়েছি, তখন সে যথাসম্ভব দ্রুত দিল্লী থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

সহসা সম্পদের মালিক হলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমরা অর্থ বানাবার কাজে এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, আমাদের সন্তানেরা কিভাবে সে অর্থ ব্যয় করে তা দেখার সুযোগ ছিল না। সন্তানদের নষ্ট করার জন্য কিছু মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছিলাম। আমি যখন বলি 'আমরা' তখন অবশ্যই অন্যদের বুঝাতে চাই। কারণ নিজের ছেলেদের ব্যাপারে আমি অত্যন্ত কঠোর। অন্যেরা যখন তাদের ছেলেদের গাড়ী চালাতে দিচ্ছে, আমি তখন বড় দুই ছেলেকে দিয়েছি বাইসাইকেল। ফলে আমার ছেলেরা যখন স্কুল কলেজে যায়, তখন অন্যদের ছেলেরা চৌরী বাজারে গিয়ে মদ্যপান ও বেশ্যাদের নিয়ে পড়ে থাকে। সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ এক শিখের বড় ছেলে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত নারীদের এক বৈচিত্রপূর্ণ হারেমের মালিক হলো এবং কয়েক ডজন সন্তানের জন্ম দিলো। অন্য একজন, যার পাঁচটি পুত্র, সে তার মধ্যে একজনকে পেল ঠিকাদারীতে সহায়তা করার কাজে। অন্যরা ব্যস্ত হলো 'শিকারে', পার্টিতে আড্ডা দিতে এবং মাতাল হয়ে থাকতে। তাদের একজন দিল্লীর কুখ্যাত বেশ্যাখোরে পরিণত হলো। সে প্রতিদিন তিনটি বেশ্যার কাছে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে দিল্লীর প্রতিটি বেশ্যার সাথে মিলিত হবার আকাংখা ব্যক্ত করেছিল। কেউ জানে না তার এই আকাংখা পূরণের পথে কিভাবে সে অগ্রসর হচ্ছিল।

কিন্তু একদিন রাতে সে তার তৃতীয় কাজটা সম্পন্ন করে বেরুতেই কিছু মুসলিম পান দোকানীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। একজন তাকে বরফ খন্ড ছুঁড়ে মারলো। সেটি তার মুখ থেকে থুতনি পর্যন্ত চিড়ে ফেললো। সে তার আঘাতকারীর চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল থানায়। এরপর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে সেলাই ও ব্যান্ডেজ করে নিলো। এসব সেরে হাসপাতাল থেকে চার মাইল দূরবর্তী বাড়িতে ফিরে এলো হেঁটে। বিছানায় যাওয়ার পূর্বে সে অনুভব করলো যে, ব্যান্ডেজ ভেদ করে রক্ত বেরুচ্ছে। রক্ত ধোয়ার জন্য সে বাথরুমে গেল। বাথটাব পানিতে পূর্ণ ছিল। ঝুঁকে পড়তেই সে টাবের মধ্যে পড়ে মারা যায়। তার চাকর রক্তে পরিপূর্ণ একটি টাবে তাকে মৃত দেখতে পায়। ছেলের মৃত্যুতে তার পিতা এক ফোটা চোখের পানিও ফেললো না। যখন তাকে শোক জানাতে গেলাম, কোন আবেগ ছাড়াই তিনি বললেন, "সে কুকুরের মত মরেছে। এটাই সে চেয়েছিল"।

আমার জীবনধারা পাল্টে গেছে। আমি ইউরোপীয় পোশাক পরতে শুরু করেছি। আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে আমি কালো ফার কোট, ডোরাকাটা ধূসর ট্রাউজার এবং জুতা পরি। জিমখানা ক্লাবে যে গুটিকয়েক ইন্ডিয়ানকে সদস্যপদ দেয়া হয়েছে আমি তাদের একজন। আমি নাচতে শিখিনি। কারণ আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, ইংরেজরা তাদের মেয়েদের সাথে ইন্ডিয়ানদের নাচতে দেখাটা পছন্দ করে না। তবে নিজ স্ত্রীর সাথে অনেক ইন্ডিয়ান নাচে। আমার স্ত্রীকে জনৈক অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের কাছে ইংরেজী শেখানোর উদ্যোগ নেয়া সত্ত্বেও সে কয়েকটি শব্দের বেশী শিখতে পারেনি। এমনকি সে 'গুড বাই' এর সাথে 'গুড মর্নিং'কে গুলিয়ে ফেলতো। আমি সপ্তাহে একদিন জিমখানা ক্লাবে যেতাম মুখ দেখানোর জন্য। ক্লাবের ইংরেজ সদস্যদের মদ্যপানে ডাকতাম। তারা সচরাচর এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতো না। আমোদ ফুর্তির জন্য ইন্ডিয়ানদের সাহচর্য পছন্দ করতাম। শিখদের চাইতে মুসলিম ও হিন্দু বন্ধুদের মিশতে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করতাম। একজন মুসলিম ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ছিলেন দিল্লীর সেরা গায়িকা। আমি তার বসবাসের জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করে দিলাম এবং প্রায়ই তাকে আমন্ত্রণ করতাম গান শোনার জন্য। আরেক হিন্দু বন্ধুর স্ত্রী ছিল অনিন্দ্যসুন্দরী এক মুসলিম মেয়ে। তার অ্যাপার্টমেন্টে প্রায়ই যেতাম মদ্যপান ও আড্ডা দেয়ার জন্য। যতটা সম্ভব আমি গনিকালয়ে আমোদফুর্তির জন্য যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতাম।

ভাইসরয় হিসেবে লর্ড চেমসফোর্ডের স্থলাভিষিক্ত হলেন ষাট বছর বয়স এক বৃদ্ধ লর্ড রিডিং। তার কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। নিজে ছিলেন এক ফল বিক্রেতার সন্তান। ইহুদী হলেও লোকটির মেধা ছিল। ইহুদী হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রমাণ করতে চাইতেন যে, ইংরেজদের চাইতেও তিনি অধিক বৃটিশ। ১৯২১ সালে তিনি যখন ভারতে আসেন তখন শিখরা তাদের গুরুদুয়ারাগুলোকে উত্তরাধিকার সূত্রে পুরোহিতদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আন্দোলন করছিল। গান্ধী ও তার কংগ্রেসওয়ালারা দাবী করছিল স্বরাজের এবং মালাবারের মোপলা মুসলিমরা হিন্দু মহাজনদের বিরুদ্ধে মাথা তুলেছে। লর্ড রিডিং গান্ধীকে চা পানের আমন্ত্রণ জানালেন তাকে আয়ত্ত করার জন্য। কয়েক মাস পর তিনি গান্ধী, দুই নেরু-মতিলাল ও জওয়াহের লালকে কারারুদ্ধ করলেন। সকলে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত সফরের প্রতিবাদে বয়কট আহ্বান করেছিল।

ঘটনাচক্রে প্রিন্স অব ওয়েলসের সাথে ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনও আসেন এবং লর্ড রিডিং-এর দেয়া এক পার্টিতে মাউন্টব্যাটেন এডউইন অ্যাশলের বাগদত্তা হন। মোপলাদের বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে। ভাইসরয় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। রিডিং সেই ধরনের লোক যিনি ইন্ডিয়ানদের সাথে তার বন্ধুত্ব করতেন তাদের মনকে জানার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কংগ্রেসের জোয়ার ঠেকানোর জন্য তিনি তেমন কিছু করতে পারেননি। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিজয় লাভ করে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় মতিলাল নেহেরু প্রধান মুখপাত্র নির্বাচিত হন।

লর্ড রিডিং দিল্লীকে গভার চাইতে ভারতীয় রাজনীতির প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে পড়েন। তবু তার সময়েই নগরী তার নিজস্ব রূপ নেয়া শুরু করে। ভাইসরিগ্যাল প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং শুধুমাত্র আসবাবপত্র ও ফিটিংসের কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। সচিবালয়ের দুই ভবনের কাজ

সমাপ্তির পথে। পার্লামেন্ট ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং অনেক বাংলো ও কোয়ার্টারের কাজও শেষ। আমি কিছু দোকানপাট নির্মাণ করেছি যার উপরতলায় অ্যাপার্টমেন্ট। দিল্লীর প্রথম সিনেমা হল, রেস্টুরেন্ট ও ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নির্মাণের কৃতিত্বও আমারই। নতুন ভাইসরয় পঞ্চাশ্লিশ বছর বয়স্ক লর্ড আরউইনের আগমনের সাথে সাথে নির্মাণ প্রকল্প সমাপ্তির তাগিদ এলো। লর্ড আরউইনের মাত্র একটি হাত থাকায় ভারতীয়দের কাছে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'টুঞ্জা লাট' বলে। অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ হওয়ার কারণে লোকে তাকে পাদ্রীও বলতো। ভাইসরিগ্যাল প্রাসাদ ও সচিবালয় ভবন দু'টি একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হলো, কারণ নতুন ভাইসরয় নতুন নগরীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। আমরা তিন শিফটে দিনরাত কাজ করলাম।

ভাইসরয় ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্টদের সাথে এতো অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, আমাদের মনে হলো বৃটিশ ও ইন্ডিয়ানরা অংশীদারের মত হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। কিন্তু মূল সমস্যা দাঁড়ালো যে, ন্যাশনালিস্টরা বহু উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। কেউ বৃটিশদের সাথে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। অন্যেরা তাদেরকে দেশ হতে বিতাড়ন করতে চায়, এমনকি প্রয়োজনে বলপূর্বক। এ ধরনের একটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি।

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসের এক সকালে সেন্ট্রাল এসেম্বলীর দর্শক গ্যালারীতে বসে আছি। আমাকে বলা হয়েছিল যে, এসেম্বলীতে বিতর্ক অত্যন্ত প্রাণবন্ত হবে। কারণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারের আনীত পাবলিক সেফটি বিলের বিরুদ্ধে কংগ্রেস তার সকল যুক্তি অবতারণা করবে। আমি অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের উপর চোখ বুলাচ্ছিলাম পত্রিকায় দেখা ছবির সাথে কোন সদস্যের চেহারা মিলাতে পারি কিনা। আমার ডান পাশে দু'জন যুবক ছাড়া গ্যালারীর অন্যান্য দর্শকদের প্রতি আমি দৃষ্টি দেইনি। তারা কোট বা টাই পরেনি। মনে হচ্ছিল কলেজ পড়ুয়া ছেলে। আমি যেমনটি আশা করেছিলাম বিতর্ক তেমন আকর্ষণীয় মনে হলো না। বাক্যবাগীশদের সুদীর্ঘ বক্তৃতা আমার কানে স্পষ্টভাবে আসছিল না। আমি একটি পত্রিকা সঙ্গে এনেছিলাম সেটির হেডলাইনের উপর দৃষ্টি দিলাম। হঠাৎ প্রচন্ড একটি বিস্ফোরণের শব্দ কানে এলো। চোখ তুলে দেখলাম, আমার পাশে বসা যুবক দু'টি সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়ছে। নীচ থেকে ধুঁয়া উঠছে এবং প্রত্যেকে দরজার দিকে দৌড়াচ্ছে অথবা বেঞ্চের পিছনে আশ্রয় নিচ্ছে। দর্শক গ্যালারী শূন্য। আমি আসনেই বসে রইলাম। পাশে গুলীবর্ষণরত দুই যুবক। তারা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। হঠাৎ একজন যুবককে দেখলাম বন্দুকের গায়ে চাপড় দিতে। এটিতে গুলী আটকে গেছে অথবা গুলী ফুরিয়ে গেছে। উদ্যত পিস্তল হাতে পুলিশ এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্ট নির্দেশ দিলো, 'হ্যান্ডস আপ'। আমরা হাত উপরে তুললাম। অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে যুবকদ্বয় আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার কারণে পুলিশ আমাকে চিনতে পেরে আমাকে ভবন থেকে বের করে আনলো।

আইন প্রণেতাদের হত্যা করে যুবকরা কি অর্জন করতে চেয়েছিল তা আমার ধারণার বাইরে। আমি জানতাম তাদের ফাঁসি দেয়া হবে। তাই করা হলো ইতিপূর্বে একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সার্জেন্টকে হত্যার জন্য। (ভগত সিং, সুখ দেব ও রাজগুরুকে ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ফাঁসি দেয়া হয়।) কিন্তু আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হলো যে কংগ্রেস নেতারা এক নিঃশ্বাসে অহিংসার কথা বলে আরেক নিঃশ্বাসে রাজনৈতিক হত্যাকান্ডকে উৎসাহিত করে। তাদের মনোভাবে পাদ্রী আরউইন পর্যন্ত হতাশ হলেন। এক বিবৃতিতে তিনি বললেন, "একদিকে কোন অপরাধের নিন্দা করে, পরক্ষণেই যার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাকে দোষারোপ করা সত্যিকার অর্থে নিন্দা প্রকাশ নয়।"

আমি সময়ের সাথে তাল মিলাতে পারলাম না। আমি বিশ্বাস করতাম যে, ভারতের জন্য বৃটিশ শাসনই ভালো। আমরা ভারতীয়রা সকল সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায় ও পক্ষপাতহীন প্রশাসন পরিচালনায় কোনদিন সক্ষম হবো না। কিন্তু আমার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অন্য কেউ একমত হতে পারে বলে মনে হলো না। আমার বৃদ্ধা মা যিনি এক সময় রাণী ভিক্টোরিয়ার ছবির সামনে সুগন্ধি আগরবাতি জ্বালাতেন, এখন তিনিই চরকা কেটে সময় কাটান এবং একদিন গান্ধীকে উপহার দেয়ার জন্য তার নিজ হাতে তৈরী সূতার একটি বান্ডিল আমাকে দিলেন। আমার দুই পুত্র স্কুলের ইউনিফর্মের জন্য কাপড় কিনতে গিয়ে 'খাদী' কাপড় কিনে আনলো। কারণ গান্ধী বৃটিশ কাপড়

বয়কট করার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি জানি, আমার শিখ কর্মচারীরা আমার পিছনে আমাকে 'ঝোলি চুক' (ভিক্ষার জন্য থলে মেলে ধরা) বলে বিদ্রূপ করে। অনেক সময় পুলিশ নিয়ে দাঙ্গা দমন করতে গেলে জনতা চীৎকার করতো 'ব্যাং-এর বাচ্চা' বলে। কিন্তু আমার বিশ্বাসে আমি অটল যে আমার জীবদ্দশা পর্যন্ত বৃটিশ শাসকরা এ দেশে থাকবে। আমি তাদের নুন খেয়েছি এবং তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না।

ন্যাশনালিস্টদের সাথে আপোষ করতে লর্ড আরউইন যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তার বর্তমানেই স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বের একটি কমিশন ভারতে এলো ১৯২৩ সালে। কমিশনে অ্যাটলিও ছিলেন। কমিশন যেখানেই গেল ন্যাশনালিস্টরা এর বিরুদ্ধে সর্বত্র ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো। ভারতকে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেয়ার ব্যাপারে আলোচনার জন্য আরউইন লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করলেন। ন্যাশনালিস্টরা প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করলো এবং দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে শুধুমাত্র গান্ধীকে পাঠালো। দেশকে নৈরাজ্যের দ্বারপ্রান্তে নেয়ার উদ্দেশ্যে তারা একটির পর আরেকটি 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু করলো। তারা 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংসার' কথা বলে, কিন্তু বোমাবাজি ও রাজনৈতিক হত্যাকান্ডে জড়িত হয়। তার জ্বাজ্বল্যমান নজীর হচ্ছে, লর্ড আরউইনের মত ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তির প্রতি তাদের আচরণ। নয়াদিল্লীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন ধার্য হয়েছে। ভাইসরয়ের স্ত্রী লেডি ডরোথি ভাইস রিগ্যাল প্রাসাদ সজ্জিত করার জন্য উপযুক্ত ধরনের পর্দা ও অন্যান্য সামগ্রী এবং মোগল উদ্যানের জন্য ফুলগাছ পছন্দ করতে সাহায্য করার জন্য স্থপতি লুটিয়েনসকে ডেকে পাঠালেন। ১৯৩১ সালে ২৩শে ডিসেম্বর ভাইসরয় ও তার স্ত্রী ট্রেনযোগে এলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। নয়াদিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেসব বিশেষ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমিও তাদের একজন। স্টেশনে প্রবেশের জন্য ট্রেন তার গতি মন্থর করতেই লাইনের নীচে পেতে রাখা একটি বোমা বিস্ফোরিত হলো। সৌভাগ্যবশতঃ ভাইসরয়ের কম্পার্টমেন্টের বদলে তার পিছনেরটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। ভাইসরয় ও তার স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও স্বাভাবিক মনে হলো এবং কোন কিছুই সংঘটিত হয়নি এমনভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। অথচ ইনিই সেই ভাইসরয় যিনি ভারতকে তার হৃদয় দিয়েছিলেন, তিনি তার বাসভবনের মুখোমুখি এক স্তম্ভে উৎকীর্ণ করেছিলেন,

In thought faith
In word wisdom
In deed courage
In life service
-So may India be great.

আমার পুরস্কার এলো খেতাবের আকারে- সরদার বাহাদুর এবং পরে সিবিই, তারপর নাইটহুড ও রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনয়ন। আমি জানি না, ন্যাশনালিস্টরা আমার পিছনে এসব খেতাব সম্পর্কে কি বলে। কিন্তু প্রতিটি খেতাব প্রাপ্তির পর তারা দলে দলে এসে আমাকে ফুলের মালা দিয়ে অভিনন্দিত করে। ইতিমধ্যে আমাকে নয়াদিল্লীর প্রধান নির্মাতা হিসেবে বিবেচনা করা শুরু হয় এবং প্রায়ই নতুন নগরীর অর্ধেকের মালিক (যা পুরোপুরি অসত্য) বলে উল্লেখ করা হয়। আমি এখন কুইনসওয়েতে এক বিশাল দোতলা বাড়িতে বাস করি। জন্তর মন্তর রোডে আমার পূর্বের বাড়িটির নামেই এই বাড়িরও নাম দিয়েছি 'বৈকুণ্ঠ' (স্বর্গ)। উর্ধতন ন্যাশনালিস্ট নেতারা আমন্ত্রণ মাত্রই আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। এক সময় সাপ্রু, জয়াকর, সি রাজা গোপালাচারী আমার সাথে ছিলেন। গান্ধী আমার নতুন বাড়ীর সামনের রাস্তার ওপারে বিড়লা হাউসে থাকতেন। রাস্তার আরেক পাশে জিন্নাহর বাড়ী। আমার গোলাপ বাগানে পায়চারি করতে করতে তারা রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন।

আমি এখন বৃদ্ধ লোক। জীবনে গুরুত্বপূর্ণ যা কিছু দেখার সবই দেখেছি। ভারত ভারতীয়দের দ্বারাই শাসিত হচ্ছে এবং নতুন বংশধররা আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'সারাটা জীবন

বৃটিশের পাদুকা লেহন করে তুমি কি পেলে?'

আমি জ্ঞানী লোক নই এবং ইতিহাসও পাঠ করিনি। কিন্তু উত্তরে যা বলি তা আসে হৃদয় থেকে। বিশেষতঃ আমি দু'চোখে যা দেখেছি, নিজের দেশবাসী ও ইংরেজদের সাথে মিশে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার ভিত্তিতে। যে নগরীকে নির্মাণ করতে আমি সাহায্য করেছিলাম এবং স্থপতি লুটিয়েনস দুই শতাব্দীর জন্য যে নগরী পরিকল্পনা করেছিলেন বিশ বছরের মধ্যে তার উপর ধ্বংসলীলা নেমে আসতে দেখলাম। আমরা চমৎকার সব অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলাম, যা অনেক শতাব্দী পর্যন্ত টিকতে পারতো। যেখানেই খোলা জায়গা ছিল সেখানেই ভারতীয়রা নির্মাণ করলো শ্রীহীন বহুতলা ভবন এবং কোঠাবাড়ী। এ কাজ করতে তারা শত শত প্রাচীন ভবন ও সৌধ ধুলিস্যাৎ করলো। আমরা প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেছিলাম, তারা নির্মাণ করলো সংকীর্ণ গলি যা দিয়ে দু'টো গাড়ী পাশাপাশি অতিক্রম করতে পারে না। আমরা মন্থর বর্ধনশীল দীর্ঘজীবী বৃক্ষ রোপণ করেছিলাম, যা আমাদের নাতির নাতিদের ছায়াদান করবে। তারা রোপণ করলো গুলমোহর জাতীয় বৃক্ষ যেগুলো এক পক্ষ বা মাস খানেক ফুল দেয়, কিন্তু কোন ফল বা ছায়াদান করে না। তাদের ইচ্ছা, যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে কিছু একটা করে দেখানো। অতীত বা ভবিষ্যত সম্পর্কে তাদের মাথাব্যথা নেই। ইতিহাসের কোন পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে আমি হিন্দু বা মুসলিম যুগ পছন্দ করবো না, এমনকি উত্তর ভারতে শিখদের স্বল্পকালীন শাসনের যুগও নয়, আমি বৃটিশ যুগে জন্মগ্রহণ করতে চাইবো। বৃটিশ রাজের অধীনে একজন নির্মাতা- ঠিকাদার হিসেবে পুনরায় বসবাস করতে চাইবো।'

তারা আরো বিদ্রূপ করে যে, 'ভারতীয় হওয়ার কারণে কি তুমি গর্বিত নও? বিদেশী শাসকের প্রশংসা করতে কি তোমার লজ্জা হয় না, যারা শত বছরের অধিককাল আমাদের শোষণ ও নিপীড়ন করেছে? ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা তোমার পূর্ব পুরুষের সাথে কি আচরণ করেছে তা কি তুমি ভুলে গেছো? ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরীহ মানুষকে হত্যার ঘটনাকে কি তুমি উদারভাবে ক্ষমা করে দিয়েছো? যতটা শান্তভাবে সম্ভব, আমি জবাব দেই, 'না আমি কোন কিছুই ভুলিনি এবং এটাও ভুলিনি যে, ভারতীয়রা পরস্পর কি করেছে। দিল্লীতে তাদের কাজের কিছু নমুনা আমি দেখাতে পারি। মন্দিরের স্থলে মসজিদ, মসজিদের স্থলে মন্দির, গুরুদুয়ারার স্থলে মন্দির তৈরী করেছে এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানরা। আমাকে হিন্দু, মুসলিম বা শিখদের একটি প্রার্থনা স্থলের কথা বলো, যেটি বৃটিশদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে? কোন কোন শাসকের রাজ্য দখলের সময় কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বয়স্ক, নবজাত বা তাদের মা কেউ রেহাই পায়নি। বৃটিশের দ্বারা একটি হত্যাযজ্ঞের নজীর উল্লেখ করো। তোমাদের তথাকথিত প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুরে তাদের নারী ও শিশুদের হত্যা করার পরও তারা তোমাদের নারী ও শিশুদের স্পর্শ করেনি। তারা কিছু লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। কিছু বাজার মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। বাস, এ পর্যন্তই।

তারা প্রতিবাদ করে, 'না এই সব কিছু নয়। তারা আমাদের সাথে কুকুরের মতো আচরণ করেছে- কুকুরের চেয়ে খারাপ। কারণ তারা কুকুর পূজারী। তারা আমাদেরকে বলে 'নিগার', তাদের ক্লাবে লেখা থাকে 'শুধুমাত্র ইউরোপীয়দে'র জন্য। ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট বরাদ্দ থাকে 'শুধুমাত্র ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের' জন্য। সাদা মানুষের জন্য এক আইন, কালো মানুষের জন্য আরেক আইন।'

আমিও পাল্টা প্রতিবাদ করি, বৃটিশরা আসার আগে ভারতে ন্যায়বিচার বলে কিছু ছিল না। বৃটিশের প্রভাব শেষ হওয়ার পরও ভারতে ন্যায়বিচার থাকবে না। তাদের বিরুদ্ধে বক্ বক্ করার জন্য তারা তোমাদের স্বাধীনতা দিয়েছিল। তোমরা যখন নৈরাজ্য ছড়িয়েছো তখনই কেবল তারা ব্যবস্থা নিয়েছে। তোমরা কি বৃটিশ ছাড়া আরেকটি এমন জাতির কথা ভাবতে পারো ,যারা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের গান্ধী, নেহেরুদের বিদ্রোহের বাণী প্রচারের পরও সৌহার্দ্য বজায় রাখবে? তারা যদি জার্মান, ফরাসী, রুশ, ইতালীয়, চীনা বা জাপানী হতো তাহলে তারা কংগ্রেসওয়ালাদের নিকটস্থ বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে রাখতো।'

'তারা যদি সে চেষ্টা করতো তাহলে এখানে অবস্থান আরো স্বল্প স্থায়ী হতো। ইউরোপে তারা যখন গলা সমান সমস্যায় আকীর্ণ, সেই প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীনতা

সংগ্রামীরা তাদের লাথি মেরে বের করে দিতে পারতো।'

'স্বাধীনতা সংগ্রামী- ঘোড়ার ডিম!' আমি চীৎকার করে বলি, 'ভাড়া করা শ্লোগানদাতারা, যারা নিজেদের বাড়ীর চাইতে কারাগারে আরামদায়ক সময় কাটায়। আর এখন চাইছে আজীবন ভাতা লাভের অধিকার। এসব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্পর্কে আমার কাছে বলো! তাদের কথায় আমার বিরক্তি আসে।'

তারা বলেন, 'তোমার মগজ ধোলাই করা হয়েছে।' বৃটিশরা বিদায় নেয়ার পর ভারতের মহান অগ্রগতির কথা বলে, 'একশ বছরের বৃটিশ শাসনে যা হয়নি স্বাধীনতার দশ বছরে সেই উন্নতি হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের সবই আমরা উৎপাদন করি। আমরা বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন করেছি। বিশ্বের সেরা বস্ত্র আমরা উৎপাদন করি। আমাদের নিজস্ব গাড়ী, বিমান, ট্যাংক, কামান তৈরী করি। আমরা পারমাণবিক বোমা তৈরী করতে পারি। মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাতে পারি, সাগর বক্ষ হতে গবেষণা সামগ্রী সংগ্রহ করি। অ্যান্টার্কটিকায় ভারতীয় তিন রঙা পতাকা উড়ে। তোমার দেশের এই সাফল্যে কি একটু গর্বও তুমি অনুভব করো না?'

'হ্যা, আমি গর্ব অনুভব করি। অমঙ্গলের আশংকাও অনুভব করি। আমরা হলাম দরিদ্রের চাইতেও দরিদ্র। বিশ্বের মুর্খদের মধ্যে সবচেয়ে মুর্খ। আমরা খরগোসের মত বংশ বিস্তার করি। খুব শিগগিরই আমরা যা খাওয়াতে পারবো, বস্ত্র দিতে পারবো, আশ্রয় দিতে পারবো- তার চাইতে সংখ্যায় বহুগুণ হবো। তখন আমরা গোবরের গাদায় কুকুরের মত লড়াই করবো। আমরা দুর্নীতিবাজদের মধ্যেও সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্বল্প বেতনভোগী পুলিশ সিপাই-এরও নিজ মূল্য আছে। আমরা সবচেয়ে নৈরাজ্যময় জাতিগুলোর মধ্যে নৈরাজ্যের প্রতি অনুরক্ত। ১৯৪৭ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আমরা কি দেখেছি? আমরা একে অন্যকে ছাগলের মত জবাই করে নিজেদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করেছি। ভবিষ্যত বছরগুলোতে আরো খারাপ অবস্থাই দেখবে। হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান, শিখ, বৌদ্ধরা পরস্পর পরস্পরকে অগণন সংখ্যায় হত্যা করবে। তোমাদের গান্ধী ও তার অহিংসা মরে গেছে- মরে গেছে।

১৯

ভাগমতী

আমি ছাড়া ভাগমতীর আরেকটি অতি প্রিয় বস্তু হচ্ছে আম। এ বছরটি আমের জন্য চমৎকার। কিন্তু বর্ষা খুব খারাপভাবে এসেছে। দিল্লীতে এমনটি সচরাচর ঘটে। প্রথম আমের চালান আসে এপ্রিলের দিকে তামিল নাড়ু হতে। মাংসল আম। মে মাসে আম আসে মহারাষ্ট্র হতে। বিভিন্ন আকৃতির সুন্দর সুন্দর আম। অত্যন্ত সুস্বাদু, কিন্তু ঘাতক দাম। দিল্লীতে বসবাসরত বিদেশীরা যখন থেকে আমের স্বাদ নিতে শুরু করেছে, দামে আগুন লেগেছে তখন থেকেই। কোন শিল্পপতি বা মন্ত্রী আমাকে এক ঝুড়ি আম পাঠালেই কেবল আমি মহারাষ্ট্রের আমের স্বাদ নিতে পারি। পড়শীদের কাছে কিছু আম প্রেরণ করি এই আশায় যে বিনিময়ে তারা উত্তর প্রদেশের আম বাজারে এলে আমাকে দেবে। ভাগমতী আমার জীবনে আসার পর আমাকে আমের জন্য উদগ্রীব থাকতে হয়, কারণ আমি আম খাওয়ার সুযোগ পাই না। এক সাথে সে তিনচারটি খেয়ে ফেলে। ছাল চেটে, আটি চুষে এমন আবেগে সে আম খায় যে, কোন রসই আর অবশিষ্ট থাকে না। আম খাওয়া শেষ হলে সে সশব্দে ঢেকুর তুলে। হাত মুখ ধোয় এবং টেবিলের উপর অবশিষ্ট আম শাড়ীর আঁচলে বেঁধে নেয় বাড়িতে নেয়ার জন্য। 'আমি জানি, আপনি এগুলো কিনেননি। এ মওসুমে আমার পরিবার আম খেতে পারেনি।' যেতে যেতে ভাগমতী বলে।

উত্তর প্রদেশের বাগানের দশেরী, ল্যাংড়া, রাতুল আমের সাথে বিশ্বে তুলনীয় আর কোন ফল নেই। হাজার রকমের আমের মধ্যে এই তিন ধরনের আমের প্রতি আমার দারুণ লোভ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই আমগুলো ভাগমতীরও পছন্দ। আমের মওসুমে সে ঘন ঘন আমার কাছে আসে। যখনই আসে আমার আমে ভাগ বসায় এবং যেগুলো খেয়ে শেষ করতে পারে না সেগুলো সাথে নিয়ে যায়। সে বলে যে, তার হজমের জন্য আম অত্যন্ত উপকারী। কোষ্ঠকাঠিন্যে মহৌষধ।

আগেই উল্লেখ করেছি, বর্ষণ ভালো হচ্ছে না। জুনের প্রথম সপ্তাহে আমি বর্ষার পাখীগুলোর ডাক শুনলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই বর্ষা শুরু হওয়া উচিত। ভারতের অন্যান্য অংশে ভারী বর্ষণের খবর আসছে। বোম্বে ও কোলকাতার রাস্তা পানির নীচে এবং আসামে ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। কিন্তু জুন ও জুলাইএ দিল্লীতে এক ফোটা পানিও ঝরলো না। আগস্টে সামান্য বৃষ্টি হলো। গত তিন মাস ধরে মেঘের গানের পাখী পাপিয়ার ডাক শোনা যায়নি। ভাগমতী পাঁচ নম্বর ল্যাড়া আমে কামড় বসিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করলো, 'এবার দুর্ভিক্ষ হবে। দিল্লীর রাস্তায় লোকজন না খেয়ে মরবে।' এরপর সে দার্শনিকের মত ভাব করে বললো, 'এ কোন ব্যাপারই নয়, এই শহরে সবসময় লোক মরছে। যদি ক্ষুধায় না মরে, তাহলে কলেরা, প্লেগ, গুটি বসন্ত, খুন, আত্মহত্যায় লোক মরছে। অথবা বার্ধক্যজনিত কারণে।'

২০

দেশ বিভাগ ও গান্ধীর হত্যাকান্ড

দিল্লীতে কিভাবে আমাদের আগমন ঘটলো তা সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। এক বিস্তীর্ণ মরুভূমির মাঝে ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমরা বাস করতাম। গ্রামের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে গেছে ঝিলাম নদী। উত্তরদিকে বৃক্ষহীন পাহাড়ের সারি, যেখানে পাথুরে লবণ ছাড়া আর কিছু জন্মে না। এছাড়া যতদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। হাদালীতে প্রায় দুশ' পরিবারের বাস। এর মধ্যে একশ' ষাটটি মুসলমান পরিবার। অবশিষ্ট হিন্দু ও শিখ। মুসলমানরা মরুভূমি ও উটের রশির মালিক। তারা কুয়ার আশেপাশে সামান্য জমিতে গম ও কিছু সব্জী চাষ করে এবং পতিত জমিতে খেজুর গাছ হতে খেজুর সংগ্রহ করে। তারা সেনাবাহিনী ও পুলিশে তাদের ছেলেদের পাঠায়, সেই ছেলেরা বাড়িতে তাদের আয় পাঠায়। তারা অবসর গ্রহণ করে হাদালীতে ফিরে আসে। আমরা হিন্দু ও শিখরা ব্যবসায়ী ও সুদে টাকা খাটানো মহাজন। আমরা মুসলমানদের টাকা কর্জ দেই। তারা যদি সুদসহ টাকা ফেরত দিতে না পারে আমরা তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে টাকা উসুল করে নেই। আমরা পাহাড় থেকে পাথুরে লবণ কিনে মুসলমানদের উটের পিঠে দূরের শহর লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং জলন্ধরে প্রেরণ করি। লবণ বিক্রয় করে আমরা চা, চিনি, মশলা, কাপড় কিনে আনি মরুভূমির গ্রামে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।

আমরা শিখ ও হিন্দুরা বাস করি ইটের বাড়িতে। আঙ্গিনায় থাকে মহিষ। মুসলমানরা মাটির ঘরে থাকে এবং প্রতিদিন এক পাত্র দুধের বিনিময়ে আমাদের গোমহিষ চরায়। আমরা তাদের প্রতি খেয়াল রাখি, কারণ তারা দরিদ্র। তারাও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে কারণ আমরা সংখ্যায় অল্প এবং আমাদের দৈহিক আকার তাদের মত বৃহৎ নয়। তাদের নারীরাও আমাদের পুরুষদের চাইতে দীর্ঘ এবং শক্তিশালী। তারা কুয়া থেকে বালতিপূর্ণ পানি এমনভাবে তুলে যেন সেলাই-এর কাজ করছে। পানিপূর্ণ চারটি কলসী তারা বহন করতে পারে-দুটি মাথায় এবং দুই কাঁখে দুটি। দেখে মনেই হয় না যে তারা কাবু হয়েছে। তাদের পুরুষেরা ছয় ফুটের অধিক দীর্ঘ এবং মনে হয় যেন চাবুক দিয়ে তৈরী। আমরা তাদের দেখে ভয়ে থাকি।

যে ঘটনায় আমরা হাদালী ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম, আমি এখন সেটি বলবো। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের কোন এক সময় ঘটনাটি ঘটেছিল।

কয়েক মাস ধরে আমরা শুনে আসছিলাম যে, মুসলমানরা রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে হিন্দু ও শিখদের হত্যা করছে। আরো শুনেছি যে, হিন্দু ও শিখরা পূর্বদিকে পালাচ্ছে যেখানে বেশী মুসলমান নেই। এরপর আমরা শুনলাম, মুসলমানরা তাদের নিজেদের একটি দেশ পেয়েছে, যার নাম পাকিস্তান এবং হাদালী পাকিস্তানে পড়েছে। প্রবীণদের কেউ কেউ হাদালী ত্যাগ করে অন্যান্য হিন্দু ও শিখ যারা হিন্দুস্থানে যাচ্ছিল তাদের সাথে যোগ দেয়ার পরামর্শ দিলো। কিন্তু আমাদের টাকা কর্জ পড়ে আছে। আমাদের ইটের দালান, মহিষ আছে। অতএব কর্জের টাকা ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত এবং সম্পত্তি বিক্রয় না করা পর্যন্ত আমরা হাদালীতে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি, রাম রাখা, তখন বয়স ছিল ষোল বছর। আমার বোন লছমী বয়সে আমার ছোট। তার জন্মের সময়েই আমার এক জ্ঞাতিভাই-এর সাথে তার বাগদান হয়। (আমাদের মধ্যে এটা ব্যতিক্রম কিছু নয়। গর্ভবতী মহিলারা সচরাচর বাগদান করে থাকে যে তাদের গর্ভস্থ শিশু বিপরীত লিঙ্গের হলে বিয়ে হবে।) বাবা মা ভাবলেন যে, চৌদ্দ বছর বয়সী বালিকাকে বিয়ে না দেয়াটা সঠিক নয়। বিয়ের দিনক্ষণ নির্ধারিত হলো। আমাদের গ্রামের রীতি অনুযায়ী মুসলমানসহ গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীতে মিষ্টি পাঠানো হলো। বিয়ের দিন ধার্য করার পনের দিন পূর্বে বরের পিতা বিয়ের

অতিথিদের ভোজনের ব্যয় নির্বাহের প্রয়োজনে তার একজন খাতককে কর্জ পরিশোধের জন্য বললো। লোকটি যখন বললো যে, তার কাছে কোনো টাকা নেই তখন বরের পিতা তার বিরুদ্ধে একটি মামলা ঠুকে দিলো। এমন কাজ আগে কেউ করেনি। মুসলমানরা আমাদের পাঠানো মিষ্টি ফিরিয়ে দিলো। এ ধরনের ঘটনাও আগে কখনো ঘটেনি।

আমাদের বিয়ের প্রস্তুতি পুরোদমে চললো। নিয়ম অনুযায়ী আমার বোন বিয়ের পূর্বের শেষ সপ্তাহ এক বস্ত্রে ঘরের মধ্যে কাটালো। সপ্তম দিনে পরিবারের মেয়েরা তাকে স্নান করালো, হাতে মেহেদী লাগিয়ে দিলো এবং হাতীর দাঁতের বালা পরালো। ঢোলকের বাজনার তালে তালে তারা গান গাইলো। সন্ধ্যায় লছমী ও তার বান্ধবীরা এক সাথে ঘর থেকে বের হলো প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন করতে। তারা সবেমাত্র বসে কাজ সারছে তখনই একদল মুসলমান যুবক তাদের ঘেরাও করলো। মেয়েগুলো এতো আতংকিত হয়ে পড়েছিল যে, তারা সাহায্যের জন্য চীৎকার পর্যন্ত করতে পারেনি। লছমীকে চিনতে যুবকদের কষ্ট হয়নি। একজন যুবক তাকে তুলে ঘোড়ার উপর বসিয়ে মরুভূমির দিকে হারিয়ে গেল। আমার বাবার অবস্থা তখন হিতাহিত জ্ঞানশূণ্যের মত। চীৎকার করে তিনি মাথার চুল ছিঁড়লেন। গ্রামের রাস্তায় বের হয়ে মুসলমানদেরকে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালি দিলেন। দীর্ঘ তের মাইল মরুভূমির বালি ডিঙ্গিয়ে থানায় গিয়ে রিপোর্ট করলেন। দারোগাকে টাকা দিলেন। পরদিন তিনি পুলিশসহ গ্রামে ফিরে এলেন, লছমীকে যারা অপহরণ করেছে বলে তার সন্দেহ, তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ। দু'দিন পর আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গেলাম। অভিযুক্তদের হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হলো। বদমাশরা গোঁফে মোচড় দিয়ে আমাদের প্রতি বাজে ইঙ্গিত করলো। একজন উচ্চস্বরে বলে উঠলো, 'আগে হাদালীতে ফিরে নেই, এইসব কাফেরদের পাছা যদি চিড়ে না ফেলি তাহলে আমার নাম তুরাবাজ খান নয়।'

তাদের উকিল বললো যে, আমার বাবার অভিযোগ মিথ্যা, কারণ আমার বোন যে যুবককে ভালোবাসতো, স্বেচ্ছায় তার সাথে চলে গেছে। তিনি তুরাবাজ খানকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। এরপর লছমীকেও হাজির করা হলো। সে বোরখা পরে এসেছে। ফলে আমাদের চোখে তার চোখ পড়লো না। সে বললো, 'জি হ্যাঁ, আমি তুরাবাজ খানকে ভালোবাসি এবং তার সাথে স্বেচ্ছায় চলে এসেছি। আমি মুসলমান হয়ে তাকে বিয়ে করেছি। আমি আর বাবা মা'র বাড়িতে ফিরে যেতে ইচ্ছুক নই।'

দারোগা এবং পুলিশ সবাই মুসলমান। অভিযুক্ত এবং উকিল মুসলমান। আমাদের উকিলও মুসলমান। (সব হিন্দু উকিল ভারতে পালিয়ে গেছে।) ম্যাজিস্ট্রেটও একজন মুসলমান। তিনি বাবার অভিযোগ নাকচ করে দিয়ে অভিযুক্তদের তৎক্ষণাৎ মুক্তির নির্দেশ দিলেন। তারা উল্লাস প্রকাশ করে আদালত কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

আমরা নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করলাম। ম্যাজিস্ট্রেট মুসলমানদের ডেকে বললো, 'তোমরা যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ। এই কাফেরদের সাথে আর কিছু করো না।' দারোগা আমাদের কাছে আরো টাকা নিলো নিরাপদে হাদালীতে পৌঁছে দেয়ার জন্য। আমাদের বাড়ির বাইরে পুলিশ প্রহরা বসানো হলো। তারাও আমাদের থেকে টাকা নিলো।

কি করে আমাদের পক্ষে হাদালীতে বসবাস করা সম্ভব, যেখানে মাত্র কয়েকটি বাড়ীর পরই আমাদের রক্তমাংসের একজনের উপর বলাৎকার চলছে? আমাদের মেয়েরা বললো যে, তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যখন তারা কুয়া থেকে পানি নিয়ে ফিরে তখন মুসলমানরা নানা অঙ্গভঙ্গি করে। আমরা পুলিশের কাছে অভিযোগ করলাম। কিন্তু তারা কিছুই করলো না। এক সন্ধ্যায় যখন ধুলিঝড় শুরু হলো, আমরা হাঁড়ি-বাসন, লেপ-কাঁথার বোঝা বেঁধে মহিষের পিঠে চাপিয়ে হাদালী ত্যাগ করলাম।

আমরা সারা রাত ও দিন হাঁটলাম। তপ্ত বালি আমাদের মুখের উপর এসে পড়ছিল। সারগোদায় পৌঁছে আমরা দেখলাম সেখানে একটি শিবিরে হাজার হাজার হিন্দু ও শিখ ভারতে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের মহিষগুলো নিয়ে নেয়া হলো। অনেকগুলো দিন আমাদেরকে কাটাতে হলো শুধু শুকনো রুটি ও চাটনী খেয়ে। এরপর সিপাহীরা এসে তাদের ট্রাকে আমাদের ভরলো। সেখান থেকে তারা আমাদের নিয়ে গেল লাহোরে। আমরা দেখলাম

অসংখ্য লোক পায়ে হেঁটে ও গরুর বাড়ীতে করে যাচ্ছে ও আসছে। যারা আমাদের দিকে যাচ্ছিল তারা হিন্দু ও শিখ। যারা উল্টো দিক হতে আসছিল তারা মুসলমান। আমরা দেখলাম রাস্তার উপর বহু শিখ মরে পড়ে আছে। তাদের দীর্ঘ চুল ছড়িয়ে পড়েছে। দাড়ি ভর্তি মুখ মাছিতে ঢাকা পড়ে গেছে। আমরা ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করলাম। রাস্তার দু'পাশে আরো অনেক মৃতদেহ। তাদের লিঙ্গের আকৃতি দেখেই বুঝতে পারি, তারা মুসলমান। মৃতদের মধ্যে বহু নারী ও শিশুও আছে। আমাদেরকে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এক শিবিরে পাঠানো হলো। সেখানে ৭০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু তাবুতে বসবাস করছে। দীর্ঘ দিন আমরা রেশনের জন্য লাইনে দাঁড়ানো এবং যার সাথেই দেখা হয় তার সাথে কথা বলা ছাড়া আর কিছুই করিনি। আমার মা সারাদিন বোনের নাম ধরে কাঁদতো। এরপর অফিসাররা এসে বললো যে, আমাদের কাজকর্ম তালাশ করা উচিত। বাবা তাদের বললেন, 'কি ধরনের কাজ? আমরা তো মহাজন, টাকা কর্জ দেই। কিন্তু এখন আমাদের কর্জ দেবার মত টাকা নেই। যা হোক, বাবা এক শিখকে পোস্টকার্ড লিখলেন, যে বাল্যকালে হাদালীতে ছিল। এই শিখ নাকি ঠিকাদারী করে প্রচুর অর্থ বানিয়েছে এবং বহু বছর ধরে দিল্লীতে বসবাস করছে। দু'দিন পর তার চিঠি এলো। লোকটি আমাদেরকে দিল্লীতে যেতে বলেছে। আমরা দিল্লীর ট্রেনে উঠলাম।

ট্রেনে বাবা বললেন যে, এই শিখ এবং তিনি এক সময় হাদালীর বালিরাশির উপর একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন। আমরা দিল্লীর যত কাছাকাছি হচ্ছি, বাবার শৈশবের স্মৃতি তাকে ততো বেশী জড়িয়ে ধরছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, দেখা হওয়া মাত্র বাবা ও শিখটি একে অন্যের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হবে।

হাঁড়িবাসন ও লেপকাঁথার বোঝা মাথায় নিয়ে রেল স্টেশন থেকে দীর্ঘ ছয় মাইল পথ হাঁটতে হলো। বহু কষ্টে শিখের বাড়ির সন্ধান পেলাম। বাবা আমাদেরকে গেটের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দশ কদম গিয়েছেন কিনা সন্দেহ, এক বিরাট কুকুর তাকে ধাওয়া করলো। বাবা দৌড়ে ফিরে এলেন। আমাদের কাছে পৌঁছার পূর্বেই কুকুর তার শার্টের কোনা ছিড়ে ফেলেছ। খাকী ইউনিফর্ম পরা এক ব্যক্তি বের হয়ে এসে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলো যে, আমরা কি চাই? বাবা অত্যন্ত বিনীতভাবে জানতে চাইলেন যে, বাড়িটি অমুকের কিনা? লোকটি গর্জে বললো, 'হ্যাঁ, তোমার কি প্রয়োজন?' বাবা তাকে শিখের চিঠি বের করে দেখালেন। লোকটি বললো, 'এখানেই অপেক্ষা করো'। কুকুরটি দাঁত বের করে আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখলো।

লোকটি ফিরে এসে কুকুরটি একপাশে সরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে নির্দেশ দিলো তাকে অনুসরণের জন্য। আমরা জিনিসপত্র তুলে তাকে অনুসরণ করলাম। উদ্যানসহ বিশাল এক দ্বিতল বাড়ি এটি। শিখ ও তার স্ত্রী বারান্দায় বসে চা পান করছে।

শিখ চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললো, 'তুমি তাহলে এসে পড়েছো ,সাঈ দিত্তা'! বাবা মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে শিখের পদস্পর্শ করলো। মা মেঝের উপর বসে পড়ে শিখ মহিলার হাঁটুর উপর মাথা রেখে বিলাপ করতে শুরু করলো। মহিলাটি বললো, 'কেঁদে আর কি হবে? যা হবার তো হয়েছে।' ইউনিফর্ম পরা লোকটিকে মহিলা নির্দেশ দিলো আমাদেরকে রান্নাঘরে নিয়ে খাবার দিতে।

আমাদেরকে গ্যারেজে থাকতে দেয়া হলো। গ্যারেজের অর্ধেক জুড়ে ছিল বাক্স-পেটরা। অবশিষ্ট অর্ধেক হলো আমাদের বাসস্থান। বাড়িতে কেউ মারা গেলে লোকজন যেভাবে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিয়ে পড়ে থাকে, আমরাও সেভাবে পড়ে ঘুমালাম। এভাবেই নয়া দিল্লীতে আমাদের নতুন জীবন শুরু হলো।

বাবা মা আমার চাইতেও দ্রুত নতুন পরিবেশের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিলেন। বাবাকে নৈশ প্রহরীর চাকরি দেয়া হলো। তিনি সারারাত বাড়ীর চার পাশে এক হাতে লণ্ঠন এবং আরেক হাতে লাঠি নিয়ে টহল দিতেন এবং মাঝে মাঝে চীৎকার করতেন 'খবরদার হো'। বিরাট কুকুরটির সাথে ইতিমধ্যে তার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সারাক্ষণ কুকুরটি তার পাশে পাশে থাকে। যে শিখটি এককালে বাবার সেরা বন্ধু ছিল ,এখন তার সাথে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বলেন। মা

মেঝে ঝাড়ু দেয় এবং শিখের স্ত্রীর পা টিপে দেয়।

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশী আঘাত দিলো, তা হচ্ছে বাবা-মা আমার প্রতি বদলে গেছেন। অথচ এখন আমিই তাদের একমাত্র সন্তান। কারণটা আমি জানতাম। তাদের জমানো টাকা ফুরিয়ে গেছে। আমাদের তিনজনের খাবার সংগ্রহের জন্য বাবার বেতন পর্যাপ্ত না হওয়ায় ইতিমধ্যে মার সোনার চুড়ি ও কানের দুল বেঁচে ফেলতে হয়েছে। আমি যদি অতিরিক্ত একটি চাপাতি চাইতাম তাহলে মা ভর্ৎসনা করতেন 'তোর কি পেট, না কুয়া?' বাবা আমাকে 'আলসে' - অকর্মা' বলে গালি দিতে শুরু করলো। একদিন বাবা-মা দু'জনেই বকাঝকা করে বাড়ি থেকে বের হয়ে কাজের সন্ধান করতে বললেন। অতএব আমি এই অদ্ভুত নগরীর ততোধিক অদ্ভুত জগতের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলাম।

কোথা থেকে আমি শুরু করবো? বাবা আমাকে বললেন লোকদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিতে যে তাদের চাকরের প্রয়োজন আছে কিনা। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ দিল্লী নগরীতে সকলেই কাজের সন্ধান করছে। যে বাড়িতেই গেলাম গেটে দারোয়ান জানতে চাইলো, আমি কি কাজ জানি? আমি যখন তাকে বলতাম, তারা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতো। এভাবে আমি দিল্লীকে চিনলাম, নতুন এবং পুরোনো দিল্লী। বিশাল বিশাল অট্টালিকা দেখলাম, যেখানে বড় বড় কর্তারা বড় মোটরগাড়ী হাঁকিয়ে কাজে যায়, কেরানীরা যায় সাইকেল চালিয়ে। আমি সবগুলো বাজার চিনলাম, কোথায় কি পাওয়া যায়। কিন্তু কোন কাজ পেলাম না। বাবা আমার প্রতি কঠোর হলেন। মা তার থেকে আমাকে রক্ষা করতেন। সন্ধ্যার পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে আমি গ্যারেজে প্রবেশ করতাম। যখন বাবা তার কাজে বের হয়ে যেতেন, মা আমাকে খাবার দিয়ে আমি না ঘুমানো পর্যন্ত পাশে বসে থাকতেন। আমি প্রায়ই স্বপ্নে বৃক্ষহীন হাদালীর দিগন্ত দেখতাম এবং কল্পনায় আসতো বালিরাশি, যেখানে জোৎস্না রাতে আমি খেলতাম। আমি দীর্ঘ মুসলমান মহিলাদের দেখতাম, যারা মাথায় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কলসী। তাদের হালকা জামা ভিজে স্তনের বোটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং পায়ের তালে প্রকাশ পাচ্ছে উচ্ছ্বাস। কখনো কখনো স্বপ্ন পরিণত হতো দুঃস্বপ্নে। দেখতাম, মুসলমান পুরুষরা ক্ষিপ্ত বানরের মত বড়সড় লিঙ্গ নিয়ে আমার উপর উপগত হয়েছে। আমি গোঙ্গাতে শুরু করতাম। মা আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগাতো এবং হাতে মাথায় হাত দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়াতো।

বাবা আমার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলেন। মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করতেন ,কোন কিছু হলো কিনা। সারাদিন আমি কি কি দেখলাম তাও তিনি জানতে চাইতেন এবং ঘুরে দেখার জন্য তিনি আমার সাথে বের হতে চাইতেন।

এক মঙ্গলবারে মা তার গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আমার সাথে বের হলেন। আমি তাকে সরকারী সচিবালয় ও পার্লামেন্ট ভবন দেখালাম। তিনি এতোটা অবাক বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালেন, যেন তিনি ছোট্ট বালিকা। মা আমাকে যাবতীয় প্রশ্ন করলেন। আমি সবকিছুর উত্তর দিলাম। আমি যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি আমাকে তা ভাবতে দিলেন। বাস ও গাড়ীর ভিড়ে ভীত হয়ে পড়লে মা আমার হাত আঁকড়ে ধরতেন। তিনি আমাকে ভাবতে দিলেন যে, আমি শক্তিশালী, বয়স্ক ও দায়িত্বশীল লোক। তাকে বিড়লা মন্দিরে নিয়ে গেলাম। তিনি শিব, পার্বতী, গণেশ, বিষ্ণু দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন। তিনি লক্ষ্মীর জন্য প্রার্থনা করলেন। একটি তামার পয়সা আমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে সেটি পন্ডিতের হাতে দিলেন। পন্ডিতকে বললেন, আমার কপালে পবিত্র ভস্ম মাখিয়ে দিতে এবং আশির্বাদ করতে যাতে আমি একটি চাকরি পাই।

বিড়লা মন্দির থেকে আমরা হনুমান মন্দির গেলাম। এখানে বিরাট জনতার ভিড় এবং মিষ্টি, খেলনা, বেলুন ও চুড়ির দোকানপাটের ছড়াছড়ি। এখানেও মা পন্ডিতকে একটি পয়সা দিলেন এবং হনুমানজীর কাছে প্রার্থনা করলেন আমার চাকরির জন্য। এরপর আমরা দোকানে দোকানে ঘুরলাম। মা আমাকে কয়েকটি পয়সা দিলেন কাঁচের চুড়ি কেনার জন্য এবং চুড়িগুলো হাতে পরলেন। আমরা যখন মন্দির ত্যাগ করলাম তখন সূর্য ডুবে গেছে এবং আকাশ ধূসর দৈত্যের মতো নিদ্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কনট সার্কাসের বৃক্ষগুলো ময়না ও টিয়ার কলকাকলিতে মুখরিত। মা আরেকবার আমার হাত ধরলেন। আমরা চমৎকার সব পোশাক পরা নারী পুরুষকে দেখলাম, কেনাকাটা করতে ও সুন্দর মোটরগাড়ী হাঁকিয়ে যেতে। যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন রীতিমতো

অন্ধকার। বাবা লাঠি ও লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে পড়েছেন এবং 'খবরদার হো' চীৎকার করছেন। মা যদিও খুব ক্লান্ত... তিনি আমার খাবার গরম করে আনলেন। আমি শুয়ে পড়লে মাথাটা তার কোলে তুলে নিয়ে তালুতে তেল ঘষে দিলেন। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তার শেষ কথা আমার কানে এলো, দেবতাদের অন্তত একজন আমার প্রার্থনা শুনবেন এবং তোমার একটা কাজ জুটিয়ে দেবেন।

দেবতারা মার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল এবং পরদিন সকালেই আমি একটি কাজ পেলাম। কাজটা কোথায় হতে পারে? রাস্তার ঠিক ওপারের একটি বাড়িতে। এটি ভিন্ন এক কাহিনী।

যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেটির সামনেই একটি মোড়, যেখান থেকে বেশ ক'টি রাস্তা বের হয়ে গেছে। এটি রাস্তার ওপাশে জিন্নাহ সাহেবের বাড়ী, যিনি পাকিস্তান তৈরী করেছেন। পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পূর্বে এই গরুখোর জিন্নাহ বাড়িটি এক ধনী হিন্দুর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন, যিনি বাড়িটিকে গো-রক্ষা সমিতির সদর দফতরে পরিণত করেছেন। আমাদের গ্যারেজের ঠিক মুখোমুখি রাস্তাটার ওপারে একটি সুবিশাল বাড়ী, যার মালিক শেঠ বিড়লা। মন্দির প্রতিষ্ঠাকারী বিড়লার ভাতিজা। এই বিড়লা নাকি ভারতের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। বাড়ীটির গেটে সবসময় জনতার ভিড় এবং প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকে। প্রথমে ধারণা করেছিলাম লোকগুলো বোধহয় আমার মতই চাকরি খুঁজছে। সে কারণে আমি সেদিকে মনোযোগ দেইনি। তাছাড়া পুলিশকে আমি ভয় করতাম। আমি লাউড স্পীকারে গান ও বক্তৃতা শুনতাম এবং শুনেছিলাম সেখানে মহাত্মা গান্ধী বাস করেন এবং যে কেউ তার দর্শনের জন্য যেতে পারে। পরদিন সকালে আমি গান্ধীজির দর্শনের জন্য গেলাম। কেউ আমাকে বাধা দিলো না। বাড়ির সামনের লনে শ্বেতাঙ্গ সাহেব ও মেমসাহেবসহ অনেক লোক। সম্মুখে একটি প্ল্যাটফর্ম এবং তাতে একটি মাইক্রোফোন। আমি এক কোণায় বসে পড়লাম। একদল যুবক এসে আমার কাছে বসলো। কয়েক মিনিট পর মহাত্মা এলেন এক মহিলার কাঁধে ভর করে। সবাই উঠে দাঁড়ালো। কিছু লোক আওয়াজ তুললো, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়।' আমার কাছে উপবিষ্ট যুবকরা চীৎকার করলো, 'ভারত মাতা কি জয়।' মহাত্মা গান্ধী প্ল্যাটফর্মে উঠে বসে দুই চোখ বন্ধ করলেন। একদল নারী পুরুষ সুর করে গাইতে শুরু করলো,

'রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম।'

আমি কখনো এই গান শুনিনি। গানটি আমার কাছে মধুর লাগলো। এরপর তারা গাইলো ঃ

'ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম
সব কো সম্মতি দে ভগবান।'

এই কথাগুলোও ভালো লাগলো। আমার কাছে বসা এক যুবক বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো, 'ঈশ্বর আল্লাহ নয়, বরং মোহাম্মদ আল্লাহ তেরে নাম'।

সঙ্গীত শেষ হলে দাঁড়িওয়ালা এক মুসলমান এসে মহাত্মার পাশে বসলো। লোকটি একটি বই খুলে মাইক্রোফোন তার মুখের কাছে টেনে নিলো। কিছু বলার চেষ্টা করলো লোকটি। আমার পাশের যুবকরা চীৎকার শুরু করলো, 'শাট আপ-মুসলমানরা আমাদের মা-বোনদের বলাৎকার করেছে। আমরা এ দেশে কুরআন পড়তে দেব না। লাফ দিয়ে উঠে তারা শ্লোগান দিতে শুরু করলো, 'ভারত মাতা কি জয়'।

মহাত্মা মাইক্রোফোন তার দিকে টেনে নিলেন। দন্তহীন ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বললেন, 'ভাই ও বোনেরা, আমি সব ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। তোমরা যদি আমার সাথে একমত হতে না পারো, তাহলে আমার প্রার্থনা সভায় এসো না। তোমরা যদি বাধা দাও, একা প্রার্থনা করবো। নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যাও এবং মনে মনে ভেবে দেখো যে, আমাদের স্বাধীনতা ভাই এর হাতে ভাইকে হত্যার

মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত হওয়া সঠিক কি না।' তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

কি ঘটতে যাচ্ছে তা বুঝে ওঠার পূর্বেই পুলিশ আমাদের ঘেরাও করলো। অন্যান্য যুবকের সঙ্গে আমাকেও ঠেলে ধাক্কিয়ে একটি ভ্যানে তোলা হলো। তারা অবিরাম চীৎকার করতে থাকলো, 'ভারত মাতা কি জয়।'

ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা পুলিশের কর্তাটি পিছন দিকে ফিরে বললো, 'মহাত্মা বুদ্ধ কি জয়।' যুবকরা হেসে উঠলো। পুলিশ সেপাই ও ভ্যান ড্রাইভারও হাসিতে যোগ দিলো। এক যুবক বললো, 'সাব ইন্সপেক্টর সাব, আমাদের বেশী দূরে নিয়ে যাবেন না।'

'যেখানে তোমাদের মর্জি, কিন্তু বিড়লা হাউজে ফিরে যেও না। তাহলে ওরা আমার গলা কেটে ফেলবে।' সাব-ইন্সপেক্টর হাত জোড় করে বললো। 'আমাদেরকে বিড়লা মন্দিরের কাছে নামিয়ে দিন। আজ আমাদের আর কোন কাজ নেই।' যুবকরা তাকে আশ্বস্ত করলো। আমরা বিড়লা মন্দিরে নামলাম। কেবল তখনই তাদের একজন আমাকে লক্ষ্য করলো, 'আরে, তুমি কে? তুমি কোন্ দলের?' বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলাম, 'আমি কোন দলটল জানি না। আমি একজন উদ্বাস্তু এবং পুলিশ ভুল করে আমাকে গ্রেফতার করেছে।' তারা জোরে হাসলো। অন্য একজন বললো, 'তুমি আমাদের সাথে যোগ দাও না কেন? নাকি তুমি সেই বৃদ্ধের মুসলিম প্রেমিক শিষ্য?' আমি তাদের বললাম যে, 'আমার বোনকে পাকিস্তানে অপহরণ করা হয়েছে। আমি কি করে মুসলমান প্রেমিক হতে পারি?' তাদের নেতা বলে মনে হলো এমন একজন বললো, 'তুমি পাঞ্জাবী, গড়নে বড় ও শক্তিশালী। হিন্দু ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে তোমাকে খাঁটি ক্ষত্রিয়ের মতো হতে হবে।' আমার পিঠে থাপ্পড় মেরে পেশী অনুভব করলো। কেউ আমাকে আগে কখনো বড় ও শক্তিশালী বলেনি।

আমি কি কাজ করি, তারা জানতে চাইলো। আমি বললাম যে, আমি কিছুই করি না। তাদের নেতা বললো, 'তাহলে চলে এসো, সংঘে যোগ দাও। তুমি অফিসে কাজ করবে, আর আমাদের ক্যান্টিনে খাবে।' এই সংঘ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে গেলাম। একটা কাগজে সই করার পর আমাকে একটি নম্বর দেয়া হলো। (শুধুমাত্র নেতা সকলের নাম জানে, বাকীরা জানে নম্বর হিসেবে)। অফিসের আসবাবপত্র মোছা এবং দরজার বাইরে বসে নির্ধারিত পাসওয়ার্ড ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়া আমার কাজ। আমাকে একটি ইউনিফর্ম এবং বেতনের অগ্রিম হিসেবে পাঁচ টাকা প্রদান করা হলো।

যে সংঘে আমি যোগ দিলাম সেটির একটি দীর্ঘ সংস্কৃত নাম আছে। প্রতিবার যখন 'রাষ্ট্রিয়া' উচ্চারণ করি আমার সঙ্গীরা হাসে। যখন বলি 'সভায়াম' তখনও তারা হাসে। সুতরাং আমি সংঘকে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্তাকারে 'আরএসএস' (RSS) বলতাম।

পাঁচ টাকার নোটটি মাকে দিলাম। মা খুব খুশী হলেন। তিনি হালুয়া তৈরী করে তা থেকে কিছুটা শিখ ও তার স্ত্রী এবং তাদের চাকরদের দিলেন। কুকুরটিকেও হালুয়ার ভাগ দিতে ভুললেন না। বাবা আমাকে বিদ্রূপ করা বন্ধ করলেন।

আমি খুব সকালে বাড়ি থেকে অফিসে গিয়ে আসবাবপত্র মুছি। এরপর ইউনিফর্ম পরে উপস্থিত যুবকদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাই। আমাদের নেতা সংঘের গেরুয়া বর্ণের পতাকা উত্তোলন করতেন। আমাদের হাত বুক বরাবর তুলে পতাকাকে সালাম জানাই। এরপর এক ঘন্টা ধরে হতো ব্যায়াম ও কুস্তি। লাঠি দিয়ে কিভাবে লড়তে হয় আমাদের তা শিখানো হয়। তারা আমাদের বললো, শীঘ্রই আমরা বন্দুক পাবো এবং গুলী চালনা শিখানো হবে। বিকেলে হিন্দু ধর্ম ও ইতিহাসের উপর বক্তৃতা হতো। তারা আর্যদের ভূখন্ড আর্যাবর্তের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বলতো। তারা বলতো, মুসলমানরা কিভাবে এই ভূখন্ডে আগমন করে আমাদের মন্দির ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা, অপহরণ করেছে, হিন্দু রমণীদের ধর্ষণ করেছে। মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত হবার পরিবর্তে কিভাবে হাজার হাজার হিন্দু রমণী স্বেচ্ছায় চিতায় জ্বলে জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতো। অশুচি ম্লেচ্ছ, মুসলমান এবং খৃষ্টানদের কবল হতে ভারতকে শুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করতো। কারণ তারা বিদেশী এবং আমাদের পবিত্র গো-মাতার ভক্ষক।

হিন্দু ও শিখদেরকে পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত করার পর মুসলমানদের কি অধিকার আছে

দিল্লী বা ভারতের অন্যত্র বসবাসের? তারা যেভাবে আমাদের নারী ও সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছে আমরা তাদের গুলো নিয়ে বাকীদের পাকিস্তান বা জাহান্নামে কেন পাঠিয়ে দেই না? এ ধরনের প্রশ্ন প্রতিদিন আমাদের মনে ঢুকিয়ে দেয়া হতো।

একদিন নেতা আমাকে ডেকে পাঠালেন, 'তুমি কি ৮৪০ নম্বর।' আমি বুক টান স্যালিউট দিলাম। নেতা জানতে চাইলেন, 'এ কথা কি সত্য যে, তোমার বোনকে পাকিস্তানে অপহরণ করা হয়েছে।' উত্তর দিলাম, 'জি হ্যাঁ'। 'তুমি কি এ ব্যাপারে কিছুই করবে না। হাতের উপর হাত দিয়ে তুমি আর কতদিন এভাবে বসে থাকবে।'

আমি জানতাম না, তিনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চান। উত্তর দিলাম, 'স্যার, ৮৪০ তার জীবন দিয়ে দিতে রাজি। এছাড়া তার আর কিছুই দেয়ার নেই'।

নেতা হাসলেন, 'আমরা হিন্দুরা শুধু জানি, কি করে জীবন দিতে হয়। অন্যদের জীবন কি করে নিতে হয় তা জানি না। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। তুমি দিল্লীর মুসলমানদের উপর কোনো হামলার নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত? শুধু মনে করো, তারা তোমার বোনের প্রতি কি আচরণ করেছে'।

উত্তেজনায় আমার মুখে রক্ত উঠে এলো। আবার সোজা হয়ে তাকে স্যালিউট দিয়ে বললাম, '৮৪০ নম্বর যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।' নেতার সামনে এক টুকরা কাগজ। তা দেখে কিছু নাম ডাকলেন, 'এরা তোমার সাথে থাকবে। তুমি যখন কাজের জন্য পুরোপুরি তৈরী হবে তখন আমাকে জানাবে। আমি দেখবো পুলিশ যাতে তোমার কাজে বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

আমি স্যালিউট করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

কিন্তু মূল সমস্যা দাঁড়ালো ,কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, তা বের করা। দিল্লীর মুসলমানরা যখন শুনলো যে কর্ণাল, আম্বালা, অমৃতসর এবং জলন্ধরে কি ঘটেছে, তারা তাদের লাল ফেজ টুপি ও লোমওয়ালা জিন্নাহ টুপি পুড়িয়ে ফেলে গান্ধী টুপি পরতে শুরু করলো। তারা দাঁড়ি কামিয়ে ফেললো, শেরওয়ানী ও ঢোলা পাজামা পরা ছেড়ে দিয়ে কিভাবে কোমরে ধুতি বাঁধতে হয় তা আয়ত্ত করলো। তাদের মহিলারা বাইরে বেরুতে বোরখা পরা ছেড়ে দিয়ে কপালে লাল টিপ দিয়ে 'নমস্তে' বলা শুরু করলো। কাউকে মুসলমান বলে সনাক্ত করার একমাত্র উপায় তার খতনা করা আছে কি না তা দেখা। কিন্তু কি করে প্রত্যেককে থামিয়ে জিজ্ঞেস করা সম্ভব, 'তোমার গোপন অঙ্গটা প্রদর্শন করো?' সতর্ক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ভিন্ন আমরা কাজে নামতে পারি না। আমরা মুসলমানদের বাড়ী-দোকানে স্বস্তিকা এঁকে চিহ্নিত করতে শুরু করলাম। মুসলমান গুন্ডারা ব্যাপারটি জেনে ফেললো এবং হিন্দুদের বাড়ী ও দোকানে স্বস্তিকা আঁকতে শুরু করলো। আমরা পরিকল্পনা পাল্টে মুসলমানদের মালিকানাধীন কিছু সুপরিচিত দোকানে হামলা চালিয়ে এর ফলাফল কি হয় তা দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। নয়া দিল্লীর কনট সার্কাসে এ রকম একটি বিরাট দোকান আছে। নেতা এই পরিকল্পনা অনুমোদন করে তা কার্যকর করার একটি তারিখ নির্ধারণ করে দিলেন।

দিন যত ঘনিয়ে এলো আমি তত ঘাবড়ে যাচ্ছি। আমি চাই সব মুসলমানের মৃত্যু, কিন্তু একটি হত্যা করতেই আমি আতংকিত। আমি দিল্লী থেকে পালাতে চাইলাম। আমার মনে যে ঝড় বইছে সে সম্পর্কে আলাপ করার মত কেউ নেই। আমি যদি মাকে বলি তাহলে তিনি নিশ্চিতভাবেই একটা গুঞ্জন তুলবেন এবং বাবা বা শিখ মহিলাকে বলবেন।

ঘটনার আগের দিন সন্ধ্যায় আমি একটু আগে বাড়ী ফিরলাম। মা গ্যারেজে বসে শিখের রান্নাঘরের জন্য মটরশুটি ছাড়াচ্ছিলেন এবং কুকুরের সাথে কথা বলছিলেন। আমি মাদুরের উপর বসে পড়লাম। মা কুকুরকে বলছেন, 'ওরে সম্বিয়া (কুকুরের নাম সিম্বা), তুই তো আমার লছমীকে দেখিসনি। দেখেছিস? যাক, পাজী মুসলমানগুলো যদি তাকে ধরে না নিতো, তাহলে আমাদের সাথে আজ এখানে থাকতো। তুই ওর বিয়ে দেখতে পারতি। আতশবাজি দেখতি, বাজনা শুনতি। কিন্তু সবই কিসমত'। দুই হাতে কপাল চাপড়ে মা কাঁদতে শুরু করলেন, 'কই গেলিরে লছমী, হায়রে আমার বেটি। তুই কোথায়? যে অভিশপ্ত মুসলমানরা তোকে ধরে নিয়েছে তারা নরকে যাক।' কুকুরটি তার কাছে ঘেষে মুখটা কানের কাছে নিয়ে কুঁই কুঁই শব্দ তুলে দুঃখে অংশ নিল। মা কুকুরকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। এই দৃশ্য আমার আর সহ্য হলো না।

মাকে বললাম, 'আর কান্না কেন মা? আমাদের লছমীকে যা করেছে, সে জন্য মুসলমানদের আমি শিক্ষা দিতে চাই।' এরপর আমি আর পিছু হটতে পারি না। পারা কি সম্ভব?

আমার ভালো ঘুম হলো না। কিন্তু ভোরের আগে ঘুম থেকে উঠলাম এবং জীপ আমাকে তুলে নিয়ে গেল। অন্যান্য যুবকরা এরই মধ্যে হেডকোয়ার্টারে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমরা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা সারলাম। চা বিস্কুট খেয়ে জীপে কনট সার্কাসের দিকে রওয়ানা হলাম। সেখানে পৌঁছে আমার সঙ্গীদের পূর্ব নির্ধারিত স্থানে মোতায়েন করে কাজ শেষে কোন অবস্থানে জীপটি অপেক্ষা করবে তা দেখিয়ে দিলাম। ঘড়িতে সকলে সময় মিলিয়ে নিলাম এবং আমার সিগনালের জন্য অপেক্ষা করতে বললাম। আমার সার্টের হাতার মধ্যে একটি চোখা স্টীলের রড।

কনট সার্কাসের মধ্যবর্তী স্থানে আমি অলসভাবে পায়চারি করছি। দেখছি দোকান মালিকরা আসছে, দোকান খোলার আগে প্রার্থনা করছে এবং দোকান খুলছে। যে মুসলিম দোকানটি আমরা নির্বাচন করেছি সেটি এখনো বন্ধ। কিন্তু দোকানের চারজন কর্মচারী বাইরে অপেক্ষা করছে। আমি তাদের পাশ কেটে গেলাম। যদিও তাদের মাথায় গান্ধী টুপি, তবুও তাদের কথায় বুঝতে পারলাম যে তারা মুসলমান। সেখান থেকে কয়েক পা এগুতে না এগুতেই দোকানের উল্টো দিকে একটি গাড়ী এসে থামলো। আমার সঙ্গীদের একজন মালিককে চিনতে পেরে তার হাতের বেত মাটিতে ফেলে দিল। অর্থাৎ 'এই লোককেই আমরা খুঁজছি।' আমি পিলারের আড়ালে অবস্থান নিলাম। লোকটি গাড়ীর জানালার কাঁচ উঠিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করলো। এরপর রাস্তা অতিক্রম করলো। চল্লিশ বছর বয়স্ক ভারিক্কি চালের লোক। কেতাদুরস্ত দিল্লীওয়ালার পোশাক তার পরনে। মসলিনের কুর্তা, সোনালী কাজ করা। সাদা ঢোলা পায়জামা কড়া মাড়ে ইস্ত্রি করা। তার এক হাতে রূপার পানের কৌটা। আরেক হাতে সিগারেটের টিন ও দিয়াশলাই। ঠোঁটে ঝুলছে একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট লোকটি হাঁটছে গর্ভবতী মহিলাদের মতো। আমার সঙ্গীরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে বের হলো। সামনে থেকে তিনজন, পিছন থেকে তিনজন। আমি অপেক্ষা করছি। রাস্তা অতিক্রম করে বারান্দায় উঠতেই আমি তার পিছনে এলাম। কর্মচারীরা মাথা ঝুঁকিয়ে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম'। লোকটি মাথা নেড়ে জবাব দিলো। একজন কর্মচারীর হাতে পানের কৌটাটি দিয়ে চাবির জন্য পকেটে হাত দিল। আমি স্টীলের রডটি বের করে সজোরে তার পিঠের মাঝ বরাবর ঢুকিয়ে দিলাম। লোকটি 'ইয়া আল্লাহ' বলে চীৎকার করে পিছন দিকে আমার উপরই পড়ে গেল। তার চোখ আতংকে বিস্ফোরিত। আমি রডটি হ্যাঁচকা টানে বের করে তাকে ফ্লোরের উপর পতিত হতে দিলাম। বাঁশীতে ফুঁ দিতেই আমার সঙ্গীরা কর্মচারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা চীৎকার করলো, বাঁচাও! পুলিশ! আমাদের মেরো না!' তাদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে এলো না। মুহূর্তের মধ্যে পাঁচজন মুসলমান বারান্দার মেঝেতে রক্তের মাঝে পড়ে গোঙ্গাতে শুরু করলো। আমরা দোকানের কাঁচের জানালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলাম। এটি একটি জুতার দোকান। তবে চামড়ার অন্যান্য সামগ্রী ব্যাগ, বেল্ট, ওয়ালেট ইত্যাদি আছে। আমি বড় দুটি সুটকেসে আমার হাতে যা পড়লো সব ভরলাম। মালিকের টেবিলে রক্ষিত ছোট্ট রেডিও, রৌপ্য নির্মিত দিনপঞ্জী এবং কিছু কলম তুললাম। এরই মধ্যে বহু লোক চৌকদার, পিয়ন, ছাত্ররা দোকানে প্রবেশ করে যা পাচ্ছে হাতিয়ে নিচ্ছে। আমাদের বোঝা জীপে নিয়ে তুললাম। গোটা কনট সার্কাস জুড়ে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়েছে। হিন্দু ও শিখরা মুসলমানদের দোকান আক্রমণ করে লুটপাট করছে। পুলিশ ভ্যান চক্রাকারে ঘুরছে। সিপাইরা হুইসেল বাজাচ্ছে আর দৌড়াদৌড়ি করছে। আমাদের নিরাপদে বের হয়ে যেতে কোন অসুবিধাই হলো না।

আমার হাত ও হাঁটু এমনভাবে কাঁপছে যেন আমার জ্বর হয়েছে। হৃদপিন্ড বুকের হাড্ডির সাথে ধাক্কা খাচ্ছে-ধক্ ধক। আমি কথা বলতে পারছি না। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই আমি খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়লাম। সঙ্গীরা এক মগ চা ও দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট এনে দিল। আমি যে কাজ করেছি সে দৃশ্য চোখের সামনে থেকে দূর করার জন্য চোখের উপর বালিশ চাপা দিলাম। কোন কাজ হলো না। আমি সেই মুসলমানের চোখের সাদা অংশ দেখতে পাচ্ছি। আমি খুন করেছি। আমার কানের পর্দায় বার বার বাজছে 'ইয়া আল্লাহ'। এ অবস্থা চলতেই থাকলো। বিকেলের আগ পর্যন্ত আমি দাঁড়াতে পারলাম না। এরপর স্নান করে কিছু ভালো বোধ করলাম। কি কি জিনিস চুরি করেছি তা দেখলাম। কিছু জিনিস বাড়িতে নেয়ার জন্য একপাশে রেখে অবশিষ্টগুলো অন্য

সুটকেসে ভরে রাখলাম। জিনিসগুলো সদর বাজার নিয়ে গেলাম। যেহেতু শহরের বহু মুসলিম দোকান লুট হয়েছে সে কারণে খুব বেশী দাম পেলাম না। তবু একশ' পঞ্চাশ টাকার বেশী হাতে এলো। শুধু রেডিওটা বিক্রি করেই পেলাম একশ টাকা।

বাড়ী ফেরার পথে আমি বাবার জন্য একটি ফ্লাশ লাইট, মার জন্য একটি রঙ্গিন মসলিনের দোপাট্টা কিনলাম। কিছু ফল এবং মাখনও কিনলাম। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম যাতে শিখের বাড়ির কেউ আমাকে বড়, নতুন সুটকেসসহ প্রবেশ করতে না দেখে। আমি সোজা গ্যারেজে প্রবেশ করলাম। একটি মাটির চুলায় মা চাপাতি সেঁকছিলেন।

মাকে বললাম, জিনিসগুলো কিনতে আমি মাসের পুরো বেতন ব্যয় করেছি। দোপাট্টাখানা তার কাঁধের উপর ছুঁড়ে দিলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বাবার পদশব্দ শুনে দৌড়ে বাইরে গেলেন। তার মনে এতো উচ্ছাস যে বাবাকে শুধু বলতে পারলেন, 'দেখ, দেখ।' বাবার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে তাকে ফ্লাশ লাইট দিলাম। নতুন খেলনা পেয়ে শিশুদের যে অবস্থা বাবার অবস্থাও তেমন হলো। তিনি বোতাম টিপে গ্যারেজের দেয়ালে আলো ফেললেন। উভয়ে জুতা কোন্ জোড়া পায়ে লাগে তা দেখলেন, অন্যান্য জিনিসগুলোও নাড়াচাড়া করলেন। তারা খুব খুশী।

কিন্তু আমার চোখে ঘুম এলো না। চোখ বন্ধ করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। যে লোকটিকে আমি হত্যা করেছি তার প্রেতাত্মার ব্যাপারে আমি আতংকিত। আমার কানে লোকটির আর্তনাদ ভেসে আসছে, 'ইয়া আল্লাহ'। আমি বাবার পদশব্দ শোনার চেষ্টা করলাম এবং তার চীৎকার, 'খবরদার হো'। অর্থাৎ আমি নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাই যে ;আমি নিরাপদ। আমি কাঁপতে কাঁপতে গোঙ্গাতে শুরু করলাম। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি, এমন ভান করলাম। মার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? আমি জোরে গোঙ্গাতে শুরু করলাম। মা কাছে এসে আমার মাথা তার কোলে নিলেন। দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। তিনি আমার পিঠ মালিশ করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি আমার পাশেই শুয়ে পড়লেন। আমার কাঁপুনি বন্ধ হলো। আমি উষ্ণতা, নিরাপদ ও ভয়হীনতা অনুভব করলাম। মায়ের বুকে মাথা রেখে তার উপর আমার ডান পা তুলে দিলাম। ঠিক শৈশবে যেমনটি করতাম। এরপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

খুন করার পরদিন সকালে আমার পাতলা পায়খানা হলো এবং পরবর্তী পাঁচদিন আমি বাড়িতেই কাটালাম। আমি বাইরেও যেতে পারতাম না, কারণ শহরের বিভিন্ন এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে। মুসলমানদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছে। তাদের সম্পত্তি, দোকানপাট লুট করা হচ্ছে। তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং বাড়ী দখল করা হচ্ছে। তারা হাজারে হাজারে পাকিস্তানে পালিয়ে যাচ্ছে। যারা এখনো যেতে পারেনি তারা পুরনো কিল্লা ও বড় মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে। দিল্লীর জন্য প্রথম যুদ্ধে জয় হয়েছে। কিন্তু এখনো অনেক কিছু করার বাকী। আমাদেরকে গান্ধী ও নেহেরুর মত মুসলমান প্রেমিকদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। অবশিষ্ট মুসলমানদের ঝেটিয়ে পাকিস্তানে পাঠাতে হবে এবং আমাদের প্রিয় ভারতবর্ষ হতে ইসলামের সকল নাম নিশানা মুছে ফেলতে হবে।

গান্ধী আমাদের এক নম্বরের শত্রু। তার কথা হচ্ছে, মসজিদ ও মুসলমানদের বাড়ী হতে বের হয়ে যাও। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, 'ওহে বৃদ্ধ লোকটি, আমরা যদি তাদের মসজিদ ও বাড়ী হতে বের হয়ে যাই, তাহলে থাকবো কোথায়? ফুটপাতে? বারান্দায়? তোমার তো থাকার সমস্যা নেই। শেঠ বিড়লার প্রাসাদে বাস করছো এসব কথা বলার জন্য। নেহেরু আমাদের দুই নম্বর শত্রু। তার ভাষায় আমরা 'গুন্ডা'। তাকে প্রশ্ন করতে চাই, 'ওহে পন্ডিত প্রবর, মুসলমানরা যখন আমাদের গলা কাটছিল, তখন তোমার পুলিশ, সেনাবাহিনী কোথায় ছিল?'

সরদার প্যাটেল আমাদের মিত্র। তিনি বলেন, 'তারা চোর বা ডাকাত নয়, বরং তারা দেশকে ভালোবাসে।' শুধুমাত্র গান্ধী ও নেহেরুকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি তার বক্তব্যের সাথে যোগ করেন যে, আমরা 'বিভ্রান্ত'। পুলিশও আমাদের বন্ধু। কেন তারা বন্ধু হবে না? নতুন পুলিশের অধিকাংশই পাঞ্জাব থেকে আগত রিফিউজি। তারা মুসলমানদের সম্পর্কে আসল সত্যটা জানে এবং গান্ধী-নেহেরুর কথামালায় তাদের মন গলে না।

একদিন সংঘ প্রধান আমাকে বললেন, 'আমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে, গান্ধীর

মতলবটা কি? ৮৪০ নম্বর, তুমি বৃদ্ধের সভায় হাজির হবে এবং আমাকে জানাবে সে কি বলে এবং কারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে।'

আমাকে একটি সাদা গান্ধী টুপি, হাতে বোনা মোটা খদ্দরের শার্ট ও পাজামা এবং একটি পশমী শাল কেনার টাকা দেয়া হলো। আমি প্রতিদিন ভোরে বিড়লা হাউজে যেতে শুরু করলাম। সভায় যারা আসে আমি তাদের নাম টুকে নিতাম। সব ধরনের বকবকানির নোট নিতাম, বিশেষ করে হিন্দু ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের ব্যাপারে বক্তব্যের।

আমি গান্ধীর কণ্ঠস্বর নকল করা শিখলাম। যা শুনেছি তা রিপোর্ট করার সময় আমি দন্তহীন বৃদ্ধের সুরে গুজরাটি-হিন্দিতে ব্যক্ত করতামঃ 'আমি আমার ভিতরের কণ্ঠের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছি-ভিতরের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আমি কান খাড়া করে আছি।' সকলে হাসিতে ফেটে পড়তো। আমি তার ভঙ্গিমাও নকল করতাম। পায়ের উপর আড়াআড়ি পা রেখে বসে মাথায় শাল জড়িয়ে বলতাম, 'আমি একটি জ্বলন্ত চুল্লীর উপর বসে আছি। চারদিকে আগুনের লেলিহান শিখা। আমার পায়ের নীচে মানবতাকে দলিত করছি। আমি আলোর আকাংখা করছি।' কিভাবে আলো আসবে একটি দিয়াশলাই বের করে তা দেখাতামঃ 'আমি এখন শুধু আলোর বিচ্ছুরিত রশ্মি দেখতে পাচ্ছি।' দিয়াশলাই-এর জ্বলন্ত কাঠি নাকের কাছে আনতাম। আমি দিল্লীর দেহিকে যখন পূর্ণালোকে দেখবো, তখনই তা আমার হৃদয়ে প্রোথিত হবে। হাসিতে তাদের পেট ফুলে ফুলে উঠে। সঙ্গী যুবকরা আমার নাম দিলো 'গান্ধী মহারাজ'। তারা বলতো, 'বুড়ো যদি আমাদের সংঘের সদস্য হতো তাহলে কিছুতেই আমার চাইতে উপযুক্ত কোন নম্বর পেতো না। ৮৪০ হচ্ছে ৪২০ এর দ্বিগুণ। যা প্রতারণামূলক দন্ডবিধির একটি ধারা এবং গান্ধী দ্বিগুণ প্রতারক।

সংঘ প্রধান আমাদের বললেন যে, আমাদেরকে কষে কোমর বাঁধতে হবে। কারণ, শীঘ্রই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে। এই সুযোগে পাকিস্তানকে একেবারে শেষ করে দিতে হবে এবং খাইবার পাসে হিন্দু ধর্মের গেরুয়া পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

আমাদের নেতার কথাই সঠিক। পাকিস্তানী উপজাতিরা কাশ্মীরে আক্রমণ করলো। প্রতিদিন আমরা আশায় থাকি যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু গান্ধী শান্তি ও প্রেমের গালগল্প বলেই যাচ্ছে। তার কথা হচ্ছে, ভারত পাকিস্তানের কাছে প্রচুর অর্থ ঋণী এবং ভারতকে তা তড়িঘড়ি পরিশোধ করতে হবে।

প্রতি সোমবার গান্ধীর উপবাসের দিন। সেদিন এই বৃদ্ধ তার মুখও বন্ধ রাখে। তার পরিবর্তে যারা আগমন করে তাদের দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং কাগজের টুকরোয় কি সব লিখে দেয়।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের এক সোমবারের সকাল। খুব ঠান্ডা পড়েছে এবং দিনটি যেহেতু বৃদ্ধের নিরবতা পালনের দিন, সে জন্য আমি বিড়লা হাউজে না গিয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত শুয়ে থাকলাম। সূর্য আলো ছড়ালে আমি উঠলাম এবং বেশ ভালো বোধ করলাম। শুকনো চাপাতি খেয়ে ও একমগ চা পান করে রাস্তা পার হয়ে বিড়লা হাউজে গেলাম। বুড়ো গান্ধী বাগানে রোদ পোহাচ্ছে এবং কাগজে কি যেন লিখছে। তার সেক্রেটারী ডঃ সুশীলা নায়ার তার চেয়ারের পাশে ঘাসের উপর বসে গান্ধীর দেয়া কাগজের টুকরোগুলো নিচ্ছে। সুশীলাজিকে আমার খুব পছন্দ। মহিলাটি ফর্সা, সুন্দর ও নাদুস নুদুস। তার চুল কোকড়ানো এবং গালে টোল পড়ে। আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও আমার ইচ্ছে হয় তার সাথে প্রেম করতে। বৃদ্ধ কি লিখেছে সুশীলাজি তা আবার পড়ে তাকে শোনায়। এরপর এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠে যেন তার বিশাল পাছায় ভীমরুল হুল ফুটিয়েছে। সুশীলা দৌড়ে গিয়ে তার ভাইকে বলে, তার ভাই অন্য কাউকে বলে এবং এভাবে সকলে জানার পূর্ব পর্যন্ত সে অন্য কাউকে বলে। একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে এবং সুশীলাজি বৃদ্ধের পক্ষ হতে একটি বিবৃতি পাঠ করে। আগামীকাল বৃদ্ধ যখন মুখ খুলবে তখন থেকে আমরণ অনশন শুরু করবে।

যা বলা হয়েছিল তার হুবহু আমার মনে নেই। কিন্তু বিষয়টি দুই ধরনের উপবাস সম্পর্কে। কেউ যদি মোটা হয়, তাহলে সে উপবাস করতে পারে। অথবা কারো প্রতি অন্যায় করলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যও উপবাস করা যেতে পারে। আর এই বৃদ্ধের উপবাস করার কারণ, আমরা মুসলমানদের প্রতি অন্যায় করেছি। বৃদ্ধ বলছে যে, বিলম্ব হয়ে যাওয়ার কারণে তার

নিজেকে অক্ষম মনে হচ্ছে। তিনদিন ধ্যান করে থাকার পর এবং উপবাস করার পর তার সক্ষমতা আবার ফিরে আসবে। তার মতে, 'কোন লোক যদি পবিত্র হয়, তাহলে তার জীবন উৎসর্গ করা ছাড়া মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না। আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি যে, আমার পদক্ষেপকে যৌক্তিক প্রমাণ করার মত পবিত্রতা আমার মধ্যে আছে। ঈশ্বর এই উপবাসের নির্দেশ দিয়েছেন। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা করবেন তখনই উপবাস শেষ হবে।' ঈশ্বর সম্পর্কে তার বক্তব্য যাই হোক না কেন, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, জীবন বিসর্জনের ইচ্ছা তার নেই। তার কথা হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান ও শিখদের মধ্যে যদি হৃদয়ের পুনর্মিলন হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত পাল্টে আবার খাওয়া শুরু করবেন।

একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে হেডকোয়ার্টারে গেলাম।

তারা রেডিওতে খবরটা শুনেছে। নেতা বললেন, 'বৃদ্ধ মরুক! হিন্দু ধর্ম চিরন্তন। আমাদেরকে সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি লক্ষ্য রাখতে হবে।' আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই যে, তুমি। তোমাকে অবশ্যই বিড়লা হাউজের ডিউটিতে থাকতে হবে এবং সবকিছু সম্পর্কে দ্রুত রিপোর্ট করতে হবে। প্রয়োজনে ট্যাক্সি নাও। (সে জন্য ধন্যবাদ। মনে মনে হিসাব করলাম, পরবর্তী কিছুদিন দৈনিক ছয় থেকে সাত টাকা আয় হবে)। গান্ধীর অনুসারীদের জ্বালাতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে হবে।'

আমি বিড়লা হাউজে ফিরলাম।

জনতার ভিড় পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়মিত আগমনকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে হচ্ছে। তারা ছাড়াও শেতাঙ্গ এবং কিছুসংখ্যক নিগ্রোসহ প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। যদিও সোমবার শেষ হয়নি, গান্ধী তখনো আছে উদ্যানে। ভিড় ঠেলে আমি তার নিকটবর্তী হলাম। অনেকে তাদের নোটবুকে কি সব টুকছে। বৃদ্ধকে তোষামোদ করার জন্য তারা প্রশ্ন করছে এটা দেখাতে যে তারা কতটা উদ্বিগ্ন।

তার পুত্র দেবদাসও সেখানে থাকে। পুত্র তার পিতাকে বলে, ধ্বজভঙ্গ, অক্ষম। পিতা পুত্রের চিন্তা-ভাবনাকে বলে ধ্বজভঙ্গ ও ভাসাভাসা এবং নিজের কাজ সামলাতে উপদেশ দেয়। অর্থাৎ পিতাপুত্র একে অন্যকে পছন্দ করে না। গান্ধী তার তিন পুত্রের কাউকেই পছন্দ করে না।

বৃদ্ধ বহু লোকের কাছে বহুবার বলেছে, 'ঈশ্বর আমাকে এই অনশনের প্রেরণা দিয়েছে। কোন মানুষের পক্ষে এই ঐশ্বরিক সিদ্ধান্ত ব্যাহত করে দেয়া সম্ভব নয়।'

এগুলো রিপোর্ট করার মত প্রয়োজনীয় কিছু বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং আমি ঘুমানোর জন্য বাড়ি চলে যাই।

পরদিন বিড়লা হাউজে অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশী পুলিশ ও সৈন্য দেখলাম। আরো অনেক সাংবাদিক সেখানে উপস্থিত। নেহেরু, প্যাটেল, মওলানা আজাদ ও কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহও সেখানে আছে। গান্ধীর পক্ষে তারা বিক্ষোভ করবে বলে জানতে পারলাম। হেডকোয়ার্টারে গিয়ে রিপোর্ট করে আবার বিড়লা হাউজে ফিরে আসি।

বেলা সাড়ে ১১টায় প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। বৃদ্ধ লোকের (এবং আমারও) প্রিয় সঙ্গীতটি দিয়েই প্রার্থনা শুরু হলো ঃ

'যে ব্যক্তি অন্যের ব্যথা বুঝতে পারে
সেই সত্যিকার অর্থে ঈশ্বরের লোক'।

সুশীলজি ইংরেজীতে কিছু গাইলেন। শ্বেতাঙ্গ মহিলারা যেভাবে হু হু হু বলে সেভাবে তার অনুকরণ করাটা আমার ভালো লাগে না। এরপর 'ঈশ্বর ও আল্লাহ' যে এক; সে সম্পর্কিত গানটি। বৃদ্ধ মাইক্রোফোনে কথা বলে। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলে যে, তাদের জন্যই তার এই অনশন। হিন্দু ও শিখদের উদ্দেশ্যে বলে যে, তাদের জন্যই এই অনশন। কাশ্মীরীদের উদ্দেশ্যে বলে তাদের জন্য এই অনশন। আরো বলে, ঈশ্বর তাকে অনশনের নির্দেশ দিয়েছেন বলেই তার এই ত্যাগ। যদিও এখন পর্যন্ত বৃদ্ধ কমলালেবুর রস গিলছে।

সন্ধ্যায় আমাদের নেতা তিনটি বাস ভর্তি রিফিউজিদের বিড়লা হাউজে পাঠালেন। রাস্তার এক

প্রান্ত থেকে তারা শ্লোগান দিতে দিতে মিছিল করলো, 'খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্গে।' নেহেরু মিছিলের দিকে তাকিয়ে দেখেও কিছু বললো না। তারা শ্লোগান দিলো, 'গান্ধী বুড্ডা মুর্দাবাদ।' নেহেরুকে যেন ভূতে পেয়ে বসলো। মিছিলের সামনে লাফ দিয়ে গিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে বললো, 'কার এতো সাহস যে গান্ধী মুর্দাবাদ বলে? যদি সাহস থাকে তো আমার সামনে ঐ কথাগুলো উচ্চারন করো। এ কথা বলার আগে আমাকে খুন করো।' নেহেরু ক্ষেপে গেছে, সবার প্রতি হাত নাড়ছে। এরপর সহসা লিমোজিনে উঠে চলে গেল। পেছনে গাড়ী ভর্তি পুলিশ।

আমি গান্ধীর কক্ষে ঢুকে পড়লাম এক ফাঁকে। একটি খাটিয়ার উপর শাল জড়িয়ে শুয়ে আছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে শুধু তার টাক মাথা ও মুখটা দেখা যাচ্ছে। কক্ষটিতে লোকজন গিজগিজ করছে। বৃদ্ধ বলছে এবং গালের উপর নেমে আসা চোখের পানি মুছলো। গান্ধী বললো, 'রাম, রাম, রাম,' এবং শালের নীচে মুখ লুকালো। এভাবে আরেকটি দিন কেটে গেল।

পরদিন সকালে বৃদ্ধ গান্ধীকে বাইরে এনে একটি খাটিয়ার উপর বসানো হলো, যাতে জনতা তাকে দেখতে পায়। জনতা চীৎকার করলো, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়?' গান্ধী দুই হাত যুক্ত করে নমস্কার জানালো, বিড় বিড় করে কিছু বললো। তাকে দেখে দু'দিনের অভুক্ত মানুষের মত মনে হলো না।

ভারতের গোটা সরকার এখন বিড়লা হাউজের বাগানে। একটি টেবিল ঘিরে পন্ডিত নেহেরু ও তার মন্ত্রীরা বসেছে। তারা পাকিস্তানকে ৩৫ কোটি টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিলো যাতে তারা হিন্দুদের হত্যা করার জন্য বন্দুক ও গুলী কিনতে পারে। গান্ধীর কাছে গিয়ে তারা বললো, 'আপনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, আমরা তা করেছি। আপনি দয়া করে অনশন ত্যাগ করুন। গান্ধী মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দেয়, 'না এখনো অনশন ভাঙবো না। আমার আরো দাবী আছে। আমার একমাত্র নির্দেশক হচ্ছেন ঈশ্বর। তিনি অভ্রান্ত ও সর্বশক্তিমান।

গঙ্গা উল্টোদিকে বইতে শুরু করছে। সমুদ্র থেকে এখন এর উৎস পর্বতের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। যা ঘটছে তা বর্ণনা করার এটাই একমাত্র উপায়। তিনদিন আগে আমরা মুসলমানদের দিল্লী থেকে বিতাড়িত করেছিলাম এবং তখন সকলে আমাদের সাথে ছিল। এখন মুসলমানরা দিল্লীতে ফিরে আসতে শুরু করেছে এবং সবাইকে আমাদের বিরুদ্ধে মনে হচ্ছে। যেসব লোক মুসলমানদের দোকানপাট লুট করেছিল, তারা লুটের মাল ফিরিয়ে দিতে বিড়লা হাউজে এলো। যেসব পুরুষ মুসলিম নারী অপহরণ করেছিল তাদেরকে বিড়লা হাউজে নিয়ে এসে গান্ধীর সামনে তাদের ক্ষমা করার জন্য উক্ত নারীদের কাছে প্রার্থনা করানো হলো। যারা মুসলমানদের রক্ত ঝরিয়েছে তারা নিজেদের হাতে ক্ষত সৃষ্টি করে সেই রক্তে গান্ধীর অনশন ত্যাগ করার দরখাস্তে স্বাক্ষর করলো। সকলের মধ্যে গান্ধী উন্মাদনা চলছে। এক বৃদ্ধ সাহেব, যিনি একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক, তিনিও অনশন শুরু করলেন এবং বললেন, 'গান্ধী এভাবে মরলে আমিও মৃত্যুবরণ করবো।' এ ধরনের পাগলামির মোকাবিলা কিভাবে করা সম্ভব?

নেতা চান, আমি সারাক্ষণ বিড়লা হাউজে থাকি। কারণ বড় কোন ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। তিনি আমাকে তার বাড়ীর টেলিফোন নম্বর দিয়েছেন, যাতে আমি রাতেও তার সাথে কথা বলতে পারি। সূর্য অস্ত যাবার সাথে সাথে খুব ঠান্ডা পড়ে। আমি বারান্দায় একটি সোফার উপর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছি। আমার গায়ে পুলওভার, পায়ে মোজা এবং উপরে শাল জড়ানো। তবুও শীতে আমি এতো কাঁপছি যে, আমার দাঁতের ঠকঠকানি বন্ধ করতে পারছি না। বৃদ্ধ ভোর সাড়ে তিনটায় ঘুম থেকে উঠলো। আকাশ ঘন অন্ধকার, অথচ তারকায় পরিপূর্ণ। আলো জ্বললো। নীরব ধ্যানমগ্নতার পর ভজন হলো। বৃদ্ধ কাজ শুরু করলো। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। বৃদ্ধ একটির পর একটি চিঠি তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বলছে এবং পাশের লোকটি একটি কাগজে তা লিখে নিচ্ছে। কয়েক ঘন্টা ধরে এটা চললো। এরপর বৃদ্ধের বাংলা শিক্ষা অনুশীলন। লোকটি যদি মরতেই আগ্রহী তাহলে নতুন একটি ভাষা শেখার অর্থ কি? এর মধ্যে সূর্যের আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। আমার কাঁপুনি বন্ধ হলো। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারপাশ জুড়ে এতো হৈচৈ যে আমাকে উঠে পড়তে হলো। ডাক্তাররা বৃদ্ধকে পরীক্ষা করছে। তারা তাকে কমলার রস দিলো এবং মাথা নত করলো। বৃদ্ধ হাত জোড় করে

নমস্কার করে তাদের বিদায় দিলো। আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, এটি একটি প্রদর্শনী-তামাশা।

বৃদ্ধ নিজেই তার ডাক্তার। কোন ওষুধ, ইঞ্জেকশন কিছুই নেয় না। বৃদ্ধ বলে, 'রামের নামই আমার ওষুধ।' এক ডজন কলমনবীশ কথাটা লিখে নেয়। আগেই বলেছি, একটি তামাশা খোলা হয়েছে।

ভজন এবং রামায়ণ, গীতা, কোরআন ও গ্রন্থ থেকে পাঠ চলতে থাকে সারাদিন। সারাটা দিন জনতার স্রোত এবং তাদের প্রতারণাপূর্ণ চোখেমুখে যেন বিশ্বের দুঃখকষ্ট জড়ো হয়েছে। নেহেরুর চোখে অশ্রু। তার কথা এ রকম, 'গান্ধীজি মারা গেলে তার সাথে ভারতের আত্মাও মরে যাবে।' মওলানা আজাদের চোখে অশ্রু। (দিনের এক সময় মওলানা একলাখ লোকের সামনে এক ঘন্টা বক্তৃতাবাজি করলো। লোকটি নিজের কণ্ঠকে ভালোবাসে)।

সন্ধ্যায় ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন, তার স্ত্রী লেডি সাহেবা এবং মিসি বাবার আগমন ঘটলো বিড়লা হাউজে। বৃদ্ধ লোক তাদের দেখে মস্করা করলো যে, তার অনশন পর্বতকে মোহাম্মদের (সঃ) কাছে এনেছে। পাতিয়ালার দীর্ঘ, সুদর্শন মহারাজা এসে বললেন যে, তিনি হাজার হাজার মুসলমানের জীবন রক্ষা করেছেন। বৃদ্ধ তার কথায় বিশ্বাস করলো না। মালীর কোটলার নবাব এসে বললেন যে, যদি কোন হিন্দু বা শিখকে হত্যা করা হয় তাহলে প্রতিটি নিহতের বদলে দশজন করে মুসলমানকে হত্যা করা হবে- এই হুমকি দিয়ে তিনি হাজার হাজার হিন্দু ও শিখকে রক্ষা করেছেন। বৃদ্ধ তাকে বিশ্বাস করলো। দিল্লীর প্রতিটি লোক মুসলিম প্রেমিক বনে গেছে। লক্ষ লোকের এক মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে এলো ঃ

'হিন্দু মুসলিম শিখ ঈসায়ী
ভারত মে হ্যাঁয় ভাই ভাই'

এরপর ধ্বনি তুললো, 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়।' হোটেল কাফে, দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যেন ছুটির দিন। আমি নিশ্চিত বলতে পারি দিল্লীতে স্মরণাতীত কালের দিল্লীর সবচেয়ে বড় তামাশা এটি।

অনশনের ৬ষ্ঠ দিবসে বৃদ্ধ বললো যে, তার পেশাব হচ্ছে না। আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাই, যে কমলালেবুর এতো যে রস গিললে তার কি হলো? তার কথাবার্তা জড়ানো, যেন অর্ধ জাগ্রত। রেডিও খবর দিলো, বৃদ্ধ মারা যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক ছুটলো, যেন তাদের আসল বাপ মারা যাচ্ছে। তারা তাকে বললো যে, তার সাথে তারাও অনশন করছে- তার বাপ, মা, স্ত্রী এবং শিশুরাও। তারা দরখাস্ত করে বললো যে, তারা আর মুসলিম দলন করবে না। মুসলমানদের মসজিদ ও বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবে। এমনকি যারা পাকিস্তানে চলে গেছে সেসব মুসলমান ফিরে এলে স্বাগত জানাবে।

যেখানেই মুসলমানদের পেলো তাদের গলায় মালা পরিয়ে মিছিল সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করলো। মুসলমানদেরকে জোর করে চা, মিষ্টি লেমোনেড খাওয়ালো। তারা শান্তি কমিটি গঠন করলো। আমাদের নেতা বললেন, সবাই যদি এভাবে পাগল হয়ে যায়, তাহলে আমাদেরকেও পাগলামির ভান করতে হবে। আরএসএস শান্তি কমিটিতে নাম লিখালো। বৃদ্ধ খৈকশিয়াল এই অপেক্ষাই করছিলো। যখনই তার কানে গেল যে, আরএসএস শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়েছে তখনই অনশন ভঙ্গ করতে সম্মত হলো।

১৮ই জানুয়ারী রোববার দিনটি শিখদের দশ জন গুরুর সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিং-এরও জন্মদিন। মুসলমানরা তার পিতা, তার পুত্র এবং তার হাজার হাজার অনুসারীকে হত্যার পর তাকেও হত্যা করে। দিল্লীর অবশিষ্ট মুসলমানের সব ক'টিকে বিতাড়ন করার মাধ্যমে আমরা দিবসটি উদযাপনের পরিকল্পনা করেছি। নেতা বললেন, 'আমরা কাজটা শুরু করলে শিখরা অবশ্যই আমাদের সাথে যোগ দেবে।' কিন্তু আমি আগেই বলেছি গঙ্গা উজানে বইছে। একশ' বাহাত্তর বছর পূর্বে যেখানে গুরুকে দাহ করা হয়েছিল, রিকাবগঞ্জের সেই গুরুদুয়ারায় হাজার হাজার শিখ সমবেত হয়েছে। তাদের মধ্যে শত শত মুসলমান শিখদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা

নিবেদন করছে। বৃদ্ধ খৈকশিয়াল বললো, দিনটি পবিত্র এবং তার যা কাম্য তা যে পূরণ হয়েছে সে জন্য ঐ দিনেই অনশন ভঙ্গ করা তার ইচ্ছা। বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে ছাগুলে দাঁড়িবিশিষ্ট মাওলানা আজাদের হাত থেকে এক গ্লাস কমলালেবুর রস নিয়ে 'রাম রাম' বলে পান করলো। কি ভন্ডামি! আমরা মাসের পর মাস পরিশ্রম করে যে কাজ করেছি, যে রক্ত দিয়েছি, এই বৃদ্ধ ৬ দিনে তা ব্যর্থ করে দিলো!

বৃদ্ধ কিভাবে তার বিজয়কে উপভোগ করলো তা সত্যিই দেখার মত। নেহেরু দৌড়ে এলো তাকে অভিনন্দন জানাতে। বৃদ্ধ আশির্বাদ করলো, 'দীর্ঘজীবী হও এবং ভারতের জওহর (মণি) হিসেবে থাকো।' শ্বেতাঙ্গ সাহেব সম্পাদক টেলিফোনে তার অনশন ভঙ্গের কথা জানালো, কারণ যুদ্ধে তার জয় হয়েছে। বিকেলে মুসলমান রমণীরা তাদের তাঁবুর মত বোরখা আচ্ছাদিত অবস্থায় বললো, আমরাও আপনার সাথে অনশন করেছি।' বৃদ্ধ উৎফুল্ল হলো, 'আচ্ছা, তাই নাকি? তোমাদের মুখ দেখাও। কোন নারীই তার পিতার সামনে মুখ ঢেকে রাখে না। আমি তোমাদের বাপু।' বোরখার নেকাব পিছনে সরিয়ে দেয়া হয়। বৃদ্ধ কামুক খুব ভালো করে ফোলা মুখো মুসলমান রমণীদের দিকে তাকায়। আত্মতৃপ্ত হয়ে বলে, 'এতেই প্রমাণ হয়, সত্যিকার প্রেম কি করতে পারে।'

আমাদের ক্ষতে বৃদ্ধ আরো নুন ঢেলে দেয়। খৈকশিয়াল আমাদের হিন্দু ও শিখদের উপদেশ দেয়, কুরআন পড়তে। বিকেলে ঘন মেঘে আকাশ ঢেকে যায় এবং বর্ষণ শুরু হয়। ভারতের দুর্ভাগ্য দেখে স্বর্গ থেকে ঈশ্বর অশ্রু বিসর্জন দেয়।

আমি জানি না, কে বলতে শুরু করেছিল, কিন্তু যুবকরা বলছে যে, ধর্মকে তার যথাযোগ্য স্থানে পুনঃস্থাপনের জন্য ঈশ্বর মানুষের জীবন চান। নেতা বললেন, এ ধরনের সম্মান কর্মযোগীর জন্য সংরক্ষিত এবং গীতার বাণী অনুসারে তাকে কোন পুরস্কারের আশা না করেই কাজটা করতে। এ ধরনের ত্যাগের জন্য ফাঁসি ভিন্ন কি পুরস্কার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু দিল্লীর কোন যুবককেই এই দায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করা হলো না। একজন চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো।

গান্ধীর অনশন ভঙ্গের দু'দিন পর। প্রার্থনা সভা শেষ হয়েছে। বৃদ্ধ খৈকশিয়াল তার স্বাভাবিক বকবকানি অব্যাহত রেখেছে। তার কথা হলো কেউ যদি তোমাকে ঘৃণাও করে, তোমার মা বোনকে বলাৎকারও করে, তাদেরকেসহ সকলকে ভালোবাসতে হবে। হঠাৎ প্রচন্ড শব্দে একটি বিস্ফোরণ হলো। নিজে নিজে বললাম, সম্ভবত চলমান মোটরের শব্দ। কিন্তু ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে এবং গান্ধীর চেলারা দৌড়াদৌড়ি করছে, যেন হনুমানজী তাদের লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। গান্ধী চীৎকার করছে, 'শোন, সবাই শোন! কোন কারণ ছাড়াই আমরা যদি এভাবে ভীত হয়ে পড়ি, তাহলে সত্যিসত্যিই কিছু ঘটলে আমাদের কি অবস্থা হবে?'

বৃদ্ধের কথায় কেউ কান দেয় না। যত দ্রুত সম্ভব তারা দৌড়ায়। আমিও দৌড় লাগাই। বিড়লা হাউজ থেকে বের হয়ে একটি ট্যাক্সি নিয়ে ড্রাইভারকে বলি অতি দ্রুত হেডকোয়ার্টারে যেতে। কি ঘটেছে বিস্তারিত বলার পর নেতা বললেন, 'বাস! হয়েছে।' তিনি অফিসের কাগজপত্র দ্রুত পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিড়লা হাউজে ফিরে যেতে বললেন এবং না ডাকা পর্যন্ত লেগে থাকতে বললেন। তিনি বললেন, 'আরো ঘটনা ঘটবে। হিন্দু ধর্মের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।' গান্ধী তার ভিতরের কষ্ট সম্পর্কে প্রচুর কথা বলে যে, ঈশ্বর তাকে সবকিছু বলছে। কিন্তু বিস্ফোরণ সম্পর্কে বৃদ্ধ কিছুই জানে না। তার ধারণা, পুলিশ চাঁদমারী করছে। আসল ঘটনা হলো, আমাদের এক ছেলে টার্গেট প্র্যাকটিস করছিল এবং সেই টার্গেট স্বয়ং বৃদ্ধ গান্ধী। ছেলেটি পাঞ্জাব থেকে আসা এক হিন্দু রিফিউজি। নাম মদন লাল পাহওয়া। পাকিস্তান থেকে আসার পর সে এক মসজিদে বাস করছিল যেখান থেকে পুলিশ তাকে বিতাড়ণ করেছে। পাহওয়া একটি বোমা নিক্ষেপ করেছিল। পুলিশ যখন তাকে গ্রেফতার করে তখন তার কাছে আরো একটি বোমা ছিল।

পরদিন গান্ধী বললো যে, পাহওয়া সম্ভবতঃ তাকে (গান্ধী) হিন্দু ধর্মের শত্রু ভেবেছে এবং নিজেকে তার নির্মূলের জন্য ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ বলে বিবেচনা করেছে। পুলিশকে গান্ধী

অনুরোধ করলো, পাহওয়ার উপর অত্যাচার না করে তাকে 'সঠিক চিন্তা-ভাবনার' দিকে উদ্বুদ্ধ করতে। বৃদ্ধকে আমি বলতে চাই, এর মধ্যে কোন সম্ভবতঃ নেই। বৃদ্ধ যথার্থই হিন্দুদের এক নম্বর শত্রু।

গান্ধী প্রত্যেকের চাইতে ভিন্ন হতে চায়। ২৬শে জানুয়ারী সবাই গেল কুচকাওয়াজ দেখতে। গান্ধী বললো, কুচকাওয়াজ তার ভালো লাগে না। অতএব বিড়লা হাউজেই পড়ে থাকলো। আমি সেদিন ছুটি নিয়ে বাবা ও মাকে কুচকাওয়াজ দেখাতে নিয়ে গেলাম। কি চমৎকার তামাশা। সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর ঢালু পথে হাজার হাজার সৈন্য নেমে আসছে। শত শত ট্যাংক, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী সৈন্যদের পিছু পিছু এসে ইন্ডিয়া গেট দিয়ে চলে যাচ্ছে। তারা নেহেরুকে স্যালিউট করছে। যুদ্ধ বিমান রঙ্গিন ধোঁয়া নির্গত করে উড়ে যাচ্ছে। এরপর নেহেরু তার ভাষণে বললো, 'ভারত হচ্ছে গান্ধীর দেশ। ভারত ট্যাংক, কামান ও সাঁজোয়া গাড়ী ও বিমানে বিশ্বাস করে না। ভারতের বিশ্বাস অহিংসায়।

গান্ধী এইসব সামরিক তামাশা পছন্দ করে না। কারণ তার নিজস্ব বিশেষ ধরনের তামাশা আছে। পরদিন বৃদ্ধ ঘোষণা করলো যে, মেহরুলিতে কুতুব মিনারের পাশে কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর মাযার জিয়ারতে যাবে। দিনটি সেই কাকীর মৃত্যুবার্ষিকী। ছয়শত বছর পূর্বে কাকী ভারতে এসে বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিল। মুলতান থেকে বিতাড়িত হিন্দুরা মেহরুলিতে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। তারা কাকীর মাযারের মার্বেল পাথরের বেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলেছে। কিন্তু যখন তারা শুনলো, গান্ধী আসছে- তখন রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ হয়ে শ্লোগান দিলো, 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই' এবং মুসলমানদের চা পানে আপ্যায়িত করলো। আমার এতো রাগ হলো যে, তাদেরকে গালি দিতে চাইলাম 'হারামজাদারা, তোরা কি ভুলে গেছিস, কিভাবে তোদের মাদের মুলতানে ধর্ষণ করা হয়েছে?'

গান্ধী কাকীর মাযারে প্রণাম করলো। মুসলমানরা তাকে বললো, 'আমাদের ফাতেহা পাঠ করুন।' গান্ধী দুই হাত তুলে পাঠ করলো, 'পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল আল্লাহর নামে বলছি'। এর ফলে সে মুসলমান হলো। তাই নয় কি? একজন হিন্দু যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে সে হিন্দু ধর্মের অন্ততঃ একজন দুশমনকে কমাতে সক্ষম হবে।

যেসব হিন্দু ও শিখ কাকীর মাযারের বেষ্টনী ভেঙ্গেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য গান্ধী মুসলমানদের কাছে অনুরোধ জানালো। গান্ধী বললো যে, তার কাছে কিছু ভালো খবর আছে- পাকিস্তানে পেশোয়ারের কাছে পরাচিনারে মুসলমানরা ১৩০ জন হিন্দু ও শিখকে হত্যা করেছে। বৃদ্ধ এটিকে ভালো খবর বলছে, কারণ হিন্দু ও শিখরা 'অহিংস সাহস' দেখিয়েছে। আমি বললাম, 'সাব্বাশ।' গান্ধী যে আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

গুজরাট রেলওয়ে স্টেশনে হিন্দু ও শিখ হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি গান্ধীর এই ভড়ং সহ্য করতে না পেরে বললো, 'আপনি আমাদের যথেষ্ট সর্বনাশ করেছেন। এখন আপনার উচিত এক্ষুণি আমাদের ছেড়ে হিমালয় পর্বতে গিয়ে অবসর কাটানো।'

বৃদ্ধ উত্তর দেয়, 'কারো হুকুমে আমি অবসর নিতে পার না। একমাত্র ঈশ্বরের নির্দেশের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি।' রিফিউজি আপত্তি করে, 'না, আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলেন। আমাদের মন দুঃখে ভরে গেছে।'

বৃদ্ধ ভন্ড উত্তর দেয়, 'আমার দুঃখ তোমাদের চাইতে কম নয়।"

কি করে একটি লোকের খুলিতে এ কথা প্রবেশ করানো সম্ভব, যে লোক সব সময় বলে চলেছে যে, 'আমার কথাই ঠিক। আর সবার কথা, চিন্তা ভুল। মুসলমানরা ঠিক। হিন্দু ও শিখরাই ভুল করছে।'

আজ শুক্রবার ৩০শে জানুয়ারী। আমার ডান হাতে উল্কি দিয়ে লেখা আমার নাম রাম রাখার মতই সেই দিন, মাস ও বছর (১৯৪৮) আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।

গত কিছুদিন ধরে আমি যে সোফাটি ব্যবহার করছি, সেটির উপর ঘুমিয়ে আছি। মনে হলো রাতটি বছরের শীতলতম। ভোর তিনটায় আলো জ্বললো। আমি উঠলাম। বুকের উপর চাপড় দিলাম। আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শীতলতা কাটাবার জন্য লাফালাফি করে বাড়ীর বাইরে গিয়ে

শুকনো ড্রেনে মলত্যাগ করলাম। বাগানের একটি পানির নলের কাছে এসে শৌচ করলাম এবং কাদা মেখে হাত ধৌত করলাম। ঠান্ডায় জমে যাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য হাত দু'টি বগলতলায় চালান করে দিলাম। বৃদ্ধ খেঁকশিয়াল কি করছে দেখার জন্য গেলাম। আমি তার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে 'নমস্কার' বললাম। বৃদ্ধ কাঁচের মধ্য দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। মধু ও লেবুর রস মিশ্রিত উষ্ণ পানি পান করলো। এরপর এক গ্লাস কমলা লেবুর রস। বৃদ্ধ লোকদের বলে থাকে, তার আয়ুষ্কাল হবে একশ' বিশ বছর। এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত বলে বৃদ্ধ ভাবে।

আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠার পূর্বে বৃদ্ধ তার নিয়ম অনুযায়ী ভজন, পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ ও ধ্যানমগ্ন হওয়ার কাজ সারলো। সূর্য উঠার সাথে সাথে এলো জনতা। এটি একটি নিয়মিত মেলা। সকালটা ক্রমে বিকেল হলো। জনতার ভিড় বাড়লো। সরদার প্যাটেল তার কন্যা মনিবেনসহ হাজির হলো। তার মুখে বিরক্তির ছাপ। কন্যার মুখ পাংশুটে। কাঠির মত লিকলিকে এবং এমনভাবে তাকায় যেন কোন মানুষকে চিনে না অথবা জানে না কি করে হাসতে হয়। বৃদ্ধের সাথে কোন বিষয়ে তার দীর্ঘ যুক্তিতর্ক করলো। গান্ধী, যার কোন কাজে বিলম্ব হয় না, তার দশ মিনিট বিলম্ব হলো। বৃদ্ধ যখন বৈকালিক বৈঠকের জন্য বেরিয়ে এলো, তখন তাকে সুখী সুখী মনে হলো। সুখী হবে না কেন? তার দুই হাত দুই যুবতীর কাঁধে। উভয় যুবতীই সুন্দরী। বৃদ্ধ তাদের সাথে মস্করা করছে। খুব হালকা রসিকতা। এক যুবতী তার দিকে গাজর এগিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বলে, 'তুমি আমাকে গো-খাদ্য দিচ্ছ।' সকলে হেসে উঠে। ধুতির ভাঁজ থেকে বৃদ্ধ ঘড়ি বের করে বলে, 'আমার দশ মিনিট বিলম্ব হয়েছে। বিলম্ব করা আমি ঘৃণা করি। ঠিক পাঁচটায় আমি প্রার্থনায় উপস্থিত হতে চাই।'

আমি তার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি। তার কাছে থাকতে আমার ভালো লাগে। কারণ এর ফলে সংবাদপত্রের ছবিতে আমিও থাকি এবং মাকে সেই ছবি দেখাই। লোকজন তাকে শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়ায়। একজন চিৎকার করেঃ 'বলো বলো।' অন্যেরা সাড়া দেয় 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়'। বৃদ্ধ সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানায়।

সবকিছু এতো দ্রুত ঘটে যায় যে, যা ঘটেছে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বারবার আমাকে দৃশ্যটা মনের মধ্যে আনতে হয়। একজন সবল যুবক ভিড় ঠেলে রাস্তা করে নেয়। তাকে থামানোর চেষ্টা করায় একটি মেয়েকে একদিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় এবং গান্ধীর পদস্পর্শ করছে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে ধুতির ভাঁজ থেকে একটি রিভলবার বের করে। কেউ কোন কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলী ছোঁড়ে- ঠাস্ ঠাস্, ঠাস্! গান্ধীর হাত তখনো যুক্ত, যেন বিশ্বকে বিদায় জানাচ্ছে। তার মুখে রাম রাম শব্দ। এরপর নিজের রক্তের উপরই পতিত হয়।

আমার মধ্যে এক অদ্ভুত উন্মাদনা ভর করে। আমি যুবকটির উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দেই। তার চাঁদির চুল উপড়াতে থাকি। মাটির উপর মাথা চেপে ধরে সব রকমের গালি বর্ষণ করি-মাদারচোদ, হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা ইত্যাদি। একজন পুলিশ এসে আমার ঘাড়ে ধরে একদিকে সরিয়ে দিয়ে ঘাতক যুবকটিকে পাকড়াও করে। সেখানে তখন চরম বিশৃংখলা। আমি কোনমতে ভিড় ঠেলে দৌড়ে একদিকে চলে আসি। আমি কাঁদতে শুরু করি। কখনো দৌড়াই। আবার কাঁদি, আবার দৌড়াই। এক রাস্তার পাশে বসে পড়ে কপাল চাপড়ে বিলাপ শুরু করি। 'হায় হায়, কি হলো।' আমার বিলাপে চারপাশে ভিড় জমে উঠে। তারা খুব নম্রভাবে প্রশ্ন করে, তোমার কি হয়েছে বেটা, তুমি কাঁদছ কেন?' আমি অশ্রুসজল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দেই, 'আমার বাপু মরে গেছে।' তারা সহানুভূতিতে আফসোসের শব্দ তুলে। একজন বলে, 'তোমার সাহস রাখা উচিত। মায়ের পাশে তোমার দাঁড়ানো উচত। তোমার বাপু যে কাজ করছিল সে কাজ তোমার চালিয়ে যাওয়া উচিত।' এরপর লোকটি আগ্রহভরে জানতে চায়, 'তোমার বাপু কি করে মারা গেল? তিনি কি অসুস্থ ছিলেন?'

'না, না। তিনি মোটেও অসুস্থ ছিলেন না। আমি নিজ হাতে তাকে খুন করেছি। আমিই তাকে খুন করেছি।' আবার কপাল চাপড়ে বিলাপ শুরু করি, 'হায় হায়, আমার কি হবে, আমি বাপুকে খুন করেছি।'

২১

ভিন্দ্রানওয়ালে ও ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকান্ড

মহাত্মা গান্ধীর ব্যাপারে আমার প্রহরী বুধ সিং-এর ক্রোধের সীমা ছিল না। গান্ধীর ধুতি-টুপিধারী অনুসারীরা বৃটিশদের এ দেশ থেকে উৎখাত করেছে, যা বুধ সিং-এর কাম্য ছিল না। বুধ সিং 'বৃটিশ রিটেনশন লীগ' কায়েম করার চেষ্টা করছিল। সে বৃটেনের রাজাকে লিখেছে তার সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হওয়ার জন্য। সে আমাকে মনোনীত করেছে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এবং আমার অ্যাপার্টমেন্টকে করেছে 'বিআরএল'-এর সদর দফতর। সে একটি স্বাক্ষর অভিযান চালাচ্ছে এবং দশ লাখ ভারতবাসীর স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবে বৃটেনে, যাতে বৃটেনের রাজার নিকট হতে ধুতি-টুপিওয়ালাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিবাদও থাকবে।

যতদূর সম্ভব সে এই উদ্যোগে শুধুমাত্র ভাগমতীর সম্মতি আদায়ে সফল হয়েছে। ভাগমতী লিখতে জানে না বলে তার নামের পাশে বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ নেয়া হয়েছে। নামের পাশে লিঙ্গ ও পেশার বর্ণনাও আছে। নাম-ভাগমতী, লিঙ্গ-হিজড়া, পেশা-বেশ্যাবৃত্তি। সে অত্যন্ত গর্বের সাথে তার সাফল্য আমাকে প্রদর্শন করেছে এবং আমাকে দুই নম্বর স্বাক্ষরকারী হওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করি। তাকে বলি যে, সে যা করতে চায় তা বহু পূর্বে ঘটেছে এবং এখন এসব করে কোন লাভ নেই। সে আমার দিকে এমনভাবে তাকায় যেন আমি পাগল হয়ে গেছি। অতএব আমি তাকে বুঝানোর মত করে বলার চেষ্টা করি যে, বৃটিশরা নিজেরাই ভারত ত্যাগ করতে চেয়েছিল। তুমি কি পত্রিকায় পড়োনি যে, তারা মুসলমানদের পাকিস্তান দিয়েছে এবং ১৫ই আগস্ট ভারত ছেড়ে চলে গেছে।

সে হতাশ হয়ে বলে, "সবই শুধু বকবকানি। মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং গান্ধীর চেলা। আমি তার অপকর্ম সম্পর্কে বাকিংহাম প্যালেসে লিখেছি।"

"তিনি রাজার আত্মীয়। তার ভাগনে বিয়ে করেছে রাজার মেয়েকে।"

'তাহলে তো এই বিশ্বাসঘাতক প্রাসাদের মধ্যে থেকেই চক্রান্ত করবে।'

"তুমি কি চাওনা যে ভারত স্বাধীন হোক।?'

বুধ সিং এ ব্যাপারে খুব বেশী মাথা ঘামায় না। সে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল চালিয়ে বিড়বিড় করে 'কিসের স্বাধীনতা? কোন্ কাজের জন্য স্বাধীনতা? লুটপাট ও হত্যার জন্য? সবাই বলে স্বাধীনতা, স্বাধীনতা- কিন্তু কেউ জানে না স্বাধীনতা কি?"

কেউ বেল টিপার কারণে বুধ সিং-এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি। তাকে বলি, "এ ব্যাপারে আমাকে চিন্তা করতে দাও।" দরজা খুলে দেখলাম আমার শিখ সাংবাদিক বন্ধু এসেছে। বুধ সিং আমার মেহমানের কাছে বৃটিশ রিটেনশন লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সুযোগ লাভের পূর্বেই আমি তাকে ভদ্রভাবে বলি, "এখন নয়, অন্য সময়। এ নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে চটজলদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়।" শিখ সাংবাদিক রসিকতায় পটু। সে একটি গল্প শোনায়, 'রাম, সীতা ও লক্ষণ যখন তাদের চৌদ্দ বছরের নির্বাসনে যাওয়ার জন্য অযোধ্যা ত্যাগ করছিল তখন শহরের লোকজন তাদেরকে বিদায় জানাতে আসে। নগর দ্বারে উপনীত হয়ে রামচন্দ্র নগরবাসীদেরকে অনুরোধ জানায় ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য, "ভদ্র মহোদয় ও পুরনারীগণ, এই যথেষ্ট, আর অগ্রসর হবেন না।" নগরবাসী তার অনুরোধ মেনে ফিরে যায়। চৌদ্দ বছর পর নির্বাসিতরা যখন অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করে, তখন তারা দেখতে পায় যে, একদল মানুষ নগর দ্বারের বাইরে অপেক্ষা করছে। তারা বলে, "আপনি শুধুমাত্র পুরুষ ও নারীদের ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। আমাদের বাড়ী ফিরে যাওয়ার

অনুমতি দেননি। আমরা পুরুষ বা নারী কিছুই নই। আমরা হিজড়া।" রামচন্দ্রজী তাদের ভক্তিতে এতোটা উদ্বেলিত হয়েছিলেন যে, তিনি তখন তাদের আশির্বাদ করেন, "১৯৪৭ সালে আমি তোমাদেরকে অর্থাৎ হিজড়াদেরকে হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্য উপহার দেব"। সে দম ফাটিয়ে হাসতে থাকে। এরই মধ্যে আবার কলিং বেল বাজে। ভাগমতী প্রবেশ করেই বলে, 'এতো হাসি কি জন্য। মজার কোন কথা হচ্ছিল কি?'

সাংবাদিক বন্ধু আমাকে গল্পটি বলার জন্য বলে। তাকে জলদি কফি-হাউজে যেতে হবে। দ্রুত সে আমার অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে। ভাগমতী আবার জানতে চায় সে কি বলছিল। কিন্তু কি করে তাকে গল্পটি বলি।

বর্ষার পর কুয়াশা ও শিশিরের মাস আসে। প্রতিদিন ভোরে আমি যখন টেনিস খেলতে যাই, গাড়ীর উইন্ডস্ক্রীন থেকে শিশির মুছে ফেলতে হয়। ডাস্টারটি ভিজে উঠে এবং ময়লা লেগে কালো হয়ে যায়। একদিন সকালে খেলা শেষে ফিরে এসে দেখি বুধ সিং হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসে আছে। সে আমার দিকে তাকায়। তার চোখ লাল। ঘাতকের দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে। আমি নরম সুরে জানতে চাই।

'কি ব্যাপার বুধ সিং'।

'আমার চোখ উঠেছে।' চোখ তুলে সে বিড় বিড় করে বলে।

'তোমার উচিত ডাক্তারকে দেখানো।'

আমার পরামর্শের প্রতি তার গরজ আছে বলে মনে হলো না। আমি ঘরে প্রবেশ করি। বাবুর্চি কার্পেটের উপর শুয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি?'

'আমার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

ডাক্তারকে ফোন করলাম। কাছেই তার ক্লিনিক। তিনি এসে বুধ সিং-এর দিকে তাকিয়েই বললেন, 'কনজাঙ্কটিভাইটিস, দিল্লীতে সবারই হচ্ছে।' তিনি একটি মলম লিখে দিলেন।

এর পর তিনি বাবুর্চিকে হা করতে বললেন। বাবুর্চি মুখ খুলে 'আ' আ-বললো। ডাক্তার তার চোখ দেখলেন। মুখে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিলেন। তাপ ১০২ ডিগ্রী। জিজ্ঞেস করলেন, পাতলা পায়খানা বা বমি হচ্ছে কিনা। সে নেতিবাচক উত্তর দিয়ে শুধু বললো, 'আমার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে।'

ডাক্তার আমাকে বললেন, এটা হেপাটাইটিস বা কলেরা নয়। দিল্লীতে প্রচুর লোকের এই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া, কিংবা ভাইরাস ফিভার। আমাকে ওর রক্ত, মলমূত্র পরীক্ষা করতে হবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। তিনি বাবুর্চির জন্য ওষুধ লিখছেন। আমার জন্যও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধ দিলেন। আমার পকেট থেকে দেড়শ টাকা বেরিয়ে গেল। প্রেসক্রিপশন নিয়ে দোকান থেকে ওষুধ কিনে বুধ সিং ও বাবুর্চিকে দিয়ে তাদের নিজ নিজ জায়গায় থাকতে বললাম। কারণ এসব রোগ ছোঁয়াচে। 'ভালো না হলে ঘুরাফেরা একদম বন্ধ।'

অ্যাপার্টমেন্ট এখন ফাঁকা। ভাগমতী এলে ভালো হয়। তাহলে দু'জনেরই সুন্দর কনজাঙ্কটিভাইটিস হতে পারে। হয়তো ইতিমধ্যে সেই কুত্তীর তার কোন আক্রান্ত খদ্দের হতে নিজেও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

গোসল সেরে চা তৈরী করে সংবাদপত্র নিয়ে বসলাম। প্রথমে হাতে তুললাম 'হিন্দুস্থান টাইমস'। সর্বাধিক প্রচারিত দিল্লীর সবচেয়ে বাজে পত্রিকা। চতুর্থ পৃষ্ঠায় মৃত্যু ও শোকবাণীর বিজ্ঞাপন পড়তে থাকলাম। দিল্লীর সকল মৃত্যুই দুঃখজনক ও অকাল মৃত্যু। সময় যখন ফুরিয়ে যায় তখন তারা কেবল মৃত্যুবরণই করে না, গীতা শুনতে শুনতে যাত্রা শুরু করে, যেন মৃত্যু এক ধরনের পোশাক বদলের ঘটনা। দিল্লীর মৃতরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বনজ জ্বালানি ধ্বংসের জন্য দায়ী। অথচ বৈদ্যুতিক শ্মশানে যাদের দাহ করা হয় তাদের জন্য ব্যয় হয় জ্বালানি কাঠের ব্যয়ের এক চতুর্থাংশেরও কম। কিন্তু ধনী ব্যক্তিরাই শুধু বৈদ্যুতিক শ্মশানে ভস্মীভূত হবার সুযোগ লাভ করে। কাঠের আগুনে জ্বলে নির্মূল হয় দরিদ্র, ভিক্ষুক ও লাওয়ারিশ মানুষের লাশ। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরের মজনু কা টিলার তিব্বতী কলোনী থেকে শুরু করে গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্র রাজঘাট পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য বিহার, মন্দির, শ্মশান, বৈদ্যুতিক শ্মশান, নেহেরু, শাস্ত্রী, চরণ সিং,

সঞ্জয় গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী এবং জাতির পিতা আসল গান্ধীর স্মৃতিসৌধ। যমুনা তীর হয়ে উঠেছে মানুষের অজ্ঞাত যাত্রার উড্ডয়ন ক্ষেত্রে।

চারের পাতায় একটি বজ্র আইটেম। নির্গমবোধ ঘাট যমুনার পানিতে উপচে গেছে। মানুষকে তাদের প্রিয়জনদের দাহ করতে অন্যত্র নিতে হবে। সম্ভবত এই প্রথম বৈদ্যুতিক শ্মশান লাভের মুখ দেখবে। আমার তেমন কাজ নেই। সে জন্য আমি এক চক্কর ঘুরে বেড়াবার সিদ্ধান্ত নেই। এরপর কফি হাউজে আড্ডা দিতে যাবো। পুরনো কিল্লা হয়ে রিং রোডে গেলাম। বামে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক সদর দফতর ফেলে অগ্রসর হলাম। এই সংস্থাটিই দিল্লীর অস্বাস্থ্যের কারণ। বিশাল আবর্জনা নিষ্কাশন প্রকল্পটি ডানদিকে। এই প্রকল্পের চারটি চিমনি থেকে উদগীরিত ধুঁয়া বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিবেশ সংক্রান্ত বুলেটিনের সেরা আলোকচিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। এই ধুঁয়া দিল্লীবাসীর হেপাটাইটিস, কলেরা, আমাশয় এবং অন্যান্য পেটের পীড়া ছড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমি ওভারব্রীজের উপর থেকে যমুনা নদীর দিকে তাকাই। কাদা মাখা ঘোলাটে পানি বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। পুরনো লোহার ব্রীজের কাছে পুলিশ বেষ্টনী এবং ব্রীজটি যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ। আমি আবার গাড়ীতে উঠি। সুইপাররা ময়লা সরাতে ব্যস্ত। তিনজন ভিক্ষুকের মৃতদেহ একটি ট্রলীতে উঠানো হয়েছে। দাহ করার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। সেখানে যেতেই শ্মশান অফিসের কেরানী জানতে চায়, মৃতদেহ কি এসেছে? তিনটি মৃতের বুকিং আছে। আমি বলি, 'আমার কেউ মরেনি। তামাশা দেখতে এসেছি।' লোকটি ধিক্কারের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তিক্ত কণ্ঠে বলে, এই তামাশা যদি এতোই ভালো লাগে, তাহলে আমার চাকরিটা নিন।'

শ্মশান থেকে বের হলাম। উল্টো দিক থেকে পুষ্পস্তবক সজ্জিত সামরিক চিহ্ন উৎকীর্ণ গাড়ী বহর শ্মশানে প্রবেশ করছে। বৃদ্ধ সৈন্যরাও মারা যায়।

কফি হাউজ জমে উঠেছে। সাংবাদিক বন্ধু এবং আমাদের রাজনৈতিক উপদেষ্টারা পত্রিকার পাতায় চোখ দিয়েছে। আমি পৌছতে তারা পত্রিকা থেকে চোখ তুলে। আমার অনিয়মিত উপস্থিতির কারণ জানতে চায়।

আমি তাদের বলি যে, আমার অনেক আত্মীয় ও বন্ধুর চোখ উঠেছে, জ্বর হয়েছে। এমনকি আমার চাকরদেরও।

শিখ সাংবাদিক বন্ধু বলে উঠে, 'তুমি ভাগ্যবান যে তোমার এইডস হয়নি। বিদেশিনীদের সাথে তুমি যা করে বেড়াচ্ছো তা জেনেই আমি বলছি যে, দিল্লীতে কারো এইডস হলে প্রথমেই হবে তোমার।

"ধন্যবাদ, তুমি নিজের কথা ভাবো। তোমার মত সমকামীদের এইডস হয়। সরাসরি যৌনকর্মের কোন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নেই।"

রাজনীতিবিদ বন্ধু বলে, 'সেক্স ছাড়া তোমাদের মাথায় কি আর কিছু নেই। দিল্লীতে মানুষ মরছে মাছির মত, আর তোমরা ভাবছো সমকাম ও বিদেশী মহিলাদের সাথে সম্পর্কের কথা। তোমরা কি শহরের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু ভাববে?

আমরা বলি, 'না' ভাববো না। যে দিল্লীতে আমি বড় হয়েছি এবং ভালোবেসেছি, এটা সেই দিল্লী নয়, তোমরা পাঞ্জাবীরা ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে ঢুকে শহরটিকে ধ্বংস করে দিয়েছো।'

১৯৪৭ সালে আমাদের করার কিছুই ছিল না দিল্লীতে আসা ছাড়া। কিন্তু যারা এখন প্রতিদিন দিল্লীতে আসছে তারাই সব সমস্যার সৃষ্টি করছে। তুমি কি জান যে, প্রতিবছর সারা দেশ থেকে ৭০ হাজার লোক দিল্লীতে আসছে? যেন দিল্লী ভারতের এতিমখানা। এখানে এলেই বাড়ী, স্কুল, হাসপাতাল পাবে। তুমি কি জানো, তের লক্ষ দিল্লীবাসী খোলা জায়গায় পায়খানা করে?

সাংবাদিক বন্ধু রাজনীতিবিদকে পরামর্শ দেয়, 'তুমি একটি আন্দোলন শুরু করো যে, কেউ সপ্তাহে এক বারের বেশী, মল ত্যাগ করতে পারবে না। আমি এর প্রচারের ব্যবস্থা করবো, এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

"তোমার সাথে এসব বলা আর সময় নষ্ট করা এক কথা। আমার কথা মনে রেখো। দিল্লী মরণাপন্ন শহর। তোমার মত লোক শহরে যত হবে, এর মৃত্যু তত ত্বরান্বিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য আমার কফির দামটা তুমিই শোধ করো।" বলেই সে কেটে পড়ে।

জীবন আমার ভাবনার চেয়েও দ্রুত কেটে যায়। সেই এক দুপুরে ভাগমতীতে রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার সাথে কতবার শয্যায় মিলিত হলাম অসংখ্যবার কতো বিদেশীনির সাথে মিশলাম যাদের তালিকা শুধু জাতিসংঘ সেক্রেটারিয়েটই দিতে পারবে। আজ আমি খুব অল্পজনের চেহারা ও নাম স্মরণ করতে পারি। আমি এখন স্থবির হয়ে গেছি। আমি যা করেছি, সে জন্য আমি লজ্জিত নই, কিন্তু আর কিছু করতে পারি না । ভাগমতীর আগমনও দুর্লভ হয়ে গেছে। দু'তিন মাস পর। তার অর্থের প্রয়োজন হলে সে এসেছে। গত তিন চার বছরে শুধু দিওয়ালীর সময়ে তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। সে এখন আর তার হিজড়া স্বামীর কথা বলে না। সে রামজী ও হিন্দু মন্দির এবং মুসলিম দরগায় যায়। শিখ ধর্ম সম্পর্কে সে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। সে আমাকে বলেছিল যে, জীবনের অবশিষ্ট সময়ে সে হরদ্বার বা বারাণসীতে গঙ্গার তীরে কাটিয়ে দেবে। একবার সে হজ্ব পালনের জন্যও যাওয়ার কথা বলেছিল। কখনো সে বলেছে, আমি মরলে আমার দেহভস্ম গঙ্গায় নিক্ষেপ করো।' আবার কখনো বলেছে, আমার কবরের জন্য নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাযারের কাছে দুই গজ জায়গা কিনে দিও।' আমি তাকে বলতাম যে, আমি নিঃসঙ্গে তার আগে মরবো এবং সে যেন আমাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে। আমরা উভয়েই জানতাম যে, আমাদের মৃত্যুর বহুদিন পর আমরা এই খবর জানতে পারবো।

বুধ সিং খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নারীঘটিত ব্যাপারটার পর থেকে সে উল্টো পাল্টা বকছে। আমি তাকে মেডিকেল ইন্সটিটিউটের মেন্টাল ওয়ার্ডে নিয়ে যাই। ডাক্তার তাকে ইলেকট্রো কমপালসিভ থেরাপি দেয়, যা আমাকেও বিচলিত করে তোলে। ডাক্তার যখন আমাকে বলে যে, তাকে আগ্রা বা রাঁচির মানসিক হাসপাতালে প্রেরণ করা উচিত, তখন বুধ সিং নিজে বিচলিত হয়। ডাক্তারকে সে বানচোৎ বলে গালি দেয় এবং তাকে মারতে চেষ্টা করলে আমি প্রতিহত করায় আমাকেও প্রায় আঘাত করে বসে। আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনে সে বসে থাকে এবং প্রবেশ ও নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সময় আড় চোখে তাকায়।

অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের গুরুদুয়ারার ভাই-এর সাথে সে বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। গুরু ভাই ভোর চারটা থেকে মাইক উচ্চ ভল্যুমে দিয়ে প্রার্থনা করে। মাইক্রোফোন আমার শয়ন কক্ষের দিকে। আমি প্রতিবাদ করায় সে আমাকে নিজের কাজ করতে পরামর্শ দেয়। বিরক্ত হয়ে আমি পুলিশকে জানাই এই উপদ্রব থেকে আমাকে উদ্ধার করতে। গুরু ভাই সাব ইন্সপেক্টরকে বলে যে, এটি শিখ সঙ্গতের সিদ্ধান্ত, কাজেই আমি প্রতিবাদ করার কে? কিন্তু আমি জানি তার একমাত্র সঙ্গত বুধ সিং। সে গুরুভাই আমাকে সতর্ক করে দেয় যে, এরপর আমি যদি পুলিশকে কিছু জানাই তাহলে সে সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালের শিষ্যদের বলে দেবে আমাকে সোজা করার জন্য। বুধ সিং শ্লোগান দেয় 'সন্ত জর্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে জিন্দাবাদ।'

আমার বাবুর্চি বার্ষিক ছুটিতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আমাকে একাকী সবকিছু করতে হয়। একা জীবন কাটানো কঠিন কিছু নয়। খুব সংক্ষেপে খাবার তৈরী করি। গুরুভাই এর মাইক্রোফোনের আওয়াজ আমাকে ভোর চারটায় জাগিয়ে দেয়। আমি এক মগ চা নিয়ে পাঠ কক্ষে চলে যাই। সেখানে ভাই-এর কর্কশ আওয়াজ পৌছে না। সাড়ে চারটায় বিবিসি'র খবর শুনি। এরপর হিন্দীতে বাইবেল সোসাইটির বাণী কিংবা অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের ভোর বেলার প্রার্থনা শুনি। সাধারণতঃ অমৃতসরের প্রার্থনাকে প্রাধান্য দেই। কারণ আমি এই প্রার্থনার সাথে পরিচিত।

সকালের আলো ফুটলে আমি লোধী পার্কে হাঁটতে যাই। সকালে যারা হাঁটে অধিকাংশ একে অন্যকে চিনে এবং নমস্কার দেয়। ফিরে এসে আরেক মগ চা পান করি। কয়েক টুকরা টোস্ট খাই। যখন পত্রিকা পড়ি, সুইপার মহিলা এসে ঘর ঝাড় দিয়ে যায়। এরপর আমার আর করার কিছু থাকে না। দিনে কয়েক মাইলের বেশী পুরানো গাড়ীটা চালাবার সঙ্গতি এখন আমার নেই। তবুও ব্যাটারী ঠিক রাখার জন্য চালাতে হয়। কখনো কখনো কফি হাউজে যাই। একথা শুনতে অবাক লাগে না যে, এই বৃদ্ধ লোকটি এখানে পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে আসছে। সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার লাইব্রেরীতে যাই। আমার স্বচ্ছল দিনে এর জীবন সদস্য

হয়েছিলাম। সেখানে ভালো সময় কাটে। রাতে ঘরে ফিরে এসে মেহদী হাসান, ইকবাল বানু, ফরিদা খানমের গজল শুনি। ভালো ঘুম হয় না। দুঃস্বপ্ন দেখি। অসুস্থ হলে আমার কি উপায় হবে? আমাকে দেখাশুনা করার মত কেউ নেই। খুব ভালো হতো যদি রাতে ঘুমিয়ে পড়তাম এবং সকালে সুইপার মহিলাটি এসে আমাকে মৃত আবিষ্কার করতো। আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সে যা ইচ্ছে তাই নিতে পারতো এবং পরে দ্বিতীয়বার ঘরে এসে চীৎকার করে কেঁদে কেটে আমার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করতে পারতো। কেউ আমাকে আক্রমণ করলে আমি প্রতিরোধ করতে পারবো না। এতে অবশ্য ভালো হবে যে, এর ফলে অনেক লোকের সমস্যার কারণ হবো না আমি। এর ফলে আমাকে হাসপাতালে শয্যা লাভের বিড়ম্বনা এবং তার বিলের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

এভাবে দিন কাটছিল। বিছানা ছাড়লেও আমার ঘুম ভাব থাকে এবং নিজেকে টেনে পড়ার টেবিলে নিয়ে যাই। এক সকালে আমার পায়ের আঘাতে টুলটি পড়ে গেল, যার উপর ইলেকট্রিক কেটলি রাখি। ভাগ্য ভালো যে, ফুটন্ত পানির মাত্র কয়েক ফোটা পায়ের উপর পড়েছিল। স্বর্ণমন্দিরের কীর্তন আর ভালো লাগছিলো না। রেডিও বন্ধ করে দিলাম। কীর্তন শোনার কারণ, ঐ সময়ে শোনার মত ভালোকিছু আর থাকে না। যখন থেকে ভিন্দ্রানওয়ালে হিন্দুদের বিরুদ্ধে স্বর্ণমন্দির থেকে বলতে শুরু করেছে তখন কীর্তনের ব্যাপারে কিছু একটা ঘটেছে। ভাই ও বুধ সিং তাকে বলছে 'সন্ত'। আমি নিজেকে খুব দুর্বল শিখ বিবেচনা করছি, কারণ আমি তাকে ভাবছি 'ভূত' বা শয়তানের অবতার।

১৯৮৪ সালের জুনের প্রথম দিবসে রেডিওতে স্বর্ণমন্দিরের সকালের কীর্তন কেমন উত্তেজনাপূর্ণ মনে হলো। তবলার শব্দ মাইক্রোফোনের এতো কাছে থেকে আসছে কেন, অথবা অন্য কিছু ঘটেছে? তবলার তাল মনে হচ্ছে গুলীর শব্দের মত। পত্রিকা বলছে যে, সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ভিন্দ্রানওয়ালেকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরার জন্য। সম্ভবতঃ তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যই এই হুমকি দেয়া হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী শিখদের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তিনি সেনাবাহিনীকে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেবেন না। বুদ্ধিমতি নারী। তিনি জানেন যে, মন্দিরে অভিযান চালালে সেটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। শিখ জাতি তাকে ক্ষমা করবে না।

আমি সতর্কতার সাথে সংবাদপত্র পড়ি এবং অমৃতসরের সকালের প্রার্থনা শুনি। ৩রা জুন স্বর্ণমন্দির নির্মাতা গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী দূরের গ্রাম থেকে আসবে পবিত্র পুকুরে অবগাহনের জন্য। কীর্তনের পিছন থেকে তাদের কলরব ভেসে আসে রেডিওতে। শিশুদের কান্নার শব্দও শোনা যায়। কান্না থামানোর জন্য তাদের মায়েরা তাদেরকে স্তনের বোটা মুখে পুড়ে দিচ্ছে ঘুষ হিসেবে। 'ওয়াহ গুরু' চীৎকার ভেসে আসছে। ভিন্দ্রানওয়ালের লোকদের সাথে তারা মন্দিরে কি করছে। অমৃতসরে কারফিউ জারি করা হয়েছে। পাঞ্জাব সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে এবং পাঞ্জাবকে গোটা বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। ৫ই জুন কীর্তনের চাইতে গুলীর শব্দই জোরে শোনা যাচ্ছে। পরের দিন সকালে রেডিও স্তব্ধ। সংবাদপত্রের বড় শিরোনাম। সবই বিজয়সূচক, সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন, ভিন্দ্রানওয়ালের ঘাঁটির পতন। 'ভিন্দ্রানওয়ালের ঘাঁটিতে ট্যাংকের হামলা।' বিবিসি বললো, ভিন্দ্রানওয়ালেসহ এক হাজারের বেশী বিদ্রোহী নিহত। গুলীবিদ্ধ রক্তাক্ত নারী-পুরুষের লাশ পবিত্র পুকুরে ভাসছে। ইন্দিরা গান্ধী এই অপকর্ম করতে গেল কেন? আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে বার বার প্রশ্ন করলাম, আমি কি একজন শিখ? 'আমি নিশ্চয়ই ভিন্দ্রানওয়ালেপন্থী কিংবা গুরুভাইপন্থী নই। ভিন্দ্রানওয়ালে বুধ সিং-এর চাইতে নিঃসঙ্গ ছিল। আমি স্মরণ করতে পারলাম না আমি কবে সর্বশেষ গুরুদুয়ারায় গেছি। গত পঞ্চাশ বছরে আমি কোন প্রার্থনা করিনি।

৬ই জুন আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টের পিছনের গুরুদুয়ারায় গেলাম। বেশ ভিড়। অনেকের চোখে পানি। তাদের চোখের পানি আমার চোখেও পানি আনলো। আমি তাদেরই একজন। প্রার্থনা শেষে গুরুভাই সংক্ষিপ্ত জ্বালাময়ী ভাষণ দিলো, 'আমরা শিখরা কখনো ভুলি না বা ক্ষমা করি না। স্মরণ করুন, আমরা আফগান বা মাসা রাঙ্গারদের কি করেছিলাম। আমরা তাদের

মসজিদ ধ্বংস করেছি ও মাসার মাথা কেটে ফেলেছি। এবারের দস্যুদেরও গুরুর সন্তানরা তাই করবে। আপনারা অপেক্ষা করুন এবং দেখুন, শিখরা মহা অন্ধ। তারা অতীতে বাস করে এবং এ কথা উপলব্ধি করে না যে, একটি সভ্য সমাজে মসজিদ ভাঙ্গা বা মানুষের মাথা কাটা যায় না।

গুরুভাই এবং অধিকাংশ শিখকে কালো পাগড়ী পরে রাস্তায় বেরুতে দেখা গেল। কয়েকদিন পর আমার কয়েকটি পাগড়ীর রংও কালো করে নিলাম। আমি তাদের একজন হয়ে গেলাম। বুধ সিং আরো উন্মত্ত হয়ে গেছে। যখনই আমার অ্যাপার্টমেন্টের সামনের রাস্তা দিয়ে কোন হিন্দু অতিক্রম করে তখনই সে শ্লোগান দেয়, 'সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে জিন্দাবাদ।' তারা হাসে। তারা যদি বুধ সিংকে চুপচাপ দেখে তাহলে তাকে প্ররোচিত করে, 'ও ভিন্দ্রানওয়ালের সন্তান। আবার শ্লোগানটা দাও।'

এভাবেই গ্রীষ্ম কেটে গেল। বর্ষা এলো। সেপ্টেম্বর শেষে অক্টোবর মাসের শেষ দিন। আমার মনটা অবসাদগ্রস্ত। কারণ কি জানি না। ঘুম ভালো হচ্ছে। সত্তর বছর বয়সে কত সমস্যা হতে পারে। এক মগ গরম আদা চা বন্দুকের নল পরিষ্কার করার মত পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য উত্তম। খবর অন্য দিনের চেয়ে খারাপ নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তন ভালোর দিকে। অতো গরম বা ঠান্ডা নয়। বিভিন্ন সুগন্ধ ছড়ানো ফুল ফুটছে। সকালে ঘাসের উপর কুয়াশা দেখে মনে হয় মুক্তার দানা।

আমার চেতনা জাগ্রত হচ্ছে না। সংবাদপত্রের হেডলাইন পড়া, মোড়ায় বসে পা দুলকানো ছাড়া কাজ নেই। ভাগমতীকে স্বপ্নে দেখা। যখন থেকে সে বছরে একবার আসতে শুরু করেছে তখন থেকে সে আমার স্বপ্নে ঘন ঘন আসছে। গত দশ বছরে আমরা শয্যায় মিলিত হইনি। কিন্তু এখনো স্বপ্নে কামনাময় ও উপভোগ্য কলিং বেল বাজছে নন স্টপ। দরজায় হাতের চাপড় পড়ছে। ভাগমতী? দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলি। না, বুধ সিং। পাগলের মত বিস্ফারিত চোখ। নাসিকা স্ফীত। চীৎকার করে কথা বলতে তার থুথু এসে আমার মুখের উপর পড়লো। "ইন্দিরা গান্ধী গুলীতে নিহত। সন্ত জর্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালে জিন্দাবাদ।'

বুধ সিংকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। আমি দরজা বন্ধ করতে চেষ্টা করি। সে এক পা বাইরে দিয়ে আমাকে নিরস্ত করে। 'আপনার ধারণা, বুধ সিং পাগল? বুধ সিং মিথ্যা বলছে? বিবিসি শুনুন।' সে মার্চ করে, 'খালিস্তান জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী মুর্দাবাদ। সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে অমর রাহে।'

আমি ট্রানজিস্টর খুলি। অব ইন্ডিয়া রেডিতে সিনেমার গান, কৃষি কর্মসূচী। আধ ঘন্টা পর বিবিসি পেলাম। ইন্দিরা গান্ধী শিখ দেহরক্ষী দ্বারা গুলীবিদ্ধ। তাকে অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইনস্টিটিউটে নেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জৈল সিং ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্র রাজীব গান্ধী দিল্লীতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অবস্থা সম্পর্কে কোন সরকারী বক্তব্য দেয়া হবে না। স্টেনগান ও পিস্তলের অনেক গুলী ইন্দিরা গান্ধীর দেহে বিদ্ধ হয়েছে। বোধ হয় তিনি বাঁচবেন না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি চেয়ারে বসে পড়ি অবসন্ন হয়ে। মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত তাকাই। আবার সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত। কলিং বেল বাজে। দরজার ছিদ্রপথে তাকাই। বুধ সিং নয়, গুরুদুয়ারার গুরুভাই। দরজা খুলি। সে একটি গামলা নিয়ে এসেছে। তাতে ময়দার পুডিং। উচ্চারণ করে, 'পেরসাদ। মন্দির অপবিত্র করার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে। শিখরা জিতেছে। ইন্দিরা কুত্তী মরেছে।"

তার কোন কথার উত্তর না দিয়ে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেই এবং ফিরে এসে চেয়ারে বসি। একজন ক্ষীণাঙ্গী, নিরীহ রমণীর হত্যা উদযাপন করা হচ্ছে। শিখদের হলো কি? এই মহিলা যদি তার ভুল স্বীকার করতো। স্বর্ণ মন্দিরে গিয়ে বলতো, শিখ ভাই ও বোনেরা, আমি দুঃখিত। আমি গুরুতর অপরাধ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। তাহলে নিশ্চয়ই তারা ক্ষমা করতো। কিন্তু একজন বিভ্রান্ত গুরু এবং তার সশস্ত্র অনুসারীদের শায়েস্তা করতে ইন্দিরা গান্ধী সেনাবাহিনীকে সহস্র নিরীহ তীর্থযাত্রীকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে। আকাল তখত ধ্বংস করেছে। নগদ অর্থ লুট করেছে। হাড়িপাতিল ভেঙ্গেছে। যাদুঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, একটি ইঁদুর মারতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী একটি বাড়ী ভেঙ্গে ফেলেছে। একটি অপরাধ আরেকটি অপরাধের জন্ম

দেয়। গোটা দেশ বাগাড়ম্বর ও মিথ্যাচারের মূল্য দেয়।

আমি অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে বিবিসি, তা থেকে ভয়েস অব আমেরিকা রেডিও জার্মা,ন রেডিও মস্কো-সব ধরতে চেষ্টা করি। অল ইন্ডিয়া রেডিও বলছে, ইন্দিরা এখনো জীবিত। মস্কো শুধু দিল্লীর উদ্ধৃতি দেয়। সময় কেটে যায়। বিবিসি এবং ভোয়া বলে ইন্দিরা মারা গেছে। সামনের লনে একটি মানুষও নেই। গুরুদুয়ারার পথে কেউ নেই। কয়েকটি বাস চলে যায়। তাতে ভিড় নেই। কয়েকজন সাইকেল চালক এতো জোরে বাড়ীর দিকে সাইকেল চালিয়েছে যেন বাতাসের বিপরীতে চলতে মাথা নীচের দিকে নিয়েছে। সর্বত্র বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা।

বিকেল হয়। হকার দরজার নীচে দিয়ে সান্ধ্য দৈনিক 'ইভনিং নিউজ' ঠেলে দেয়। শিরোনাম 'ইন্দিরা গান্ধী নিজ শিখ দেহরক্ষীর দ্বারা গুলীবিদ্ধ। দেহরক্ষীদের একজন নিহত। অন্যজন গুরুতর আহত। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল ইন্সটিটিউটে সার্জনরা ইন্দিরার দেহ থেকে গুলী বের করে নিয়েছে এবং রক্ত দিচ্ছে।'

বাসী খবর। ততক্ষণে সকল বিদেশী রেডিও বলছে যে, ইন্দিরা অপারেশন টেবিলে মারা গেছে। কিন্তু এখন কি হবে?

কলিং বেল বাজছে। সাথে দরজায় করাঘাত। দরজার ছিদ্র দিয়ে দেখি। কিছুটা মোটা, বৃদ্ধ মহিলা। আবছা অন্ধকারে আমি চিনতে পারি না। দরজা খুলি। ভাগমতী। পাকা চুলে সে মেহদী লাগিয়েছে। দাঁত নেই। মুখ ঝুলে পড়েছে। এই কি সেই ভাগমতী। আমার কামনার দিনগুলোতে যাকে কামনা করতাম? দন্তহীন মুখে সে উচ্চারণ করে 'হায় লাম, হায় লাম। তওবা, তওবা। আমি নিজ চোখে দেখে এলাম, ওরা সব শিখকে হত্যা করছে। তাদের গাড়ী পুড়িয়ে দিচ্ছে। কনট প্লেসে আগুন দিয়েছে। ওরা লুটপাট করছে শিখ দোকানে, শিখদের অফিস ও হোটেলে। আর তুমি এখানে বসে আছো। ওরা এসেই তোমাকে খুন করবে। আমি তোমাকে লাল কুয়ানে নিয়ে যাচ্ছি। কেউ কোন হিজড়ার এক গাছি চুলও বাঁকা করতে পারবে না। চলো। আর দেরি নয়।' সে নির্দেশের সুরে বলে।

আমি ওকে থামতে বলি। 'ওরা যদি শিখকে দেখা মাত্র মেরে ফেলে তাহলে কি করে লাল কুয়ানে যাবো। তার চেয়ে এখানে থাকাই উত্তম। পুলিশ যথাসময়ে ব্যবস্থা নেবে।'

'পুলিশ!' উত্তেজিত হয়ে সে বলে, "ওই বানচোৎরা হিন্দুদের সাথে যোগ দিয়েছে। তারা বলেছে, 'তোমাদের ছত্রিশ ঘন্টা সময় দিলাম এর মধ্যে সব শিখকে শেষ করে ফেলবে।" দুঃখে সে দুই হাতে মুখ ঢাকে। এখন তাকে সান্ত্বনা দেয়ার সময়। আমি তার কাঁধে হাত রাখি। তাকে বলি, 'পরিস্থিতি অতো খারাপ হবে না। এটি একটি সভ্য দেশ।"

অশ্রু ভেজা চোখ তুলে সে তাকায়, "তুমি নিজ চোখে এসব দেখতে চাও। চলো ছাদে উঠে তোমাকে দেখাই।" আমরা চারতলার ছাদে উঠি। আঙ্গুল দিয়ে সে কনট সার্কাসের দিকে দেখায়। আকাশ উজ্জ্বল। বৈদ্যুতিক আলোতে নয়, আগুনের শিখায়। বিভিন্ন স্থান থেকে ধুঁয়ার কুন্ডলী মেঘের মতো উড়ছে। অনেক রাস্তায় আগুন। শিখদের ট্যাক্সি, ট্রাক জ্বলছে। সন্ধ্যার মৃদমন্দ বাতাসের সাথে ভেসে এলো শ্লোগান, "ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ, শিখ খুনীদের খতম করো।" জনতার একটি অংশকে আমার অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগুতে দেখা গেল। ভাগমতী উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, "নীচে বলো, তোমার চুল দাড়ি তাড়াতাড়ি কেটে দেই। তাহলে তুমি নিরাপদে থাকবে। ওরা শুধু তোমার বইগুলোই পুড়তে পারবে। দিল্লীওয়ালাদের কাছে বই এর মূল্য নেই।"

আমি ধমক দেই, 'তামাশা করো না। কেউ আমার চুল বা দাড়ি কাটবে না।" আমি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসি। আমার নেমপ্লেট খুলে নেয়ার সময় নেই। তবু একটি রড় দিয়ে সেটি খুলে ফেলি। "এখন কেউ জানবে না, এই অ্যাপার্টমেন্টে কে থাকে।"

ভাগমতী ক্রুদ্ধ হয়, 'তুমি একটা গর্দভ শিখ। ওরা তোমার পড়শীকে জিজ্ঞেস করবে। আমি যা বলি, তাই করো তোমার চুল দাড়ি কেটে দেই। তাহলে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠতে পারবে কিছুদিনের জন্য।"

"না। যা হয় হোক। আমাকে কাবু করার আগে ওদের অন্ততঃ দুএকটিকে খতম করতে পারবো।'

'তুমি বুড্ডা বেওকুফ। তোমার কি কোনদিন হুশ হবে?' ভাগমতী আমাকে গালি দেবে, এমন

ঘটনা ঘটেনি। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আমার পিছনের বাগানের দিক থেকে আসা শোরগোলে আমার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার বাগানের একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে লক্ষ্য করতে থাকি। লোহার রড হাতে প্রায় পঞ্চাশজন যুবক। কারো কারো হাতে পেট্রোলের টিন। তারা গুরুদুয়ারায় প্রবেশ করে। গুরুভাইকে টেনে হিঁচড়ে বের করে রড দিয়ে পিটাতে থাকে। উচ্চকণ্ঠে তার চীৎকার ভেসে আসে, "বাঁচাও বাঁচাও, পুলিশ।" যুবকরা পাল্টা চীৎকার করে, 'এই শালা ভিন্দ্রানওয়ালের বাচ্চা। তোর বাপ এখন তোকে বাঁচাবে।' তারা গ্রন্থসাহিব, রেহাল বের করে আনে। অন্যান্য জিনিসপত্র বাইরে এনে স্তূপে আগুন দেয়। রক্তাপ্লুত গুরুভাই চীৎকার করে, "আমাকে যা খুশী করো, কিন্তু পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অবমাননা করো না। ইশ্বরের দোহাই।"

কেউ বলে উঠে, "পবিত্র গ্রন্থের সাথে হারামজাদাটাকেও জ্বালিয়ে দাও।' তারা তার মাথায় পেট্রোল ঢালে, দাড়ি ভিজায় এবং এরপর অগ্নিকুন্ডের মধ্যে ঠেলে দেয়। গুরুভাই আর্তনাদ করে, দেহ বিকৃত করে এবং এক সময় নিশ্চল হয়ে যায়। যুবকরা বিজয়ের আনন্দে চীৎকার করে। 'ইন্দিরা গান্ধী অমর হোক।'

আমার হাঁটু ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি ভেজা ঘাসের উপর বসে পড়লাম। আমি প্রস্রাব করে ফেললাম। ভাগমতী আমার পিঠ ডলে দিচ্ছে। সে আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করে, "চলো , আমাদের দেখে ফেলার আগেই ঘরে যাই। আমি ঝোপের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে আছি। দেখলাম, একজন হাতে একটি কাগজ তুলে পড়ছে। সে শিখ মেকানিকের গ্যারেজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। জনতা গ্যারেজের দিকে অগ্রসর হয়। মেরামতের জন্য রাখা গাড়ীতে ওরা আগুন ধরিয়ে দেয়। লোকজন ব্যালকনি থেকে তামাশা দেখছে। তাদের কেউ কেউ চীৎকার করে, "গাড়ীগুলো হিন্দুদের। শিখ মেকানিক পালিয়েছে। গ্যারেজে আগুন দিলে গোটা বিল্ডিং এ আগুন লাগবে। আমরা এখানে সবাই হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। তার চেয়ে তোমরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যাচ্ছো না কেন?

জনতা তাই করে। তারা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে যায়। ট্যাক্সি চালকরা প্রস্তুত। তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হয়। ভাগমতী আমাকে ঘরের দিকে টানে। ছয়জন ট্যাক্সি চালক সশস্ত্র জনতাকে মোকাবিলা করছে। নিক্ষিপ্ত পাথর ঠেকাচ্ছে। অসম ভয়াবহ যুদ্ধ। হঠাৎ গুলীর শব্দ হলো। একজন চালক ট্যাক্সির পাশে পড়ে গেল। বাকী পাঁচজন রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। সশস্ত্র পুলিশ ট্যাক্সিগুলো ঘিরে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে মানিব্যাগ, রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার খুলে নিল। এরপর তারা জনতাকে আগুন লাগানোর জন্য ছেড়ে দিল। পুলিশ তাদেরকে মার্কেটে শিখ দোকানগুলোর হদিস দিয়ে দিল। তারা এখন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে দূরে। ভাগমতী আমার ভেজা প্যান্ট পাল্টাতে বললো। নিজেই লজ্জিত হলাম।

আমি আমার সর্বশেষ স্কচ হুইস্কির বোতল বের করলাম। ভাগমতী হুইস্কি পান করে না। কিন্তু আজ সে পান করবে। ক্যাম্পা কোলার সাথে মিশিয়ে তাকে হুইস্কি দিলাম। সে পান করে আরো চাইলো। সে আমাকে পাগল বুধ সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করলো।

তাইতো! সকালে তো আশেপাশেই ছিল। উন্মত্ত অবস্থায় ঘুরছিল। জনতার হাতে পড়ে থাকলে তো এতক্ষণে শিক কাবাব হয়ে গেছে। সে এখানে এলে আটকে রাখতে হবে। ভাগমতীকে বিস্কুট খেয়ে আমার বিছানায় ঘুমাতে বললাম। 'ঘরে এছাড়া আর কিছু নেই।' সে একটা বিস্কুট তুলে নেয় এবং চাপ দিয়ে দেখে। 'কি করে কাঠের মত শক্ত বিস্কুট খাবো? আমার দাঁত নেই। স্কচ ও ক্যাম্পা কোলার মিশ্রণে সেটি ভিজিয়ে নেয় এবং মুখে পুড়ে। এভাবে প্যাকেটের সব বিস্কুট সাবাড় করে ফেলে, আমার জন্য কিছু থাকলো কিনা সেদিকে খেয়াল না করেই। যা হোক, আমার ক্ষুধা নেই। সে বিছানায় চলে যায় এবং কয়েক মিনিট পরই তার নাক ডাকার শব্দ আমার কানে আসে। আমি সোফায় ঘুমাবো।

এরপর রেডিও নিয়ে বসলাম। বিদেশী স্টেশনগুলো ইন্দিরা গান্ধী হত্যার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে। সংক্ষেপে দিল্লীতে শিখদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তান্ডবের কথাও বলছে। শুধুমাত্র রেডিও পাকিস্তানের খবরে দিল্লীতে শত শত শিখ হত্যা ও গুরুদুয়ারা ভস্মীভূত করার খবর দিলো। টেলিফোন বাজলো। "তুমি কি সেই....।" 'হ্যাঁ। টেলিফোনকারী গালিগালাজের ঝড় তুলে, "হারামজাদা, তুই তোর মাকে খুন করেছিস"। আমিও পাল্টা চীৎকার করি, "তুই মাদারচোদ,

তুইই বেজন্মা... । তুই তোর বাপুকে খুন করেছিস। এখন খুব বকবক করছিস।"

টেলিফোনে গালি আমাকে দুঃখ দেয়। আবার টেলিফোন বাজে। এবার বেশ ভদ্র কণ্ঠ। 'ট্যাপের পানি পান করবেন না। শিখরা বিষ দিয়েছে। আবার টেলিফোন আসে। 'পাঞ্জাবে শিখরা ট্রেন ভর্তি হিন্দুকে হত্যা করেছে। সেই ট্রেন দিল্লীতে পৌঁছে গেছে। হিন্দুরা এর প্রতিশোধ নেবে।" আমি কিছু বলার আগেই অপর প্রান্ত রিসিভার রেখে দেয়।

আমি বসে বসে ফোনের অপেক্ষা করি। আর ফোন আসে না। মধ্যরাতে আবার কোলাহল শুনতে পেলাম। শ্লোগান, চীৎকার, লোকজনের দৌড়াদৌড়ি। সবাই জেগে আছে। ট্রাক ভর্তি কিছু যুবক আবার এসে কিছু গাড়িতে আগুন দিয়ে চলে যায়। লোকজন জানালা দিয়ে তাকিয়ে আগুন দেখে। সশস্ত্র পুলিশ কিছুক্ষণের জন্য থেমে অন্য দিকে যায়।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম চেয়ার বসেই। গুরুদুয়ারার দিক থেকে হট্টগোল ভেসে আসায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। দৌড়ে বাগানে এলাম। তখনো ভোরের অন্ধকার। কিন্তু সবাই মনে হলো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা জানালা দিয়ে গুরুদুয়ারার দিকে দেখছে। ভাগমতী টের পেয়ে দৌড়ে এসে চীৎকার করছে, 'শীগগীর ঘরে চলো।' আমি ওর কথায় কান দেই না। ঝোপের মাঝ দিয়ে দেখতে থাকি।

বুধ সিংকে গুরুদুয়ারার চত্বরে দেখলাম খোলা কৃপান হাতে গ্রন্থ সাহিব ও গুরু ভাই-এর দেহভস্মের পাশে। উন্মত্ত দরবেশের মত-সে নাচছে। সমবেত লোহার রডধারী হিন্দু যুবকদের উদ্দেশ্যে গালি ছুঁড়ে দিচ্ছে। শালা মাদারচোদ বানচোৎ 'তোমরা আমাদের পবিত্র গ্রন্থ জ্বালিয়েছ। তোমাদের 'বেদ ও 'শাস্ত্র' এভাবে পুড়বে।

যুবকরা তাকে নিয়ে ইঁদুর বিড়াল খেলে। রড দিয়ে তার পিছনে খোচা দেয়। আবার সামনে গেলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে। বৃদ্ধ বুধ সিং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতোগুলো মানুষের সাথে সে কি করে লড়বে? একজন তার কাঁধে রডের আঘাত করতেই সে শেষবারের মত ভূপাতিত হয়। হাত থেকে কৃপান খসে পড়ে। একজন কৃপাণ তুলে নিয়ে বুধ সিং-এর পশ্চাদদেশে ঢুকিয়ে দেয়। দু'জন গিয়ে তার হাত পিছনে বেঁধে ফেলে। একজন কাঁচি এনে বুধ সিং-এর দাড়ি কেটে দেয়। বুধ সিং যুবকের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেয়। যুবক তাকে থাপ্পড় মারে। চুলের গোছা ধরে তাও কেটে নেয়। তারা আরো মজা করবে। একজন একটি টায়ার নিয়ে আসে। পেট্রোল দিয়ে টায়ারের ফাঁকা স্থান পূর্ণ করে আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিগোলক বুধ সিং-এর গলায় পরিয়ে দেয়। যেন আগুনের মালা। বুধ সিং আর্তনাদ করে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। যুবকরা অট্টহাসি হাসে আর শিখ বিজয়ের শ্লোগান দেয় ব্যঙ্গ করেঃ বোলে 'সো নিহাল- সত শ্রী আকাল।'